সংশপ্তক

শহীদুল্লা কায়সার

বইয়ের নামঃ সংশপ্তক
লেখকঃ শহীদুল্লা কায়সার
প্রথম প্রকাশঃ ১৯৬৫
ভাষাঃ বাংলা
বইয়ের ধরণঃ উপন্যাস
প্রকরনঃ ইপাব (epub), মোবি(mobi)
পঠন সৌজন্যতাঃ ইবাংলা লাইব্রেরী
ইপাব তৈরিঃ আল মোস্তাইন বিল্লাহ

সংশপ্তক

সংশপ্তক শহীদুল্লাহ কায়সারের একটি উপন্যাস। ১৯৬৪ সালে রচিত এই উপন্যাসটি ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে আবদুল্লাহ আল মামুন নাট্যরূপ প্রদান করেন এবং যা বাংলাদেশ টেলিভিশনে সম্প্রচারিত হয়। সংশপ্তক নাটকটি বাংলাদেশে টিভি নাটকের অন্যতম জনপ্রিয় নাটক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সংশপ্তক শব্দের অর্থ হয় জয় না হয় মৃত্যু।

০১-০৫

হারামজাদী ছিনাল।

বজ্জাত মাগী।

খানকী বেইশ্যা।

মিঞাবাড়ির কাচারির সুমুখে লম্বালম্বি মাঠ। মাঠের পর মসজিদ। সে মসজিদের সুমুখে বসেছে বাদ জুমা মজলিস। খানিক দূরে দাঁড়ান ঘোমটা ছাড়া একটি মেয়ে। গালিগুলো ওরই উদ্দেশে।

এই কসবী হারামজাদী! ঘোমটা দে। ধমকে উঠে ফেলু মিঞা। ফেলু মিঞা শুধু মিঞার বেটা মিঞা নয়, গাঁও মজলিসের কর্তা। তার ধমকে কেঁপে ওঠে মজলিস।

আবার দেমাক দেখো না? কিরে খানকি মাগী যারবা পেটে নেবার সময় খেয়াল ছিল না? দেমাগটা তখন কোথায় ছিল? মুনিবের চেয়ে কণ্ঠস্বর আর এক ডিগ্রী চড়া করে খিঁচিয়ে ওঠে রমজান। রমজান শুধু কর্মচারী নয় সব কাজেই ফেলু মিঞার দক্ষিণহস্ত। অতএব, কর্তার রোখ বুঝে তার স্বরের ওঠানামা। তা ছাড়া কানে-কানে চালু কথা, আগাগোড়া ব্যাপারটার পেছনে কাজ করেছে রমজানের পাকা হাত।

কিন্তু মেয়েটি নির্বিকার। এত যে গালি তাতে ভাবান্তর নেই ওর মুখে। একটু হেলছেও না, কাঁপছেও না। মিঞার ধমকে মাথায় ঘোমটা তুলল না ও। একটিবার চেয়ে দেখল না হুকুমদাতা ফেলু মিঞা অথবা রমজানের দিকে। বাঁশের ছিলার মতো দেহটাকে টান করে, ঘাড়টিকে তেরছা করে অদূরের এক খণ্ড চেলা কাঠের দিকে চেয়ে সেই যে দাঁড়িয়ে আছে, আছেই। যারা থুক থুক করছে নীরব অবজ্ঞায় সেই থুতু যেন ফিরিয়ে তাদেরই গায়ে ছিটিয়ে দিচ্ছে।

বিচার শুরু হোক, কে যেন বলল। মাথা নেড়ে সায় দেয় অন্যরা, হ্যাঁ, শুরু হোক।

ফেলু মিঞা অথবা রমজানের মুখ খারাপ করার প্রয়োজন পড়ত না মেয়েটি যদি এক ডাকেই এসে পড়ত। সে আসবে না বলেছিল। বলেছিল তার অসুখ, জ্বর। আর ওই পঞ্চায়েৎ মজলিস-ফজলিস মানে না সে। কী এত-বড় দুঃসাহস ওই খানকি মেয়ের! পঞ্চায়েৎ মানে না! গর্জে উঠেছিল ফেলু মিঞা। পাঠিয়েছিল রমজানকে আর পেয়াদা কালুকে। পেয়াদা চুলের মুঠো ধরে হেঁচড়ে হেঁচড়ে টেনে এনেছে মেয়েটিকে।

হর সখছ যে মোমিন মুসলমান সে গোনাহকে ভয় করে। গোনাহ্ দুই কিসিমের– এক কবীরা গোনাহ্, দোসরা সগীরা গোনাহ্। সগীরা গোনাহর তওবা আছে, মাফ আছে। কিন্তু কবীরা গোনাহর তওবা নেই, মাফ নেই। বড় কঠোর তার শাস্তি। যেনাহ্ কবীরা গোনাহ্। পাটের গোছার মতো লম্বা দাড়ির আগায় আঙ্গুল বুলোতে বুলোতে বলে গেলেন খতিব সাহেব। তিনি হাফিজ-ই-কোরান, সহি হাদিসের মশুর ওস্তাদ। তিনি মসজিদের খতিব। জুমার নামাজ এবং খোতবা দুটোই তিনি পড়ে আসছেন গত পঁচিশ বছর। তাঁর কথা পবিত্র কোরানের বয়াতের মতোই অভ্রান্ত, অবশ্য পালনীয়। তাই তিনি যা বলেন শুধু বলেন না, এলান করেন। কী শাস্তি! কী সেই কঠিন শাস্তি। পঞ্চায়েতের শেষের দিকে বসে আছে গ্রামের ছেলেপুলেরা, মাতব্বর নয় এমন মাঝবয়সীরা। উৎকণ্ঠায় ওদের জিহ্বার তালু শুকিয়ে আসে–কী শাস্তি হবে ওই পতিতার! যেনার বিচার তারা কোনোদিন

দেখেনি শোনেও নি। দুচার মৌজায় যেনার বিচার কখনো হয়েছে কিনা সে কথাও জানা নেই কারও।

শরিয়ত বলে, চুরি করলে যে হাত দিয়ে চুরি করেছে সে হাতটি কেটে দাও, খুন করলে ঠ্যাংটা ছেঁটে ফেল আর যেনা করলে বুক পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে পাথর ছুঁড়ে মার, পাথর ঢেলাতে থাক যতক্ষণ না যেনাকার বা যেনাকারিণীর মৃত্যু হয়। এতটুকু বলে পানের পিক গেলবার জন্য থামলেন খতিব সাহেব।

ছ্যাঁৎ করে ওঠে সেই শেষ কাতারের মানুষগুলোর বুক।–বুক পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে পাথর ঢেলিয়ে মেরে ফেল? এই মেয়েটাকে এভাবেই মারতে হবে? পানের পিকটা পেটের দিকে চালান দিয়ে বোজা চোখে ঊর্ধ্বমুখী হলেন খতিব সাহেব। গভীর চিন্তায় যেন ডুবে গেছেন তিনি। শরা-শরিয়তের জটিল ব্যাপার, না ভেবে উপায় আছে তার? সেই অবস্থাতেই চিবানো পানের দলাটা জিবের আগা দিয়ে ঠেলে ঠেলে বাঁ-গাল থেকে ডান গালে সরিয়ে আনেন। ঠোঁট জোড়া বন্ধ রেখে গরুর জাবর কাটার মতো আস্তে আস্তে চিবোতে থাকেন।

সারা মজলিসের চোখ খতিব সাহেবের মুখের উপর। শরিয়তের এমন কঠিন বিধানটি ঘোষণা করার পরও যখন চোখ বুজে ভাবছেন তখন আরও কিছু নিশ্চয় বলার আছে খতিব সাহেবের। কী বলবেন তিনি?

অবশেষে চোখ খুললেন খতিব সাহেব। সকলের দিকে এক নজর বুলিয়ে বললেন : তবে এই আউরত পয়লা গোনাহ্ করেছে তাই আমি বলি ওকে শুধু দোররা মেরেই ছেড়ে দেওয়া হোক। পাঁচ দোররা।

আরবী ড়-আইন বর্ণটিকে যেমন একেবারে গলার গভীর খাদ থেকে টেনে উচ্চারণ করতে হয় তেমনিভাবে আলাজিহ্বারও নিচ থেকে টেনে টেনে দোররা শব্দটি বার কয়েক উচ্চারণ করেন খতিব সাহেব।

আল্লাহ্ পাক, তুমিই গোনাহ মাফ করনেওয়ালা, মোনাজাতের ভঙ্গিতে হাত জোড়া আকাশের দিকে উঁচিয়ে কথা শেষ করলেন খতিব সাহেব। তার পর কোলের উপর রাখা তসবির ছড়াটা হাতে তুলে নিলেন। তসবি গোটা গুনে গুনে আল্লাহ্ পাকের নাম স্মরণে মন দিলেন।

দোররা? পাঁচ দোররা? ইপাব তৈরিঃ আল মোস্তাইন বিল্লাহ

বুক অবধি মাটিতে পুঁতে ঢিলিয়ে মেরে ফেলবার অমোঘ বিধান শুনে বুক যাদের ছ্যাঁৎ করে উঠেছিল, তারা কী আশ্বস্ত হল? না। আশ্বস্ত হয় না শেষের সারির

লোকগুলো, গায়ের লোমকূপ দাঁড়িয়ে যায় তেমনি একটা ভয়াকুল শিহরণ, একটা অস্পষ্ট গুঞ্জন বয়ে যায় সেখানে। মেয়েটি কেমন করে সইবে ওই ভয়ংকর শাস্তি? তাই ওদের আশঙ্কা। আবার কারও কৌতূহল। চোখগুলো খতিব সাহেবকে ফেলে এবার মেয়েটির উপর নিবদ্ধ হল।

নিঃশঙ্ক ঔদ্ধত্যে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটি যেমনটি প্রথমেই এসে দাঁড়িয়েছিল। ওসব হুমকি ধমক বুঝি বহু শোনা আছে তার, পরোয়া করে না সে। শুধু একবার ডান পা থেকে বাঁ পায়ে নিয়ে এল দেহের ভারটা। অবস্থান পরিবর্তনের আচমকা আলোড়নে ওর অন্তর্বাসহীন দুটি স্তন উত্তাল তরঙ্গের ফণার মতন মাথা তুলে কেঁপে কেঁপে আবার স্থির হয়ে যায়। ডান পায়ের উপর ভর রেখে ছেঁড়া আঁচলটাকে এবার খুব সেঁটে পিঠের এলোমেলো ছড়ানো চুলের উপর দিয়ে পেঁচিয়ে আনল মেয়েটি। তারপর গলার কাছটিতে দোপাট্টা করে বেঁধে নিল। আর সে বন্ধনে ওর ফালি-বাঁশ দেহটি নাভি অঞ্চল থেকে ঈষৎ বেঁকে এল ছিপের আগার মতো। পুষ্ট অথচ ধারালো দেহের ওই বঙ্কিম ভঙ্গিটিই যেন বিদ্রোহের প্রকাশ্য ঘোষণা। হোড়াই পরোয়া করে সে এই পঞ্চায়েতের।

মুহূর্তে চকচকিয়ে ওঠা চোখ জোড়া অন্যদিকে ফিরিয়ে নেয় ফেলু মিঞা। লালা ঝরে রমজানের জিবের ডগায়, লোভী কুকুরের মতো।

একবার আড়চোখে দেখেই মুখ ঘুরিয়ে নেয় খতিব সাহেব। তসবি গোটার উপর দ্রুততর হয় তার আঙ্গুলের সঞ্চালন। দোয়া পড়ে দূরে রাখেন পাপের শয়তানকে– তওবা আসতাগ ফিরিল্লা। তওবা তওবা।

মেয়ে মানুষ। তাকে দোররা মারাটা কী ঠিক হবে, না সম্ভব হবে? মিঞা কী বলেন? প্রশ্নের আকারে জবাবটিও উপস্থিত করে সতুর বাপ। তারপর ভার-ভারিক্কী মুখের তোয়াজটা অপ্রশস্ত হাসির আকারে মেলে ধরে মিঞা অর্থাৎ ফেলু মিঞার দিকে। তিনিই কর্তা, তিনি যা বলবেন সেটাই তো হবে শেষ বিচার, হক বিচার।

গোটা মজলিসের চোখ এবার ফেলু মিঞার দিকে। মোগলীয় হুঁকোর নল হাতে চেয়ারে বসা আতরের খোসবু ছড়ানো ওই যে মিঞার বেটাটি সে কী একটা সাব্যস্তের কথা বলতে পারে না?

ল্যায্য কথাই বলেছে সতুর বাপ। মেয়ে মানুষকে মজলিসের সামনে, বলতে গেলে গোটা গেরামের সামনে বেপর্দা করে দোররা মারা–এ বড় না-জায়েজ ব্যাপার। সতুর বাপের সমর্থনে একটা জোরালো যুক্তিই তুলে ধরলেন কারি সাহেব। তিনিও

হাফিজ ই-কোরান, শরা-শরিয়ত সম্পর্কে তিনি ওয়াকিফহাল। অতএব, ফেলবার নয় তাঁর কথা।

সত্যি-ই তো। গোটা গেরাম না হোক মজলিসের এত লোকের সামনে একটি যুবতী মেয়ের নিতম্বে চাবুক মারা, এ বড় বিশ্রী কারবার। শেষের সারির লোকগুলো মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। ওরা কী বলবে কিছু?

জরী সুতোয় পেঁচানো রাবারের নলটি আলবোলার গায়ে জড়িয়ে রেখে মুখের অবরুদ্ধ ধোঁয়া পরম আয়াশে ঢোকে ঢোকে ছেড়ে দেয় ফেলু মিঞা। চোখ উপরে তুলে অপেক্ষা করে, হাল্কা মেঘপুঞ্জের মতো ধোঁয়াটা যতক্ষণ কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে কাচারির উঁচু চালের সাথে লাগোয়া দমদমায় অদৃশ্য না হয়ে যায়। তারপর মিঞা তরবিয়তে একটু হেলে-দুলে বলল : সতুর বাপ মাতব্বর এবং কারি সাহেব যথার্থই বলেছেন। আমি বলি ওকে ছেঁকা দেয়া হোক। আর গ্রামে গ্রামে বাড়ি বাড়ি ঢোল পিটিয়ে দেয়া হোক ওকে কেউ জায়গা দেবে না, খাবার দেবে না; দিলে এক ঘরে হবে, মেল থেকে বরখাস্ত হবে।

তথাস্তু। মিঞার কথার উপর কী কথা আছে? সকল মাতবর এক বাক্যে সাব্যস্ত করল যেনাহ্ করার অপরাধে হুরমতিকে ছেঁকা দেয়া হবে। এবং একঘরে করা হবে।

মেয়েটি কী একবার কেঁপে উঠল? ভয় পেল?

তেমন কোনো আভাস নেই মেয়েটির চোখে অথবা মুখে। সেই যে চেলা কাঠ-টার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছিল, এতক্ষণে মুখটা তুলেছে ও। চোখ মেলে দেখছে দণ্ডদাতাদের। মেয়েটি গৌরবর্ণা, সুন্দরী বললে খুবই কম বলা হয় বুঝি। জ্বরের তাপে জ্বল জ্বল করছে গৌর মুখখানি। চোখ দুটি কামার চুল্লির গনগনে দুটুকরো লোহার মতো পুড়ছে আর আগুনের হলকা ছোটাচ্ছে। দেমাক নয়, এ তার প্রচণ্ড ঘৃণা। চোখের গর্ত থেকে গরম ধাতুর মতো গলে গলে পড়ছে সে ঘৃণা। বেপরোয়া সেই দৃষ্টিতেও যেন শেষবারের মতো জরিপ করে নিল কে তার শত্রু, কে তার মিত্র। তারপর আগের মতো ঘাড়টাকে শক্ত আর তেরছা করে চেয়ে রইল সেই চেলা কাঠের দিকে। কাঠের মুখটা পোড়া। কেউ হয়ত তামাক খাবার জন্য উনুন থেকে তুলে এনেছিল।

বিচারকরা কেউ তাকাতে পারে না পাপিষ্ঠার সেই জ্বলজ্বলে মুখের দিকে। অবশেষে হুকুম এল ফেলু মিঞার, কালু শুরু কর তোর কাম। ফেলু মিঞার

একাধারে লেঠেল পেয়াদা আর খাস নফর কালু। হুকুম পেয়েই কালু লেগে যায় ছেঁকার এন্তজামে।

যারা মাতব্বর নয় তাদের মাঝে শেষের সারির আগের সারিতে বসেছিল সেকান্দর মাস্টার। মেয়েটি যে ব্যভিচারিণী সে সম্পর্কে তিলমাত্র সন্দেহ নেই ওর। তাই সহানুভূতিও নেই মেয়েটির প্রতি। তবু কী যেন বলার থেকে যায়, ঠোঁটের গোড়ায় এসেও কথাটা বের হতে পারে না। বলাও হয় না।

এক বাজারে দুই ভাও, এটা কোনো দেশি কথা। অল্যায্য কথা। উল্টো পক্ষের বিচারটা কী হবে না? একেবারে শেষের লাইন থেকে অর্ধেক দাঁড়িয়ে বলে লেকু। বলেই টুপ করে বসে পড়ে।

শেষের সারির লোকগুলো একটু নড়েচড়ে বসে ওরই কথায় যেন সায় দিল। এ কী বেতমিজী! মাতবরদের এক মুখের রায়কে বলে কিনা এক বাজারে দুই ভাও? লাল হয়ে ওঠে মাতবরদের মুখ, কিন্তু না শোনার ভান করে চুপ মেরে রইল ওরা।

শুধু ঘাড়টা ফিরিয়ে একবার দেখল সেকান্দর মাস্টার। ওর কথাটাই লেকু বলে ফেলেছে, অতি নিখুঁতভাবে। নিজে বললে, অত পষ্টাপষ্টি বলতে পারত না সেকান্দর মাস্টার।

আসলে কারো কাছেই অস্পষ্ট থাকার মতো নয় ব্যাপারটা। সবাই জানে মেয়েটি ছিনাল, কসবী। পাপের শাস্তি দিতেই হবে। কিন্তু যে হার্মাদ ছেলে আনল ওর পেটে সেও তো এই মজলিসে হাজির। তাকে চেনে না কে! মেয়েটির শাস্তি হলে সে লোকটিরও বিচার হওয়া দরকার বই কী? এটাই সেকান্দরের কথা।

লেকুর কথাটা আমারও। এক হাকিমের দুই বিচার, সেটা অবিচার। রমজান কিছু বলুক। যেন একটা বোমা ফাটাল সেকান্দর। আভাস নয় ইঙ্গিত নয় একেবারে স্পষ্ট কথাটা বলেই ফেলল ও?

কারো পছন্দ হল না কথাগুলো ভাঁটার মতো চোখে ক্রোধ ফাটায় রমজান। ভ্রূ জোড়া কুঁচকে নেয় সতুর বাপ। প্রচণ্ড বিরক্তির সঙ্গে চিলমচিতে পানের পিক ফেলে ফেলু মিঞা।

সেও একটা দিক বটে। মাস্টারের কথাটা গওর করতে হবে আমাদের। তবে ভাই জুম্মা শেষ হল অনেকক্ষণ। বেলা আসর হতে চলল। খাব না আমরা? সামনের মিটিং-এ বিষয়টা আসতে পারে, কী বল মাস্টার? চাতুর্যের সাথেই আলোচনার গলা কেটে দিল ফেলু মিঞা।

মাস্টার অর্থাৎ সেকান্দর আর না করে কেমন করে! বলছে ফেলু মিঞা তার উপর লেকু ছাড়া আর কেউ কী মুখ খুলবে? তেমন কোনো ভরসা দেখছে না ও। অতএব, রফার নামে ধামাচাপার প্রস্তাবটাই মেনে নেয় মাস্টার।

সম্রাট পঞ্চম জর্জের প্রতিকৃতি আঁকা তামার একটি পয়সা। কাঠ কয়লার আগুনে পুড়ে পেয়েছে নতুন এক চেহারা। না আছে সেই মুকুট, না সম্রাটের মুখ, মনে হয় জমাট আগুনের একটি গোলাকার পাত। চিমটে দিয়ে কয়লা থেকে যখন কালু তুলে আনল গনগনে পয়সাটা, গোটা মজলিসে কেঁপে কেঁপে গেল একটি ভীতির ছায়া। শুধু ভাবান্তর নেই মাতবরদের মুখে। আপনাদের বিচারের মানদণ্ডে তারা অবিচল।

ইতিমধ্যেই বসিয়ে দেয়া হয়েছিল মেয়েটিকে। দুজন জোয়ান তার হাত পাগুলো চেপে ধরেছে, যদিও নাকের আদলে ছোট্ট একটি কুঞ্চনে আর বিনা প্রতিবাদে ওদের হাতে হাত-পাগুলো সঁপে দেয়ারও মাঝে কেমন একটা অবজ্ঞা ছিটিয়ে রেখেছে মেয়েটি। যেন বলছে প্রয়োজন কী এই জবর-দস্তির।

এবার রমজান নিজেই এগিয়ে আসে। দুতালুর যাঁতায় থুঁতনিটা চেপে রেখে উঁচিয়ে ধরে ওর মুখখানি। চোখ বুঁজে নেয় মেয়েটি। মেয়েটি কী কাঁপছে? যেমন কাঁপে কোরবানীর পশুগুলো? দূর থেকে লেকু কিছুই বুঝতে পারে না। রমজানের হাতের ফাঁক দিয়ে যতটুকু নজরে পড়ে দেখে দাঁতে দাঁত চেপে কেমন ঝিম মেরে আছে ও। লাল টকটকে ওর মুখ, শরীরের সমস্ত রক্ত যেন মুখে এসে ঠাঁই করেছে। মনে হয় পাকা শসার ছিলকের মতো চিকন মুখের চামড়া ফুঁড়ে এখনি রক্তের ফিনকি ছুটবে।

চিমটের আগায় পোড়া পয়সাটা ধরে এক পা এগোয় কালু, ছ্যাঁৎ করে চেপে ধরে অনেকক্ষণ চেপে রাখে, মেয়েটির কপালের ঠিক মাঝখানে যেখান থেকে কিঞ্চিৎ ঢালু হয়ে নেমে গেছে ওর সুন্দর টিকোল নাকটি আর দুপাশে ছড়িয়ে পড়েছে দুটো কাজল রেখা ভ্রূ।

লেকু দেখল নির্দয় ব্যাধের মুঠোয় অসহায় পাখির ছানার মতো কী যন্ত্রণায় ছটফটিয়ে গেল মেয়েটি। তার পর নিথর হল। মনে হল লেকুর পায়ের তলায় মাটিটা ওর শরীরের ভর আর রাখতে পারছে না। এখুনি বুঝি মাথা ঘুরিয়ে পড়ে যাবে ও। অসহ্য! অসহ্য! আল্লাতালা কী মানুষের রুহগুলো কেড়ে নিয়েছে? সেই যে সিনার নিচে থাকে মানুষের কইলজা সে কী পাথর বনে গেছে? নইলে মানুষ কেমন করে এত বেরহম হয়ে চেয়ে দেখে অমন নিষ্ঠুর নির্যাতন।

কলি। কলি। ঘোর কলি। আল্লার দুনিয়া কী আর আছে? এখন ঘরে ঘরে, মানুষের মনে মনে শয়তানের বসতি। শাস্তি যতই কঠিন হোক শয়তানের গায়ে লাগে না তার আঁচড়। সকলে মিলেই এই রায় দেয় মাতবররা এবং এ যে অভ্রান্ত সত্য তাতে লেশমাত্র সন্দেহ নেই ওদের মনে। প্রমাণ তো হাতের কাছেই। নইলে গাঁ ভর লোকের সামনে এত ঘটা করে হাতপা চেপে ধরে কপালের এক পয়সা পরিমাণ চামড়া পুড়িয়ে দেয়া হল অথচ একটু আহ শব্দ করল না মেয়েটি? তেমন যে পশু ছাগল, কোরবানির সময় কেমন করে দেখনি? ছটফটিয়ে চিল্লিয়ে ঠ্যাং ছুঁড়ে কী একাকার কাণ্ড করে, সামলানো দায়।

হ্যাঁ হ্যাঁ কলিকাল ছাড়া আর কী! সমাজ মানে না, বিচার মানে না, শাসনকে ভ্রুকুটি করে ছোটলোকের জাত। আসকারা পেয়ে ব্যাটার মাথায় চড়েছে, গায়ে ব্যাটাদের চর্বি জমেছে। যেন জনান্তিকেই কথাগুলো বলে গেল ফেলু মিঞা।

ভারত সম্রাট পঞ্চম জর্জের নাম আর প্রতিকৃতি অঙ্কিত কলঙ্ক চিহ্নটি ললাটে নিয়ে চলে যায় মেয়েটি। ঠিক দৃপ্ত ভঙ্গিমায় নয়, এতক্ষণে ওর শক্তি ফুরিয়ে এসেছে পা জোড়া ঠিকমতো ভার সামলাতে পারছে না। যন্ত্রণার কালো কুঞ্চনে বিকৃতি নেমেছে ওর মুখে আর জল জমেছে চোখে।

ব্যভিচারিণীর সমুচিত দণ্ড বিধান করতে পেরে স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ে ফেলু মিঞা। ঠোঁটের দৃঢ়তায় তার শক্তি আর মর্যাদার সদম্ভ ঘোষণা।

ইয়া পরোয়ার দেগার! গোনাহগার বান্দার সকল গোনাহ্ তু-ই মাফ করনেওয়ালা। সকলের হয়ে খোদার কাছে মাফ চেয়ে নিলেন খতিব সাহেব। তসবীর ছড়াটা পকেটে পুরে বিদায়ের জন্য মিঞার অনুমতি চাইলেন।

ক্রুর উল্লসিত দৃষ্টি রমজানের। সে দৃষ্টিটা অনেকক্ষণ ধরে পড়ে থাকে মিয়া মসজিদের উত্তর কোণের দিকে, যে দিক দিয়ে এই মাত্র চলে গেল মেয়েটি।

ব্যাটা বদমাস। হারামখোর। তুমি সাজ সাধু? এক রোখা শুয়োরের মতো গোঁৎ গোঁৎ করে তেড়ে আসে লেকু। এখনি বুঝি ঝাঁপিয়ে পড়বে রমজানের উপর।

চোখের পলকেই বেধে যেতো তুমুল কাণ্ড। ঠিক সময়টিতেই সেকান্দর লাফিয়ে পড়ল ওদের মাঝখানে।

কর কী? কর কী? বুড়ো কারি সাহেবও ধরে ফেললেন লেকুর হাতটা। দেখলেন দেখলেন হুজুর। আপনার সামনেই? ভাঁটার মতো চোখে ক্রোধ শানিয়ে গর গর করে রমজান আর নালিশ জানায় মুনিবের কাছে।

সুচতুর মিঞা সকল তূণেই অস্ত্র মজুদ রাখতে হয় তাকে। নইলে মিঞাগিরি চলে না। একটু হেসে বলল ফেলু মিঞা থাক্ আর কথা বাড়াও কেন। এদিকে এসো, চৌদ্দ নম্বর তৌজির তহসিল খাতাটা বের করে রাখ। কাজ আছে। আমি ততক্ষণে খেয়ে আসি।

০২.

ভোঁ দৌড়ে চলে আসে মালু। ইপাব তৈরিঃ আল মোস্তাইন বিল্লাহ

জানো রাবু আপা! হুরমতি বুয়াকে ছেঁকা দিয়েছে। ইস্ কী যে তাঁতাল পয়সাটাকে লাল আগুনের মতো হয়ে গেল, দিল চেপে হুরমতি বুয়ার কপালে। ক্ষোভে কান্নায় উত্তেজনায় স্বরটা প্রায় বন্ধ হয়ে আসে মালুর। ওর বার বছরের জীবনের এ হল নিষ্ঠুরতম ঘটনা।

শুনলে তো বড় আপা! তোমার মামাটা কী রকম হার্মাদি শুরু করেছে। সাতদিনও হল না বেচারীর বাচ্চা হয়েছে। এরি মধ্যে কী টানা হ্যাঁচড়া। বড় আপা অর্থাৎ আরিফা রাবুর চেয়ে দুবছরের বড়। তাই বড়র গাম্ভীর্যটা ছেলেমী উৎসুক্যে ক্ষুণ্ন না করে তাকাল মালুর দিকে। শুধাল হুরমতি এখন কই রে?

উত্তরটা দিতে গিয়ে এবার কেঁদেই ফেলল মালু। জড়িয়ে জড়িয়ে ভেজা গলায় বলে, জানেন বড় আপা! এই, এত বড় ঘা হয়েছে। দেখলে ডর করে। হাতের আঙ্গুলগুলো সাজিয়ে ঘায়ের আয়তনটা দেখাতে চেষ্টা করে মালু। তারপর সার্টের খুঁটে চোখগুলো রগড়ে রগড়ে মোছে, জবাব দেয় বড় আপার প্রশ্নের–হুরমতি বাড়িতে। বলেই উল্টোমুখী হয় মালু। ওকে এখুনি ছুটতে হবে রাশুদের বাড়িতে, খবরটা দিতে হবে রাশুকে। আজ সে সিন্নি খেতেও যায়নি, পঞ্চায়েতের এমন হুলস্থূল শাস্তিটাও দেখতে যায়নি। কেন, সেও এক দ্বন্দ্ব মালুর মনে।

একটু দম নিয়ে ছুট দেবে মালু। এরি মাঝে কিসে যেন কী হয়ে গেল। মুখ ঘুরিয়ে দেখবার অবকাশ পেল না। দুমদাম কিল থাপ্পড়ে পিঠটা তার জর্জরিত হল কান আর গালের উপর শক্ত শক্ত চড় পড়ল। আর সাথে সাথেই শুনল যে কণ্ঠটিকে সে পৃথিবীতে সব চেয়ে বেশি ভয় করে সেই কণ্ঠের নিত্যকার শোনা গালি হারামজাদা কামিনা, ডাকতে ডাকতে ঝাঁঝরা হয়ে গেল মাথাটা। লেখা নাই, পড়া নাই শুধু ড্যাং ড্যাং।

মালু জানে গালির মাত্রাটা যতই উচ্চগ্রামে পৌঁছাবে ততই কমতে থাকবে প্রহারের মাত্রা। তাই টানে টানে মাথাটা মার হাতে সঁপে দিয়ে সুবোধ ছেলেটির মতো

অপেক্ষা করে কখন একটু ঢিল পড়বে মারের।

কানটারই ব্যথা সবচেয়ে বেশি। টন টন করছে কানের সাথে সাথে মাথাটাও। এদিক ওদিক একটু ঢিল দিয়ে একটু শক্ত করে দেখল মালু কিন্তু উপায় নেই। আজ কিছুতেই ফস্কাচ্ছে না মায়ের আঙ্গুল। যেন চিমটের মতো কামড়ে রেখেছে মালুর কানটা। কিন্তু সুযোগটা অকস্মাৎ এসে গেল। মার ডান হাতটা সবে একটু ক্লান্ত হয়ে আসছিল অতর্কিতে সেই হাতটাই খামচে দিল মালু। তখখুনি ছুট দিল দরজার দিকে। সেখানে বাঁধা পড়ল রাবুর হাতে।

খোদার কহর পড়ুক তোর উপর, জাহান্নামে যাবি তুই। জল্লাদ হবি। বাপের নাম ডুবাবি... কোত্থেকে একখানি কঞ্চি জোগাড় করে তেড়ে আসেন মা। ব্যথা পেয়েছেন তিনি। ডান হাতের নিচে প্রায় এক আঙ্গুল চামড়া খামচে দিয়েছে মালু। কয়েক ফোঁটা রক্তও জমেছে। এই কঞ্চিটা আজ তোর পিঠে আমি গুঁড়ো করব, তোর হাডডি মাংস একসার করব। মা প্রায় ধরে ফেলেন মালুর চুলের ঝুটি।

মাফ করে দেন খালা। আমিই ওকে শাসন করছি। দুহাত বাড়িয়ে মারমুখী মালুর মাকে রুখে দাঁড়ায় রাবু।

কথায় বলে, বাপ যদি হয় আলেম ছেলে হয় জালেম। এই ছেলে ঠিকই জালেম হবে। লাই দিয়ে দিয়ে ওকে নষ্ট করছে তোমরা। বিদ্যে-বুদ্ধি কিচ্ছু হবে না, এই ছেলে জালেম হবে, জল্লাদ হবে। কহর দিতে দিতে চলে যান মা।

রাবুর আঁচলের তলায় খুক করে হেসে দেয় মালু। এটা ওর বরাবরের কৌশল। রাবু আপার আঁচলে আশ্রয় নিয়ে হাডডি মাংস একসার হওয়া থেকে অনেকদিন রক্ষা পেয়েছে ও। আজও রক্ষা পেল। আঁচলের ভেতর থেকে ওর কানটি খুঁজে নিয়ে টেনে ধরে রাবু বলে সত্যি জল্লাদ হবি তুই। মাকে এমন করে খামচায়। কষ্ট পায় না মা? রাবু আপার শাসনটাও মিষ্টি, মার কর্কশ আদরের পাশাপাশি কথাটা সব সময় মনে পড়ে মালুর আজও মনে পড়ল। কানের সেই টন টনে ব্যথাটা যেন ভুলে গেল ও।

একগাল হেসে বাঁ কানটি বাড়িয়ে দেয় রাবুর দিকে বলে, দেখনা টেনে টেনে কেমন লাল করে দিয়েছে। আমার বুঝি কষ্ট লাগে না! বলতে বলতে গলাটাও কী এক অভিমানে ভারি হয়ে আসে ওর।

হেসে দেয় রাবু। আরিফাও ওর বলার ঢংয়ে না হেসে পারে না। কিন্তু পরমূহূর্তেই গম্ভীর হয়ে যায় রাবু। দৌড়ে যায় উঠোনের দিকে। ফিরে আসে এক মুঠো মাটি

নিয়ে। মাটিটা মালুর হাতে দিয়ে বলে, এই মাটি ছুঁয়ে বল আর কখনো খামচাবিনা খালাকে, নইলে আমিই পিটিয়ে তোর হাডডি-মাংস একসার করবো।

না, আর কখনো খামচাবো না, মাটি ছুঁয়ে বলতে গিয়ে এবার কেন যেন কাঁদো কাঁদো হয় মালুর স্বরটা।

চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাক এখানে, আমাদের নিয়ে যেতে হবে, বলে শোবার ঘরের দিকে চলে যায় রাবু। কিছুক্ষণ বাদ বেরিয়ে আসে তোয়ালে জড়ানো একটা পুঁটলি নিয়ে।

নে চল এবার, বলল রাবু; সামনে সামনে যাবি, লোক দেখলেই হুঁশিয়ারি করে দিবি।

হুঁশিয়ারির ব্যাপারটা শুনেই বুঝে নেয় মালু কোথায় যেতে হবে। বীর পুরুষের মতো বুকটাকে ফুলিয়ে তোলে, হাফ প্যান্টের পকেটে হাত পুরে ছটফট করে কখন রাবু পা বাড়াবে।

এ তো বাড়াবাড়ি, সত্যি বাড়াবাড়ি। মুরুব্বির মতো গম্ভীর আর কেমন ভারিক্কী মেজাজে বলে আরিফা।

জানালা দিয়ে ও এতক্ষণ দেখছিল রাবুর কাণ্ডটা। টিন খুলে বিস্কুট বের করেছে রাবু। আলমারি থেকে বের করেছে সাবুদানা, তোরং খুলে বের করেছে। তুলো আর কী একটা মলম। সব এক জায়গায় করে বেঁধেছে তোয়ালেটায়।

খারাপ মেয়ে ছিনালী করেছে, যোগ্য সাজাই পেয়েছে। তাতে তোর অত দুশ্চিন্তা কেন? জোরে জোরেই বলে আরিফা।

রাবু যেন শুনতেই পায় না ওর কথা। একটু ভ্রূক্ষেপ না করে মালুর হাতটা ধরে পা তোলে।

ওর এই গোয়ার্তুমিটাকেই দুচোখে দেখতে পারে না আরিফা, গাছে চড়তে গিয়েও এমনি করে ও। হয়ত সরু ডালে ভর্তি গাছটা, আরিফা না করল উঠিসনে, ব্যস তখুনি ওর রোখ চেপে গেল, উঠতেই হবে ওই গাছের মগডালে।

ডাকবো আম্মাকে? পেছন থেকে চেঁচিয়ে বলে আরিফা। চিত্রার্পিতার মতো দাঁড়িয়ে যায় রাবু। আতঙ্ক বিবর্ণ মুখটি এতটুকু হয়ে যায়।

হি হি করে হেসে উঠে আরিফা, তুই কী একলাই যাবি? আমি বুঝি যেতে পারি না!

আরিফার কথায় আশ্বস্ত হলেও রাগ পড়ে না রাবুর, এমন করে ভয় দেখানোর কোনো মানে হয়?

আম্মা, খালা, সবাই পাক ঘরে। সাঁ করে বেরিয়ে যায় ওরা। বাড়ির পেছনেই পুকুর। পুকুরের পর সুপুরি বাগিচা। বাগিচা পেরিয়ে গাং। গাংয়ের ওপারে মাঝিবাড়ি। তারপর গ্রামের রাস্তা। এই রাস্তার কাছে এসেই থমকে দাঁড়াতে হয় ওদের। কারা যেন আসছে রাস্তা দিয়ে। মালু রাস্তার কিনারেই দাঁড়িয়ে থাকে। রাবু আর আরিফা ঝট করে সরে যায় মাঝিবাড়ির বেতঝোপের আড়ালে।

ছয় মাস আগেও এ-রকম ছিল না অবস্থাটা। সারা গ্রাম চষে বেড়াত ওরা দুবোন। গাছে চড়ত, ফল পাড়ত সাঁতার কাটত বাইর বাড়ির বড় পুকুরটায়। সে সব বন্ধ হয়েছে। আরিফার আম্মা, রাবুর জেঠি আম্মা, তিনি একদিন ফজরের নামাজ শেষে জায়নামাজটায় বসে বসেই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন ব্যাপারটা।

শোন আরিফা। শোন রাবেয়া। তোমাদের চুল বাঁধতে হবে টেনে; খোঁপা করে। এলোচুলে শয়তান ভর করে। ঘোমটা রাখতে হবে মাথায়, বাড়ির বাইরে যাওয়া চলবে না, এমনকি বাইর বাড়ির বা কাচারী ঘরেও না। কথা বলতে হবে আস্তে আস্তে। বাড়ির পুরুষরাও যেন শুনতে না পায়। চেঁচানোটা হল অসভ্যতা, ছোটলোকরাই চেঁচায়। পরপুরুষদের সুমুখে বের হবে না। বাড়ির চাকরদের সুমুখেও না। এক এক করে নির্দেশগুলো বুঝিয়ে দিয়ে তিনি বলেছিলেন, তোমরা এখন বড় হয়েছ, বালেগা হয়েছ।

বিস্ফারিত চোখে ওরা শুনে গিয়েছিল, ভুলে যেতেও চেষ্টা করেছিল। কিন্তু পরবর্তী কয়েকটি মাসে ভালো করেই বুঝে নিয়েছে ওসব ভুলে গেলে চলে না। আমল করতে হয়। অবাধ্যতার জন্য কম মার খায়নি ওরা। মার খেয়ে খেয়ে ভয় জন্মেছে ওদের, তাই সবদিক সামলে-সুমলেই নিয়ম ভাঙে ওরা। কিন্তু একটা ব্যাপার ওরা কিছুতেই বুঝতে পারছে না কখন বড় হয়ে গেল ওরা। আর হলই যদি বা তফাৎটা কোথায়? এই তফাৎটা বুঝতে পারছে না বলেই গত ছমাস ধরে গালটা তিরস্কারটা মালুর মতোই ওদের নিত্য পাওনা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

না, অপরিচিত কেউ না। সতুর বাপ পেছনে ছেলের কাঁধে সুপুরির ভার চাপিয়ে চলেছে হাটে।

ধাৎ ও তো সতুর বাপ। আমি ভাবলাম কে-না কে। বেতের কাঁটায় আটকে যাওয়া শাড়ির প্রান্তটা সন্তর্পণে আলগা করে ঝোঁপ থেকে বেরিয়ে আসে রাবু। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে বাপ-বেটার চলার দিকে। ছোপ ছোপ সবুজ আর হলুদ রং কাঁচা-

পাকা সুপুরিগুলো ভারি সুন্দর। ভারের দুপাশে ঝোলান থোকগুলো দ্রুত পায়ের উঠতি-পড়তি বেগে দুলে দুলে এ ওর গায়ে ঢলে পড়ছে আর ভারটি দুপাশে বেঁকে আসছে ধনুকের মতো। তন্ময় হয়ে দেখে রাবু, এ সব দৃশ্য দেখা নাকি নিষিদ্ধ ওদের।

থোকে থোকে ক্রমাগত ধাক্কা খেয়ে গোটা দুই সুপুরি ঝরে পড়ে রাস্তায়। দুকদম এগিয়ে মালু চট করে তুলে নেয় প্যান্টের পকেটে! ইশারা দেয়, এসে পড়, রাস্তা সাফ।

তুই বুঝেছিস ঘোড়ার ডিম, ঝোঁপের আড়াল থেকেই বলে আরিফা।

কী বলছিস! সুপুরি থোকের উপর থেকে চোখ তুলে আরিফার দিকে তাকায় রাবু।

চেনা-অচেনা কারো সুমুখেই যেতে পারবিনে। সেই হল গিয়ে পর্দা।

ধ্যাৎ তা হবে কেন? সতুর বাপ, সেই ছোট্টটি থেকে দেখছে আমাদের। ওর সামনে আবার পর্দা কী রে?

তাই তো বলছি তুই বুঝিস না কিছুই। আরে বেকুফ অচেনা লোক হঠাৎ করে দেখে ফেললে বরং ক্ষতি কম, চেনা লোকে দেখলেই তো মুশকিল। ওরা বদনাম করে। এখানে-সেখানে রটিয়ে বেড়ায়।

রাবু বুঝতে পারে না ওর কথা। বুঝি ভালো করে বুঝবার জন্য ওর কাছে। এসে দাঁড়ায়, বলে, তা হলে তুই বলতে চাস ওই সতুর বাপ বুড়োর সামনে আমাদের বের হওয়া চলবে না?

আলবৎ না। সেই যে–গেল বছর আমরা কোলকাতা গেলাম কী বলেছে মেজো ভাই মনে নেই?

কী বলেছে?

আহ্, তুই কিচ্ছু মনে রাখতে পারিসনে। আম্মাকে নিয়ে আমরা সিনেমা গেলাম না? ঘোর আপত্তি ছিল না আম্মার? মেজো ভাই যখন বুঝিয়ে বলল, সিনেমায় সব বিদেশি বেগানা লোক, ওরা দেখলে পর্দা ভাঙে না। চেনা লোকের কাছেই তো পর্দার দাম। তারপর সে না রাজি হলেন আম্মা সিনেমা দেখতে?

মেজো ভাই সব সময়ই উল্টো-পাল্টা চালায়, সে আমার জানা আছে। গম্ভীর হয়ে বলল রাবু!

বুঝি আরো কিছু বলতে যায় আরিফা। কিন্তু থেমে যেতে হয়। ওদিকে অধৈর্য হয়ে মুখ খিঁচিয়ে চলেছে মালু–সাধে কী গুরুজনরা বলেন মেয়েদের নিয়ে বেরিয়ো না রাস্তায় ওরা পথের মাঝেই কোঁদল বাধায়। কবে ঠাট্টা করে কথাটা বলেছিল জাহেদ, ওদের সবার মেজো ভাই, মালু মনে রেখে দিয়েছে। আজ সুযোগ বুঝে ঝেড়ে দিল কথাটা।

ওর মুরুব্বিপনা দেখে মুখ টিপে হাসে রাবু বলে, মেজো ভাইকে তো আচ্ছা পীর ঠাউরেছিস, তোর আর ভাবনা কী?

কয়েক লাফে রাস্তাটা এক রকম টপকে চলে আসে ওরা। ভুঁইঞা বাড়ির পেছন দিক দিয়ে কারি বাড়ির পাটি পাতার জঙ্গলে ঢুকে পড়ে। এর পর একটা লম্বা ধানক্ষেত। ক্ষেতের ওপারে হুরমতির বাড়ি।

এতদূর এসে শেষে ওই ক্ষেতটাই বুঝি ওদের আটকে রাখল। ক্ষেতের এক দিকে সদর রাস্তা। অন্য দিকে মিঞাদের নারকেল-সুপারির বাগিচা। দুদিকেই লোক চলাচল।

হাফ প্যান্টের দুপকেটে দুহাত গুঁজে ক্ষেতের আলটা ধরে ছোট ছোট পায়ে এগোয় মালু। কিছুদূরে গিয়ে পকেট থেকে বাঁ হাতটা বের করে তালুটা প্রসারিত করে মালু অর্থাৎ এগিও না, রাস্তা মুক্ত নয়।

কতক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা যায়! মশার কামড় খেয়ে চটে যায় আরিফা : মশা আর আস্ত রাখবে না আজ। তার উপর বাড়ি ফিরে আম্মার কিল। সবই তোর জন্য। রাবুও রেগে ছিল। এই মাত্র একটা লাল-কালো পিঁপড়ে মুখ খিঁচিয়ে কামড় বসিয়ে দিয়েছে ওর কবজির গোড়ায়, সেও জবাব দেয় তিরিক্ষি মেজাজে : আমি খুব পায়ে ধরে সেধেছিলাম কিনা? এলি কেন?

সংকেত আসে না মালুর। মাঝে মাঝে গোড়ালিটা উঁচিয়ে পায়ের আঙ্গুলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে লম্বা হতে চেষ্টা করছে ও। যাতে দূর বাঁকটাও দেখতে পায় সহজে। কাজটায় রীতিমতো হাত পাকিয়ে ফেলেছে মালু। রাবু আর আরিফা যেদিন থেকে পর্দা নিয়েছে সেদিন থেকেই মালু ওদের আইন অমান্যের বিশ্বস্ত সহচর। এই তো সেদিন লস্কর বাড়ির বিয়েটা দেখিয়ে আনল রাবুকে। বড় শখ ছিল রাবুর কনে সাজানো দেখবে। তা দেখেছে বই কী!

আর মান্দার বাড়ির জাম খাওয়া? সে তো একবারে দিন-দুপুরের ব্যাপার। ইপাব তৈরিঃ আল মোস্তাইন বিল্লাহ

.

মান্দার বাড়ির ভুতি জামের তুলনা হয় না, যেমন মিষ্টি রস তেমনি পুরু মাংস ভেতরে দানা এক রকম নাই বললেই চলে। রাবু আপা বলল, ওই জাম খেতে হবে এবং গাছে বসেই। মালু তো খুশিতে ডিগবাজি খায়। পাঁচবেলা নামাজের মাঝে যোহরটাই সবচেয়ে দীর্ঘ। তার উপর যোহর সেরে আম্মা ওজিফা পড়েন, সেও বেশ সময় নিয়ে। ওই সুযোগেই কেটে পড়েছিল ওরা। নামই মান্দার বাড়ি, কবেকার ছাড়াবাড়ি কে জানে! সৈয়দদেরই সম্পত্তি, এখন গাছগাছালির জঙ্গলে ভর্তি। তাও সব যে মান্দার তা নয়, আম-জাম-কাঁঠাল, সব গাছই রয়েছে কম বেশি। সে কী ফুর্তি রাবুর! ডালে ডালে ঘুরে ঘুরে বেছে বেছে সবচেয়ে সেরা জামগুলো পেড়েছে ও। ছুঁতে গেলেই রস বেরিয়ে পড়ে এমনি টসটসে জাম এক আঁচল ভর্তি করে বসেছিল চওড়া দেখে একটি ডালে, পা দিয়েছিল নিচের দিকে ঝুলিয়ে। আর সেই অবস্থাতেই টপাটপ এক আঁচল জাম শেষ করেছিল রাবু। আর মাঝে মাঝে দুএক মুঠো ফেলে দিচ্ছিল নিচের দিকে। সার্টের খুঁট পেতে ধরে নিচ্ছিল মালু। ওর তো পাহারা দেবার কঠিন দায়িত্ব, গাছে চড়লে চলবে কেন? তবু ওতেই আনন্দ ধরছিল না ওর। রাবু আপাকে খুশি করে এত আনন্দ পায় ও! কথাটা যেন আজই প্রথম মনে করল ও। আর মনে করে ওর বুকটা যেন হঠাৎ লাফিয়ে অনেক উঁচু আর চওড়া হয়ে যায়।

কিন্তু বড় আপার খেয়াল খাসলতটা দিন দিন কেমন যেন বদলে যাচ্ছে। এমনিতেই একটু ভীরু বড় আপা। তার উপর আজকাল ভারিক্কি হচ্ছে। মেজাজটা হচ্ছে পাকা গিন্নীর মতো। আর সবতাতেই পিছুটান। অথচ ইচ্ছারও কমতি নেই। আগ্রহ আছে গাছে চড়ে জাম খাবার, কিন্তু মনের ভেতর রয়েছে ভয়। সেদিন মান্দার বাড়িতক পৌঁছেও শেষ সময় আচ্ছা এক ব্যাগড়া বাধিয়ে দিল।

যোহরের সময় গাছে চড়তে নেই। শনি ধরবে বলেছিল আরিফা এবং রাবুকে বাধা দেবার জন্য রীতিমতো টানা-হ্যাঁচড়া শুরু করেছিল।

মিথ্যে কথা। কতদিন চড়লাম। ওর নিষেধটাকে একটুও গ্রাহ্য না করে রাবু শাড়ির আঁচলটা আঁট করে নিয়েছিল কোমরের চারপাশে।

এই শোন।

তাড়াতাড়ি বল। আজকাল কথা বলতে বড় বেশি সময় নিস তুই।

একটুও তর সইছিল না রাবুর।

আমি বলি মালুকে চড়িয়ে দে না গাছে। ও পেড়ে পেড়ে নিচে ফেলুক। আমরা আঁচল বিছিয়ে ধরি।

মালুকে যদি শনিতে ধরে? ওর জানটার বুঝি দাম নেই? দিন দিন কী যে হচ্ছিস তুই বড় আপা! জাম গাছের মোটা কাণ্ডটা দুহাতে জড়িয়ে ধরে তর তর করে উঠে গেছিল রাবু।

ওজিফা তেলাওয়াত শেষ করে আম্মা এসে দেখেন অঘোর ঘুমুচ্ছে রাবু আর আরিফা।

এই আরিফা, এই রাবেয়া! কী যে অলক্ষ্মী হয়েছিস তোরা। দেখ তো দালানের ছায়াটা উঠোনের শেষ মাথায়, বেলা আসর ধরে ধরে। এখনো ঘুমুচ্ছিস তোরা? ওঠ, ওঠ। তাড়া দিয়ে রান্না ঘরের দিকে চলে গেছিলেন আম্মা। আর দাওয়া থেকে দেখছিল মালু, মুখে আঁচল পুরে হাসি চাপতে গিয়ে কী বিষম খাচ্ছে রাবু।

এমনি করে নিয়ম ভাঙে ওরা। ধুলো দেয় আম্মার চোখে। মালু ওদের ডান হাত, বাঁ হাত, পথের দিশারী। আর যখন ধরা পড়ে যায়? উহ্, সে কথা মনে করতেও ছ্যাঁৎ করে ওঠে মালুর বুকটা। মনে হয় এখনো কঞ্চির বাড়িগুলো জেগে আছে ওর পিঠে।

সেদিন আম্মা গিয়েছিলেন তাঁর বাপের বাড়ি মিঞা বাড়ি। রাবুর তো মহাফুর্তি। গোটা একটা দিন কোনো পর্দা নেই, শাসন নেই! কী মজা! আম্মার ছায়াটা মিলিয়ে যেতেই তিনজনে মিলে টুক করে সটকে পড়ল। মাঝি বাড়ির লাগ সৈয়দদের একটা পুকুর। সে পুকুরটা সেঁচা হয়েছে কিছুদিন আগে। মাছটাছ মারা সে পর্বও শেষ। কিন্তু কয়েকদিন ধরেই ওরা খবর পাচ্ছে পাঁকের তলায় লুকিয়ে থাকে যে সব মাছ সিং মাগুর-বাইম-কৈ, তারা সব পাঁক খেয়ে খেয়ে এখন উপরে উঠে আসছে। পাঁকের গায়ে গায়ে শুধু মাছ আর মাছ। এমনিতেই পুকুর সেঁচার সময় যেতে পারেনি ওরা না আরিফা না রাবু। অথচ সেই থেকে ছনবন করছে ওদের মনটা।

পাঁক ঘেঁটে ঘেঁটে কাদায় সারা গা একাকার করে আশ মিটিয়ে মাছ ধরল ওরা। এ ওর গায়ে কাদা ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারল। মাছ ভেবে সাপের গলা টিপে ধরে চমকে উঠল। সিং মাছের কাঁটা ফুটিয়ে আঙ্গুল বিষ করল। যেন কত জন্মের অন্ধ অবরোধ ভেঙে বেরিয়ে এসেছে ওরা দুজন। মুক্ত আলো-বাতাসের ছোঁয়া পেয়ে আনন্দে নেচে উঠেছে ওরা, সেই পাঁক কাদার রাজ্যে বসিয়ে দিয়েছে আনন্দের হাট। আর সেই আনন্দ মেলার কর্ণধার মালু। না : রাস্তার লোক চলাচল বন্ধ হওয়ার কোনো

আলামত দেখছে না মালু। খেয়ালই ছিল না যে আজ হাটবার। খেয়াল থাকলে এমন সময় কখখনো বের হত না ও।

হঠাৎ ওর নজর পড়ে মিঞাদের নারকেল-সুপুরি বাগিচার দিকে। ক্ষেত থেকে একটা ছাগল খাসিকে কে যেন তাড়া করে নিয়ে চলেছে বাগিচার দিকে। লোকটা যেন চেনা চেনা মনে হলো। কিন্তু সেদিকে নজর দেবার ফুরসুতও নেই, প্রয়োজনও নেই মালুর। আসল বিপদের জায়গা হল রাস্তাটা। সেটা যদি একটু ফাঁকা পায় তা হলেই নিশ্চিন্ত হয়ে রাবুদের ইশারা দিতে পারে মালু।

যথেষ্ট আক্কেল হয়েছে এবার চল, বিরক্ত স্বরে বলে আরিফা। পিঁপড়ে আর মশার কামড় খেয়ে রাবুরও মেজাজটা কম খাট্টা হয়নি। তার উপর কয়েকটি শুকনো পাটিপাতার ঘষা লেগে হাতের চামড়াটা জ্বালা করছে। কিন্তু রেগেই-বা লাভ কী? কার উপরই বা রাগবে? এতদূর এসে ফিরে যাওয়ারও কোনো অর্থ হয় না। নিরুত্তর থাকে রাবু। হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে–বড় আপা, বড় আপা তোর মাথার উপর সাপ। ভয়ে-আতংকে কোনদিকে ছুটবে দিশে পায় না আরিফা। কয়েকটা পাটিপাতার ডালসুদ্ধ ভেঙে নিয়ে হুড়মুড়ি খেয়ে পড়ে যায় ও।

তুই তো আচ্ছা ভীতু হয়েছিস? হি হি করে হাসে রাবু। শাড়ির প্যাঁচটা একটু আল্গা করে বুকে থুতু ছিটোতে ছিটোতে উঠে দাঁড়ায় আরিফা। কাঁপছে গা-টা। রেগে টং হয়, এমন করে ভয় দেখাস তুই?

বেশ করেছি। ফিরি ফিরি করে দিক করছিলি কেন এতক্ষণ?

দুটো মেয়ে মানুষ এক সাথে হয়েছে কী চুলোচুলি করবেই, সেয়ানা ঢংয়ে বলে মালু আর মুখ খিঁচোয়। আহ্ রাবু আপা জলদি কর না, সেই কখন থেকে হাত ইশারায় ডাকছি তোমাদের! এবার চিল্লিয়ে ওঠে মালু। মাঝারি গোছের একটা দৌড় দিয়েই ওরা পৌঁছে গেল হুরমতির বাড়ি। গেরস্ত বাড়ির মতো নয়। বেল গাছের তলায় ছোট্ট উঠোন, একটি মাত্র ঘর। কিন্তু টিনের চালা। নবজাতককে পাশ দিয়ে শুয়ে রয়েছে ও। গালের উপর হাতটি রেখে চমকে উঠল রাবু। হুরমতির গা পুড়ে যাচ্ছে।

জ্বরের ঘোরেও রাবু-আরিফাকে চিনল হুরমতি উঠে বসতে চেষ্টা করল। পারল না।

হুরমতির কপালটার দিকে তাকাতে বড় কষ্ট হয় রাবুর। এক দলা ঝলসানো মাংস ফুলে নাকের দিকে ঝুলে পড়েছে। বীভৎস কদাকার। হা আল্লা! এমন জুলুম মানুষ

মানুষের উপর করে? গায়ের চামড়া পুড়িয়ে দেয়? কাঁচা হলুদের মতো রং এমন সুন্দর কপাল হুরমতির। কোন্ নিষাদের হাত উঠল সে কপালে? চির জন্মের মতো কালো কলঙ্ক এঁকে দিল? খসে পড়ুক সে হাত। বাজ পড়ুক সে হার্মাদের মাথায়। মনে মনে যেন প্রার্থনা করল রাবু।

এক পয়সার ঘায়ের উপর পুরু করে মলম মাখল রাবু। তারপর তুলো বসিয়ে বেঁধে দিল কপালটা।

ঘরে উল্টো কোণায় হাঁড়ি-পাতিল নিয়ে নাড়াচড়া করছে লেকুর বৌ আম্বরি। এগিয়ে এসে বলল, লেকু ওকে পাঠিয়ে দিয়েছে, ও থাকবে হুরমতির সাথে। ভালোই হল। আশ্বস্ত হয় রাবু। আম্বরিকে পাঠিয়ে দেয় সাগু জ্বাল দিতে। তারপর আরিফা শুদ্ধ মাটির ঘড়ায় করে পানি তুলে আনে ডোবা থেকে। প্রায় তিন ঘড়া পানি নিঃশেষ করে হুরমতির মাথায়।

নগ্ন লালসা আর কদর্য কামনার নিষ্ঠুর শিকার হুরমতি। ঈর্ষা লোভ হিংসার বিষচক্রে রূপবতী যৌবনের সর্বনাশা আগুনে বিষিয়ে দগ্ধে পুড়ে দিন কাটে হুরমতির। ছোট বেলায় মা হারিয়েছে। বাপ তার কোনো কালেই ছিল না। মমতার ছোঁয়া কদাচিৎ পেয়েছে জীবনে। তাই স্নেহের এই পরশটি ওকে অভিভূত করে। হুরমতির তপ্ত কপোল বেয়ে অশ্রুর ধারা নামে। হুরমতি। চল, আমাদের বাড়ি থাকবি যদ্দিন ভালো না হচ্ছিস।

কিছুক্ষণ রাবুর মুখের দিকে চেয়ে থাকল হুরমতি। বলল, রাবু বুজান সে হয় না।

কেন হয় না। জন্ম হল তোর আমাদের বাড়ি। বড় হলি আমাদের বাড়ি। আমাকে আপাকে কোলে করে এত বড় করলি। আর এখন আমাদের বাড়ি তোর বাড়ি না? কেন হয় না বল!

কী বলবে হুরমতি! শুধু পানি ঝরে ওর চোখ দিয়ে। বড় হলে বুঝবে বুজনি। এখন বুঝবে না। বলেই মুখটা ঘুরিয়ে নেয় হুরমতি।

সত্যি, রাবু বোঝে না হুরমতির এমন করে দূরে সরে যাওয়া আর পর হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা।

হুরমতির মায়ের জন্ম মিঞা বাড়িতে। আরিফার আম্মা যখন মিঞা বাড়ি ছেড়ে সৈয়দ বাড়ি এল বাড়ির বড় বৌ হয়ে, তখন বাদি হিসেবে সঙ্গে এসেছিল হুরমতির মা। তারও অনেক বছর পর হুরমতির জন্ম হয়েছিল এই সৈয়দ বাড়িতে। হুরমতির তখন কতই বা বয়স, পাঁচ কী ছয়, ওর মা মিঞা বাড়ি গিয়েছিল বেড়াতে

সৈয়দ গিন্নীর সাথে। সেই সময় একদিনে বার তিন কম করেই শেষ নিশ্বাস ছেড়েছিল। মালুর মা খালার কাছেই এ সব কথা শুনেছে রাবু এবং আরিফা। আর ছোট বেলা থেকে চিনে এসেছে হুরমতির কোল। সেই হুরমতি যে কেমন করে আলাদা বাড়িতে একলা থাকে আর পর হয়ে যায়, এখনো বুঝে উঠতে পারে না ওরা।

হুরমতি। হুরমতি। খোদার দোহাই তোর। তুই চল আমাদের বাড়ি। ছোট্ট বুকের গভীর আকুলতায় ওর হাত দুটি ধরে বলল রাবু। এমন অবস্থায় হুরমতিকে ছেড়ে যেতে কিছুতেই মন চায় না ওর।

আচ্ছা যাব। জ্বরটা একটু কমুক। ওকে নিরাশ না করার জন্যই হয়ত বলল হুরমতি। আরো জোরে ঠেলে আসে হুরমতির চোখের ধারা। দুঃখের নয় এ কান্না। ঝলসানো কপালটার জ্বালাপোড়ার ছটফটানি কান্নাও নয়। এ যেনো ওর অন্তহীন কোনো আনন্দের নিঃস্রবণ।

০৩.

আক্রোসে ফুলতে ফুলতে বাড়ি ফিরছিল রমজান। ওই ছোট লোক লেকু সেদিনও কামলা খেটে গেছে ওর বাড়িতে। সেই লেকুর এত দুঃসাহস? বলে কিনা, এক বাজারে দুই ভাও? আবার তেড়ে আসে? আসতই আর এক পা, তা হলে বাছাধনকে মক্কা দেখিয়ে ছেড়ে দিত রমজান। আর ওই কুলাঙ্গার সেকান্দর? সে আবার ওই চাষা ছোট লোকটার কথায় সায় দিয়ে বলে–এক হাকিমের দুই বিচার কেন?

রমজানের রাগটা শেষ পর্যন্ত লেকুকে ছেড়ে সেকান্দরের উপরই গিয়ে পড়ল। সেকান্দর-রমজান চাচাত জ্যাঠাত ভাই। ওদের বাবারা ছিলেন সহোদর ভ্রাতা। একই রক্তের পয়দায়েশ ওরা। একই বাড়িতে থাকে। বাবা জ্যাঠা দুটো সমান হিস্যায় বাড়িটাকে ভাগ করে সেই যে আমের চারা দিয়ে সীমানা পুতেছিলেন সেই আমের গাছ এখনো মানুষের মাথা ছাড়ায় নি। অথচ এর মাঝেই সেকান্দর শত্রুতা শুরু করল রমজানের?

কথায় বলে, জ্ঞাতি শত্রু বড় শত্রু। নইলে সেকান্দর যায় ওই ছোট লোকের কথায় ধুয়ো তুলতে? ছোট, অতএব ছোট ভাইয়ের মতোই ওকে স্নেহ দিয়েছে সাহায্য দিয়েছে রমজান। কত, না হয় চার বছর আগের কথা, ম্যাট্রিক পাস করে সেকান্দর গেল ফেনী কলেজে আই.এ. পড়তে। রমজানই তো এক থোকে ভর্তির

টাকাগুলো তুলে দিয়েছিল ওর হাতে। সে কথাটাও কী বেমালুম ভুলে বসে আছে সেকান্দর? অকৃতজ্ঞ আর বলে কাকে।

না হয় একটু চরিত্র দোষ আছে ওর। সাধু পুরুষ বলে রমজান দাবীও করে না কোনোদিন। আর ওই হুরমতি। সব ঘাটেই যে পানি খায় যেখানে নগদ কড়ি সেখানেই যার ধর্না সে মেয়ের সাথে একটু না হয় আশনাই করল রমজান। এমন কী অপরাধের হল সেটা? যারবাটা যে রমজানেরই সেটা নিশ্চয় হলফ করে বলতে পারবে না এ গাঁয়ের কোনো মানুষ। আসল কথা যার হাতেই আছে দুটো নগদ পয়সা সে-ই হুরমতির দরজায় টোকা মেরেছে। দোষ শুধু রমজানের? আর সত্যি যদি সেকান্দরের বুকের পাঁটা থাকত তবে সে মিঞার নামটা করে দেখলেই পারত একবার? মজাটা তখুনি টের পেত বাছাধন।

দুনিয়াতে কোনো শালার উপকার করব না মনে মনে কসম খায় রমজান।

কিন্তু লেকু? ব্যাটাকে আচ্ছা রকম শিক্ষা দিতে হবে। নইলে ইজ্জত থাকবে রমজানের।

দেবে নাকি ওর ঘরটায় আগুন ধরিয়ে? শালার আবার ভারি পেয়ারের বৌ আম্বরি। এক মুহূর্ত, শুধু একটা দিয়াশলাইর কাঠি, রমজান ছারখার করে দিতে পারে শালার পেয়ারের বেহেশত!

না। ওতে তেমন কিছু ক্ষতি করা যাবে না। ছন বেচে বেটা নগদ পয়সা পেয়েছে এ বছর। চটপট বানিয়ে নেবে নতুন ঘর। তার চেয়ে...এমন একটা প্রতিশোধ নিতে হবে যাতে শালার আগামী তের গোষ্ঠী মনে রাখবে–রমজান বাপের বেটা বটে। হ্যাঁ...তাই...হাটবার। অমাবস্যার ঘুরঘুটি আঁধারে। যখন ফিরবে হাট থেকে সেই সময়, পিতলের পীত বসানো সুন্দরী কাঠের সেই লাঠিটা, তারই দুঘা বসিয়ে দেবে মাথায়। তারপর গুনে গুনে কয়েকটা বাড়ি হাঁটুতে, কনুইতে। বাছাধনকে আর হাঁটতে হবে না, কাজ করতে হবে না কোনোদিন। সারা জন্মের মতো নুলো হয়ে বাড়িতে বসে বসে খুঁতনি চিবোবে। এই হল গিয়ে বাপের বেটা রমজান। সেই বার্মা মুল্লুকে ওর কোমরে লুকানো ছুরিটা যে কী ত্রাস ছিল, ভুলে গেছে লেকু? আর হ্যাঁ, এখানেও নিজের হাতেই সারতে হবে কামটা, ভাড়াটে লোকদের বিশ্বাস নেই। থানা পুলিশের চাপে ফাঁস করে দিতে কতক্ষণ।

থানা পুলিশের কথাটা মনে আসতে একলা পথে খামোখাই চমকে উঠল রমজান। কেন যেন ভয় হল ওর উচ্চৈঃস্বরেই বুঝি চিন্তা করছিল ও আর মনের

দুরভিসন্ধিটা কারা যেন জেনে ফেলল। সামনে পিছে ডানে বাঁয়ে শঙ্কিত দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে আনে রমজান। না, মাঠে বা রাস্তায় একটি ছায়াও নেই।

অপরাহ্নের গ্রামটা রাতের মতোই নিস্তব্ধ নির্জন। হঠাৎ পাওয়া ভয়টা যেন পিছু পিছু অনুসরণ করে চলেছে রমজানকে। থানা পুলিশকে ওর বড় ভয়। এমনিতেই দুটো খুনের মামলা ঝুলে রয়েছে মাথার উপর। হোক না বিদেশে, তবু খুন তো, মনের উপর সম্ভাব্য বিচারের যে ভীতিটা চেপে রয়েছে অদৃশ্য ভূতের মতো সে ভয় থেকে তো এখনো মুক্ত হতে পারেনি রমজান।

তার চেয়ে... ছোট লোকের বউটাকে ভাগিয়ে আনলে কেমন হয়? শালার তেজ থাকবে কোথায় তখন। বউটা যদি বাধা দেয়, চেঁচামেচি করে? মুখে গামছা পুরে পাঁজা কোলে করে সোজা নিয়ে আসবে মিঞাদের সুপুরি বাগিচায়। বাগিচা তো নয়, জঙ্গল, দিন দুপুরেও ত্রিসীমানায় মানুষের সাড়া পাওয়া যায় না। ব্যবস্থাটাও সেখানে মন্দ না। পাকা ভিটির উপর ছোট্ট একটা ছনের ঘর। চৌকি বিছানা সবই চমৎকার। মিঞার যখন শখ চাপে এক আধ রাত্রি কাটায় সে বাগিচায়। সেখানেই রাতটা আর দিনটা রাখবে আম্বরিকে! মিঞা যদি খোশদিলে থাকেন তাকে দিয়েই না হয় বিসমিল্লা পড়াবে। তারপর সোয়াদ মিটিয়ে লেকুর সামনেই ফিরিয়ে দিয়ে আসবে, বলবে–নে শালা, বুঝে নে তোর বউ, জনমটা তার সার্থক করে দিলাম।

ভাবতে ভাবতে সেই সম্ভাব্য রাত আর দিনের আতপ্ত উত্তেজনা যেন এখুনি অনুভব করে রমজান, গা-টা গরম হয়ে ওঠে। আর বিশদ বিবরণগুলোও আকার দিয়ে ভেসে ওঠে চোখের সুমুখে।

কিন্তু...বড় বদসুরত আম্বরিটা। হাড় গিলগিলে চেহারা। একরত্তি চেকনাই নেই গায়ে। বুড়ির মতো বঁটে এসেছে গালের চাম। এককালে সুশ্রী আর স্বাস্থ্যবতী ছিল মেয়েটি, বার্মা যাওয়ার আগে দেখে গেছিল রমজান। কিন্তু মেয়েটার সব রসকষ চুষে নিয়েছে শালা লেকু।

আম্বরির রোগা পটকা সুরতটা মনে করতেই আস্তে আস্তে ধিমিয়ে আসে রমজানের শরীরের গরমটা। কল্পিত পরিকল্পনার জালটিও ছিঁড়ে যায়। না, ওই হাডডিসার মাগিটাকে নিয়ে শোয়া আর খরখরে একটা তক্তা বুকে জড়িয়ে শোয়া একই কথা। রমজান কামাতুর। কথাটা এক বিন্দুও মিথ্যে নয়। তাই বলে বাজারে তাজা তাজা মাছ থাকতে শুটকী মাছের দিকে নজর পড়বে ওর, এমন অপবাদ কেউ দিতে পারবে না ওকে।

হঠাৎ কী যেন চোখে পড়ল রমজানের। বিড়ালের চোখের মতো পিট পিট করে জ্বলে উঠল ওর চোখ জোড়া। লেকুর ছাগল খাসিটা মিঞাদের সেই বাগিচার পেছনে ফুটি ক্ষেতে চরে বেড়াচ্ছে। ঘাসের এক একটি কচি পাতা মুখে পুরছে আর কেমন ভীতু ভীতু চোখে এদিক ওদিক দেখছে। প্রতিশোধ নেবার এমন একটা সুযোগ অযাচিতে এসে যাবে ভাবতে পারেনি রমজান। হোক না অকিঞ্চিৎকর তবু এতেই আপাতত রমজানের গায়ের জ্বালাটা মিটবে।

পেছন থেকে গিয়ে খাসির গলায় গামছাটা আলগোছে পেঁচিয়ে দিল। তার পর কষে চেপে ধরল। একটু ভ্যাঁ করে ডাকবারও ফুরসুত পেল না পশুটা। গামছাবদ্ধ পশুটাকে বাগিচায় তুলে আনল রমজান।

ছুরি দা সবই মজুদ থাকে ফেলু মিঞার এই স্বল্প ব্যবহৃত ঘরটায়। জবাই করতে চামড়া ছিলতে গোশত কাটতে কতটুকুই বা সময় লাগল ওর। এরি মাঝে একবার চোখ তুলে দেখল সৈয়দ বাড়ির মেয়ে দুটো দৌড়ে চলেছে ক্ষেতের আল ধরে। বিস্মিত হল রমজান। আরো বিস্মিত হল যখন দেখল ওরা গিয়ে উঠল হুরমতির ঘরে।

আর্ধেকটা গোশত বেচবার জন্য হাটে পাঠিয়ে দিল রমজান। বাকী আর্ধেকটা নিয়ে এল বাড়ি। প্রতিশোধের স্পৃহাটা অল্পতেই তুষ্ট হল। বিপদ এসেছিল লেকুর জানের উপর। সামান্য মালের উপর দিয়েই সে বিপদটা কেটে গেল। খাসিটা ওর এত বড় উপকারে এসেছে বলে, লেকুর উচিত আল্লার দরবারে শোকরগুজার করা। রাত্রে হাডডি চিবুতে চিবুতে এই কথাগুলোই ভাবে রমজান।

০৪.

অনেক কিছু বলবে বলেই তো শেষের সারি থেকে উঠে দাঁড়িয়েছিল লেকু। অথচ দাঁড়িয়েই কী যেন হয়ে গেল। পা কাঁপল, জিবটাও যেন জড়িয়ে এল। কয়েকটা লবজো বলেই বসে পড়তে হল। নিজের উপরই সে রেগে গেছিল। রেগে গুম হয়ে বসেছিল। প্রতিবাদের কোনো ভাষা খুঁজে পাচ্ছিল না। ষণ্ডা কালুটা যখন চিমটেটা হাতে নিয়ে মূর্তিমান আজরাইলের মতো এসেছিল তখন ওর শরীরের শিরাগুলো যেন অকস্মাৎ পাকানো দড়ির মতো টান ধরেছিল, চামড়া ফেটে গায়ের যত রক্ত ফিনকি দিয়ে আসতে চেয়েছিল। ঠিক সেই মুহূর্তে কেমন করে যে ওর আড়ষ্ট ভাবটা কেটে গেছিল ও ঝাঁপিয়ে পড়েছিল হারামখোর রমজানের উপর; এখন ঠিক মনে করতে পারছে না। কিন্তু রাগের রেশটা এখনো ওর রগে রগে লঙ্কার গুঁড়োর মতো জ্বালা ছড়াচ্ছে।

লেকু জানে হুরমতির ব্যাপারটা কী। রমজান ওকে সাঙ্গা করতে চেয়েছিল। হুরমতি বলেছিল–আবার যদি কও তবে জিবটা কেটে রেখে দেব। তাই এই নির্যাতন। অবশ্য আরো হেতু যে নেই তা অস্বীকার করে না লেকু। তবে সে সব মিঞা আর সায়েব সুয়োদের ব্যাপার, মনে মনে ঘাঁটতেও ভয় পায় লেকু। ইদানীং সাবডিবিশন শহরটায় ঘন ঘন পাড়ি দিচ্ছিল হুরমতি, আর তাতে যে ফেলু মিঞার চক্ষু টাটিয়েছে এটা কোনো কেয়াসের ব্যাপার নয়। এতে রমজানের হল সুবিধে, ফেলু মিঞার সমর্থনে এমন করে দাদ তুলতে পারল।

হুরমতিটা যে কী! পঁই পঁই করে সাবধানী দিয়েছিল লেকু; খবরদার ওই বদমাশটার হাতে ধরা দিবি না। বার্মা মুল্লুকে খুন করে পালিয়ে এসেছে, বেটা খুনী। হুরমতি কান দিল না ওর নিষেধে।

এখন? অমন চাঁদ মুখখানা দিলে তো জন্মের মতো বদখত করে? আর এত যে যন্ত্রণা? উ! দগদগে, সেই ঘাটা লেকু কিছুতেই তাড়াতে পারে না মনের চোখ থেকে।

আর নয়। লেকু আর কোনো সম্পর্ক রাখবে না হুরমতির সাথে। কোনো দিন না। মরুক হুরমতি। অমন পাপিষ্ঠার মরাই ভালো। নিজের বউ আছে মেয়ে আছে লেকুর। ওদের দিকে বেশি করে মন দেবে ও। আসলে হুরমতির উপর ওর রাগটা চৈত্রমাসের বৃষ্টি ফোঁটার মতো, মাটি ছুঁতে না ছুঁতেই মিলিয়ে যায়। যখন বাচ্চা হল হুরমতির কেউ এল না ওই কসবির যারবা সন্তানকে ভূমিষ্ঠ করতে। লেকুই পাঠিয়েছিল আম্বরিকে। সেই থেকে আম্বরি রাতের বেলাটা হুরমতির ঘরেই শোয় ওর রান্নাটাও সেরে দেয় নিজেদের হাঁড়িতে। উঠোনে পা রেখে লেকুর চটা মেজাজটা আরো চটে গেল–মাঝ উঠোনে ঝাঁটাটা হাঁ করে রয়েছে ওর আসার পথের দিকে।

আম্বরি আম্বরি চেঁচায় লেকু। কোনো সাড়া না পেয়ে আরো চেঁচায়। ঘরের পেছনে এসে আবার ডাকে হুরমতির ঘরটির দিকে মুখ করে। হুরমতি আর লেকুদের ঘরের মাঝখানে ব্যবধান ছোট্ট একটি ডোবা, এ ঘরের কথা ও ঘরে বসে শোনা যায়। অথচ সাড়া নেই আম্বরির। কতদিন বলেছে আম্বরিকে, ঝাঁটাটা যেখানে সেখানে ফেলে রাখবি না, আসতে যেতে চোখে পড়লে আমার মেজাজটা বিগড়ে যায়। তবু আম্বরি যেন ইচ্ছে করেই ঝাঁটাটা হয় উঠোনে নয় তো দাওয়ায় ফেলে রাখবে, লেকুর চোখে পড়বেই।

ও আম্বরি। আম্বরি। স্বরটাকে একেবারে সপ্তমে তুলে দিল লেকু। এবারের ডাকটা আম্বরির কানে যায়। জবাব না দিয়েই ত্রস্তে দৌড়ে আসে ও। হাতের নাগালে আসতে না আসতেই শক্ত হাতে ওর চুলের মুঠিটা ধরে নেয় লেকু। হিড় হিড় করে টেনে আনে উঠোনে। উপুড় হয়ে সেই হাঁ-করে থাকা ঝাঁটাটাই কুড়িয়ে নেয়। সপাং সপাং ঝাঁটার বাড়ি চালিয়ে যায় ওর পিঠে উন্মাদের মতো। খসে পড়ে আম্বরির গায়ের কাপড়। স্পষ্ট দেখা যায় কড়া পড়েছে পিঠের চামড়ায়। কত যে মারের দাগ সেখানে।

দিক বিদিক জ্ঞান নেই লেকুর। হিস-সিং হিস-সিং আর্তনাদ তুলছে ঝাঁটার বাড়ি আর নারকেল শলাগুলো দাগ কেটে বসে যাচ্ছে আম্বরির উদলা পিঠে। ওর পিঠের এক ইঞ্চি চামড়াও বোধ হয় আজ আস্ত রাখবে না। লেকু থেঁতলে দেবে সারা পিঠ। যেমন ক্ষেপেছে!

এক সময় ঝাঁটার গোছটা খুলে গিয়ে শলাগুলো এদিক ওদিক ছিটকে পড়ে। তারপর এক লাথিতে আম্বরির পলকা শরীরটাকে প্রায় তিন হাত দূরে ছিটকে ফেলে দেয় লেকু। সেখানেই একটা পাতলা কাঠির মতো অনড় পড়ে থাকে আম্বরি। হয়ত অপেক্ষা করে কখন রাগ পড়বে লেকুর।

হারামজাদী মাগি। কাঁড়ি কাঁড়ি ভাত গিলবি। কাজের বেলায় ঢুঁচ। মিঞা বাড়ির বিবি আর কী! ঝড় বর্ষা মেহেন্নতা করে মরব আমি আর তিনি বিবি পালঙ্কে পায়ের উপর পা তুলে খাবেন। দাসী লাগবে। বান্দী লাগবে.. কেনরে হারামজাদী! ঝাঁটাটাও সরিয়ে রাখতে পারিস না? তবে আমার ভাত গিলিস কোন আক্কেলে…। বর্ষণটা একটানা চলে না। মাঝে মাঝে থামে লেকু। প্রচণ্ড হুমকি দিয়ে দৌড়ে যায় আম্বরির দিকে আবার দুপা পিছিয়ে আসে। রাগলে কখনো এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না লেকু।

হঠাৎ ওর খেয়াল হল একটুও নড়ছে না আম্বরি। মরে গেল না তো? ঝুঁকে পড়ে হাতের পিঠটা আম্বরির নাকের মুখে ধরল লেকু। না, গরম নিশ্বাস হাতের পিঠে স্পষ্ট অনুভব করছে ও! উঠে এল দাওয়ায়। গুম হয়ে বসে রইল। এটাই ওর রাগ পড়ার লক্ষণ। ইপাব তৈরিঃ আল মোস্তাইন বিল্লাহ

আম্বরি কাঠির মতো দেহটাকে যেন বিনা চেষ্টায় তুলে নিল, সুড়সুড় করে চলে গেল হুরমতির ঘরের দিকে। হুরমতির ছেঁকা দেখে এসে লেকু যে আজ কারবালার তাণ্ডব শুরু করবে সেটা আম্বরি আগেই আঁচ করতে পেরেছিল। ঝাঁটাটা উপলক্ষ মাত্র।

তকদীরটাকেই দোষী করে আম্বরি। তকদীরটাই এমনি, নইলে সেও যাচ্ছিল মিঞা বাড়ির দিকে জুমার পর যে কাণ্ডটা ঘটবে সেটা দেখতে। কিন্তু ঘরের বাইরে পা দিয়েই মনটা খুঁত খুঁত করে। শুকনো আম পাতায় ভরে গেছে উঠোনটা। পোড়া মন ঝাঁট দিয়ে ঝাঁটাটাকে উঠোনে ফেলেই দৌড় দিয়েছিল টেন্ডল বাড়ির দিকে। টেন্ডলদের পাটি পাতার জঙ্গল থেকে ভেসে আসছে লেংড়ি মুরগিটার চিৎকার হয়ত শিয়াল তাড়া করেছে। আম্বরি পৌঁছে দেখে শিয়াল নয়, লেংড়িকে তাড়া করেছে টেন্ডল-বউ। লেংড়ি তিন গণ্ডা কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে তার খুদ খেয়েছে এই অপরাধ। সঙ্গে সঙ্গে টেন্ডল-বউ আদ্য শ্রাদ্ধ করল লেকু এবং লেকুর বউ খানকি মাগিটার।

.

ত্রাস বিক্ষিপ্ত বাচ্চাগুলোকে এক জায়গায় করে অনেক সান্ত্বনা দিয়েও লেংড়ির চিৎকার থামাতে পারেনি আম্বরি। ভীষণ উত্তেজিত লেংড়ি চেঁচিয়েই চলেছে। অগত্যা লেংড়ি আর বাচ্চাদের ওদের পরিচিত উঠোনে পৌঁছে দিয়ে আবার দৌড় মেরেছিল আম্বরি টেন্ডল বাড়ির দিকে। টেন্ডল-বউর জন্মটা আসলে শুয়রের জন্ম আর তার মা বাপ তাকে বিষ্ঠা ছাড়া আর কিছুই নাকি খাওয়ায় নি। মুখরা টেন্ডল বউর ধারালো জিবের প্রত্যুত্তরে এই জবাবটাই আম্বরিকে নানাভাবে ফুলিয়ে বাড়িয়ে শোনাতে হয়। স্বরটাকে কখনো উচ্চতানে কখনো মধ্যতানে নানা খাদে নানা টানে এই নিত্যকার কীর্তন গাইতে গিয়ে বেলা যায় বেড়ে। উঠোনে আর ফেরা হয় না ওর। ঘরের পিছন দিক দিয়ে তাড়াতাড়ি হুরমতির ঘরেই পৌঁছুতে হয় ওকে। এর মাঝে ঝাঁটার কথাটা কেমন করে মনে থাকে! পোড়া মন পোড়া যে কপালে লেখা আছে খসমের হাতের মার পায়ের লাথি, নইলে কী আর মনে থাকত না? কপালের উপর সব ভার চাপিয়ে দিয়ে যেন একটু হাল্কা হয় আম্বরি। গায়ের ব্যথাটাও একটু কম মনে হয়।

দাওয়ায় সেই যে গুম হয়ে বসেছে লেকু। বসেই আছে। আফসোস হয় ওর। ওর জন্যই তো খেটে খেটে বউটি আজ কঙ্কালসার। আম্বরি না থাকলে ও কী পারতো ঘর বাঁধতে, আট গণ্ডা জমি কিনতে? না পারত সে সব ধরে রাখতে? এই শরীর নিয়েও কাজ কী কম করে আম্বরি? ওর জন্য কোনোদিন একটা গাছ ফেড়ে দিয়েছে লেকু? দেয়নি। আম্বরি নিজেই বন বাদাড় ঘুরে খড় শুকানো ডালপাতা হাবিজাবি জোগাড় করে সারা বছর উনুনটা জ্বালিয়ে রাখে। ভাতের সাথে কচুর লতিটা ঢেঁকি শাকটার ব্যবস্থা করে। মাছও ধরতে জানে আম্বরি। ফুরসুত পেলেই

ওই ডোবাটায় নতুবা সৈয়দের মজা দীঘিতে প্যাঁক হাতড়িয়ে মাছ তুলে আনে। গুণের শেষ নেই আম্বরির।

একপাল হাঁস-মুরগি পালে আম্বরি। আণ্ডা বেচে। বাচ্চা ফোটায়। একটু বড় হলেই হাঁস-মুরগির বাচ্চাগুলো বেচে নিয়ে দুটো পয়সা ঘরে তোলে। ছাগল পালে। তালতলির রামদয়ালের হাঁপানির ব্যামো। প্রতি বছর ছাগল বিয়োলেই দুধটা রামদয়ালের জন্য বাঁধা দামটাও নগদ।

আম্বরিকে বাদ দিলে কী থাকে লেকুর? অমন করে ওকে মারাটা সত্যি অন্যায় হয়ে গেছে। রাগটা কোথায় উবে গেছে লেকুর। ইচ্ছে করে আম্বরিকে ডেকে একটু আদর করতে। আম্বরির সন্ধানেই এদিক ওদিক তাকায় লেকু।

তিন-জনের সংসার লেকুর। সে, বৌ আর চার বছরের মেয়ে ভুনি। সম্পত্তির মধ্যে রয়েছে চৌদ্দ গণ্ডা জমি। নিজের কেনা ছয় গণ্ডা বাপের বন্ধকী দেওয়া জমি। পরে কর্জ শোধ করে সেই জমি ছাড়িয়ে নিয়েছিল লেকু। আর সেই ভিটিটা। ভিটির চার পাশে কিছু ডাঙ্গা। ডাঙ্গায় কয়েক গণ্ডা সুপুরি গাছ, গোটা চার আমগাছ একটা জাম গাছ। ডাঙ্গায় ঢালুতে পাটি পাতা। আম্বরি লক্ষ্মী। ওইটুকুন তো ডাঙ্গা। সেই ডাঙ্গা থেকেও গতরের খাটুনি দিয়ে কত কিছু আদায় করে নেয় আম্বরি। পাটি পাতা হাটে পাঠায়। আসন বানায়, পাটি বোনে, বঠনী বানায়। তালতলির হাটে এসব জিনিসের দাম আছে। আম্বরির যত্নে গাছের একটি সুপুরিও নষ্ট হয় না। নিজে পান খেতো আম্বরি। কাউয়ের কোয়ার মতো লাল টকটকে আর রসে ভরে রাখত ঠোঁট জোড়া। কিন্তু পানও ছেড়ে দিয়েছে, সুপুরি বেচার আয়টাও বাড়বে, পান কেনার ফজুল খরচাটাও কমবে। তবু আম্বরির আয় আর খেতের আয় কদ্দিন চলে : বড় জোর মাস পাঁচ। বাকী সাত মাসের খোরাকের জন্য নানা ফিকির লেকুর। কোনো বছর উত্তরে চলে যায়, বাঁশ আর ছন নিয়ে আসে। ছন আর বাঁশ বিক্রী সেরে আবার যায় সেই উত্তরের পাহাড়ে। নিয়ে আসে কুমড়ো বেগুন এমনি সব তরকারি। বিক্রী করে তালতলি আর বড় হাটে। কোনো বছর চলে যায় ধান কাটতে বাখরগঞ্জ অথবা আসামে। সে বছর পাহাড়ে যায় না। প্রথম প্রথম জোয়ানকী বয়সের দেদার খাটুনি ঢেলে খাই খরচা চালিয়েও কিছু টাকা জমাতে পেরেছিল লেকু। অবশ্য স্বীকার করবে লেকু অন্তত এই ঠাণ্ডা মেজাজের মুহূর্তে লক্ষ্মীমন্ত আম্বরির হাতে না থাকলে জমতো না সেই টাকা। ওই জমানো টাকা দিয়েই তো আট গণ্ডা জমি কিনেছে লেকু আর সুদে-আসলে বাপের ঋণটা শোধ দিয়ে বন্ধকী ছয় গণ্ডা জমি ছাড়িয়ে নিয়েছিল রামদয়ালের কাছ থেকে। তারপর ঘরটা পড়ে গেছিল সেই গেল বছরের আগের বছর যে তুফান হল সেই

তুফানে। লেকু তো অন্ধকার দেখেছিল চোখে, আম্বরি ওর পায়ের রূপোর খাড়ু আর কোমরের রূপোর শিকলিটা খুলে বলেছিল, বসে বসে ঝিমোলে তো আর চলবে না। যাও এগুলো রামদয়াল খুড়োর কাছে বন্ধক দিয়ে নিয়ে আস যা পাও। তাই করেছিল লেকু। ঘর উঠেছিল। কিন্তু, আম্বরি এখনো ফিরে পায়নি ওর অলংকারগুলো। তার জন্য এতটুকু অভিযোগ নেই আম্বরির। এত মার খায়, রেগেমেগেও কোনোদিন এতটুকু একটা খোঁটা দেয় না। আম্বরি লেকুর লক্ষ্মী। আম্বরি ওর খোদার নেয়ামত। দু বাজুর বন্ধনে ডুবে যাওয়া মাথাটাকে তুলে আবার এদিক-ওদিক তাকায় লেকু। আম্বরির দেখা নেই।

আহ্ ওকে এখন একবার কাছে পেলে ওর ঝাঁঝরা পিঠটায় একটু হাত বুলিয়ে দিত লেকু। মেয়েটাও নেই। কোথায় গেল ওরা সব? হুরমতির ঘরে হয়ত। হুরমতির কথাটা মনে পড়তেই রমজানের মুখটাও ভেসে ওঠে লেকুর চোখের সুমুখে। একদলা বিষ যেন আচমকা গলা দিয়ে নেমে যায়। ওর সারা শরীরটাকে বিষময় করে তোলে। লেকুর জীবনটাকে অশান্তির আগুনে ছারখার করার জন্যই যেন রমজানের জন্ম। আম্বরিকে ঘরে এনে বছর দুই বাদেই লেকু চলে গেছিল রঙ্গম অর্থাৎ রেঙ্গুন শহরে। বুড়ো বাপ তখনো বেঁচে। নামকরা কামলা ছিল বাপজান। ঘরের বেড়া মাছের চাঁই ডুলো পলো এসব কাজে দুচার গ্রামে জুড়ি ছিল না তার। যতদিন বেঁচে ছিল বাপজান ছেলে-বউ আম্বরিকে এতটুকু কষ্ট করতে দেয়নি। আম্বরিকে সেই বাপের হাওলায় রেখে নিশ্চিন্তে আয় করতে বিদেশ পাড়ি দিয়েছিল লেকু।

রমজান ছিল রেঙ্গুন ডকের কুলি-সরদার। একটা নিয়মিত বখরা দেবে রমজানকে। সেই কড়ারে কুলির কামটা তাড়াতাড়িই পেয়ে গেল লেকু। বছর খানিক সে বন্দোবস্তের এতটুকু এদিক সেদিক করেনি লেকু। কিন্তু নটীর নগরীর রঙ্গমে যে এত ফাঁদ সে কী জানতু লেকু? মোহিনী রঙ্গম চুম্বকের মতো টেনে নিল ওকে। ফুল-বসনা রঙ্গমীর চটুল কটাক্ষ ওর মগজে ধরাল নেশা, দেহে তুলল আগুনের হিল্লোল। টাকার প্রয়োজন দেখা দিল। তাই নিয়ে রমজানের সাথে বাধল মনোমালিন্য, মতান্তর। হাতাহাতি।

গতর খাটাই আমি, তুই কেন ভাগ বসাবি? সোজা কথা লেকুর। সব কুলির সাথেই এমনি একটা ফাও রোজগারের ব্যবস্থা রমজানের। তেড়িমড়ি যে কেউ করে না তা নয়। তার দাওয়াইটাও রমজানের হাতে। বখরা নেই কামও নেই, ব্যস রাস্তা দেখ। তবু বাঁধা ব্যবস্থাটা হুট করে নাকচ করে দেয় না রমজান। নিজেও ধৈর্য ধরে

দামদস্তুর করে। উল্টো পক্ষকেও একটা সুযোগ দেয় নিজের স্বার্থটা তলিয়ে দেখবার।

তুই হলি গিয়ে আমার দেশি ভাই। খেসি কুটুম্বিতা না থাকুক তোর বাপ আমার বাপজানকে তো ভাই বলেই ডাকত। নে যা দিয়ে আসছিলি তার অর্ধেক দিবি টাকায় দুই আনা। রাজি তো? ধমকের পথে না গিয়ে আপসের লাইন ধরে রমজান।

এক পয়সাও না, কামাই করি আমি তুই কেন তার হিস্যা চাস? একটা মৌলিক প্রশ্ন তুলে লেকু কটমট করে তাকিয়েছিল ওর দিকে তখন আর কথা বাড়ায়নি রমজান। জবাবটা দিয়েছিল পরদিন। হাজিরা খাতায় লেকুর নামটা কাটা পড়েছিল। আফসোস করেছিল রমজান–দুনিয়াতে আপন মনে করে কোনো ব্যাটার উপকার করতে নেই।

তাই বলে রমজান কেমন করে ভাত মারবে লেকুর। অমন গোবদা গোবদা যার পায়ের গোছা, হাত আর মুখ আর বুকের পাঁটাটা যার কুলোর মতো চওড়া, খাটতে পারে সে মোষের মতো, তার আবার রঙ্গম শহরে ভাতের অভাব? আর এক সর্দার তাকে লুফে নিয়েছিল। ওতে রমজানের আক্রোশটা কেবল বেড়েই গেছিল। তলে তলে ফুলতে থাকে রমজান। ফুলতে ফুলতে একদিন ক্ষেপে গেছিল। ছোরা নিয়ে তেড়ে এসেছিল লেকুকে খুন করবে বলে।

এই ক্ষিপ্ত হওয়ার পরোক্ষ কারণ লেকু, প্রত্যক্ষ কারণ ছিল রমজানের নিজের কুলিরা। লেকুর দেখাদেখি অন্য কুলিরাও সাহস পেয়েছিল। অস্বীকার করেছিল বখরা দিতে। অবস্থা দেখে অন্য সর্দাররাও টোপ ফেলেছিল, কিছু কম দর হেঁকেছিল। সেই কম দরেই ওরা চলে আসে রমজানের দল ছেড়ে। শেষে এমন হল, রমজানের সর্দারিটাই বুঝি যায় যায়, ফাও রোজগার তো দূরের কথা।

তোকে আমি খুন করব। তোর রক্ত খেয়ে তবে আমার বিরাম।

বেশ, দেখা যাবে কে কার রক্ত খায়। লেকুও তেড়ে জবাব দিয়েছিল আর সর্বক্ষণের জন্য একটা ধারালো ছোরা গুঁজে রাখতো কোমরের ভাঁজে।

কিন্তু ওরা কেউ কারো রক্ত খেতে পারেনি। রমজানকে ফেরার হতে হয়েছিল জোড়া খুনের অভিযোগে। আর লেকুকে বাপজানের মৃত্যু-খবর পেয়ে ফিরে আসতে হয়েছিল গ্রামে।

এত বছর পেরিয়ে গেছে তবু আক্রোশে ভাটা পড়েনি রমজানের, এখনো বুঝি দাদ তুলবার ফিকির খুঁজে বেড়ায়। আর লেকু? সেও কী ক্ষমা করতে পেরেছে উৎপীড়ক রমজানকে?

ও আঘরি। আম্বরি! বাজুতে গোঁজা মাথাটা একটু তুলে কেমন মোলায়েম করে ডাকে লেকু। এটা ওর আদরের ডাক, আম্বরি জানে। আর এ ডাকে কখনো সাড়া না দিয়ে পারে না আম্বরি।

কেন আমি কম যাই কিসে? ফেলু ওস্তাগরের বেটি আমি। হামিদ বেপারীর পোলার সাথে আমার সাঙ্গাটা ভাঙলো কে? হামিদ বেপারীর পোলা, দুই দুইটা বলদ তার, একটা গাই গরু, তিন কানি জমিন, একখানা গোটা হাল! গোলা আছে হামিদ বেপারীর, সেই গোলাভর্তি ধান। আশার বাপকে পঞ্চাশ টাকা ঘুষ দিয়ে এমন সোনার সম্বন্ধ ভেঙে দিল কে? কে? কোত্থেকে হঠাৎ ছুটে এসে লেকুর সুমুখে দুহাতের দশটা আঙ্গুল নেড়ে নেড়ে চিল্লিয়ে চলে আম্বরি। ইপাব তৈরিঃ আল মোস্তাইন বিল্লাহ

কী হল আম্বরির? লেকুর অমন আদরের ডাকে এই জবাব? কিছুক্ষণের জন্য থ মেরে যায় লেকু। কেননা আম্বরির এমন উগ্রচণ্ডী রূপ কখনো দেখেনি ও। অসহ্য হলে মনে মনে গজর গজর করেছে আম্বরি। সেও কদাচিৎ। কিন্তু এমন করে সহস্র অভিযোগে ও তো কোনোদিন ফেটে পড়েনি? তবে কী লেকুর মারের মাত্রাটা আজ বেশি হয়ে গেছে? লেকুর কোনো জবাব নেই আম্বরির অভিযোগের। একটি অভিযোগও মিথ্যে নয়। ও শুধু পরম বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে আম্বরির দিকে! এত নালিশ, এত রাগ এতদিন কোথায় লুকিয়ে রেখেছিল আম্বরি?

হাল আছে একখানা? আছে একটা গাই গরু? তবে অত রোয়াব কেন? কেন আসতে-যেতে পায়ের লাথি ঝাঁটার বাড়ি! আ-হা-রে! কী আমার বিবির সুখরে! গেলবার সেই ঈদের চাঁদে দিয়েছে একখানা শাড়ি, সে তো ছিঁড়ে তেনা-তেনা, তালি লাগাবারও জায়গা নেই। ঝাঁটার বাড়ির মতোই খেংরা আওয়াজ আম্বরির।

মারের মুখে চুপ থাকে আম্বরি, কী এক আনুগত্যে বিছিয়ে দেয় পিঠখানি, দাঁতে দাঁত চেপে গ্রহণ করে স্বামীর নিষ্ঠুর নির্যাতন। শুধু দুহাতের দুর্বল আড়াল তুলে কোনো রকমে রক্ষা করে যায় মুখ আর তল পেটটা। সেই আম্বরির আজ এ কী মূর্তি!

কেন এমন হল? বলা নেই কওয়া নেই যে চড় চড় করে চড়ে যায় লেকুর মেজাজটা! আর জানোয়ারের মতো হাত-পা চালিয়ে যায় ওই চিমসে যাওয়া

দুর্বলা মেয়েটার কাড়াপড়া গায়ে? এসব কথা যে লেকু একেবারেই ভাবে না তা নয়। যখন বুকের কাছে টেনে নেয় আম্বরিকে তখন ভারি দুঃখ হয় কেমন অনুতাপও হয় লেকুর, ভালো লাগে না! সোহাগ ছেড়ে দিয়ে কেন অমন নিষ্ঠুরের মতো ঠেঙ্গায় আম্বরিকে সে কথাটাই ভাবে। আজও বাজুর কেঁচকিতে মাথা রেখে সে কথাই ভাবছে লেকু।

অথচ লেকু তো এমন ছিল না! এই বছর তিনেক আগেও আম্বরিকে ঠেঙ্গানোর কথাটা ভাবতেই পারত না ও। সেই যে তুফান এল, ঘরটা উড়ে গেল তারপর থেকেই কেমন যেন হয়ে গেছে লেকু। সেবার তো আম্বরির খাড়ু শিকলী বন্ধকীর টাকা নিয়ে কোনো রকমে চাল তুলল মাথার উপর। তারপরের বছর অর্থাৎ গেল বছরের আগের বছর এল বান। বানের পানিতে ভেসে গেল চোদ্দ গণ্ডা জমি আর বার গণ্ডা বর্গা চষা জমির ফসল। তারপর বউ-মেয়ে-ঘর সামলাতে গিয়ে এই দুটো বছর ওর ভাটিতে যাওয়া হয়নি। ফলে উপোস চলেছিল গেল বছরের প্রায় আটটি মাস। কী হবে? কী করবে? লেকু তো প্রায় অন্ধকার দেখছিল চোখে। সব বিপদের ভরসা আম্বরি, সে-ই পথ দেখাল। গলার হাঁসুলি আর এক জোড়া চুড়ি ওর হাতে দিয়ে বলল, তুফানের বছর যে কথা বলেছিল সেই একই কথা রামদয়াল জ্যাঠার কাছ থেকে যা পাও নিয়ে চলে যাও পাহাড়ে। সেদিন আম্বরি যদি ওর গায়ে দা-এর দুটো কোপ বসিয়ে দিত তা হলেই বুঝি ভালো হত। কিছুতেই নিতে চায়নি লেকু। রঙ্গম থেকে আসার সময় লেকু শখ করে কিনে এনেছিল ওই হাঁসুলি আর চুড়ি। কী খুশিই না হয়েছিল আম্বরি। সারাক্ষণ গলায় জড়িয়ে রাখত হাঁসুলিটা। সেই হাঁসুলি বিক্রি করতে হবে? এর চেয়ে দু ঘা দা-এর কোপ বসিয়ে দেয় না কেন আম্বরি?

তবু বন্ধক রেখে টাকা আনতে হয়েছিল ওকে। পাহাড়ে গিয়ে ছনও কিনে এনেছিল। কিন্তু শত্রু যে ওর পায়ে পায়ে। অর্ধেকেরও বেশি ছন গেল চুরি। আম্বরির হাঁসুলি বন্ধকের টাকাটা গেল রমজান চোরের পেটে। আবার শুরু হল উপোস।

এবার? এবার কী হবে? এবারও আম্বরিই টেনে তুলল ওকে, বলল, যাও না পাহাড়ে। ধর গিয়ে মহাজনদের। এতদিনের কারবার তোমার সাথে। এক কিস্তি কী আর বাকী দেবে না?

ওই টুকুন তো আম্বরি কেমন করে এত বুদ্ধি খেলে তার মাথায়। তাজ্জব বনেছিল বার্মা ফেরত, বিদেশ-দেখা লেকু। আরো তাজ্জবের কথা, পুরনো মহাজন খুশি হয়েই বাকী দিয়েছে ওকে। আর এবারের বিক্রির দরটাও পেয়েছে আশাতীত

ভালো। ধার শোধ করে গেল বছরের লোকসানটাও অনেকদূর পুষিয়ে নিয়েছে লেকু।

কিন্তু সেই যে ফসল গেল, অলংকার গেল, পুঁজি গেল, তার সঙ্গে সঙ্গে লেকুর মেজাজটাও গেল বিগড়ে। ফসলের বিক্ষোভ, চুরির আক্রোশ, ক্ষিধের যন্ত্রণা সবই সে মিটিয়ে চলেছে আম্বরির পিঠে নীল-কালো দাগ তুলে তুলে। দুহাতে এখনো তার দানোর বল, সব লোকসান, সব ক্ষতিই হয়ত পুষিয়ে নেবে লেকু। কিন্তু বিগড়ানো মেজাজটার কী সারাই হবে কোনোদিন? বাজুর কেঁচকিতে মাথাটা যে ডুবিয়ে রেখেছে লেকু, ডুবিয়েই রাখে। আর ভাবে শুধু ভেবে চলে। এমন করে তো কোনোদিন ভাবেনি লেকু?

গায়ের গোশত তো সবই গেছে, এখন হাডডিগুলো পঁচলেই বাঁচি। সারা দিন যত মরার খাটনি, গতরটার কী সুখ আছে এক পল? এখন আবার তাঁর বেইশ্যার সেবা, সেও আমাকেই করতে হবে। হাঁসগুলো এখনো ফিরল না, খাসিটার নেই দেখা, ছাগীটা বাঁধা রয়েছে আমতলায়, একটু দেখলে কী হয়! তা উনি তো মিঞা সেজেছেন। চাকর না থাক বান্দী তো একটা আছেই ঘরে। বান্দী বলে বান্দী, বেইশ্যার পা টিপিয়েও ছাড়ল।

হায় রে কপাল! ও এ জন্যই এত রাগ আম্বরির?

এই এই হারামজাদী! চুপ কর। হঠাৎ মাথা ঝাঁকারি দিয়ে বাঘের মতো লাফিয়ে পড়ে লেকু। মস্ত জোয়ান দেহটার ভারে শক্ত উঠোনটা যেন কাঁপে আর ঠন ঠন বেজে ওঠে।

কিন্তু একি হল লেকুর। আম্বরির পিঠের উপর তুলেও হাতটা কেমন করে সামলে নিল ও। কোনো দুঃসাহসিক প্রচেষ্টায় সংযত করে নিল ভেতরের দানবটাকে! অত বড় দেহের ফুলে ফুঁসে ওঠা শক্তি আর প্রচণ্ড ক্রোধটা নিষ্ক্রমণের পথ না পেয়ে কী বিকৃতি ফেলেছে ওর মুখে। রগ আর গলার শিরাগুলো পাকানো দড়ির মতো কেমন ফুলে কঁকিয়ে শুধু মোচড় খেয়ে চলেছে। হঠাৎ শিশুর মতো হাউ হাউ করে কেঁদে দেয় লেকু। কুঁচ কালো মুখ বেয়ে ছুটে যায় অশ্রুর ধারা। রুদ্ধ কণ্ঠে বলে লেকু, ঘরে যার ভাত নেই সে কী মানুষরে আম্বরি! সে যে অমানুষ, জানোয়ার। নইলে তোর মতো লক্ষ্মী বউকে কেউ এমন করে ঠেঙ্গায়!

ঝড়ের বেগে বেরিয়ে যায় লেকু।

০৫.

আসসালাতো খাইরুম মিনান নওম
আসসালাতো খাইরুম মিনান্ নওম।

পূর্ব আকাশে ঈষৎ সাদা পোঁচ। একটু বাদেই সূর্য উঠবে। মোয়াজ্জিনের মিহি কণ্ঠে ভোরের আহ্বান, নিদ্রার চেয়ে উপাসনা উত্তম। ডাক দিচ্ছে মোয়াজ্জিন, ওঠ উপাসনায় শামিল হও। কুয়াশার পর্দা ছিঁড়ছে চড়ই শালিকের প্রভাত কাকলি। সারারাতের রুদ্ধ যত গান এই মুহূর্তেই যেন ওদের কণ্ঠে এসে ঝংকার তুলেছে। ওদের গান আর মোয়াজ্জিনের কণ্ঠ শীতের কুহকি সকালে যেন সুরের এক ইন্দ্রজাল। সে সুর গৃহস্থের ঘরে ঘরে আনে জাগরণের সাড়া।

এমনি করেই সকাল হয় বাকুলিয়া গ্রামে।

একশ বছর আগেও, এমনি করেই নাকি সকাল আসত এই গ্রামে। মিঞা বাড়ির মসজিদ থেকে ভেসে আসত আজানের মিষ্টি করুণ রাগিণী। আজান শুনবার আগেই, নীড়জাগা প্রথম পাখিটির আনন্দ, কূজনে, ঘুম ভাংতো কুল-বধূর, ঠেলা দিয়ে জাগিয়ে তুলত পাশের মানুষটিকে, সেই একশ বছর আগে। তার আগের ইতিহাস কিংবদন্তী।

কেউ বলে সৈয়দদেরই পূর্বপুরুষ এ অঞ্চলে এসেছিল ইসলাম প্রচারে। এখন যে মিঞা বাড়ি সে বাড়িতে ছিল এক বিত্তশালী হিন্দু পরিবার। গৌরবর্ণ দিব্যকান্তি তরুণ এক মুজতাহিদ। তার প্রচারে আকৃষ্ট হয়েছিলেন বাড়ির কর্তা। তরুণ সাধককে সাদর আমন্ত্রণে ডেকে এনেছিলেন বৈঠকখানায়। গোটা পরিবার ইসলাম কবুল করেছিলেন। তারপর কোনো এক শুভলগ্নে বাড়ির কর্তা আপন কন্যাকে সমর্পণ করেছিলেন সুদর্শন পীরের খেদমতে। যাযাবর মুজতাহিদ আটক পড়েছিল দুটি পেলব বাহুর বন্ধনে। সেই বছরই তৈরি হয়েছিল মিঞা বাড়ির ওই মসজিদ আর গ্রামের অপর প্রান্তে পত্তন হয়ে ছিল সৈয়দ বাড়ির।

অন্যরা বলে আর এক কাহিনী। একদা অঞ্চলটি ছিল বিরানা। বসতি ছিল অনেক দূরে উত্তরে। সেই উত্তরের নমো কুঁয়োররা উঁচু জাত ব্রাহ্মণদের উৎপীড়নে অস্থির হয়ে একদিন বসতি ছেড়েছিল। মুসলমান হয়ে চলে এসেছিল এই বিরানা অঞ্চলে, পত্তন করেছিল বাকুলিয়ার। এ নাকি বল্লাল সেনেরও আগের কথা।

লিখিত ইতিহাস আর কিংবদন্তী মিলে যে সত্য সে সত্য উদঘাটনের চেষ্টা কেউ করেনি। বাকুলিয়ার মানুষের সে আগ্রহ নেই। তারা শুধু জানে ওই মসজিদের দালানটি একশ বছরের পুরনো। এটা জানা সহজ কেননা মসজিদের প্রবেশ পথেই আরবী-বাংলা সনের পাশাপাশি লেখা রয়েছে ১৮৩৫ইং। অবশ্য মিঞারা

বলেন, মসজিদের পত্তন আরো দুশ কি তিনশ বছর আগের, তখন ঘরটা ছিল কাঁচা। আর একটি কথা তারা জানে, সেই যে শুনেছে দাদাপিজার দিনে, বাকুলিয়ার ভাগ্য আবর্তিত হত মিঞা আর সৈয়দ বাড়িকে কেন্দ্র করে; আর সে সব কথা প্রাচীন পুঁথির মতোই বাসি হয়ে গেছে। মিঞারা আজ কোমর ভাঙা সিংহ, হয়ত গুরুত্ব আছে তাদের এই বাকুলিয়ার সমাজে কিন্তু শক্তি নেই রোয়াব নেই, শুধু আছে হৃতবিত্ত খানদানীর খেদ আর হায় আফসোস, অক্ষমের ক্রোধ। আগ্রহ না থাকলেও কিংবদন্তীর আড়ালে লুকনো কোনো সত্য যখন ঝিলিক মেরে ওঠে তখন উৎকর্ণ হয়, কৌতূহলী জটলা পাকায় বাকুলিয়ার মানুষ। ওই মসজিদেরই পয়লা কাতারের পয়লা কী দোসরা আসনটিকে কেন্দ্র করে ব্যাপারটা ঘটেছিল। সেও বছর তিরিশ আগের কথা। মরহুম বড় মিঞার তখন শেষ সময়।

দিনটা ছিল শুক্রবার, জুমার নামায শুরু হয়ে গেছে। ইমাম সাহেবের ঠিক পেছনে একজনের মতো জায়গা শূন্য। ওটা বড় মিঞার আসন। অসুস্থতার দরুন সব সময় তাঁর পক্ষে জামাতে আসা সম্ভব হয়ে ওঠে না। তবু জায়গা-টুকু খালি থাকে, তিনি যদি এসে পড়েন ওখানেই বসবেন, এটাই নিয়ম।

তিনি না এলে দু চার মিনিট অপেক্ষা করবেন ইমাম সাহেব, নিয়ত বাঁধবার আগে শেষ বারের মতো জেনে নেবেন বড় মিঞা জামাতে আসছেন না, তখন দুপাশের লোক সরে এসে ওই খালি জায়গাটুকু ভরে দেবে, শুরু হয়ে যাবে জামাত।

কিন্তু সেদিন এই নিয়মটার ব্যতিক্রম হয়ে গেল। বড়ো সৈয়দ সাহেবেরও আসতে দেরি হয়ে গেছিল। খেয়ালে হোক, বেখেয়ালে হোক এসেই টুপ করে বসে পড়লেন ওই খালি জায়গায়। ওদিকে একটু পরেই বড় মিঞা এসে মুহূর্তখানেক দাঁড়িয়ে থাকলেন, তাঁর জায়গা নেই। কিন্তু বেশিক্ষণ না, পরমুহূর্তেই কে একজন পাশে সরে গিয়ে জায়গা করে দিল, বড় মিঞা নামাযের নিয়ত বাঁধলেন। এখানেই শেষ হত ব্যাপারটা। হল না। কেননা বড় মিঞার বড় ছেলে এই অমার্জনীয় বেয়াদবীর প্রতিবাদ করে বসল সেই মুহূর্তেই। বিস্মিত অপমানিত বুড়ো সৈয়দ নীরবে সরে যান পাশে, বুঝি জায়গা করে দেন বড়ো মিঞার জন্য। কিন্তু জবাব দিলেন বুড়ো সৈয়দের সাহেবজাদা : খোদার ঘরেও কী আসন সংরক্ষণ? সে তো না-জায়েয।

হয়ত তাই। তা বলে শরাফতের খানদানের নেকবক্তের কোনো মর্যাদা থাকবে না? গরম হয়ে ওঠে বড়ো মিঞার বড় ছেলে।

সে মর্যাদা আর যেখানেই থাকুক, খোদার ঘরে নয়। জ্ঞানলব্ধ গাম্ভীর্যের সাথে কিছু উষ্ণতা ঢালে সৈয়দ-পুত্র।

বেধে গেল তুলকালাম বহস। হাদিস-ফেকাহ্-উসুল-তফছিরের জটিল তর্কের ঝড় উঠল। কিতাব এল বোখারী শরীফ মুসলেম শরীফ, তিরমিজি শরীফ আবু দাউদ আরো কতো।

সেদিনের মতো কোনো রকমে নামায সারা হল। তারপর মসজিদ ছেড়ে বাইরে এল তর্কটা। বাইরে এসেই অন্য রূপ নিল, দু বাড়ির খানদানী মর্যাদার দ্বন্দ্বে নয়া গিঁঠ লাগল।

বাকুলিয়ার মানুষ তাজ্জব হয়ে শুনল, প্রশ্ন আর হাদিস-তফসিরের নয়, আল্লাহর ঘরে সকলের সমান অধিকার নয়। প্রশ্ন বড় মুসলমান কে? সৈয়দরা অথবা মিঞারা? বাকুলিয়ার মুখ্যসুখ্যুরা দেখল কোনো লুপ্ত গহ্বর থেকে উঠে এসেছে ইতিহাসের ছেঁড়া পাতা, অবলুপ্ত ইতিহাসের বিবর্ণ অক্ষর গুলো ঝলসে উঠেছে। দলিল ছুঁড়ে দিয়ে সৈয়দরা বলল, এই দেখ তোমাদের পূর্ব পুরুষ আমাদের পূর্বপুরুষদের পায়ের ধুলো মুখের কলেমা নিয়ে মুসলমান হয়েছে।

মিঞারাই বা কম যাবে কেন? বলল, ওসব ভুয়ো, আসলে তোমরা যে ভেসে এসেছিলে, নেহাৎ আমাদের অনুগ্রহে এখানে বাস করছ। এই দেখ আমাদের পূর্বপুরুষরা ওই বসতবাটি বানিয়ে দিয়েছে তোমাদের পূর্বপুরুষদের, ওই ওই জোত, ওই ওই জমি আর তালুক খুশি হয়ে তোমাদের দান করেছে। এই বাঘে মহিষের লড়াইতে মুখ্যসুখ্যুরাও দল বেছে নিল, ফরাক হয়ে দু দল হল। কিন্তু মুখ্যসুখ্যুদের জন্য আরো যে অনেক মাদারির খেল জমা ছিল। হঠাৎ ওরা শুনল আপস হয়ে গেছে। দেখল মিঞা বাড়ির মেয়ে বধূ হয়ে চলে এল সৈয়দ বাড়ি। দুপুরুষ ধরে সেই তিন পুরুষ আগের আত্মীয়তায় যে চিড় ধরেছিল, নয়া কুটুম্বিতার বন্ধনে নিকটতর হল দুই খানদানের সেই প্রাচীন আত্মীয়তা।

মজলিসের সুমুখে আজও যখন জটলা বসে বাকুলিয়ার বুড়োরা সে বহসের গল্প শোনায় কতো রং ফলিয়ে আরবী-ফার্সী উর্দু কিতাবগুলোর বিচিত্র বর্ণনা জুড়ে।

মিঞা বাড়ির মিনার থেকে প্রভাত বন্দনার সেই মন্দ্র মধুর সুরটি ভেসে আসবার আগেই ভোর হয়ে যায় সৈয়দ বাড়িতে। শেষ রাত্রে উঠে জিকির করেন মুনশীজী। জিকির শেষে দরুদ পড়েন সারা বাড়ি ঘুরে ঘুরে।

আজও তেমনি রাত থাকতেই ভোর হয়েছে সৈয়দ বাড়িতে। জিকির শেষ করে মুনশীজী গোটা বাড়ি টহল দিয়ে চলেছেন।

বালাগাল উলা বেকামালিহী
কাসাফুদ্দোজা বেজামালিহী
হাসানাতজামী ওয়া খেসালিহী
ছল্লে আলাইহে ওয়া আ-লিহী।

দহলিজের টিনে অন্দর বাড়ির দেয়ালে দেয়ালে আঘাত খেয়ে গম গম করে মুনশীজীর গম্ভির উদাত্ত কণ্ঠ। প্রথমে দহলিজ, তারপর বাইর বাড়ি, তার পর ভিতর বাড়ি। আবার উল্টো পথে বাইর বাড়ি।

খড়মের খট খট আওয়াজ। পরিষ্কার মিষ্টি সুরের লহরী। শেষ রাত্রির নৈঃশব্দে অনির্বচনীয় এক ধ্বনির মায়াজাল বিস্তার করে চলেন মুনশীজী। সে সুরে আর যারই ঘুম ভাঙুক মালুর ঘুম ভাঙে না। চোখের পাতা গুলো যেন আরো জড়িয়ে আসে, ঘুমটা যেন আরো মিষ্টি মনে হয়। মনে হয় ঘুমের গানটি চলুক আরো কিছুক্ষণ। মালু-ওঠ, বাচ্চু মিঞা, কেনু মিঞা–ওঠেন, ভোর হল, নামাযের সময় হল। ধ্বনির লহরে অকস্মাৎ যেন ছন্দপতন। দালানের কাছটিতে এসে চেঁচিয়ে ওঠেন মুনশীজী। মালু তার আপন সন্তান, বাচ্চু, কেনু সৈয়দ বাড়ির ছেলে। তাই পদপ্রয়োগে মুনশীজীর এই পক্ষপাতিত্ব। বাচ্চু কেনুর কী মনে হয় মালু জানে না। কিন্তু মালুর কাছে ওই বিরক্তিকর। কাঁথাটাকে টেনে মুখখানা ঢেকে নেয় মালু, অস্বীকার করে ওই নিষ্ঠুর হাঁক। কান পেতে থাকে আবার কখন ভেসে আসবে ঘুমের মিষ্টি আমেজের মতো সেই মিষ্টি সুরটি। অপেক্ষা করতে করতে বুঝি ঘুমিয়ে পড়ে আবার। ঘুমের মাঝেও যেন শোনে–সামসুদ্দোজা বদ রুদ্দোজা... আর হঠাৎ ওই গানের সুরে আবৃত্তিটা থামিয়ে হাঁক দেন মুনশীজী–মালু মালু! এবার কাঁথাটাকে কানের দুপাশে একেবারে সেঁটে নেয় মালু।

বড় আপা, ও বড় আপা, দেখ সুরুজ উঠে গেল।

কাঁথাটাকে একটু ফাঁক করে দেখল মালু, ঘুম ভেঙে উঠে বসেছে রাবু, আড়-মোড়া ভাঙছে।

কী রে বড় আপা, তোর কী নামায পড়ার ইচ্ছে নেই? একটা মৃদু ঠেলা দিয়ে বলে রাবু।

ক্যাট ক্যাট করিস না তো? ঘুমুতে দে। খেঁকিয়ে উঠল আরিফা।

বেশ, ঘুমা। আমি কিন্তু রোজ রোজ জ্যাঠিআম্মার কাছে মিছে কথা বলতে পারব না তোর জন্য।

কে বলছে তোকে মিছে বলতে। বলিস নামায পড়িনি আমি, পড়বোও না। হল তো? রেগে যায় আরিফা।

বেশ, পিঠে যখন দুমদাম পড়বে আমায় দোষতে পারবিনে।

আরিফা রাগটা আর ধরে রাখতে পারে না। মাথার তলা থেকে বালিশটা তুলে ছুঁড়ে মারে রাবুর দিকে। খুব বাড় বেড়েছে তোর, ভারি নামাযি হয়েছিস।

বালিশ ছাড়াই দু হাত লম্বালম্বি বাড়িয়ে তারই ফাঁকে মাথাটা রেখে আবার ঘুমিয়ে পড়ে আরিফা।

রাবু আপাটা যে কী? এই শীতেও কেমন করে যে লেপের মায়া ছেড়ে রাত থাকতেই উঠে পড়ে। ভাবে মালু আর সজাগ থাকতে চেষ্টা করে। এক্ষুনি তো রাবুর ফরমান আসবে–ওজুর পানি এনে দে।

গানের মতো মিষ্টি আবৃত্তি থেমে গেছে। খড়মের শব্দটাও আর কানে আসছে না। বাইরের পুকুর থেকে ভেসে আসছে ওজু আর গলা ঝাড়ার শব্দ–খাঁক খাঁক, ঝপ ঝপ। আযানের শেষ কলিটাও বাতাসে ঝংকার রেখে মিলিয়ে গেল : হাইয়ালাস্-সালা হাইয়ালাল-ফালা আল্লাহ-হু-আকবর...কাল যে মস্ত বড় একটা গোনাহ করেছিস খেয়াল আছে?

রাবুর গলা। উৎকর্ণ হয় মালু। ছোট্ট বুকটা টিপ টিপ করে। গোনাহকে ওর বড় ভয়। গোনাহ্গারকে নাকি জ্বলে ও পুড়ে ছটফট করতে হয় দোজখের আগুনে। সে আগুন যে সে আগুন নয়। সে আগুন সাংঘাতিক। দুনিয়ার কেউ দেখেনি তেমন আগুন। লক্ষ বছর, কোটি বছর সে আগুনে পুড়তে হবে, যতদিন না শাস্তি মওকুফ করে দেন আল্লাহতালা। আব্বার কাছে, আম্মার কাছে এ সব কথা শুনেছে মালু। ওর ছোট্ট বুকের টিপ টিপানিটা বেড়ে যায়, কী এমন গোনার কাজ করল রাবু আপারা। ইপাব তৈরিঃ আল মোস্তাইন বিল্লাহ

গোনাহ? গোনাহ্ কখন করলাম। গোনাহর কথা শুনে আরিফা চোখ রগড়ায়। উঠে বসে। ব্যাপারটা সত্যি বুঝে নেয়া দরকার। ওই যে পর্দা ভাঙলি কাল? আম্মা হয় না-ই জানল কিন্তু, খোদা তো দেখেছে? খোদা মাফ করবে কেন? ব্যাপারটা ভেঙে বলে রাবু।

ধ্যাৎ, কেউ তো দেখেনি আমাদের। আরিফার কণ্ঠে অবিশ্বাস।

না দেখল। আমরা তো দিনের বেলায় প্রকাশ্যেই বেরিয়েছি, নিষেধ অমান্য করে। সেটা পাপ হল না?

আরিফার ঘুমের নেশাটা এতক্ষণে ছুটে গেছে। চোখ বড় বড় করে শুধায়, কী বলতে চাস তুই?

আমি বলি, চল, নামাযটা পড়ে ফেলি। এক রাকাত নামাযে এক হাজার গোনাহ্ মাফ হয়, জানিস, তো?

গম্ভীর হয়ে ভাবতে শুরু করে আরিফা। রাবুর কথাটা একেবারে উড়িয়ে দেবার নয় বুঝি।

মেঝেতে কাঁথার নিচে এই শীতেও বুঝি ঘেমে ওঠে মালু। কেমন অস্থির লাগে ওর। বড় আপাটা যে কী! সহজ কথাটাও বুঝতে পারে না অথবা বুঝতে চায় না। সাপকে তার এত ভয় অথচ গোনাহ সম্পর্কে কেমন নির্বিকার। এক রাকাত নামাযে এক হাজার গোনাহ্ মাফ; রাবু আপার কথাটা যে একটুও বানানো নয় এটা কী বুঝতে পারছে না বড় আপা? কাঁথাটা ছুঁড়ে তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে মালু, বলে, ওজুর পানি দেই, বড় আপা? রাবু আরিফা, দু জনেই বুঝি চমকে ওঠে। ওমা : মালু আমাদের কেমন সুবোধ ছেলে দেখ, না ডাকতেই উঠে পড়েছে আজ! কেমন সুধা ঝরা রাবু আপার কণ্ঠে।

মালুর কচি মুখটি আকর্ণ কৃতার্থতা ফুটিয়ে চেয়ে থাকে রাবুর দিকে। রাবু আপার মুখের মতোই মিষ্টি তার কথাগুলো। আব্বার কেরাত আর ওই সকাল বেলার সুর করে পড়া দরুদের মতোই মধুমাখা রাবু আপার কথা। কান পেতে শুনে যেতে ইচ্ছে করে মালুর। ধাঁ করে বেরিয়ে যায় মালু। ঝাঁ করে ফিরে আসে দু বদনা পানি হাতে।

কিছুদিন হল সাপ ঢুকেছিল রাবুদের ঘরে। নীরবে এসে নীরবেই চলে গেছিল সাপটা। ওদের দিকে ফিরেও তাকায়নি। তবু ঠক ঠক করে কেঁপেছিল আরিফা আর ভয়ের চোটে গলা ফাটিয়ে মালুকেই ডেকেছিল রাবু। সেই থেকে রাবুদের ঘরেই মালুর শোবার ব্যবস্থা। মেঝেতে চাটাই বিছিয়ে কাঁথা জড়িয়ে ঘুমোয়। সকালে নিজেই গুটিয়ে রাখে বিছানাটা। এবার দেখা যাবে কেমন বীর পুরুষ; ওর গালে ছোট্ট একটা টোকা মেরে বলেছিল রাবু।

হুঁ! সাপকে যেন ভয় করি আর কী! হাতের লাঠিতে একটা ঝাঁকুনি তুলে উত্তর দিয়েছিল মালু।

সাপ সম্পর্কে মালু অকুতোভয়। মামুলী সাপগুলোকে ও অবলীলাক্রমে লেজে ধরে নেয়, মাথার উপর দু চক্কর ঘুরিয়ে ছুঁড়ে মারে শূন্যের দিকে। শূন্যে ঘুরতে ঘুরতে ভিরমি খায় সাপের বাচ্চা, আর সে-ই ক-দ্দুর গিয়ে পড়ে যায়, অনেকক্ষণ নিথর পড়ে থাকে। গোখুরেকে নিয়ে অবশ্য একটু সাবধান হতে হয়। মাথাটা তাক করে লাঠি ছুঁড়তে হয়। ফসকে গেলে বিপদ। কিন্তু মালুর লক্ষ্য যে অব্যর্থ এ বাড়িতেই দু দুটো গোখুরো সাপ মেরে সে কৃতিত্ব অর্জন করেছে মালু। রাবুর ঘরে শোবার বন্দোবস্তটা ওর সেই সাহসিকতারই পুরস্কার। বুকের উপর হাত না রেখেও বুঝতে পারে মালু খুশির চোটে রাতারাতি ওর সিনাটা ফুলে ফেঁপে কত চওড়া হয়ে গেছে।

ওদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ঘুমটা যেন পালিয়ে যায় মালুর। নিয়ত বেঁধে বুকের উপর হাত রাখল রাবু আর বড় আপা। রুকুতে গেল। তারপর সেজদায় পড়ল। দুবার সেজদা দিয়ে উঠে দাঁড়াল। বাতাস পেয়ে গাছের পাতাগুলো যেমন ঘন ঘন নড়ে তেমনি দ্রুত নড়ছে ওদের ঠোঁট। কোন সুরা পড়ছে বুঝবার উপায় নেই। কেন না শুধু ঠোঁট দুটোই নড়ছে কোনো শব্দ নেই। আবার সেজদায় পড়ল ওরা। তারপর সেজদা থেকে উঠে দু হাত তুলে মুনাজাত সারল। আবার দাঁড়িয়ে নিয়ত বাঁধল।

আকাশের দিকে অতক্ষণ হাত তুলে আল্লার কাছে কী চাইল রাবু আপারা। গোনাহর জন্য মাফ চাইল? সত্যি কী গোনাহ করেছে ওরা? আর তাই যদি দোজখেই যায় রাবু আপা তা হলে? ইস্! অমন টকটকে আর আরামের শরীর রাবু আপার, কেমন করে সইবে দোজখের আগুন? আল্লাহ্ শাস্তি দিও না রাবু আপাকে; মাফ করে দাও রাবু আপাকে। মনে মনে প্রার্থনা করে মালু। পানিতে ভরে যায় ওর দুটো চোখ। রাবু আর আরিফার মাঝে রাবুর প্রতিই বুঝি মালুর পক্ষপাতিত্ব। তাই প্রার্থনা থেকে আরিফার নামটা যে একেবারেই বাদ পড়ে গেল সেটা খেয়ালেই পড়ল না ওর।

কিরে ফোঁস ফোঁস করছিস কেন? কী হল? সালাম ফিরিয়ে শুধায় রাবু। তাড়াতাড়ি কাঁথা টেনে মুখ লুকোয় মালু। প্রার্থনার কান্নায় কখন ভারি হয়ে এসেছিল ওর নাকটা। দু আঙ্গুলে টিপে নাকের পানিটা বের করতে গিয়ে ধরা পড়েছে রাবুর কাছে। বড় লজ্জা।

আচ্ছা, রাবু আপা, পুরুষদের জামাতে ইমাম আছে, তোমাদের নেই কেন? তুমি বা বড় আপা ইমাম সাজতে পার না? কাঁথার তলা থেকে মুখটা বের করে হঠাৎ শুধায় মালু। প্রশ্নটা এইমাত্র জেগেছে ওর মনে। রাবু ততক্ষণে কর গুনে গুনে দরুদ পড়ছে। জবাব না দিয়ে শুধু ভ্রূ কুঁচকে তাকায় একবার।

সত্যি রাবু আপা, বল না মেয়ে ইমাম কী হয় না? কৌতূহল চেপেছে মালুর। জবাব না পেলে কৌতূহলটা মিটাবে কেমন করে? কিন্তু রাবুর দরুদটা শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারে না মালু। নামায শেষ করে মা এসে পড়েছেন ঘরে : মালু, এখনো শুয়ে?

তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে মালু। খিড়কির পুকুরে গিয়ে দু আঙ্গুল পাঁক তুলে দাঁতগুলো সাফ করে নেয়। ভিজে হাতটা মুখের উপর বার দুই বুলিয়ে ফিরে আসে। মাথার উপর দিয়ে গলিয়ে নেয় সার্টটা। ছুট দেয় বাইর বাড়ির দিকে। মক্তবের সময় হয়ে গেছে। ছুটতে ছুটতেই মার হাত থেকে তুলে নেয় পিঠেগুলো। ভরে নেয় প্যান্টের পকেটে। চুলটা একটু আঙ্গুল চালিয়ে ঠিক করে দিতে যায় মা। দাঁড়ায় না মালু। আব্বা মুনশীজীর ছড়িটাকে ওর ভীষণ ডর। নামায নিয়ে এখনো তেমন বাড়াবাড়ি শুরু করেননি আব্বা। তাই ভোরে না উঠলেও দু একটা ধমকের উপর দিয়েই কেটে যায় তাঁর অপ্রসন্নতা। কিন্তু মক্তবে দেরি করলে রক্ষে নেই। বেহুশের মতো ছড়ি চালিয়ে যাবে, মালুর পিঠে।

সৈয়দ বাড়ির কাছারীর পাশেই মক্তব ঘর। মিঞা আর সৈয়দ বাড়ির ইজের হাফ প্যান্ট পরা ছেলে-মেয়ে ছাড়াও গ্রামের উদলা গায়ের ছেলে মেয়েরাও সূর্য উঠতে না উঠতেই মক্তবে এসে জড়ো হয়। ছোটরা আসে খালি হাতে। একটু বড়োদের হাতে থাকে আমপারা। যারা মালুর বয়সী বা আর একটু বড় ওরা আসে মাথায় টুপি, বগলে রেহাল আর কিতাব নিয়ে। আলিফ যবর আ, বে যবর বা, তে যবর তা, ঘরের চারিদিকে চাটাইয়ের উপর গোল হয়ে বসে সামনে পিছনে দুলে দুলে পড়ে যায় বাচ্চারা। একটু বড়রা মুন্‌শীজীর গলায় গলা মিলিয়ে টান ধরে–আ-উ-যু বিল্লা হে মিনাশ শায়তোয়ানির রাজিম।

সৈয়দ বাড়ির বাচ্চু কেনুদের সাথেই বসে মালু। ওরা বসে মুন্‌শীজীর ডান দিকে। অন্যরা মুনশীজীর বাঁ দিকে। দু দিকে থেকে গোল হয়ে সারিটা যেখানে এসে মিলেছে সেখানে সীমান্তের প্রহরী মুন্‌শীজীর আলমিরা। আলমিরা মুন্‌শীজীর কোরান-কিতাবগুলো ধারণ করে আর রক্ষা করে আশরাফ আতরাবের সীমানা।

কচি কচি গলার কত আওয়াজ, বিচিত্র উচ্চারণ, কল কল করে মক্তবঘর। ছোট্ট দুয়ার দিয়ে কচি কচি কণ্ঠের সেই ঐক্যতান ছড়িয়ে পড়ে শীতের কুয়াশা ঢাকা গ্রামের ঘরে ঘরে কী এক আহ্বানের মতো। সামনে পিছে ঢুলে ঢুলে আবৃত্তি করে চলেছে কিশোর-কিশোরী, উঁচুতে উঠতে ওদের কচি কণ্ঠ। সেই ধ্বনির তরঙ্গে দোল খেয়ে হয়ত অনাগত দিনের স্বপ্ন দেখছে ওদের কুটিরবাসী আব্বা আম্মারা।

মালুর চলছে কোরান শরীফের দ্বিতীয় সিপারা। রেহালের উপর কোরানটা খুলে রেখে সেও সবার সাথে দোল খায়, ঠোঁট নাড়ে। এত কণ্ঠের মাঝে ওর কণ্ঠটা যে হারিয়ে যায় সেটা জানে মালু। তাই শুধু ঠোঁট নাড়ে। একটি চোখ লক্ষ্য করে মুনশীজীকে আর একটি চোখ পড়ে থাকে উন্মুক্ত দহলিজে যেখানে চলছে ঘাস-রং ফিঙেটির উড়তি ঘুরতির বিচিত্র খেলা। আর ওর মনটা কোথায় কোথায় যেন ছুটে চলেছে। মসজিদের সুমুখে সেই পঞ্চায়েতের মেল মুখে নল পুরে ফেলু মিঞার গুড় গুড় আলবোলা টানা, হুরমতির সেই ঝলসে যাওয়া কপাল। আহ্ কী কষ্ট হুরমতির। রাবুর সেযদা, পিঠটা বেঁকিয়ে রুকু থেকে যখন সেযদায় নামে রাবু অদ্ভুত সুন্দর দেখায় ওকে...এমনি সব কথা ভাবতে ভাবতে কত জায়গায় কত কিছুর মাঝে, কত মানুষের সাথে ছুটে চলে মালুর মনটা। ডানে বাঁয়ে লেখা সেই বাঁকা অক্ষরগুলো আর চোখে পড়ে না ওর।

হঠাৎ কান খাড়া করে মালু। রাস্তার ওপারে যে ট্যাণ্ডল বাড়ি আর তার উল্টোদিকে রমজানের বাড়ি, তারই মাঝামাঝি কোনো জায়গা থেকে ভেসে আসছে আম্বরির গলা। কানের নিচে হাতের তালু রেখে ভালো করে শুনে নিল মালু। হ্যাঁ আম্বরির গলাই বটে। কেন যেন ক্রুদ্ধ হয়েছে আর কার উদ্দেশে কহর দিয়ে চলেছে অনর্গল : নিজের মেয়ের গোশত খা, পোলার গোশত খা, মেয়ের হাডডি চিবিয়ে খা, দাঁত ভাং...আমার খাসি তো নয়, খেয়েছিস নিজের মাইয়া, নিজের পোলা ... হায় হায়রে আমার কী চেকনাইওয়ালা খাসিটারে। রাইন্যারা পাঁচ টেঁয়া দিতে চেয়েছিল, বেচলামনা সেই খাসিটা কোন্ হারাম-খোরের পেটে গেল-রে। তারপর শোনা যায় আম্বরির বিলম্বিত বিলাপ।

কী হল আম্বরির? উসখুস করে মালু।

মুন্শীজী ছড়িটা উপরের দিকে তুলে ধরেছেন। এটা পড়া বন্ধ করার ইঙ্গিত। মন্ত্রপূতের মতো স্তব্ধ হয়ে যায় সেই কচি কণ্ঠের ধ্বনি কল্লোল। ছড়ি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পড়া নিতে শুরু করেছেন মুনশীজী।

ধ্বক করে ওঠে মালুর বুকটা। কিছুই তো পড়া হয়নি। মনে মনে একটু পড়ে নিতে চেষ্টা করে মালু।

আরো স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে আম্বরির অভিশাপগুলো : যে খেয়েছে আমার খাসি মুখের জিহ্বা গায়ের গোশত তার খসে খসে পড়বে। নির্বংশ হবে সে। সাতকুলে কেউ থাকবে না। মরলে কবর দেয়ার লোক থাকবে না। মরা লাশ শিয়ালে কুত্তায় টেনে টেনে খাবে। তাই তো হঠাৎ মনে পড়ে গেল মালুর। ওই আঘরির খাসিটাকেই তো গলা বেঁধে মিঞাদের বাগিচায় টেনে উঠয়েছিল রমজান। অস্থির হয়ে ওঠে মালু, এটা জানাতেই হবে আম্বরিকে।

ভূত নেমে যায় মালুর গা থেকে। সৈয়দ গিন্নী ডেকে পাঠিয়েছেন মুনশীজীকে। অতএব পড়া দেবার সেই নিষ্ঠুর নির্যাতন থেকে রেহাই পেয়ে গেল মালু, আরো অনেকে। সমবেত গানের মতো সুর করে করে সেই ছুটির আগের দরুদটা শুরু করে দেয় ওরা!

ছল্লেল্লা হো আলা সৈয়দেনা মোহাম্মদ
ওয়া আলা আ-লেহী ওয়া আসহাবেহী ওয়াসাল্লাম।

দরুদ শেষে গল গল করে বেরিয়ে যায় ওরা। কোরানশরিফ আর রেহালটা গুটিয়ে আলমিরার লাগোয়া তাকে রেখেই ছুট দেয় মালু।

০৬-১০

গ্রামের কিষাণ কিষাণী। শিক্ষার আলোকে দৃষ্টি ওদের প্রখর হয়নি, জ্ঞানের চর্চায় বুদ্ধি ওদের শাণিত হয়নি। সে অভাবটি পূরণ করার জন্যই হয়ত ওদের রয়েছে সরল বুদ্ধির একটি সহজাত অনুভব ক্ষমতা, যা দিয়ে ওরা আঁচ করে সম্ভাব্য বিপদ, আবহাওয়ার গতি। কুকুরের যেমন ঘ্রাণশক্তি, মাটি শুঁকে শুঁকে খুঁজে নেয় অনেক দূরের শিকার, বিড়ালের যেমন দৃষ্টি, অন্ধকারেও জ্বল জ্বল করে, তেমনি কৃষকদের এই সহজাত অনুভব ক্ষমতা। হাওয়ার গতিতে ওরা বুঝে নেয় আসন্ন দুর্যোগের সংকেত, আকাশের চেহারায় ওরা খুঁজে পায় খরার চিহ্ন চারা গাছটির রং দেখে ওরা করে ফসলের ভবিষ্যদ্বাণী। সব ক্ষেত্রেই ওদের এই বিচার শক্তি হয়ত অভ্রান্ত নয়। কিন্তু অনেক পুরুষে সঞ্জাত অভিজ্ঞতাটা দিয়েই ওরা বুঝেছে ওদের এই সহজ সরল প্রবৃত্তির ইঙ্গিত মোটামুটি সঠিক পথেই চালিয়ে নেয় ওদের।

মারতে গিয়েও আম্বরিকে মারতে না পেরে সেই যে বেরিয়ে এসেছিল লেকু কিছুক্ষণ বসেছিল রাস্তার ধারে। খুঁটি বাঁধা ছাগিটা ঘরে ফেরার জন্য যখন অস্থির চেঁচামেচি শুরু করে তখন বুঝি হুঁশ হয় লেকুর। বাচ্চাসুদ্ধ ছাগিটাকে বাড়ি নিয়ে আসে ও।

ঢেলা ঢেলা মাটি দিয়ে তৈরি খোয়াড়ের দরজাটা বন্ধ ছিল, হাঁস-মুরগিগুলো ঢুকতে পারছিল না। প্যাঁক প্যাঁক কঁক কঁক চিৎকারে বাড়ি মাথায় তুলেছিল ওরা। ওদের খোয়াড়ে বন্ধ করতে গিয়েই লেকুর মনে পড়েছিল খাসিটার কথা। বাড়ির আশেপাশে, সৈয়দদের মান্দার বাড়ি। ট্যাণ্ডল বাড়ি, মাঝি-বাড়ি কোথাও খাসিটার খোঁজ না পেয়ে রমজানের উপরই সন্দেহ হয়েছিল লেকুর। তারপর গাঙ্গের কিনারটা ঘুরে এসেও যখন সন্ধান পাওয়া গেল না তখন দৃঢ় হয়েছিল লেকুর সন্দেহটা।

রমজান, নিশ্চয় রমজান ডাকাতের কাণ্ড। ওর ঘরদোরটা ভালো করে দেখে এসো তুমি। খবরটা শুনে আম্বরিও চেঁচিয়ে উঠেছিল।

সারা রাত ঘুমুতে পারেনি আম্বরি। রাতভর শুধু এপাশ ওপাশ করেছে আর খাসিটার শোকে লম্বা লম্বা নিশ্বাস ছেড়েছে। আর গোটা পয়লা প্রহর ধরে শুধু অভিসম্পাত ছুঁড়ে গেছে কোনো হারামখোর চোর বাটপাড়ের উদ্দেশে। সকালে উঠেই রমজানদের বাড়ির সীমানাটায় দাঁড়িয়ে সেই অভিশাপগুলোকে আরও চোখো আরও স্পষ্ট করে শুনিয়ে চলেছিল।

রাতের বেলায় এবং সকালেও অনেকক্ষণ শুনি না শুনি করে চুপ মেরে ছিল রমজানের স্ত্রী তাজুর মা। কিন্তু বেলা বাড়তে সেও জিবে ধার দেয়। খানকির বেডি খানকি, ফকীরার মাগি! তোর মেয়ের মাথা খা তুই। তুই শুয়ার খা। তুই হারাম খা। তারপর দীর্ঘ বর্ণনা দিয়ে চলে তাজুর মা–সাত কানি তাদের জমি, মিঞা বাড়ির নায়েরি, পুকুরে অঢেল মাছ, কিসের অভাব তাদের? তারা কেন যাবে ভিখারীর স্ত্রী ভিখারিনীর খাসি চুরি করতে? অমন কত খাসি তাদের ডাঙ্গায় ডাঙ্গায় ঘুরে বেড়ায়!

স্ত্রীদের এই মুখের লড়াইয়ে দুদিকের পুরুষরাই চুপ। বিগতযৌবনা মেয়েটির মাধুর্যহীন অনাকর্ষণীয় কণ্ঠস্বরের চিৎকারে কী এক পৈশাচিক পুলক পায় রমজান। গোটা শরীর দুলিয়ে হাসে ও।

মনে মনে প্রতিকারহীন অন্যায়ের প্রতিশোধ খোঁজে লেকু। নির্বিষ সাপের আস্ফালনের মতো মনে মনে ফোঁসে গর্জে তড়পায়।

লেকুর কানের উপর মুখটা নিয়ে ফিস ফিস করে সেই গত কালকের কিসসাটাই বুঝি বলল মালু। তারপর প্যান্টের পকেট থেকে সকালের নাশতার পিঠেগুলো বের করে। একটি ভুনির হাতে গুঁজে দেয়। আর একটি মুখে পুরে দৌড় দেয়। ওর মেলা দৌড়াদৌড়ি আজ, তালতলিতে নাকি কবির লড়াই হবে, রাধাকৃষ্ণের পালা হবে, যাত্রা হবে। যাত্রায় নাকি পুরুষ মানুষ মেয়ে সাজে। এ এক তাজ্জব ব্যাপার। নিজ চোখে না দেখে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারবে না মালু। পথে রাসুকে দেখে যেতে হবে, কী মজা হয় ও যদি সঙ্গে যায়!

ওদের বাড়ির পেছনটায় সেই ডোবার মতো ছোট্ট পুকুরটার ঘাটে বসে আছে রাসু। হাত দিয়ে মাঝে মাঝে পানিটা নাড়ছে আর কী যেন দেখছে। একটা মোটাসোটা ঢিল কুড়িয়ে ছুঁড়ে মারল মালু। রাসুর সামনে গিয়েই ঢুপ করে পড়ল ঢিলটা। কয়েক ছিটা পানি উড়ে পড়ল রাসুর গায়ে। চমকে উঠে ঝুঁকে আর আশপাশে থুথু ছিটায় রাসু। এদিকে ওদিকে তাকায় ভীতু ভীতু চোখে। কোথাও কিছু নেই, তবে কী ভূতের ঢিল? ভূত নাকি এমনি করে ঢিল ছোঁড়ে। রাসু তাড়াতাড়ি শাড়ির আঁচলটা টেনে দেয় মাথার উপর। যেন বাতাস থেকে টুপ করে রাসুর পাশটিতেই ঝরে পড়ে মালু। বলে এত ভীতু তুই?

এবারও কেমন যেন গায়ে কাঁটা দেয় রাসুর। জিন-পরীর সাথে খাতির আছে নাকি মালুর? মুখটা উল্টাদিকে ঘুরিয়ে নেয় রাসু। হড় হড় করে বলে গেল মালু। একটু

বাড়িয়ে বলল, এলাহি কাণ্ড হতে চলেছে তালতলি মহা ধুমধাম, রাসু কী দেখতে যাবে না? না। এমন ভাবে বলল রাসু, সত্যি সত্যি ঘাবড়ে যায় মালু।

কেন রে? রাসুর মুখটা ভালো করে দেখবার জন্য একটু ঝুঁকে আসে মালু কিন্তু ওর মুখটা দেখা যায় না। চোখে পড়ে ডোবার কালচে পানিতে প্রতিবিম্ব পড়ছে ওদের দুজনের, সেখানে রাসুর মুখটা কেমন ভার ভার। বেজার হয়েছিস? শুধাল মালু।

ইস বয়ে গেছে আমার ওনার উপর বেজার হতে। ফোঁস করে বলল রাসু, আর মুখটা সোজা ঘুরিয়ে আনল মালুর দিকে।

কেমন হকচকিয়ে যায় মালু। তাজ্জব হয়ে তাকায় রাসুর মুখের দিকে। স্বরটাই শুধু বাঁকা হয়নি রাসুর মুখের আদলটাও কেমন বদলে গেছে ওর। কখন? এতদিন তো চোখে পড়েনি মালুর?

একটুকরো ভাঙা পিঠে এখনো বুঝি পড়ে রয়েছে পকেটে। সেটা বের করে রাসুর হাতে গুঁজে দেয় মালু, নে খা। খালি খালি বেজার হয়েছিস তুই।

এতক্ষণে বুঝি হাসি আসে রাসুর মুখে। সে টুকরো পিঠেটাকেই ভেঙে দুটুকরো করে ও। একটা টুকরো গালে পুরে বাকীটা দেয় মালুকে।

একা একা বসেছিলি কেন? শুধায় মালু।

মাছ ধরব।

তবে নামছিস না কেন? চুলের গোছার ভেতর দিয়ে আচমকা হাতটা চালিয়ে দেয় মালু। ঘাড়টা ধরে ঠেলে দেয় সামনের দিকে। পড়তে পড়তে সামলে নেয় রাসু। একটা পা ওর পানিতে পড়ে যায়। আঁতকে পা-টা তুলে নেয় রাসু। চেঁচিয়ে ওঠে, জোঁক জোঁক!

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মালুও পা-টা নামিয়ে দেয় পানিতে। ঝুঁকে পড়ে অনেকক্ষণ ধরে জোঁকের সন্ধান খোঁজে। কোথায় জোঁক। জোঁক নেই।

ঘাটটার শেষ ধাপ একটি নারকেল গাছের গুঁড়ি, তিরতিরে পানি তার গায়ে। সেদিকে আঙ্গুলে উঁচিয়ে বলল রাসু ওই যে ওখানে। খুঁটাটাকে জোরে জোরে নাড়া দিল মালু। নারকেল গুঁড়িটা একটু হেলে কেঁপে গেল। পা-টাকে সজোরে পানির উপর আছড়িয়ে আনল মালু। আবর্ত উঠল পানির গায়ে। ছলাৎ ছলাৎ লাফিয়ে উঠল পানি। এমন ঘুটুনী পেয়ে জোঁক বসে থাকতে পারে না, থাকলে নিশ্চয় বেরিয়ে আসত। পানিটা আবার স্থির হয়। জোঁকের নাম নিশানা নেই।

আয় নাম, জোঁক নেই, ডাক দেয় মালু।

সভয়ে এক ধাপ পিছিয়ে যায় রাসু বলে : নেই মানে, নিজ চোখে দেখলাম যে? ভাইজানের স্কুলের সময় হয়ে এল মাছ না নিলে তাঁর খাওয়া হবে কেমন করে? কিন্তু ওই জোঁকের জন্যই তো পানিতে নামতে পারছি না। সেই কখন থেকে বসে আছি।

পা-টাকে জোরে জোরে সামনে পেছনে চালিয়ে মালু আবার ঘুঁটিয়ে দেয় পানি। ঘোলা হয়ে যায় পানিটা। তন্ন তন্ন করে দেখে মালু।

না জোঁক নেই। আয় নেমে আয়। রাসুর কব্জিটা মুঠোয় পুরে একটা জোর টান দিল মালু।

ঘাটের উঁচু খুঁটিটা আঁকড়ে থাকে রাসু, ও কিছুতেই নামবে না পানিতে। ওর ডর দেখে সত্যি রাগ হয় মালুর। ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দেয় ওর গালে, এতই যদি জোঁকের ভয় তবে মাছ ধরতে আসিস কেন?

অতর্কিত চড় খেয়ে মুহূর্তের জন্য সরে যায় রাসু। চোখ ঠেলে বেরিয়ে পড়ে কান্না। দুহাতে চোখ কচলায় রাসু।

বুঝি হকচকিয়ে যায় মালু, হঠাৎ করে কেঁদে দেবে রাসু। ভাবতে পারেনি ও। তাড়াতাড়ি রাসুর হাত দুটো টেনে নামায়, ধরে রাখে নিজের হাতে। শুধায়, খুব লেগেছে নাকি রে?

ওর নরম গলাটা বুঝি আরো অসহ্য মনে হয় রাসুর। ফোঁস করে ওঠে ও আর মালুর হাতে আটকে থাকা ওর দুখানি হাতের মুঠো সজোরে ঠেলে দেয় সামনের দিকে। টাল সামলাতে না পেরে ঝুপ করে পানিতে পড়ে যায় মালু।

পাঁকের উপর সন্তর্পণে পা-টা টেনে চলে মালু। পুকুরটার কিনার ঘেঁষে দাম গজিয়েছে। দামের নিচে নিশ্চয়ই মাছ আছে। কিনার ধরে আস্তে আস্তে এগোয় মালু। হঠাৎ পায়ের নিচে সির সির করে ওঠে। পা-টাকে নরম কাদার ভেতর সোজা গেড়ে দেয় মালু। পালাবার ফুরসত পায় না মাছটা। তুলে দেখে মাঝারি গোছের একটা টাঁকি। ছুঁড়ে দেয় পারের দিকে। ইপাব তৈরিঃ আল মোস্তাইন বিল্লাহ

কী যে লাফাতে পারে টাকিগুলো। শুকনো মাটি যে ফোঁসকা ফেলে ওদের গায়ে, গাটা মাটিতে লাগতে না লাগতেই তিড়িং তিড়িং লাফিয়ে চলবে। রীতিমতো বেগ

পেতে হয় রাসুর মাছটাকে জুত করে ধরে ডুলোয় পুরতে।

দামের নিচে হাত চালিয়েই বুঝতে পারে মালু অনেকগুলো খোড়ল সেখানে। পায়ের আগা দিয়ে প্রথম খোড়লের মুখটা একটু আলগাভাবে পরীক্ষা করে দেখল ও। ছোট্ট, সরু আর তেরছা খোড়লের মুখটা, হয় সাপের, নতুবা সিঙ্গী মাগুরের। আস্তে করে নিঃশব্দে বসে পড়ে মালু শুধু নাকটাকে ভাসিয়ে রাখে পানির উপর। না, সাপও নয়, সিঙ্গী-মাগুরও নয়, একজোড়া কই মাছ। স্পর্শ পেয়েই কানের আর পিঠের কাঁটাগুলো খাড়া করে দৌড় মেরেছে মাছ-গুলো। আর সেই কাঁটার উপরই চেপে বসে যায় মালুর হাতের তালু। বিষিয়ে ওঠে হাত, তবু মুঠিটা ছাড়ে না মালু, তুলে আনে পানির উপর ছুঁড়ে দেয় রাসুর দিকে।

ভারি পোক্ত কই। পিঠ যেমন তেলতেলে কালো তেমনি সোনালী লাল পেট। খুশি হয়ে ওঠে রাসু, চেঁচিয়ে বলে এগুলো আমি কুটতে দিয়ে আসি। এই যাচ্ছি আর আসছি।

ডুলাটা লয়ে রাসু দৌড়ে চলে যায় বাড়ির দিকে।

বাকী খোড়লগুলো পরিত্যক্ত, মাছ নেই সেখানে। এবার মালু মাঝ পুকুরের কাঁটা ঝোঁপটার দিকে এগিয়ে যায়। বড় মাছ যত সবই ওই ঝোঁপের তলায় কিন্তু সেখানে পানি বড্ড বেশি। ঠাঁই পাবে না মালু। আর ডুব দিয়ে বড় মাছ কী ধরতে পারবে ও, ওই তালতলির জেলেপাড়ার ছেলেদের মতো?

কিন্তু অতদূর যেতে হয় না ওকে। পায়ের নিচে আর একটা বড় গোছের টাকি সির সির করে বেরিয়ে যায়, ওর জোড়াটা নিশ্চয় আছে ধারে-কাছে। খুঁজতে থাকে মালু। হঠাৎ একটা চিংড়ি ঠাস করে ওর পায়ে বাড়ি মেরেই এক লাফে সটকে পড়ে।

দাঁড়িয়ে যায় মালু। একটু যাতে শব্দ না হয়, আলোড়ন না জাগে পানিতে তেমনি সতর্কতায় ধীরে ধীরে পা-টা ঘুরিয়ে আনে কাদার উপর দিয়ে। আর দুহাত পানির উপর রেখে এক-পায়ে শক্ত হয়ে থাকে ওর শরীরটা। এমনি করে কাদার উপর পা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বুঝি অনেকক্ষণ চলে যায়। উঠেই আসছিল মালু হঠাৎ পায়ের নিচে একটু খরখরে শক্ত মতো কী যেন বাধল। হুঁ বুঝতে পেরেছে মালু। টুপ করে ডুব দেয় ও। দুহাতে চেপে ধরে শক্ত বস্তুটাকে। তারপর দমটা ছেড়ে দেয়, আপনি আপনিই ভেসে ওঠে ওর শরীরটা। ইতিমধ্যে শক্ত বস্তুটা বের করে দিয়েছে ওর সাঁড়াসির মতো লম্বা ঠ্যাং যে ঠ্যাংয়ের তীক্ষ্ণ নখ অংকুশের মতো বিঁধে গেছে মালুর হাতের চামড়ায়। উহ্ কী অসহ্য কামড়! গায়ের গোশত বুঝি তুলে নিয়ে

গেল। তারপর হঠাৎ কামড়টা ছেড়ে দিয়ে মাছটা লেজ আর মাথা এক করে ঝপাং ঝপাং ঝাপটা মারতে থাকে। পানি কেটে সেই লেজের ঝাপটা কোনো কাঁটা পরা হাতের চড়ের মতো ঠাস ঠাস করে এসে বাজছে মালুর হাতের পিঠে। বুঝি একেবারে ঝাঁঝরা করে দিল ওর হাতের চাম। পানির উপর তুলে মালু তো অবাক, ইয়া বড় চিংড়ি। এত বড় চিংড়ি অনেকদিন দেখেনি ও। পানির ভেতর সব মাছেরই জোর থাকে, তাই বলে এত বড় মাছ কল্পনাও করতে পারেনি ও। ও মা, কত বড়, কত বড় চিংড়ি, খুশিতে পায়ের উপর যেন নেচে ওঠে রাসু। ছুঁড়বি না, ছুঁড়বি না– উঠে আয়, রাসু চেঁচায়।

দু-হাতে ঠ্যাং সুদ্ধ চিংড়িটা যেতে ধরে উঠে আসে মালু। ঠিকই বলেছে রাসু অত বড় চিংড়িটাকে ছুঁড়ে পাড় অবধি হয়ত পাঠাতে পারত না মালু। ডুলার মাঝে ধরে না চিংড়িটা। তিন গিঁটের প্রায় দেড় হাত লম্বা ঠ্যাং সে ঠ্যাংয়ের মুখে শলার মতো তীক্ষ্ণ লম্বা নখ, সাহস পায় না রাসু ওটাকে হাতে ধরতে। শক্ত মতো একটা মাটির ঢেলা কুড়িয়ে নেয় মালু, ঢেলার বাড়ি মেরে মাছটার নখের আগাগুলো ভোতা করে দেয়, বলে, যা, নিয়ে যা।

দৌড়ে চলে যায় রাসু।

ও-রকম সুন্দর আর দুর্লভ চিংড়িটা ধরতে পেরেও কেন যেন খুশির খোঁজ পায় না মালু। কেমন যেন হয়ে গেছে রাসুটা। মক্তবে যায় না, সেও বুঝি মাসের উপর হয়ে গেল। এদিকে আবার শাড়ি ধরেছে। কী বিশ্রী দেখায় ওকে শাড়িতে। না পারে সামলাতে, না পারে গুছিয়ে পরতে। তার উপর যেতে চায় না তালতলিতে। এই তো সেদিন ভট্টচায্যি বাবুদের বাড়িতে কী একটা পূজো ছিলো। ওরা দুজনই গিয়েছিল। পেট পুরে পেসাদ খেয়েছিল। আর আজ বলে কিনা যাবে না? কী হল রাসুর? ভেবে কোনো কিনারা পায় না মালু।

একটা কলা গাছের আড়ালে মালু। এদিক-ওদিক তাকিয়ে চট করে খুলে ফেলে ভেজা হাফ প্যান্টটা। ভালো করে চিপে নিংড়িয়ে পানিটা ঝরিয়ে দেয়, আবার পরে নেয় প্যান্টটা। গেঞ্জিটা চিপে বিছিয়ে রাখে পিঠের উপর। তার পর আগের জায়গাটিতে এসে বসে পড়ে। ভেজা প্যান্টের কুঞ্চনগুলো টেনে টেনে ঠিক করে আর ভাবে এত মোটা কাপড় প্যান্টের, তালতলি যেতে যেতে শুকালে হয়। কাঁধের উপর স্পর্শ পেয়ে ঘাড় ফেরায় মালু। দুষ্টু হাসি রাসুর মুখে।

তুই রেগেছিস? শুধাল রাসু।

যাহ্ মুখটা ঈষৎ বেঁকিয়ে বুঝি আগের ভাবনাটায় মন দেয় মালু। হাসিটাও কেমন বদলে গেছে রাসুর। এইমাত্র যে হাসল, সে কী রাসু?

মক্তবে যাস না কেন? ওর দিকে না তাকিয়েই শুধাল মালু।

বুঝি গম্ভীর হয়ে যায় রাসু। কী যেন ভাবে। আপনিই যেন নত হয়ে আসে ওর মুখখানি, কেমন ধীর টানে বলল, বড় হয়েছি না?

সহসা সব কিছু স্পষ্ট হয়ে গেল মালুর কাছে। রাবুদের মতো রাসুরও পর্দার সময় হয়েছে। তাই মক্তবে যায় না। শাড়ি ধরেছে। তালতলি যাবে না। অকস্মাৎ মনে হয় মালুর, অনেক দূরে সরে গেছে রাসু, পর হয়ে গেছে রাসু। আজ তবু চেনা যায় ওকে, আসছে কাল হয়ত চেনাই যাবে না। কিন্তু মালু? সেও তো বড় হচ্ছে। কই ওর তো এমনি করে বদলে যাওয়ার কথাটা মনে হয় না? মালু তাকায় রাসুর দিকে, সত্যি বড় হয়ে গেছে রাসু, শাড়ি পরে অনেক বড় দেখাচ্ছে ওকে।

তা হলে তো বিয়ে হবে এবার! ফস করে মালুর মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায় কথাটা।

রাঙা হয়ে ওঠে রাসুর মুখ। চুপ করে মালুর পিঠে একটা কিল মেরে উঠে যায়, দৌড় দেয় বাড়ির দিকে। দৌড়াতে দৌড়াতে একটু থামে, পেছন ফিরে বলে : কাল আসিস, ওই কুল গাছটার তলায়। চুপি চুপি আসবি, কেউ যেন না দেখে।

রাসুর সাথে দেখা করতে হবে গোপনে? সব যেন গুলিয়ে যায় মালুর। গেঞ্জিটা কাঁধে চড়িয়ে উঠে পড়ে মালু। মিঞাদের মসজিদের সুমুখ দিয়ে দক্ষিণ ক্ষেতে পড়ে। দখিন ক্ষেতের দিকে তাকিয়ে ওর মনে হল কেমন ঝাপসা সব কিছু, ও যেন স্পষ্ট দেখছে না কিছুই। কখন পানিতে ভরে গেছে ওর চোখ জোড়া।

কান্নাটা মালুর কাছে অতি সহজ আর মামুলি। মায়ের মার খেয়ে অহোরাত্র গলা ফাটিয়ে কাঁদতে হয় ওকে। কিন্তু আজকের কান্নাটা যেন কেমন, নিজেই বুঝতে পারে না মালু। আরও অদ্ভুত, আজকের কান্নায় দুঃখ নেই। কী যেন কথা, ও বলতে পারে না, বুঝতেও পারে না স্পষ্ট করে, সে সব কথাই যেন চোখের পানি হয়ে ঝরে পড়ছে। আর কেমন আরাম পাচ্ছে মালু।

০৭.

বাকুলিয়া আর তালতলি। পাশাপাশি দুটো গ্রাম।

দু গ্রামকে ফারাক করে রেখেছে বিস্তীর্ণ এক শস্যক্ষেত। পাশ তার পোয়া মাইল। লম্বায় মাইলেরও উপর। বাকুলিয়ার দক্ষিণে, তাই ক্ষেতটার নাম দখিন ক্ষেত।

আর তালতলির মানুষরা বলে উত্তুরের ক্ষেত।

বাকুলিয়ার প্রবেশ পথে সৈয়দ বাড়ির সদর ফটক আর বেরুবার পথে মিঞা বাড়ির মসজিদ। দুটো খানদানী বাড়ি। দুই প্রহরীর মতো গোটা গ্রামটিকে যেন হাতের বেষ্টনে ধরে রেখেছে। মিঞা বাড়ির মসজিদের লাগ বড় পুকুরটার সীমানা থেকে শুরু হয়েছে দখিনের ক্ষেত। ক্ষেতের ওপারে তালতলির দত্তদীঘির দীর্ঘ তাল বীথি, তালতলির প্রবেশ তোরণ।

সোনার চেয়েও দামী পূর্ব বঙ্গের মাটি। কাঁড়ি কাঁড়ি সোনা ফলে এ মাটিতে। পুস্তক-কিতাবের লেখা নয়, দখিন ক্ষেতে যারা লাঙ্গল চালায় তারাই জানে কত উর্বর সোনা-ফলা এ মাটি। বছরে ধানী ফসল উঠে দুটো, চৈতী ফসল উঠে এন্তার। কখনো খালি পড়ে থাকে না এ জমি। কখনো ধান, কখনো সরিষা, মুগ, কলাই, খেসারি, গুচ্ছ গুচ্ছ হলুদ আর সবুজ বুকে নিয়ে সন্তানবতী নারীর পুষ্ট বক্ষের মতো ভরে থাকে দখিনের ক্ষেত।

দখিন ক্ষেতের বুক চিরে চলে গেছে বড় খাল, তালতলিকে বেড় দিয়ে বারগনিয়া চাটখিলের দিক। তার পর সুলতানপুর, উদরাজপুর গ্রামগুলোকে চক্রাচারে ঘুরে গিয়ে পড়েছে মেঘনায়। এই বড় খালটায় এসে মিশেছে তালতলি বাকুলিয়ার গাঙ, ছোট ছোট খাল আর অজস্র নালা।

বিরাট বটের অসংখ্য শিকড় যেমন এঁকেবেঁকে মাটির ভেতর ছড়িয়ে যায়, মাটির সাথে অচ্ছেদ্য বন্ধনে ধরে রাখে বিশাল মহীরুহকে, রস সিঞ্চন করে প্রতিনিয়ত, তেমনি ওই গাঙ আর ছোট ছোট খালগুলো তালতলি বাকুলিয়াকে ধরে রেখেছে অসংখ্য বাহুর আলিঙ্গনে। রস ভরে যায় তালতলি বাকুলিয়ার মাটি, বৃষ্টি বন্যার পানি আর আবর্জনা বয়ে নিয়ে অটুট রাখে দু গ্রামের স্বাস্থ্যশ্রী। আর বর্ষার মরসুমে, শীতের শুরুতে মাছ দেয় অঢেল। পুকুর পাড়ের গাব গাছটির নিচে দাঁড়িয়ে। নির্নিমেষ চেয়ে থাকে ফেলু মিঞা। দৃষ্টি তার প্রসারিত দক্ষিণের ক্ষেতে। পুকুরটির পূর্ব পাড় থেকে একটা সরু রাস্তা এঁকেবেঁকে গিয়ে উঠেছে তালতলির তালবীথি ছায়া পথে। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ফেলু মিঞা ধীরে ধীরে নেমে আসে রাস্তাটায়। হাত জোড়া পেছনে কোমরের উপর কেঁচির মতো আড়াআড়ি রেখে আনত মুখে হেঁটে চলে।

কিছুদূর এগিয়ে ফেলু মিঞা উদাস চোখে তাকায় সামনের দিকে, যেখানে একটি রূপোর সুতোর মতো চিকচিক করছে বড় খাল। ওই খালের এপার-ওপার একদা সবটাই ছিল মিঞাদের সম্পত্তি। তালতলি, চাটখিল, সুলতানপুর এসব গ্রাম ছিল

মিঞাদেরই জমিদারীর অংশ। কিন্তু কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় কেমন করে যে জমিদারীটা বেহাত হয়ে যায়, সে ইতিবৃত্ত এখনো উদ্ধার করতে পারেনি ফেলু মিঞা। শুধু শুনেছিল প্রাচীন সম্পত্তি পুনর্বার বন্দোবস্ত নেবার মতো নগদ টাকা নাকি ছিল না তাদের দুর্ভাগা পূর্বপুরুষদের হাতে। ছিল না তেজারতী কারবারে নগদ অর্থের অধিকারী কোনো হিন্দু বেনিয়ার সাথে প্রতিযোগিতার রৌপ্যশক্তি। তাই ত্রিপুরার মহারাজার অধীন কয়েকটা পত্তনী আর বন্দোবস্ত নিয়েই তুষ্ট থাকতে হয়েছিল সেই অভাগা পূর্ব পুরুষদের। পরে সেই পত্তনী বন্দোবস্তগুলোও একের পর এক হাতছাড়া হয়েছে।

খালের ধারটিতে পৌঁছে ফেলু মিঞা একবার পেছন ফিরে তাকায়, তাদের পুকুরের সেই গাব গাছটিকে ছোট একটা ঝোঁপের মতো দেখায় এখান থেকে। এই তো সেদিনও আব্বাজান বড়ো মিঞার আমলে খালের এপারে ভূঁইগুলো ছিল তাদেরই তালুকভুক্ত, কিছু ছিল খাস দখলি। একনাগাড়ে দশ বছর ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টগিরি করে গেছেন আব্বাজান বড়ো মিঞা। কী তার প্রতাপ! কত তাঁর রব-রোয়াব! জমিদার না হয়েও ক্ষমতা রাখতেন জমিদারের মতো। আর আজ? দখিন ক্ষেতের ষোল আনার দুই আনাও মিঞাদের হাতে আছে কিনা সঠিক করে বলতে পারে না ফেলু মিঞা। তালুক পত্তনী, ওসব দিয়ে কী হব? ছেলেরা বিদ্বান হোক, মানুষ হোক বলতেন বড় মিঞা। আর একটার পর একটা তালুক বেচে গিয়েছেন ছেলেদের শহুরে জীবনধারার অন্তহীন চাহিদা মেটাতে।

সাঁকোর উপর পা রেখে আর একবার পেছনের দিকে তাকায় ফেলু মিঞা। আলঘেরা ক্ষেতের পর ক্ষেত। এসব খালের এপার-ওপার সবটাই, সবটাই কত পুরুষের সম্পত্তি মিঞাদের! ওই তো ডান দিকে তিন নম্বর তালুকের সীমানা, যে তালুকটা আব্বাজান বড় মিঞা বেচে গিয়েছিলেন রামদয়ালকে। বাঁয়ে সাত নম্বর। ওটা তামাদী হয়েছিল। রামদয়ালই নীলাম ডেকেছিল। আর সুমুখেরটা মৌজা সুলতানপুরের চৌদ্দ নম্বর তৌজি, ধড়িবাজ রামদয়াল লাহা স্টেটের নায়েবকে ঘুষ দিয়ে আট হাজার টাকার সম্পত্তিটা স্রেফ দু হাজারেই গাপ করেছে। সাদাসিধে আর সাফ দিলের মানুষ আব্বাজান বড় মিঞা, টেরই পেলেন না কেমন করে রাতারাতি বেহাত হয়ে গেল সম্পত্তিটা। সব, গোটা দখিন ক্ষেতটাই এখন ওই মালাউনের বাচ্চা রাম-দয়ালের পেটে। অনুপস্থিত সেই রামদয়ালের উদ্দেশেই যেন একবার কটমটিয়ে তাকাল ফেলু মিঞা। সঙ্গে সঙ্গেই রাগটা ঘুরে গিয়ে পড়ল শহরবাসীর নাফরমান ভাইগুলোর উপর।

তিন তিনটি ভালো তালুক বেচা পয়সায় মানুষ হল, অথচ একটি পয়সা যদি দেয় দেশের বাড়িতে। যদি একটু সাহায্য করত ওরা, বেশি না তিরিশটি করে তিন ভাই মিলে যদি নব্বইটি টাকা পাঠাত দেশে, তা হলে... তা হলে দেখিয়ে দিত সে যে মিঞার বেটা ফেলু মিঞা। বুদ্ধি আর টাকার খেলে ঘোল খাইয়ে ছাড়ত ওই রামদয়ালকে। অন্তত তিন নম্বর আর সাত নম্বর তালুকটা যে উদ্ধার করতে পারত রামদয়ালের খপ্পর থেকে এতে এতটুকু সন্দেহ নেই ফেলু মিঞার।

এসে পড়েছে তালতলি। দত্তদীঘির পাড়ের মানুষগুলোকে চেনা যাচ্ছে। তালদীঘির ওপার থেকে উঁকি দিচ্ছে রামদয়ালের দোতলা দালান। ওই দালানটার উপর নজর পড়তেই যেন বিছুটির বিষে সারা গাটা জ্বলে গেল ফেলু মিঞার। আর ওর গলা দিয়ে বেরিয়ে আসে অভিসম্পাত, ধিক্কার-অপদার্থ পূর্বপুরুষদের প্রতি। যদি থাকত তাঁদের এতটুকু দূরদৃষ্টি, এই হাল হত মিঞা বাড়ির? মরহুম আব্বাজান বড় মিঞা, (আত্মার তাঁর মাগফেরাত হোক,) তাঁকেও ক্ষমা করতে পারে না ফেলু মিঞা। সব গিয়ে-টিয়ে সায়-সম্মানে বাঁচার মতো যাও ছিল সে সবও বেচে বিলিয়ে একেবারে ফতুর করে গেছেন মিঞা বাড়িটাকে। আঃ আব্বাজান।

সেই আট বছর বয়সে দেখা ছবিটা এখনো ভেসে ওঠে ফেলু মিঞার চোখের সুমুখে। শুভ্র শ্মশ্রু কেশ সৌম্য-দর্শন সুপুরুষ সে বছরই কনিষ্ঠ সন্তান ফেলু মিঞার মাথায় আশীর্বাদের হাতটা রেখে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন বাকুলিয়ার বড় মিঞা। শেষ বয়সে কী যে ভীমরতি ধরেছিল আব্বাজানের, ওই শালা মালাউনের পাল্লায় পড়ে গেলেন খেলাফতে স্বদেশিতে, জেল খাটলেন দুই দুইবার। জেলেই তো ভাঙলো শরীরটা। আর ওই সুদখোর রামদয়ালটা সেই ফাঁকেই তো বেহাত করে নিল মোটা মোটা সম্পত্তিগুলো। আর বড় মিঞার সেই অপরিণামদর্শিতার ফলটা ভুগতে হচ্ছে আজ ফেলু মিঞাকে, মিঞার মতো বাঁচার সামর্থ্য নেই তার।

কী বোকামিই না করে গেছেন আব্বাজান! সাহেব বানিয়ে গেছেন ছেলে গুলোকে। সাহেব না হাতী, ইংরেজের নফরদারী। একজন করেন ডেপুটিগিরি, একজন কলেজের মাস্টার, সেজো জন বিলেতী কোম্পানীর ক্যাশিয়ার। ফুস, মুনিবের পা-ই যদি চাটবি, ইংরেজের নফরদারীই যদি করবি তবে কেন মিঞার ঘরে জন্মেছিস?

আর গোলামী করে করে কেমন ছোট হয়ে গেছে ওদের নজরটা। বছর পাঁচ আগের কথা। ফেলু মিঞা গেছিল বড় ভাই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের

কোলকাতার বাড়িতে। অনেক কাকুতি-মিনতি করে, অনেক ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে চেয়েছিল, বেশি না, মোটে হাজার দুই টাকা। শুনে তো আঁতকেই উঠেছিল বড় ভাই। বলেছিল, কোথায় পাব অত টাকা? কী করবি, তুই টাকা দিয়ে?

আগরতলার মহারাজা কিছু জমিদারী স্বত্বের বন্দোবস্ত দিচ্ছে। তা লাগবে তো অনেক টাকা। কিন্তু তার আগেই যে কিছু টাকা ঢালতে হবে মহারাজার কাচারিতে। নায়ের মশায়ের সাথে সে সব বন্দোবস্ত না করেই কী শহর অবধি ছুটে এসেছে ফেলু মিঞা? সব বন্দোবস্ত পাকা। শুধু হাজার আটেক টাকা কাচারীর ডালিডুলি নজরানায় খরচা হবে। স্বত্বটা লেখা হয়ে যাবে ফেলু মিঞার নামে, অথবা ওদের চার ভাইয়ের নামে। ব্যস। বাকী টাকা সে পঞ্চাশ হাজারই হোক আর লাখই হোক সে জন্য পরোয়া করে না ফেলু মিঞা। একবার জমিদারী স্বত্বটা পেয়ে গেলেই কিস্তি কিস্তি টাকা দেবে, কিছু এধার-ওধার করবে। কত খুঁটির খেল, কত ফাঁকফুকর এ সব কাজে সে কী আর জানেন না ফেলু মিঞা?

তা আট হাজার টাকার সবটাই তো আর ভাইদের কাছে চাইছে না ফেলু মিঞা! বড় মিঞা দুহাজার মেজো মিঞা এক সেজো মিঞা এক–মোট চার হাজার। বাকী চার হাজার ফেলু মিঞাই চালিয়ে নেবে। একি খুব বেশি চাওয়া হচ্ছে, মিঞা বাড়ির ইজ্জত হুরমতের নিশান বরদার বড় মিঞার বংশধরদের কাছে?

সব শুনে অট্টহাসিতে ভেঙে পড়েছিল মিঞা বাড়ির বড় মিঞা হালে ইংরেজ কাচারীর হাকিম। হাসি থামিয়ে বলেছিল : ওসব ফাজলামো রেখে জমিজমা কিছু বিক্রি করে চলে আয় কোলকাতায়। একটা দোকান করে দেব তোকে। সেই দোকান নাড়াচাড়া করতে করতে চাই কী একদিন মস্ত বড় ব্যবসায়ী বনে যাবি।

শুনে লজ্জায় অধোবদন হয়েছিল ফেলু মিঞা, এই কী মিঞা বাড়ির জ্যেষ্ঠ সন্তানের কথা? শেষ পর্যন্ত মিঞা বাড়ির ছেলে দোকানদার হবে? ছিঃ ছিঃ। কোত্থেকে একটা রাগের হলকা এসে যেন ঝলসে দিয়েছিল ফেলু মিঞার গোটা শরীরটা। মুখ তুলে বড় ভাইয়ের চোখে চোখ রেখে বিনীত কিন্তু দৃঢ় কণ্ঠে বলেছিল ফেলু মিঞা : ভাই সাহেব। বেয়াদবী মাফ করবেন। আপনার কথা শুনে মিঞা বংশের স্বর্গীয় আত্মারা পর্যন্ত দুঃখ-বেদনায়-লজ্জায় মুখ ঢাকছে। থাক, আমি আর কথা বাড়াব না। নফরদারীর মর্যাদা নিয়ে শহরে সুখে-স্বচ্ছন্দেই বসবাস করুন আপনারা, বাড়ির লুপ্ত গৌরব এই ফেলু মিঞা একাই পুনরুদ্ধার করবে। যদি বেঁচে থাকেন ইনশাল্লাহ দেখবেন।

কথাগুলো মনে পড়ায় অদ্ভুত একটা রোমাঞ্চের কম্পন অনুভব করল ফেলু মিঞা। মনে হয় মাথার চুলগুলো তার দাঁড়িয়ে পড়েছে আর এক ঝলক গরম রক্ত পা থেকে মাথা পর্যন্ত তীব্র বেগে দৌড়ে গেল।

স্কুলের নয়টা ধাপ পেরিয়ে দশমটাতে পৌঁছাতে পারেনি ফেলু মিঞা।

তবু সেদিন কেমন করে ওই কথাগুলো গুছিয়ে-গাছিয়ে বলেছিল ভাবতে গেলে আজও তাজ্জব বনে যায় ফেলু মিঞা। অবশ্য বড় ভাই ঠাট্টা করে সেদিনও বলেছিল আজও বলেন, আমাদের ফেলু চটে গেলে কেমন চোস্থ বাংলা বলে দেখেছিস? এর সাথেই ফোড়ন কেটেছিলেন মেজো মিঞা, হুঁ ঠিক যেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। নো, নো, বিদ্যাসাগরের আলহজ্ব এডিশন, ক্যাশিয়ার ভাই গলা বাড়িয়ে যোগ করেছিলেন। তারপর ফেলু মিঞার বুকের তাজা ঘায়ে বস্তা বস্তা লবণ ছিটিয়ে তিন ভাই হো হো করে হেসেছিল। পাঁচ বছর আগে কত বড় মুখ করে কথাগুলো বলে এসেছিল ও। এই পাঁচ বছরে সেই হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের সংকল্প কতদূর এগিয়েছে ফেলু মিঞা? শাঁ করে কোত্থেকে যেন তীরের মতো ছুটে আসে প্রশ্নটা, এফোঁড় ওফোঁড় করে যেন দু ভাগে কেটে দিয়ে যায় ফেলু মিঞার বুকের ভেতরটা। হ্যাঁ হ্যাঁ। আশানুরূপ না হলেও কিছুদূর, অনেকদূর, এগিয়েছে বই কী ফেলু মিঞা। আজকের এই দিনটি সেই অগ্রগতিরই এক ফলক-চিহ্ন হয়ে থাকবে। তাই তো মনে করছে, আশা করছে ফেলু মিঞা। বাকী খোদার মর্জি। মনে মনে সেই সর্বশক্তিমানের উদ্দেশে মাথা নত করল ফেলু মিঞা আর দত্তদীঘির উঁচু পাড়ে পা রাখবার আগে যেন পিছুটান খেয়েই মুখটা আবার ঘুরিয়ে নিল দখিন ক্ষেতের দিকে। দখিনের ক্ষেত, এখন সেটা উত্তরের ক্ষেত কাঁচা-পাকা শস্যে অথবা উদলা বুকে সবুজ-হলুদ আর মাটি রংয়ে চিহ্নিত দেহটি এলিয়ে দিয়ে রোদ পোহাচ্ছে। কী এক নিগূঢ় হাতছানি সেখানে, যেন ডাকছে ফেলু মিঞাকে, বলছে তার জাদুভরা কণ্ঠে-আমার এ সম্ভার, সবই তোমার, সবই তোমার। কেন যেন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলু মিঞার বুক চিরে কেঁপে কেঁপে বেরিয়ে আসে। দত্তদের বৈঠকখানার দিকে দ্রুত পা চালায় ফেলু মিঞা।

আরে আসেন আসেন। মিঞার বেটার পায়ের ধূলো আমার বাড়ি? কী সৌভাগ্য! দু কদম এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা করে রামদয়াল।

প্রতি আদাব দিয়ে চেয়ারে গিয়ে বসে ফেলু মিঞা। কিন্তু ভেতরটা তার জ্বলতেই থাকে, মিঞারা কোনোদিন ভুলেও পা ফেলেনি দত্তবাড়ি আর আজ ফেলু মিঞা যেচে এসেছে। ফেলু মিঞা সেই খোঁটাটাই খুঁজে পেল রাম দয়ালের অভ্যর্থনায়।

রমজান আগেই এসেছিল ফেলু মিঞার আগমন বার্তা নিয়ে। তাই ডাবের পানি, চা-বিস্কুট প্রস্তুত রেখে অপেক্ষা করছিল রামদয়াল। ডাবের পানিটা নিঃশেষ করে আলবোলার নলটা টেনে নেয় ফেলু মিঞা। এ তার নিজস্ব আলবোলা। একমাত্র আত্মীয় বাড়ি ছাড়া যখন যেখানে যায় হুঁকোটাও সঙ্গে যায় ফেলু মিঞার। কখনো বা তার আগেই এসে পড়ে হুঁকোটা। এটা মিঞা আভিজাত্যের প্রাচীন রেওয়াজ।

মুসলমান ডাবায় নিজের জন্য তামাক সাজাতে সাজাতে কথাটা পাড়ে রমজান– দয়াল মশায় তালুক তো আপনার অনেক, একখানা আমাদের দিন। ভনিতা ব্যাখ্যা পূর্বাহ্নেই সারা। ভাবার যা সে আগেই ভেবে নিয়েছে রামদয়াল, বলল : সাত নম্বর তো? দশ হাজার। ইপাব তৈরিঃ আল মোস্তাইন বিল্লাহ

আলবোলার নলটা বুঝি মুখ থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসে ফেলু মিঞার। নিজের কানটাকেও যেন বিশ্বাস হয় না তার। তিন হাজার টাকায় যে তালুক নিলাম ধরেছে রামদয়াল, পনেরো বছর ভোগ করেও তার দাম হাঁকছে দশ হাজার?

বহুত বেশি চাচ্ছেন, কিছু কমিয়ে দিন, ডাবটা মুখের কাছে এনে বলল রমজান।

একটু যেন ভাবল রামদয়াল। বুঝি ভেবে-চিন্তেই বলল : ফেলু মিঞার সামনেই বললেন আপনি। না করতে পারি? আচ্ছা নয় হাজারই দিন।

আকাশ-পাতাল ভাবনা সুঁই চালায় ফেলু মিঞার মগজে। ধান বেচে চাকলা রোশনাবানের যে তিনটি তালুক এখনো হাত ছাড়া হয়নি সেখানকার প্রজাদের এক রকম জোর-জুলুম করে বাকী বকেয়া আদায় করে হাজার সাতেক টাকা জোগাড় করেছে ফেলু মিঞা। অভ্যস্ত আরামগুলোকে হারাম করে, রুহটাকে নিষ্ঠুরভাবে বঞ্চিত করেই টাকাটা জমিয়েছে ফেলু মিঞা। এর বেশি এক আধলাও আর সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। রামদয়ালের সাথে দরদস্তুর করতে ফেলু মিঞার মর্যাদায় বাধল, সংক্ষেপে বলল, ভেবে দেখি। উঠি উঠি করেও এক কথায় দু কথায় আলাপ জমে যায়। তালুক পত্তনিতে কী আর সে সুখ আছে? বাড়ি বাড়ি ট্যা ট্যা করুন, তাগিদ দিতে দিতে মাথাটা ঝালাপালা করুন, পায়ে ফোস্কা ফেলুন, তবু কী পাবেন খাজনা? ওই যে আপনাদের গ্রামের রসুন আলির পোলা ফরজ আলি, কত করে বললাম, দে বাবা, চার বছরের বাকী অন্তত দু বছরেরটা উসুল দিয়ে রাখ, তা কী বলে শুনবেন? বলে, ঘ্যানর ঘ্যানর করবেন না দয়াল মশায়। হাকিম আছে, আদালত আছে, নালিশ করুন গিয়ে। থেমে একটা বিড়ি ধরায় রামদয়াল। বলল আবার–থুক মারেন তালুকের কপালে। তালুক না গলায় ফাঁস।

সেই দিন কী আর আছে দয়াল মশায়? হুঁ জমিদারী তালুকদারী, সে এক সময় মিঞারা চালিয়েছে বটে দেখেছি। পেয়াদা পাঠিয়েছে, বেঁধে এনেছে। চোখ একবার তুলেছে, কী চাবকিয়ে শেষ করেছে। ছোট লোকের জাত, পিঠ যে তাদের হামেশাই সুড়সুড় করে চাবুকের জন্য। সে তো আপনারা বুঝবেনও না, শাসনটাও ছেড়ে দিয়েছেন আজকাল। রামদয়ালের কথাটাকে আর একটু টেনে বলল রমজান।

ফেলু মিঞা সাহেব, তার চেয়ে এক কাজ করুন আপনি। কিছু জমি কিনে নিন, ট্রাক্টর এনে ভালো করে চাষ করুন। ধান পাট গেণ্ডারী সব ফসলেরই দর আছে আজকাল। আর যা অবস্থা তাতে তো মনে হচ্ছে যুদ্ধ একটা লাগবেই। তা হলে তো কথাই নেই, ধান চাল মানেই কাঁচা সোনা, টাকা রাখবার জায়গা পাবেন না তখন। পরামর্শ দেয় রামদয়াল। হিসেবী লোক রামদয়াল। তালুক জোত আর কম নয়। কিন্তু মহাজনী তেজারতিটাই আসল পেশা, পূর্বপুরুষদের পেশাও বটে। তা ছাড়া দত্তের বাজারে অর্ধেক শরীক, দোকান, মহকুমা শহরে ধান-চাল-মশলার পাইকারী কারবার। ওতেই টাকা ঢালে রামদয়াল। ওতেই মুনাফা অঢেল নগদানগদি। ইতিমধ্যে সম্ভাব্য যুদ্ধের হিসাবটাও করে ফেলেছে রামদয়াল।

মুখটা লাল হয়ে ওঠে ফেলু মিঞার। রামদয়াল ওকে চাষ করতে বলছে? বেটা সুদখোর মালাউন মিঞার ছেলেকে চাষা বানাতে চায়? হারামখোরিতে পয়সা বানিয়ে এত স্পর্ধা হয়েছে ব্যাটার?

আর একটু তামাক টানতে ইচ্ছে করে ফেলু মিঞার। সামনের দরজা দিয়ে একটা ছেলেকে যেতে দেখে বলে, এই-এই ছেলেটা। নাম কী না ওর! দে তো একটু তামাক সাজিয়ে।

আনমনে চলছিল মালু। হাত দুটো গোঁজা হাফ প্যান্টের পকেটে। রমজানের উপর মনটা তার কোনোদিনই প্রসন্ন নয়। হুরমতিকে ছেঁকা দেয়ার পর থেকে ফেলু মিঞার উপর মালু বিরক্ত। আড়চোখে একবার দেখল মালু। বুঝল তাকেই তামাক সাজতে ডেকেছে ফেলু মিঞা। মিনিট খানিক বুঝি নীরবে তাকিয়ে রইল। তার পর বলল–আমি কী চাকর নাকি?

শুনলেন তো, শুনলেন তো বান্দির পুতের কথা? তিন লাফে বেরিয়ে আসে রমজান।

থতমত খেয়ে যায় মালু। হাত দুটো এখনো প্যান্টের পকেটে আটক। পকেট ভর্তি মিত্তির বাড়ির আমলকি। কতটা হবে তাই পকেটে হাত রেখে গোপনে গুনে গুনে

দেখছিল ও। রমজান প্রায় এসে পড়েছে, এখুনি বুঝি ধরে ফেলবে ওকে। মালু দেখল দৌড়ে পালাবার উপায় নেই। কোনো দিকে দেখবারও অবসর নেই। তর তর করে উঠে গেল ও সুমুখের সুপুরি গাছটায়।

বেআদব পোলা, আছাড় মেরে তোর নাড়িভুড়ি বের করব একদিন। নিচে থেকে দাঁত-মুখ খিঁচোয় রমজান। আর খামোখাই তড়পায়, হাত-পা ছোঁড়ে। চিকন আর পিছল সুপুরি গাছটা প্রাণপণে আঁকড়ে থাকে মালু। বুক ঘেঁষে ঘেঁষে উপরে ওঠে। বুকটা বুঝি ছড়ে যায়, একটু জ্বালাও টের পাচ্ছে মালু। কিন্তু সেদিকে লক্ষ করলে চলবে না। একটু বেখেয়াল হয়েছে কী ধড়াম করে পড়বে ওই ইট আর ঝামার টুকরো ছড়ানো মাটিতে; নতুবা গাছে; দেহটার উপর দিয়ে ছচ্ছড় করে গিয়ে পড়বে একেবারে রমজানের মুঠোয়, এখনো তো দাঁড়িয়ে আছে রমজান সাক্ষাৎ আজরাইলের মতো।

মালুর ছোট্ট শরীরের দৃঢ় আকর্ষণে আর বাতাসে দোল খায় চিকন সুপুরি গাছটা। মালু চেয়ে দেখল আগার দিকটা বড় আম গাছটার ডাল থেকে মোটে দু হাত দূরে। কিন্তু এত সরু সুপুরি গাছের আগাটা মালুর ভার সইতে পারবে তো? আস্তে আস্তে সেই সরু আগাটায় উঠে এল মালু। গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে টাল খেল মালু, আর সুপুরি গাছের সরু আগাটা বেঁকে এল আম গাছটার দিকে। থপ করে ধরে ফেলল মালু আম গাছের ডালটা, শরীরটাকে একেবারে হাল্কা করে উল্টো লাফে চড়ে বসল ডালের ওপর। আম ডালে বসে হাঁপাতে থাকে মালু। গা টা ওর কাঁপছে।

আর একটু হলেই হাতটা তার ফসকে গেছিল আর কী। আর ফসকালে...? একবার নিচের দিকে তাকিয়ে দেখল মালু।

দাঁত মুখের খিচুনিটা বন্ধ করে উপরের দিকে চেয়ে আছে রমজান। চোখ তার ছানাবড়া। ছেলেটার দুঃসাহসিকতায় তারও বুকটা বুঝি ঢিপ ঢিপ করছে।

হারামজাদা বান্দির পুত। গালিটা ছুঁড়ে ব্যর্থ ক্রোধের জ্বালাটা লাঘব করে রমজান। পা বাড়ায় রামদয়ালের বৈঠকখানার দিকে। ঠিক আন্দাজ করে পর পর দুমুখ থুতু নিচের দিকে ফেলে দেয় মালু। দুমুখ থুতুই, থক করে রমজানের ঘাড় খোলা কামিজ আর চুলের মধ্যবর্তী জায়গাটুকুতে পড়ে লেপে যায়।

ছি ছি ছি তড়িতাহতের মতো বৈঠকখানার দিকে দৌড়ে যায় রমজান। রামদয়াল হাসে।

ফেলু মিঞা সিগারেট ধরায়।

০৮.

শা-লা-কর্ন ওয়ালিস...নাফরমান ইংরেজের বাচ্চা...ব্যাটা মালাউন, বলে কিনা চাষ করুন? উত্তরের ক্ষেতে পা রেখে দাঁত দাঁতে চেপে অনেকটা স্বগতোক্তিতে বলে ফেলু মিঞা।

কর্নওয়ালিসের নামটা মুনিবের কাছেই দুচারবার শুনেছে রমজান। অন্য কোথাও কখনো শোনেনি। তবে নামটা যে কোনো ইংরেজের সেটা মুনিবের কথা থেকেই আন্দাজ করে নিয়েছে ও। কিন্তু সেই কর্নওয়ালিসের সাথে মুনিবের যে ঠিক কোথায় এবং কী ধরনের সংঘর্ষ সেটা আজও অজ্ঞেয় রমজানের কাছে। মালাউন বলতে কাকে বোঝায় ফেলু মিঞা, সেটা রমজান জানে। তাই মুনিবের শেষের কথাটই আমল করে রমজান। গলাটাকে বেশ উঁচিয়ে বলে : হারামখোরী করে তিন পুরুষ ধরে খালি টাকাই জমিয়েছে। টাকার গরমে কী আর মানুষকে মানুষ কয়? কী রকম চশমখোর! আরে নিলাম ধরলি তিন হাজার, এখন কোন শরমের মাথা খেয়ে দশ হাজার চেয়ে বসলি? মুনিবের চিন্তাগুলোরই প্রতিধ্বনি করে রমজান। পুরুষ পরম্পরায় মিঞাদের সাথে দীর্ঘ দিনের সম্পর্কের ভেতর দিয়ে এ বিদ্যাটি বুঝি পুরোপুরিই রপ্ত রমজানের।

এই বাংলা দেশটা, তামাম হিন্দুস্তানটা কাদের ছিল জান? স্বরটা হঠাৎ তীক্ষ্ণ করে আর মুখটা রমজানের দিকে ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করে ফেলু মিঞা। প্রশ্নটা শুধু আকস্মিক নয়, কিছুটা দুর্বোধ্যও। তা ছাড়া এ ধরনের ব্যাপার একটুও খেলে না রমজানের মাথায়। তবু ভড়কে না গিয়ে স্বাভাবিক বুদ্ধিটা খাটিয়ে বলল, তা আর জানি না?

সেই যে আকবর বাদশা, তামাম হিন্দুস্তানের বাদশা ছিলেন। আর ওই যে নবাব আলিবর্দী তিনি ছিলেন সুবে বাংলার হর্তা-কর্তা মালিক। তাঁদেরই বংশধর আমরা। এই দেশ তো আমাদের। নিজের প্রশ্নের নিজেই জবাব দিয়ে চলে ফেলু মিঞা। কিন্তু ওই শুয়োরখোর ইংরেজ? কেড়ে নিল আমাদের বাদশাহী তখত। বাদশার জাত, আমরা এখন ভিখিরীর জাত। পোয়াবারো, ওই মালাউনদের, জমিজিরাত সবই লুটপুটে খাচ্ছে ওই ব্যাটারা।

তা ঠিকই বলেছেন স্যার, সায় দেয় রমজান। স্যার শব্দটা বার্মা মুল্লুক থেকে শিখে এসেছে ও। আর লক্ষ করেছে ওই সম্ভাষণটি শুনলে কেমন খুশি হয় মুনিব ফেলু মিঞা। তাই সুযোগ পেলেই ওটা ব্যবহার করে রমজান।

কিন্তু বাদশার জাত বাদশারই জাত। টাকা হলেই কী আর খানদান পাওয়া যায়? কী বল রমজান?

ছোট্ট একটা জি বলে চুপ মেরে থাকে রমজান। এসব ভাবালুতার আগা মাথা খুঁজে পায় না ও। মুনিবের দু কদম পিছে পিছে চলেছে ও। আর ভাবছে ওই সাত নম্বর তালুকটারই কথা। তালুকটা বেচেই দিতে চায় রামদয়াল। ওতে নাকি লোকসান যাচ্ছে। তাই রমজানের বরাবর ফেলু মিঞার প্রস্তাবটা আসতেই লুফে নিয়েছিল রামদয়াল। দামটা ইচ্ছে করেই একটু বেশি হেঁকেছিল, কারণ জাতমহাজন রামদয়াল জানে মিঞার যখন রোখ চেপেছে তখন তালুক সে কিনবেই। দশ হাজার হেঁকেছে অন্তত আট হাজার বের করবেই সেই সাথে রমজানকেও টিপে দিয়েছে রামদয়াল, যদি আট হাজার খসাতে পারে তবে পাঁচ শো রমজানের। পান চিনি খাবে রমজান। যদি এর বেশি হয় তবে বেশিটুকুর বকরাও আধাআধি। দুটো কদম তাড়াতাড়ি ফেলে মুনিবের পাশাপাশি এসে দাঁড়ায় রমজান। কিন্তু, মুখের দিকে তাকিয়ে ভড়কে যায়, ঠোঁটের কাছে ঠেলে কথাটা উল্টো দিকেই ফিরে যায়।

কী ভাবছে ফেলু মিঞা অমন রক্ত-টকটক মুখে?

তালুকটা আসলে বেচবার ইচ্ছে নেই রামদয়ালের। তাই অমন অসম্ভব দাম হেঁকেছে। মাঝখানে ফেলু মিঞাকে নিজের কাচারিতে বসিয়ে শুধু একটু মজা দেখে নিল। এ সম্পর্কে একটুও সন্দেহ নেই ফেলু মিঞার মনে।

আহ্ বুকের সেই আগুনটা আবার দাউ করে জ্বলে উঠছে। অপমানে ক্ষোভে রাগে ফেটে যেতে চায় গোশতের শরীরটা। সে জন্যই বুঝি স্কুলের স্বল্প শেখা ইতিহাসের জ্ঞান থেকে বার বার ভেসে ওঠে দুটো নাম–আকবর বাদশা আর নবাব আলিবর্দী। এই নাম দুটোর সাথেই জড়িত যত গৌরব। তারপর সিরাজুদ্দৌলা, বাংলা তথা ভারতের স্বাধীনতা হরণ। এই কলঙ্কের সাথে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত মিঞা আভিজাত্যের বিলুপ্ত অধ্যায়। তার ওপর শালা কর্নওয়ালিস, শেষের শূলটা তো ওই শুয়োরখোরটাই মেরে গেছে। তাই তো আজ বাইন্যারামদয়ালের কাচারিতে যেচে আসতে হয় ফেলু মিঞাকে। ফিরে যেতে হয় ব্যর্থ মনোরথে। জ্বালা। জ্বালা। এ এক অসম্ভব জ্বালা। ভেতরের শিরাগুলো কেমন টাটিয়ে ওঠে আর ফেলু মিঞার মনে হয় শরীরের সমস্ত চামড়া যেন ঝলসে গেল। এমনিই হয়, মিঞাদের অতীত বর্তমান আর ভবিষ্যৎটা যখন চিন্তা করে ফেলু মিঞা তখন এমনি এক জ্বালায় দাউ দাউ করে বুকটা, কোত্থেকে কোন হারানো দিগন্তের বহ্নি শিখারা এসে ছেঁকে ধরে ওকে। সেই শিখার মাথায় চড়ে, লুণ্ঠিত মর্যাদা, লুপ্ত অতীত,

অতৃপ্ত আকাক্ষা আর এখনো অপূর্ণ সেই সংকল্পটি ধেই ধেই করে কী এক আগুনের নাচন জুড়ে দেয় ফেলু মিঞাকে ঘিরে। কখন যে এমন অবস্থা হবে আগে ভাগে একটুও টের পায় না ফেলু মিঞা।

হয়ত বা রাত্রে ঘুমুতে গেছে অথবা দিবানিদ্রার উদ্দেশে হাতপাগুলো একটু ছড়িয়ে দিয়েছে অমনি ওৎপাতা জন্তুর মতো চিন্তাগুলো একটার পর একটা লাফিয়ে পড়ে ঘিরে ধরে ফেলু মিঞাকে। অন্য সময় কোন্ কানি-ঘুপচিতে যেন লুকিয়ে থাকে এসব চিন্তা। মাঝে মাঝে শুধু থাবাটা বাড়িয়ে দেয় একটুখানি, আর কাজ করতে করতে অন্যমনস্ক হয়ে যায় ফেলু মিঞা। কিন্তু অবসর সময়টাতে ওদের দৌরাত্মের আর সীমা থাকে না। নিদারুণ তীক্ষ্ণতা অসহ্য বিষ ওই জন্তুর মতো থাবা-মেলা চিন্তাগুলোর। দাদুর নাকি একটা হাতি ছিল, ঘোড়া ছিল চারটে। হাতিটা মরে যায়। দাদুর জীবিত কালে হাতি আর কেনা হয়নি। কতদিন ভেবেছে ফেলু মিঞা–হাতি হল আভিজাত্যের বিশিষ্ট অঙ্গ, হাতি একটা কিনতেই হবে। কোনোদিন কী কিনতে পারবে ফেলু মিঞা? আল্লা কী সে তৌফিক দিবেন তাকে।

সেই দাদুর আমলের ষোল বেহারার পালকিটা, খুঁটো আর দরজা ভেঙে কবে পড়ে আছে দেউড়ি ঘরে। না আছে সেই বেহারা, না চড়বার লোক। ফেলু মিঞার আছে সেই আব্বাজান বড় মিঞার আমলের একটি মাত্র ঘোড়া। বুড়ো হাড়জিরজিরে ঘোড়াটা। চড়বে কী, ওটাকে দেখলেই যে মায়া হয়! পাছে লোকে দেখে হাসাহাসি করে তাই চাকরটাকে কড়া নির্দেশ দিয়ে রেখেছে ফেলু মিঞা–দিনের বেলায় আস্তাবল থেকে কখনো বের করবি না ঘোড়াটাকে। নেহাৎ মরহুম আব্বাজানের ঘোড়া নইলে কবে এক গুলি খরচ করে ওটাকে চোখের সুমুখ থেকে সরিয়ে দিত ফেলু মিঞা। কবে, কবে একটা তেজী বলিষ্ঠ-স্বাস্থ্য সুন্দর চকচকে ঘোড়া কিনতে পারবে ফেলু মিঞা? কত দিনের সাধ তার!

এ গাঁ সে গাঁ, দুচারজন থুথ থুরে বুড়ো, তাদের মুখে শুনেছে ফেলু মিঞা, একটা পুইন্যাহত বটে মিঞা বাড়ি। সে কী পুইন্যা রীতিমতো ভোজ-জিয়াফত। লেগে থাকত দুটো দিন। পিঁপড়ের সারির মতো দূরদূরান্ত থেকে প্রজারা আসত। কত নজরানা, কত উপঢৌকন। রূপার টাকা, কাগজের টাকা আলাদা আলাদা জমা। জমে জমে স্তূপ হয়ে রীতিমতো পাহাড়ের মতো উঁচিয়ে উঠত। শুধু কী টাকা। চাল ডাল ফল গরু ভেড়া ছাগল, মনে হত চার পাঁচটা হাট উঠে এসেছে মিঞা বাড়ির কাচারি মাঠে। যারা সম্ভ্রান্ত প্রজা ওরা আসত ঘোড়া অথবা পাল্কিতে চড়ে। নজরানা দিত গিনি সোনা অথবা সেই বাদশাহী আমলের আশরফি। সে এক দিন ছিল বটে। আর আজ? আজও বছর বছর পুইন্যা হয়, কিন্তু, সে শুধু নিয়ম রক্ষার

খাতিরে। জমক নেই, লয়-লস্কর নেই, প্রজা নেই; পুইন্যা কেমন করে জমবে! অথচ ওই রামদয়ালের কাচারিটা পুইন্যার সময় কেমন গম গম করে, কত ধুমধাম কত হৈ হৈ।

এ সব ভাবতে ভাবতে ফেলু মিঞা দেখে মনের পর্দায় মিঞা-আভিজাত্যের যে নিখুঁত ছবিটি এঁকে রেখেছে, সেই ছবিটি কখন জীবন্ত অবয়ব নিয়েছে, একটা ছবি নয়, অসংখ্য ছবি–তারা জীবন্ত হয়ে ওর চোখের সুমুখে চলে বেড়াচ্ছে। নহবতখানায় সানাইয়ালা বাঁশিওয়ালা ঘুঙ্গুর ওয়ালা। কী এক ললিত রাগিণীর মুর্ছনায় ধিমি ধিমি সুরের জাল বিস্তার করে চলেছে ওরা। হাতিশালায় হাতি। ঘোড়াশালায় ঘোড়া। মেজবান খানায় মেহমানের ভিড়। লোক-লস্করে গম গম করছে মিঞা বাড়ি। কত কণ্ঠ কত হাসি। হাসি হাসি মুখ প্রজাদের, মিঞার অনুগ্রহ পেয়ে হাত তুলে দোয়া করছে। আল্লার দরবারে দীর্ঘায়ু কামনা করছে ফেলু মিঞার। আহা সে দিন কখনো আসবে না? এই তো ছবি মিঞা বাড়ির। এ ছবিটা সেই কবে থেকে মনে মনে নাড়া-চাড়া করছে ফেলু মিঞা। কত রং লেগেছে কত বিচিত্র বর্ণে মুড়ে নিয়েছে নিত্যকার আঁকা সেই ছবিকে।

এমনি ভাবতে ভাবতে আনন্দ উত্তেজনায় স্নায়ুগুলো তার চিন চিন করে বেজেছে। কান পেতে শুনেছে ফেলু মিঞা ধমনীর উষ্ণ রাজ্যে সে এক স্পন্দন, সে এক রুদ্র নাচন। চোখ তার জ্বলে উঠেছে, শরীরটা উঠেছে তেঁতে। অস্থির হয়েছে ফেলু মিঞা। ঘুমের আয়োজন হয়েছে লণ্ডভণ্ড। আর হঠাৎ, হঠাৎ তার মনে হয়েছে কোত্থেকে ছুটে আসছে সেই সব বহ্নিশিখা যা ওকে ঝলসে পুড়িয়ে একাকার করে দিয়ে যায়। স্বপ্ন, অতীত, বর্তমান, অপূর্ণ সাধ আর সংকল্পের শিখারা... ধেই ধেই নাচন দাউ দাউ অগ্নিতাণ্ডব আপন জগতের বন্দী ফেলু মিঞা।

সাঁকোটায় উঠতে গিয়ে ফেলু মিঞা কী হোঁচট খেল? দু হাতের বেড় দিয়ে তাড়াতাড়ি ধরে নেয় রমজান। সাঁকোটা পেরিয়ে জলদি জলদি পা ফেলে ওরা। বেলাটা হেলে পড়েছে।

সাঁকোটার মেরামত দরকার, অনেকক্ষণ পর মুখ খুলল ফেলু মিঞা।

একটা কথা। যা এতক্ষণ বলার জন্য সাহসটা সংগ্রহ করতে পারছে না, রমজান সেই বরাভয়টা চেয়ে বসল মুনিবের কাছে। বল। বল।

বলছিলাম কী : মান বেশি, না টাকা বেশি।

মর্মে গিয়ে বিঁধল কথাটা। এতক্ষণ ধরে এ কথাটাই তো ভাবছে ফেলু মিঞা, মান বড়, না টাকা বড়। মনে মনে একটু হিসেব করে দেখে ফেলু মিঞা। স্ত্রী হালিমার বিছে হারটা আর এক জোড়া বাজুবন্দ, এতে হাজার খানিক টাকা হয়ে যাবে। কিন্তু, বাকী আরেক হাজার?

আমার তো মনে হয় ব্যাটা আট হাজার তক নামবে, বুঝি মুনিবের চিন্তাটা অনুসরণ করেই বলে রমজান।

কী? চকচকিয়ে ওঠে ফেলু মিঞার চোখ মুখ! তবে তুমি যাও। কালকের মধ্যেই পাকা দলিল করে ফেল। আমি রাজি। ভবিষ্যতের রঙিন কল্পনাটা কী এক অপরূপের মূর্তি ধরে আর একবার নেচে যায় ফেলু মিঞার চোখের উপর দিয়ে। সারা দিনে এই প্রথম একটু হাসল ফেলু মিঞা।

কিন্তু রমজানের ঝুলিতে আরো অনেক বুদ্ধি। অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত সে বুদ্ধির জাল। বলল রমজান : লেকু, বসির, ট্যান্ডল, সেকান্দর মাস্টার, তাজু, ব্যাপারী, হামিদ শেখ, কারিবাড়ি, খতিব বাড়ি, আরো অনেক–কেউ চার বছর, কেউ তার চেয়েও বেশি খাজনা বাকী ফেলেছে। ওদের ক্রোক দিন উঠে যাক, গাছ গাছড়া ভিঁটিভুঁটি সমান করে ফেলি অন্তত দশ কানি জমি তো হবেই। ধান তোলা যাবে দু খন্দ, রবি ফসলও নেহাৎ কম হবে না।

কী বলতে চাও তুমি! রমজান বুঝি সেই চাষের কথাটাই তুলছে আবার। তীক্ষ্ণ আর কর্কশ হল ফেলু মিঞা।

একটুও না দমে বলে চলে রমজান : কানি প্রতি যদি দুই খন্দে পঞ্চাশ মণ ধানও ধরি তা হলে বছরে হল গিয়ে পাঁচ শো মণ। মণকরা দু টাকা করে ছেড়ে দিন ধানগুলো। কত হল? পুরো এক হাজার টাকা। কম কথা? বছরে যদি হাজার টাকা জমে তা হলে, সাত নম্বর তো থোড়ি বাত, ওই তিন নম্বর, চৌদ্দ নম্বর আর মিত্তিরদের জোতগুলো কিনতে কয় বছর লাগে বলুন তো? আপনার জন্য জমি, অন্য সব তহসিলের আয়ের কথাটা বাদ দিয়েই বলছি।

অজস্র শিখায় জ্বলছে যে দাবাগ্নি, সেটা বুঝি আর একটু উসকে দিল রমজান। সহসা উত্তর জোগায় না ফেলু মিঞার মুখে।

এ তো গেল এই বছরের হিসেব। যুদ্ধ কী লাগবে না ভাবছেন? নির্ঘাত লাগবে। তা হলে? তা হলে দুটাকার ধান হবে তিরিশ টাকা। তখন ওই দশকানি জমির পাঁচশো মণ ধান দিয়ে হেলে-ফেলেও পনেরোটি হাজার টাকা ছেঁকে তুলবেন আপনি। এর

একটি কথাও যদি মিথ্যে হয় তবে বলছি স্যার, আপনার এই না-কাবেল গোলাম রমজানের কানটা কেটে রেখে দেবেন আপনি। আপনাদের দোয়ায় বিদেশ ঘুরে কিছু তো শিখেছি স্যার।

চেয়ে থাকে ফেলু মিঞা রমজানের খোঁচা-খোঁচা-দাড়ি মুখটার দিকে। এত বুদ্ধি রাখে রমজান? কড়া গণ্ডা হিসেব, নিখুঁত পরিকল্পনা। তার চেয়েও আশ্চর্য, রামদয়ালের কথাগুলোই রমজানের মুখ দিয়ে কেমন আকর্ষণীয় আর লোভনীয় হয়ে ঘিরে ধরে ফেলু মিঞাকে।

তবু খোঁচা লাগে, নীতিবোধে নয়, সম্মানকামী আভিজাত্যবোধে। প্রজা মানে সভ্রম। আসতে যেতে সালামটা, কারণে অকারণে একটু হাঁকডাক। এসব বাদ দিয়ে, প্রজাকে নাকচ করে বড় মানষীর কথা, অভিজাত্যের কথা কী ভাবা যায়? দ্রোণে দ্রোণে জমির মালিক হাজার জন মজুর খাটিয়ে চাষ, সে বলদ দিয়েই হোক আর কলের লাঙ্গলেই হোক, টাকা লাখই আসুক আর কোটিই আসুক হাতে, তবু তো চাষ করা? লোকে চাষা-ই বলবে; বলবে না মিঞার বেটা মিঞা। টাকার পাহাড়ের উপর বসে থাক, হাজার জনমজুরের উপর সর্দারী কর, সে এক জিনিস। আর মিঞাগিরি? সে এক গৌরব। সে এক বড়মানষি। আর কে না জানে খুদে মিঞা, জমিদার তালুকদার, ওদের যা কিছু রব-রোয়াব, প্রতিপত্তি সে তো ওই দশ বিশ ঘর প্রজারই দৌলতে! কিন্তু... সরকারি খতিয়ানের আঁকাবাঁকা দাগগুলো ভেসে ওঠে ফেলু মিঞার চোখের সমুখে। কত বিচিত্র নাম লেখা সেখানে, চাকলা রওশনাবাদ, পরগনা সুলতানপুর আমিরাবাদ, কোথায় কত ডিসিমলের মাপ, কত ঘর প্রজা, সবই যে মুখস্থ ফেলু মিঞার। আর ওই তিন নম্বর, সাত নম্বর, চৌদ্দ তালুকগুলো, সে যে মিঞা আভিজাত্যে দুষ্ট কাঁটা, খচ খচ করে অনবরত বিঁধে চলেছে ফেলু মিঞাকে। না, যেমন করেই হোক ফিরিয়ে আনতে হবে ও সব তালুক। আর? আর আগরতলার মহারাজার কাছ থেকে একটা স্বত্ব। সেই যে একটা ব্যবস্থা প্রায় পাকা করে এনেছিল, নাফরমান নালায়েক ভাইগুলোর মদদ না পাওয়ায় সে তো ভণ্ডুল হয়ে গেছে। কিন্তু যদি টাকা আসে হাতে তবে ম্যানেজারকে ভজিয়ে ভুজিয়ে আর একটা ব্যবস্থা ফেলু মিঞা করে ফেলতে পারবে বইকি।

প্রয়োজন টাকার। টাকা ছাড়া মিঞাগিরি চলে না, চলবে না। দাঁড়িয়ে পড়ল ফেলু মিঞা। এগিয়ে এসে রমজানকে পাশে দাঁড়াবার সময় দিল। বলল, ওদের সবাইকে খবর দাও আসতে। একটু থামল ফেলু মিঞা। বলল আবার, হ্যাঁ, আর জানিয়ে দাও খাজনা তাদের দিতেই হবে, নইলে ক্রোক।

কী এক লোভ-চিকচিকে হাসির ঝিলিক তুলেগেল খোঁচা-খোঁচা-দাড়ি মুখটায়। মনে মনে হিসেব কষে ফেলল রমজান সাত নম্বরের জন্য পাঁচশ, তিন আর চৌদ্দ নম্বরের জন্য এক হাজার করে দুহাজার, একুনে আড়াই হাজার। ইস্ রঙ্গমের সেই সর্দারী যাবার পর থেকে এত টাকা, একসাথে দেখেনি রমজান।

ওরা পৌঁছে যায় বাকুলিয়া। পুকুর পাড়ে উঠে সেই গাব গাছটার তলায় দাঁড়িয়ে পেছনে তাকায় ফেলু মিঞা। দখিনের ক্ষেতে শীত দুপুরের রোদ মাকড়শার মতো আপন মনে বুনে চলেছে সূক্ষ্ম কোনো জরির জাল। ফেলু মিঞার চোখের ক্ষেতে ফুটে উঠেছে স্বপ্নের কোনো কারু চিত্র। ইপাব তৈরিঃ আল মোস্তাইন বিল্লাহ

০৯.

কেমন করে যে দিনটা গড়িয়ে গেল টেরই পেল না মালু। তালতলি এলে সময়টা বড় তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায়। বাকুলিয়ার মতো সংকীর্ণ আর আঁকাবাঁকা নয় তালতলির রাস্তাগুলো, সোজা আর প্রশস্ত। দুপাশে আমলকি, জাম, কামরাঙ্গা জামরুল কত ফলের আর ফুলের গাছ। মাঝে মাঝে কেয়ার জঙ্গল। অজস্র কাঁঠালিচাপার গাছ, সারা গ্রামটিতে ভুর ভুর গন্ধ ছড়ায়। অদ্ভুত মিষ্টি কাঁঠালিচাপার গন্ধটি, ওই দত্তদের মেয়ে রামদয়ালের ভাইঝি রানুদি, তার চুলেও এমনি একটা সুবাস। এই কাঁঠালিচাঁপা বেটেই বুঝি তেল বানায় রানু আর সেই তেল চুলে মাখে, কত দিন জিজ্ঞেস করবে ভেবেছে মালু কিন্তু জিজ্ঞেস করা হয়নি।

বড় বড় দালান তালতলিতে। বাকুলিয়ায় তো দালানই মোটে দুটো–সৈয়দ দের আর মিঞাদের। কিন্তু তালতলির দালানের তুলনায় এগুলো যেন কবুতরের খোপ। দালানগুলোর চেয়েও তালতলির ইয়া বড় বড় টিনের চৌচালাগুলো যেন আরো ভালো লাগে মালুর। ভালো লাগে তকতকে ঝকঝকে মাটির ভিটি। বাকুলিয়াটা বড় নোংরা, তালতলিতে এলেই একথাটা মনে পড়ে ওর। তাই তালতলির রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে, ফল কুড়োতে ফুল কুড়োতে কেমন করে যেন সময়টা কেটে যায়। বাকুলিয়ায় ফেরার কথাটা মনেই থাকে না।

এসবেরও উপর তালতলির রানুদি আর ওই স্কুল। মালুর মনে তারা এঁকে রেখেছে ভয় বিস্ময় আর আনন্দ মেশানো এক আশ্চর্য ছবি। কী এক দুর্নিবার আকর্ষণ ওকে টেনে নিয়ে যায় রানুদির কাছে, ওই স্কুল ঘরের দিকে।

লম্বা স্কুল ঘরটির কাছাকাছি এসে কিন্তু বুকটা মালুর ঢিপ ঢিপ করে। কী এক সম্ভ্রম এবং ভয় ওকে আর কাছে যেতে দেয় না। রজনী ময়রার টুলের উপর বসে

বসে দেখে মালু ঢং ঢং ঘন্টা পড়ছে, ছেলেরা হুড় হুড় করে বেরিয়ে আসছে। আবার ঘণ্টা পড়ছে ছেলেরা হৈ হৈ করে ক্লাসে যাচ্ছে। তারপর কত ধরনের কত স্বরে পড়ার শব্দ আসে ভেসে। মালু ভাবে ওখানে যারা পড়ে কত না ভাগ্যবান তারা। কতদিন ইচ্ছে হয়েছে মালুর ভিতরে গিয়ে দেখুক কেমন করে ছেলেরা বসে, কথা বলে অথবা পড়া করে। অমন যে মালু সাপকে যার ভয় নেই, এখানে এলে কেমন যেন কেঁচো বনে যায় ও। সাহস পায় না ভিতরে যাবার। আব্বার মক্তবটার কথাও মনে পড়ে যায়। ওই মক্তবটা সম্পর্কে যেমন ভীষণ বিতৃষ্ণা মালুর তেমনি গভীর শ্রদ্ধা আর বিস্ময়ভরা কৌতূহলের আকর্ষণ তালতলির স্কুল সম্পর্কে।

রানুদি গো। তুমি বুঝি ওই চাঁপা ফুল বেটে চুলে মাখ। আজ এরকম চোখ বুজেই জিজ্ঞেস করে ফেলল মালু। কিন্তু অমন যে ভালো দিদি রানুদি সেও কেমন অদ্ভুত আচরণ করে বসে। মালুর হাতটা ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যায়। তারপর হাত ছেড়ে কানটা বার দুই টেনে মুচড়ে দেয়, বলে, দুষ্ট ছেলে, পালিয়ে এসেছিস বুঝি?

দেখ না কাণ্ড রানুদির। কী জিজ্ঞেস করল মালু আর কী তার জবাব। আর মালুর কানটা যেন এজমালি সম্পত্তি, জাতিধর্ম বয়স নির্বিশেষে সকলের যেন অবাধ অধিকার সেখানে। প্রতিবাদে মালু গাল ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে চুপচাপ।

ওহ্ হো জনাবের আবার অভিমান আছে দেখছি। সেই উঠোনভর লোকের সামনেই ঝুঁকে পড়ে ওর কপালে চুমু খায় রানু। কী যে আক্কেল রানুদির। লজ্জা হয় মালুর। বাকুলিয়ায় অমন করে কেউ চুমু খায় না ওকে, আম্মাও না, রাবুও না।

নে খা। শানকি ভর্তি খই আর সন্দেশ এনে দেয় রানু। মুহূর্তে লজ্জাটা ভেঙে যায়, রাগটা পড়ে যায় মালুর। বলল, রানুদি তুমি কী চাঁপা ফুল–আহ্ ভীষণ ফাজিল হয়েছিস মালু। ধমক দিয়ে ওকে থামিয়ে দেয় রানু। তারপর শুধায় সেই পুরনো কথা–আচ্ছা রাবু, আরিফা কেমন আছে রে? বোরখা পরে ওরা সারাদিন ঘরেই বসে থাকে বুঝি? পুকুরে স্নান করতে যায় না?

উদ্ভট প্রশ্ন রানুর। কতদিন বলেছে মালু, রাবু আপারা বোরখা এখনো ছোঁয়নি। বিশ্বাসই করে না রানু। তাই উত্তর না দিয়ে নির্বিকার মালু খই চিবিয়ে যায়।

রাবু নাকি নোলক পরেছে আর এক্কেবারে চোখ ঢেকে ঘোমটা দিচ্ছে? এবারও চুপ চাপ খই চিবিয়ে চলে মালু।

আচ্ছা মালু। কে বেশি সুন্দর রে, আমি না তোর রাবু আপা?

খই চিবানোটা বন্ধ হয়ে যায় মালুর, এ প্রশ্নটা আগে কখনো ওঠেনি, ভেবেও দেখেনি মালু। আর যদি ভেবেও থাকতো, মালু কী বলতে পারবে : রানু দি তুমিই সুন্দর? তা পারবে না। কেননা, রানুদির চুলে যেমন চাপার গন্ধ তেমনি রাবু আপার গায়ে অদ্ভুত এক মিষ্টি সুবাস, যার নাম জানে না মালু। রাবু আপার কথায় মধু, রাবু আপার তিরস্কার মিষ্টি, রাবু আপার স্পর্শ মিষ্টি, রাবু আপা কাঁচা হলুদের মতো টকটকে সুন্দর। কিন্তু রানুদি যে আরো সুন্দর। গান করে রানুদি, রাবু আপা গান করে না। রানুদি ফুল দিয়ে খোঁপা বাধে, ফুলের চুরি পরে হাতে। রাবু আপার টেবিলে সাজান থাকে না ফুল। আর কী সুন্দর রানুদির আদরটা।

তুমিও সুন্দর, রাবু আপাও সুন্দর, শানকিটা মাটিতে রেখে বলল মালু।

ওরে বাবা, এযে একেবারে সেয়ানা ছেলের সেয়ানা উত্তর। খুব চালাক হচ্ছিস বুঝি আজকাল? মালুর চিবুকটা ধরে টিপে দেয় রানু।

খাওয়া শেষ হয়েছে মালুর। আস্তিনের খুঁটে মুখটা মুছে বলল, বই দাও, বই চেয়েছে রাবু আপা।

কী বই? শুধাল রানু।

তা তো বলেনি?

বোকারাম কোথাকার, এর পর থেকে বইয়ের নাম নিয়ে আসবি। নইলে পাবি না। বুঝলি? বলতে বলতে আর এক ঘরে চলে গেল রানু। কয়েকটা বই এনে মালুর হাতে দিয়ে বলল আবার হ্যাঁরে, রাবু কী আমার চেয়েও লম্বা হয়ে গেছে?

জবাব না দিয়ে বইগুলো বগলে নিয়ে পা বাড়ায় মালু। যখনি দেখা হবে এই বাঁধা ধরা প্রশ্নগুলো জিজ্ঞেস করবে রানু। শুনে শুনে মালুর বিরক্তি ধরে গেছে।

মালু একদিন বলেছিল লম্বা, আর একদিন বুঝি বলেছিল খাট। বলে, কী বিপদেই না পড়েছিল। আজ আবার কোন্ কথা বলে নাজেহাল হবে রানুর হাতে? কেন, রানুদি একবার গিয়ে নিজের চোখে দেখে আসতে পারে না?

কিরে, কথার উত্তর না দিয়ে চলে যাচ্ছিস যে বড়? মালুর পথটা আগলে দাঁড়ায় রানু।

গিয়ে দেখে আসলেই তো পার। নইলে বল, আমি নিয়ে আসব রাবু আপাকে?

আসবে রাবু? আনতে পারবি?

বা-রে। পারবো না কেন? কত জায়গায় নিয়ে যাই রাবু আপাকে?

কিন্তু, ওর আম্মা? আম্মা কী আসতে দেবে?

এ প্রশ্নের যে কী জবাব সেটা রানুকে ভাবতে দিয়ে বেরিয়ে আসে মালু। এত চিঠি লেখালেখি, এত ভাব ওদের দুজনের। অথচ ওদের দেখা হয় না, ওরা দেখা করতে পারে না। রানু কোনোদিন যায়নি বাকুলিয়ায়। রাবু সেই কবে একবার এসেছিল তালতলিতে থিয়েটার দেখতে। মনে আছে মালুর রাবু আর আরিফা তখনো ফ্রক পরত। মেজ ভাই ওদের দু জনকে দু পাশে রেখে হাত ধরে হাঁটছিল।

মালু ছিল পেছনে। ওই একবারই তো দেখা রাবুর সাথে রানুর। তাতেই কত ভাব। কিন্তু, ওরা দেখা করে না কেন? রানু কেন যায় না বাকুলিয়ায়? অথবা রাবু কেন আসে না রানুদের বাড়ি। প্রশ্নটা শুধু আজ নয়, অনেক-দিনই জেগেছে মালুর মনে।

কিন্তু এ কী বিপত্তি। কবিয়াল আর যাত্রার দলটার ধারে কাছেও কী ঘেঁষতে পারবে না মালু? সেই কখন থেকে চেষ্টা করছে ও। কিন্তু একটা বদখত ভুড়িওয়ালা লোক বার বার ওর সব ফিকির বানচাল করে দিচ্ছে। একবার তো তাঁবুর ভেতর প্রায় ঢুকেই পড়েছিল মালু, এমন সময় আস্ত একটা চেলা কাঠ এসে পড়ল ঠিক কোমর ঘেঁষে। আর একটু হলে মালুর মাজাটা হয়ত আস্ত থাকত না এতক্ষণে। আর কী শ্যেন দৃষ্টি লোকটার। বার তিন চেষ্টা করেও সে দৃষ্টিটাকে ফাঁকি দিতে পারল না মালু। যেই একটু কাছে গেছে অমনি তেড়ে এসেছে লোকটা। হয়ত যাত্রা পার্টির দারোয়ান, নইলে অমন করে তেড়ে আসবে কেন?

তৃতীয় চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে মিত্তির বাড়ির আমলকি গাছটায় উঠে কিছু আমলকী পেড়ে নিয়েছিল মালু। সে আমলকী চিবুতে চিবুতে আর পকেটেরগুলো গুনতে গুনতে বাজারের শেষ প্রান্তে ওই তাঁবুগুলোর দিকেই যাচ্ছিল মালু। এমন সময় ফেলু মিঞার দৃষ্টি পড়ে, কী কাণ্ডটাই না ঘটে গেল। ইস্ কেমন ছড়ে গেছে বুকটা। এত থুতু লেপে দিয়েছে তবু এখনো জ্বালা করছে। সার্টের বোতামগুলো খুলে বুকটা আর একবার দেখে নিল মালু, অনেকটি জায়গা লাল হয়ে আছে এখনো।

তারপর রানুদের ওখানে গিয়ে আরো দেরি হয়ে গেল মালুর। না গিয়েই বা উপায় ছিল কী? পেট তো রীতিমতো কুলহুয়াল্লা পড়ছিল সেই কখন থেকে। ভারি ভালো লাগছে মালুর। খই আর সন্দেশ ভরা পেটে এক গ্লাস পানি পড়ে বেশ টিমটিমে হয়েছে পেটটা।

রজনী কাকা, তোমার চৌকির নিচে বইগুলো রেখে যাচ্ছি: কাউকে ধরতে দিও না কিন্তু। বইগুলো রেখে ছুট দেয় মালু।

আঃ বাঁচা গেল। সেই ভুঁড়িওয়ালা লোকটা নেই। স্যাঁৎ করে মালু ঢুকে পড়ল তাঁবুর ভেতর। কিন্তু নিদারুণ ভাবে হতাশ হল মালু। ওর এত সুন্দর কল্পনাটা মুহূর্তে কে যেন খান খান করে ভেঙে দিল। সেই ভট্টাচায্যি বাবুদের ছেলে বাদল বলছিল রূপোর জাজিম, সোনার পোশাক, হীরের তাজ, ঝিলিক দেওয়া রামের তরবারি, আরো কত কিছু আছে ওখানে। কিন্তু কোথায় সে সব? মালু শুধু দেখল কতগুলো নোংরা দড়ির খাটিয়া তারই উপর কতগুলো লোক বিশ্রী ঢঙে বসে কী সব আলাপ করছে। শুনে মালুর কানটা গরম হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি পাশের তাঁবুটায় চলে এল ও। এদিক ওদিক চোখ ফেলতেই দেখল মালু পরমাশ্চর্য এক পুরুষ মূর্তি ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে এল ওর দিকে। হাত রাখল ওর কাঁধে বলল, কোথা হতে আগমন তব, বৎস?

চোখ বড় বড় করে মালু দেখল ইয়া জোয়ান এক পুরুষ কী পুষ্টু আর শক্ত তার বাহু। সে বাহুর ভারে মালু বুঝি বসে পড়বে মাটিতে। বৎসে, কী নাম তব কোথা তব নিবাস? জবাব না পেয়ে আবার শুধাল লোকটা। আশ্চর্য ঝংকার লোকটার কণ্ঠে। কথায় তার তরবারির ঝিলিক। এমন অলংকৃত কথা কখনো শোনেনি মালু। মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে থাকে ও। কে হে বালক তুমি? চেন না মোরে? মোর নাম সুগ্রীব, রামের মিতা। মালুর পলকহীন চোখের জিজ্ঞাসাটা আন্দাজ করেই যেন বলল লোকটা।

সুগ্রীব? মালু কখনো শোনেনি এ নাম। তাই খানিকক্ষণ ওর মুখটাকে যেন চেনবার চেষ্টা করল মালু। বলল ও, তুমি রাম নও?

মুহূর্তে সুগ্রীবের চোখ কী এক হিংস্রতায় উগ্র হয়ে ওঠে। বলল সুগ্রীব-রাম? সে আবার বীর নাকি। সে তো আস্ত এক গবেট। সাধ্য কী রামের বিনা সুগ্রীব যুদ্ধ জিতে? আমিই সেই সুগ্রীব। ডান হাতের তর্জনীটা তুলে বুক ঠোকে সুগ্রীব, মাসল ফোলায়। সে বীরত্ব ব্যঞ্জনায় তাক লেগে যায় মালুর। সত্যি, মহাবীর সুগ্রীব।

হঠাৎ মানুষের মতো গলাটা দরাজ করে হাসে সুগ্রীব, বলে–চল, দেখাই তোমারে রামের কারখানা। সঙ্গের আর একটা তাঁবুতে মালুকে নিয়ে আসে সুগ্রীব। কাগজের মুকুট, টিনের তলোয়ার আর কিছু জরি আঁকা পোশাক এদিকে ওদিকে ছড়ানো। কিন্তু ওসবে মালুর কৌতূহল উবে গেছে, সুগ্রীবই ওকে মুগ্ধ করেছে।

কিছুক্ষণ ইতস্তত করে সুগ্রীবের সেই দোসরা প্রশ্নটার জবাব দেয় মালু–আমার নাম মালু, আবদুল মালেক, গ্রাম বাকুলিয়া।

এ্যাঁ, তুমি মুসলমান? নেড়ে? হঠাৎ যেন সাপের উপর পা পড়ে আঁতকে উঠে সুগ্রীব। পিছিয়ে আনে দুপা।

শুকিয়ে এতটুকু হয়ে আসে মালুর মুখখানি। কেমন ছোট মনে হয় নিজেকে। এই পরমাশ্চর্য পুরুষটির সামনে সে বুঝি মহা অন্যায় করে ফেলেছে।

সৌভাগ্য মালুর, সুগ্রীবের আতঙ্কটা স্থায়ী হয় না বেশিক্ষণ। সামলে নিয়ে বলে সুগ্রীব তা মুসলমান হলে কী হবে, চেহারা তোমার সুন্দর; খাসা মানাবে সখির পার্টে।

আপনার বাড়ি কোথায়? সুগ্রীবের পুরো পরিচয়টা জানবার আশায় শুধাল মালু।

আমার বাড়ি বিন্ধ্য পর্বতের ওপারে, কিষ্কিন্ধ্যার রাজপরিবারে আমার জন্ম। কথাগুলো বলতে বলতে বাইসেপটা ফুলিয়ে তোলে সুগ্রীব। তারপর চওড়া বুকটাকে নিশ্বাসের টানে বেশ এক প্রস্থ ফুলিয়ে বলে–রাম? রামটা তো আস্ত ছাগল। শুধু তীর ছুঁড়ে কী লড়াই জেতা যায়? বিজয়ের জন্য চাই বুদ্ধি, কৌশল। সে বুদ্ধি সে কৌশল এই সুগ্রীবের? আমি না থাকলে হেরে ভূত হতনা রাম। আশ্চর্য! আশ্চর্য বীরত্ব ভঙিমা সুগ্রীবের।

আচ্ছা ভাই, রিহার্সালের ডাক পড়েছে। তোমাকে কিন্তু পার্ট নিতে হবে। মালুর চিবুকে একটি টোকা মেরে বীরের দৃপ্ত পদক্ষেপে চলে যায় সুগ্রীব অন্য তাঁবুতে।

বাকুলিয়ার সৈয়দ বাড়িতে পালিত ছোট্ট সেই কিশোর। আচমকা বিচিত্র বিস্ময় আর পুলক ভরা এক দুনিয়া উন্মোচিত হয়ে গেল, ওর বার বছর বয়সের অনিরুদ্ধ কৌতূহলের সুমুখে।

১০.

অকালে কোত্থেকে খাজনা দেব? কেমন অসহায় ভাবে বলল কসির। খাজনা দেব না, ভিটিও ছাড়ব না, দেখি কী করতে পারে। মিয়ার পুতি। যেন কসিরের অসহায়তারই প্রতিবাদে বলল লেকু। চমকে উঠে সেকান্দর মাস্টার। বলে কী লেকু? ওরা খুঁজছে একটা ভদ্রস্থ রফা। কিন্তু লেকুর মতো গোয়ার্তুমি দেখালে তো যে কোনো রফারই দফারফা।

ওই শুয়রের জাত রমজান, সব তারই শয়তানী, সে ব্যাটাই বুদ্ধি দিয়েছে মিঞাকে। আমাদের গেরাম ছাড়া করবে এই তার মতলব। ফুলে ফুলে উঠে লেকুর ঘাড়ের পেশীগুলো।

ওরা কেউ ভাবেনি অমন আচমকা একটা নোটিশ দিয়ে বসবে ফেলু মিঞা। মাঘ ফাল্গুনে কৃষকদের ঘরের কাজের সময়। এই দুটো মাসে সেরে ফেলতে হয় সারা বছরের বকেয়া কাজ। এ সময় আবহাওয়াটা থাকে ওদের অনুকূল, বৃষ্টি নেই, প্যাঁক নেই, শীতের নির্মল রোদ-ঝকঝক আবহাওয়া, কাজ করে শ্রান্ত হয় না ওরা। ফসল তোলা শেষ করেই হাজার গণ্ডা টুকিটাকি কাজে মন দেয়: মন্থর অবসরে হাত-পা ছড়িয়ে ছন বাছে, ছোট বড় নানা আকারের গুচ্ছ বেঁধে বেঁধে তুলে দেয় চালের উপর, দেখতে দেখতে, ঘরের উপর ওঠে নতুন ছাউনি। ভাঙা বেড়াগুলো মেরামত করতে হয়, পাল্টাতে হয় বর্ষার উইয়ে খাওয়ার পালা। ডোবাটার প্যাঁক তুলে আর একটু গভীর করে রাখতে হয় যাতে বর্ষার পানির সাথে মাছ পড়ে আবার পালিয়ে না যায়। এ সব কাজে টাকা লাগে। এমন সময় বকেয়া খাজনার নোটিশটা বাজের মতো ইপাব তৈরিঃ আল মোস্তাইন বিল্লাহপড়েছে ওদের মাথায়।

যাদের জমি আছে তাদের কথা আলাদা, তারা ধান বেচবে, পাট বেচবে, নগদ পয়সা তুলবে ঘরে।

কিন্তু বাকুলিয়া, শুধু বাকুলিয়া কেন, এ তল্লাটে কয়জন চাষীর হাতে জমি আছে? বাকুলিয়ার আশি ঘর প্রজার মাঝে পঞ্চাশ ঘরই সৈয়দ অথবা মিঞাদের প্রজা। বাকি তিরিশ ঘরের খাজনা পাওয়ার মালিক রামদয়াল। বাকুলিয়ার উত্তরে পশ্চিমে যে জমি, সে আর কতটুকু। তাও প্রায় আধা-আধি ভাগ সৈয়দ আর মিঞাদের ভেতর। দখিনের ক্ষেত, বিশ পঁচিশ মৌজায় সেটাই তো সবচেয়ে বড় ক্ষেত, সে ক্ষেতের যদি দুআনা থাকে মিঞাদের তবে বার আনাই তালতলির দত্ত মিত্তিরদের। বাদবাকি দু আনার হাজার মালিক, হাতের তালুর মতো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে ভাগ করা। কৃষকরা নিজের মেহনতেই চাষ করে সে জমি। মিঞারা অথবা তালতলির বাবুরা মাঠে নামে না। ওদের সব জমিই বর্গা খাটে। ওই দুই আনার যে হাজার মালিক তারাই অথবা যাদের নেই এক রত্তি জমি তারা, অর্ধেক বিনিময়ে চাষ করে দেয় সে জমি। একমাত্র রামদয়ালই আট জোড়া লাঙল আর দশ জন গাবুর খাটিয়ে নিজেই চাষ করায় তার জমির কিছু অংশ।

সারা বাংলাদেশেই জমির অভাব। জমির অনুপাতে মানুষ নাকি অনেক বেশি। মানুষ তো কাজ চায়, খেটে খেতে চায়। এক টুকরো ক্ষেতের পিছে কী অমানুষিক

পরিশ্রম ঢেলে দেয় ওরা। তবু বছরে দুটো মাসের অন্ন জোটে কী? জমি যে নেই কাজই বা কোথায়। তথ্য নিয়ে যারা ঘাঁটাঘাটি করেন সে সব পণ্ডিতরা বলেন–এক দিকে গারো পাহাড় অন্য দিকে ত্রিপুরা পর্বতের বেষ্টনী, আর ওই আরাকান পর্বতমালার সানুদেশ থেকে নাবতে নাবতে একেবারে মেঘনা আর বঙ্গোপসাগরের মোহনা অবধি–এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলটা পৃথিবীর সবচেয়ে ঘনবসতি অঞ্চল। পৃথিবীর আর কোথাও এত ছোট এলাকায় এত বেশি মানুষ বাস করে না। কথাটা যে কত নিমর্মভাবে সত্য বাকুলিয়ার লাঙল-ঠেলা চাষীর মতো করে অন্যরা কী বুঝবে? ওদের ছেলেরাই যে অল্প বয়সে মায়ের আঁচলের মায়া কাটিয়ে ঘর ছাড়ে। অন্নের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায় দেশান্তরে। এক রত্তি যে ছেলে, লুঙ্গিটা পড়ে যেতে চায় কোমর ছেড়ে, সেও বিদেশে ছোটে কামাই করবে বলে। দুমুঠো ভাত দিতে অক্ষম মা-বাবা ধরে রাখতে পারে না কচি ছেলেগুলোকে। যারা থেকে যায় গ্রামে তারাও বছরের অর্ধেকটা সময় কাটায় পাহাড়ে, আসামে অথবা ভাটি অঞ্চলে, শ্রমের বিনিময়ে টাকা অথবা শস্য নিয়ে ঘরে ফেরে।

বাকুলিয়ার সারেং বাড়ি, সব কয়টা জোয়ান জাহাজে জাহাজে ঘোরে এক সমুদ্র থেকে আর এক সমুদ্রে। গোটা ট্যান্ডল বাড়িটাই তো রেঙ্গুনে, এক বৌগুলো আর ট্যাণ্ডলবুড়ো বাদে। কসির, ফজর আলী, ওদেরও ভাইরা কাকারা হয় রেঙ্গুনে, নয়তো কোলকাতায়, বিদেশ না করলে যে ওদের ভাত জোটে না।

মরসুমের শুরুতেই লেকু পাহাড় থেকে ছন এনেছিল। ইচ্ছে ছিল আর একটা খেপ দেবে। কিন্তু চার বছরের খাজনা যদি দিতে হয় তাহলে ও ছন আনবে কেমন করে? আবার পয়সার মুখ দেখবে সেই বর্ষার শেষাশেষি পূবের দেশে গিয়ে। তাই বুঝি এমন উত্তেজিত হয়েছে ও। কিন্তু মাস্টার সাহেবের কাছে এসেছে ওরা পরামর্শের জন্য, সেখানে অমন গোঁয়ারের মতো চটে যাওয়াটা তার মোটেই সমীচীন হয়নি। বুঝতে পেরে বুঝি লজ্জিত হয় লেকু, বলে, সবাই মিলে যা সাব্যস্ত হবে তাই তো করতে হবে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ তাই। তবে অসুবিধাটা যা সে তো বলবেই, সেকান্দর আশ্বস্ত করে।

গালে হাত দিয়ে ভাবে ওরা।

হাতে নেই টাকা, ঘরের হাঁড়িতে টান, তখন গালে হাত দিয়ে ভাবা ছাড়া উপায় কী? কিন্তু ভাবলেই কী উপায় আসে? ওরা তাকিয়ে থাকে মাস্টারের মুখের দিকে। মাস্টার কী বলে?

দুসনের খাজনাটা দিতেই হবে। দিয়ে একটা সন মওকুফ চাইতে হবে। আর বাকী, সে আগামী সন, কী কও? ভেবে চিন্তে বুঝি এই একটা উপায় ঠাওরায় সেকান্দর। সেই ভালো, দুটো সনের টাকার ব্যবস্থা কোনো রকমে করা হোক। বাকী বছরের বকেয়া বাখরগঞ্জ বা আসাম থেকে ফিরে এসে। সেকান্দরের প্রস্তাবটায় সায় দিয়ে বলল ফজর আলী। মিঞাদের প্রজা না হলেও সে এসেছে দোস্ত লেকুর দাওয়াতে। লেকুর বিপদে আপদে ও মদদ দেয়। লেকুও দোস্তের নামে এক পা।

প্রস্তাবটিতে যুক্তি আছে, সবাই মনে মনে নেড়ে চেড়ে দেখছে বুঝি বা। কী কও তোমরা, জিজ্ঞেস করে সেকান্দর।

এই সনে এক পয়সাও দিতে পারবো না আমি। যদি পারি আগামী সনে সব জমাই এক সাথে উসুল করে দেব।

লেকুর কথায় সবার মুখেই যেন অসন্তোষ। কিন্তু ওরা বুঝছে না কেন লেকুর সমস্যাটা? দুসনের খাজনা দিতে হাতের টাকাটা যদি খরচ হয়ে গেল, তবে যে পাহাড়ে যাওয়াটা ওকে বাদ দিতে হবে। আর পাহাড় থেকে ছন আর বাঁশ এনে দুটো নগদ পয়সা যদি শীত থাকতে থাকতেই হাতে না তুলতে পারে তবে যে ওর কোনো কামই হবে না। রাতে শিয়াল ঢোকে ঘরে, এমনি হয়েছে বেড়াগুলোর অবস্থা। নতুন বেড়া দিতে হবে না? ঘরের সুমুখের চালটায় গেল বছর নতুন ছন দিয়েছে। পেছনের চালটা যদি এবার ছেয়ে না দেওয়া যায় তবে বর্ষায় আর রক্ষে আছে?

সবই তো বুঝলাম কিন্তু মিঞা যদি না শোনে? জিজ্ঞেস করে সেকান্দর। শুনবে না কেন? আমরা তো আর ফাঁকি দিচ্ছি না। সামনের সনে যেমন করে হোক দেব, মুখের করার আমাদের। তর্ক করে লেকু।

এক সনেরও আদায় দিবি না, আর মিঞাকে বললেই মিঞা তোদের আর্জি রাখবেন? বলল কসির।

বুঝিয়ে সুঝিয়ে একটা ব্যবস্থা করতে গেলেও অন্তত একটা বছরের খাজনা হাতে নিয়ে যেতে হবে। কসিরের কথাটাকেই অন্য ভাবে ঘুরিয়ে বলল ফজর আলি, লেকুর দোস্ত।

বেশ, তোমাদের ট্যাঁক ভর্তি, তোমরা দাও গে। আমার ট্যাঁক খালি, আমি দিতে পারব না। এবার সত্যি চটে যায় লেকু। ঘাড়ের শিরা ফুলে উঠেছে, স্বরটা চড়েছে। একমাত্র লেকুই বেঠিক, আর ওরা সবাই ঠিক, কী যে কথা বলার ঢং ওদের!

না দিলে চলবে কেন, ক্রোক করবে যে। শান্ত স্বরে আশু বিপদটার কথা ওকে স্মরণ করিয়ে দেয় সেকান্দর।

করুক। রামদয়ালের অনেক খালি ভিটে পড়ে রয়েছে, তারই একটাতে গিয়ে উঠে পড়ব। মিঞার প্রজা অথবা রামদয়ালের প্রজা, কথা তো একই। চাষাভুষোর আর কী ভবিষ্যৎ! যেন আগে থেকেই সব ঠিক করা, এমনি ভাবেই বলে গেল লেকু।

বাপদাদার ভিটে। একেবারে ছেড়ে দিবি? লেকুর দিকে তাকিয়ে কেমন করে যেন বলে ফজর আলি।

মুহূর্তের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে যায় লেকু। অমন যে চটাং চটাং কথা ছুঁড়ছিল সে সব কথা কে যেন নিমেষের মাঝেই কেড়ে নিল ওর মুখ থেকে।

বাপদাদার কথা এলেই কেমন যেন হয়ে যায় এ গাঁয়ের লাঙল-ঠেলা মানুষগুলো। বাপদাদারা ধর্মকর্ম করতো তাই ওরাও ধর্ম কর্ম করে, মসজিদে যায়, শিন্নি দেয়। মিঞা সৈয়দদের সেলাম দিয়ে এসেছে বাপদাদা, ওরাও দেয়। বাপদাদা লাঙল ঠেলতে শিখিয়েছে, পূর্বের পথ দেখিয়েছে, পাহাড়ের পথ চিনিয়েছে, বিদেশের ঠিকানা দিয়ে গেছে। তাই ওরা লাঙল ঠেলে পূর্বে যায়, বিদেশকে ভয় করে না। পদে পদে ওদের অতীতের বন্ধন। প্রশ্নাতীত ওদের আনুগত্য বাপদাদার নামে চলতি অনুশাসনের প্রতি। বুঝি সব দেশের সব যুগের কৃষকরাই এমনি, অতীত ওদের বড় প্রিয়। নিত্য কর্মে নিত্য ভাবনায় তাদের অতীতের টান, স্মৃতির সঞ্চালন। ভিটিটা সে অতীতেরই মূর্ত প্রতীক, মৃত বাপদাদার জীবন্ত নিশানি।

সেই ভিটি ছেড়ে যাবে লেকু? সেই আব্বাজানের ভিটি? আজও যার হাতের কাজের সুনাম ছড়িয়ে রয়েছে গ্রামে গ্রামে? রাগের মাথায় ক্রোকের কথাটা একদম খেয়াল ছিল না ওর। কেমন আনমনা হয়ে গেল লেকু। চেয়ে রইল মাস্টারের দাওয়ার দিকে। কখন দুফোঁটা পানি এসে জমেছে ওর চোখের কোণে। ঝরে পড়ার আগে টলটলিয়ে উঠল ফোঁটা দুটো। ওরা দেখল। ওরা মুখ নাবিয়ে নীরব হল।

শেষ পর্যন্ত যেখান থেকে শুরু করেছিল সেখানেই ফিরে এল ওরা। ওরা আর কী বলবে? কতই বা বুঝ ওদের! মিঞার সাথে বোঝাপড়া, আপস-রফা, যাই করতে হয় মাস্টার করুক, তার কথাই সকলের কথা। ওরা চলে যায়।

সরল গাঁয়ের মানুষ। শিক্ষা থেকে বঞ্চিত বলেই বুঝি শিক্ষা আর শিক্ষিতের প্রতি অমন ভক্তি ওদের। যারা এলেম হাসিল করেছে তারা হল খোদার খাস বান্দা,

রসুলের পেয়ারা। ইহলোক পরলোক তাদের করায়ত্ত। বাপদাদার মুখ থেকে আরো হাজারটি উপদেশের মাঝে, এই উপদেশটাও শুনেছে ওরা। সে ভক্তিটাই ওরা দেয় সেকান্দর মাস্টারকে। আর সংকুচিত হয় মাস্টার। অমন বিশ্বাস, শ্রদ্ধাভক্তির বিনিময়ে ওরা যা চায় সেটা দেবার সামর্থ্য বা যোগ্যতা কোথায় মাস্টারের? ভাবতে ভাবতে যেন আরো সংকুচিত হয়ে আসে সেকান্দর মাস্টার।

বাকুলিয়ায় শিক্ষা বলতে যা বোঝায় সে তো মিঞা আর সৈয়দদেরই এক চেটিয়া। বাকুলিয়ার প্রজাকুল ওদের এই এলেমকে সম্মান দেয়, যখন যায় তালতলির হাটে বুক ঠুকে তর্ক করে, আমাদের বাকুলিয়ার মিঞাদের মতো অতোটা পাস কাদের আছে? তালতলির ঘরে ঘরে বি.এ, এম. এ. পাস, তাই তালতলির মানুষ হয়ত মুখ লুকিয়ে হাসে। সে হাসিতে বাকুলিয়ার কৃষক একটুও ক্ষুণ্ণ হয় না, বলে, ওটা হিংসে।

কিন্তু সেকান্দর মাস্টারকে নিয়ে ওদের গৌরবটা অন্য ধরনের। সে যেন ওদের আপন জন ঘরের ছেলে। সন্তানের গৌরবে গর্বিত পিতার মতো সেকান্দর মাস্টারের কথা বলতে বলতে বাকুলিয়ার কৃষকদের বুকটাও ফুলে ওঠে। ও যে কৃষকের সন্তান। আর মিঞা এবং সৈয়দ বাড়ির বাইরে একমাত্র সেকান্দরই তো দু দুটো পাস দিয়েছে, বি.এ. পর্যন্ত পড়েছে। ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়েছে এমন একটা ছেলেও তো নেই বাকুলিয়ার কৃষকদের। তাই মাস্টার ওদের গৌরব। ওদের অকুণ্ঠ বিশ্বাস স্নেহপ্রীতি আর বোধহয় অনেক আশা ভরসা ওকে ঘিরে।

তুমি আমাদের লায়েক ছেলে। তোমার কাছে না এসে যাব কার কাছে? তুমিই তো করবে সব। ওরা বলে আর সেকান্দর যেন মিইয়ে যায় মাটির সাথে। ওদের জন্য কী করতে পারে সেকান্দর? ওর সেই সামর্থ্য বা সচ্ছলতা কোনোটাই যে নেই? একটু যে চিন্তা করবে ওদের নিয়ে সে ফুরসতই বা কই? সে তো নিজের সমস্যায় আকণ্ঠ নিমগ্ন।

স্কুলেই কেটে যায় দিনটা। সেখান থেকে মাসে মাসে যে কুড়িটা টাকা মাইনে পায় ছাঁকা আয় বলতে একমাত্র ওটাকেই ধরা যায়। জমি আছে দুকানি। তার জন্য একখানা হালও রাখতে হয়েছে। জমির ফসল আর স্কুলের মাইনেয় মোটামুটি চলে যায় সংসারটা। ভাই সুলতান, বোন রাসু আর মাকে নিয়ে ওর যে সংসার তার চাহিদাও হয়ত বেশি নয়, ডাল ভাত আর সাফ কাপড়।

কিন্তু শুধু চলে যাওয়াতেই যে সন্তুষ্ট নয় সেকান্দর। আব্বাজানের আকস্মিক মৃত্যুর পর অল্প বয়সেই সংসারের হাল ধরতে হয়েছে ওকে। সেই অবস্থাতেই

আইএ-টা পাস করেছে। ভর্তি হয়েছিল বি. এ-তে কিন্তু ওই সংসারের তের ঝঞ্ঝাটে পড়াটা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি ওর পক্ষে। অথচ কত স্বপ্নই না ছিল ওর। সেই অতৃপ্ত আকাক্ষাটা পুরনো ক্ষতের মতো আজও জেগে ওঠে, মনে আর শরীরে যন্ত্রণা ছড়ায়। তাই নিজেকে একটা গোপন শপথে আবদ্ধ করেছে। সেকান্দর-–ছোট ভাই সুলতানকে যেমন করে হোক বি. এ-টা পাস করাবে এবং ভালো ভাবেই পাস করাবে। ক্লাস এইটে পড়ছে সুলতান। ওর কলেজের খরচের জন্য এখন থেকেই একটা দুটো করে টাকা জমিয়ে চলেছে সেকান্দর। জমাতে গিয়ে পরিশ্রমটা ওর একটু বেড়েছে বই কী! চাকরটাকে বিদেয় দিয়েছে। শুধু খন্দের কয় মাস একটা গাবুর রাখে। সেই গাবুরের সাথে সেকান্দর নিজেও ফুরসুত মতো হাল ধরে। ডাল খেসারি, এ সব ফসলের জন্য ও নিজেই চাষ দেয়, বীজ বোনে। দিনের কাজগুলো সেরে বিকেল বেলায় যেতে হয় সৈয়দ বাড়ি রাবু আর আরিফাকে পড়াতে। মাস মাস সৈয়দ বাড়ির ওই দশটি টাকা বড় লোভনীয়। সব দিক সামাল দিয়ে চলার জন্য ওই টাকাটা একটা নিশ্চিন্ত অবলম্বন। বিকেলটা সৈয়দ বাড়িতে কাটে বলে সুলতানকে নিয়ে রাত্রে আর বসা হয়ে উঠে না। সকালেই ওকে নিয়ে কিছুক্ষণ বসতে হয়। ইপাব তৈরিঃ আল মোস্তাইন বিল্লাহ

দিন আর রাতের এমনি একটানা খাটুনির পর লেকু কসিরের কথা, বাকুলিয়ার কথা চিন্তা করা, এ কেমন করে সম্ভব হবে: কখনো সম্ভবও হয়নি। কিন্তু আজ লেকু ওরা সমস্ত দায়িত্বটাই ওর উপর ছেড়ে দিয়ে গেল কেন? একি ওদের বিশ্বাস অথবা ওকে একটু বাজিয়ে দেখবার ছল! সেই কখন চলে গেছে ওরা, তবু উঠোনে ওই বৈঠকের জায়গাটিতেই বসে বসে ভাবছে সেকান্দর।

কী বলবে ও ফেলু মিঞাকে? সেই হুরমতির বিচারের দিন সেকান্দরের কথায় ফেলু মিঞা রীতিমতো নাখোশ হয়েছে সে তো স্পষ্ট। এর পর ফেলু মিঞা কী শুনবে ওর কোনো আর্জি? তা ছাড়া ওঁর নিজেরই যে খাজনা বাকী তিন সনের। নিজেরটা পরিষ্কার না করে অন্যের জন্য কেমন করে সুপারিশ করবে ও? মনে মনে একটু হিসেব কষে নিলে সেকান্দর। সামনে ঈদের জন্য কয়েকটা টাকা তুলে রেখেছে ও। সেই টাকার সাথে চলতি মাসের মাইনেটা যোগ করলে বকেয়া খাজনা শোধ হয়ে যাবে। ঈদের ভাবনা ঈদের সময়টাতেই ভাবা যাবে।

তাই ঠিক করল সেকান্দর। নিজের জমাটা পরিষ্কার থাকলে অন্যদের জন্য আবেদন করতে বাধবে না ওর।

অন্ধকারটা ঘন হয়ে রাতের খবরটা জানিয়ে গেল। আস্তে আস্তে উঠে সৈয়দ বাড়ির দিকে পা বাড়াল সেকান্দর।

সেকান্দরদের উঠোন থেকে বাইরে যাবার পথটা রমজানের গোয়াল ঘর ঘেঁষে। লেকু কসিরকে আসতে দেখেই চুপি চুপি গোয়াল ঘরে গিয়ে আড়ি পেতেছিল রমজান। শুনছিল ওদের আলোচনা। শুনতে শুনতে শরীরের রক্ত ওর মাথায় চড়েছিল আর কী এক তাণ্ডব শুরু হয়ে গেছিল ওর মাথার খুলিতে।

কমজাত ছোট লোকের দল জোট বাঁধতে শুরু করেছে। আবার গুরু ঠাউরেছে মাস্টারকে! কেন রমজানকে চোখে পড়ে না, না চোখে লাগে না তোদের? রমজানের কাছে এলে সে কী কোনো একটা পথ বাতলে দিতে পারত না? কে না জানে রমজান ফেলু মিঞার ডান হাত বাঁ হাত–ব্যাটা লেকু, গায়ে চর্বি বড় বেশি হয়ে গেছে ওর। বলে কিনা, শুয়রের জাত রমজান? যদি হতি মরদের বাচ্চা তবে রমজানের মুখের উপরই কথাটা বলতি! বলে দেখতি কত তোর মাজার জোর। মনে মনে গজরায় রমজান আর বড় ঘরে গিয়ে মাচাং থেকে এক ঝটকায় কামিজটা হাতে নেয়। তারপর কামিজটা কাঁধের উপর ফেলে বেরিয়ে পড়ে।

কমজাত কী আর সাধে বলে! বোঝে না নিজের স্বার্থটাও। রমজান তো শুধু মিঞার নায়েব নয়! আরো কিছু। চাষী আর মিঞার মাঝে রমজান হল গিয়ে এক সেতু। কত জনের কত দরবার নিয়ে ও যায় মিঞার কাছে। মিঞা শুধু চোখ তুলে একবার তাকায় ওর দিকে, যেন শুধায়, তুমি বলছ? তারপর যা চায় রমজান তা-ই মঞ্জুর করে দিয়ে অল্প হেসে কাজে মন দেয় ফেলু মিঞা।

চাষী আর মিঞার মাঝামাঝি এই যে একটা মর্যাদা রমজানের, এতো নিছক একটি মর্যাদাই মাত্র। আর কী? না এতে দুটো পয়সা আমদানি হয় রমজানের না কোনো বিশেষ সুবিধে। এমন ব্যবস্থায় ফেলু মিঞা তো খুশি হয়েই সায় দিয়েছে। কিন্তু কমজাতের বাচ্চাগুলো রমজানের নাম শুনলেই যেন ফোঁসকা পড়ে ওই ব্যাটাদের গায়ে। উপরে ফেলু মিঞা নিচে ওরা, মাঝখানের স্তরে রমজানকে বিশেষ মর্যাদা দিতে যেন আঁতে ঘা লাগে ছোটলোকগুলোর। অথচ সে কী কম করেছে, না কম করে তার চাষী ভাইদের জন্য। এই তো গেল বার জমি বর্গা দিল মিঞারা। দুকানি জমি কসিরকে পাইয়ে দিয়েছে রমজান। সৈয়দরা তো বছর বছরই জমি লাগিত দেয়। রমজানের সুপারিশেই ফজর আলির জন্য সে জমির এককানি প্রতি বছরকার বরাদ্দ। সে সব জমিতে কী ধান হয়নি? রমজান কী গেছে সে ধানে ভাগ বসাতে? আর সেই অযাচিত উপকারের প্রতিদান–শুয়রের জাত রমজান?

কয়েকটা দিন আগে সেই যে কসম খেয়েছিল রমজান, সে কথাটা মনে পড়ল ওর। এ দুনিয়াতে কোনো শালার উপকার করতে নেই। কোনো শালার উপকার

করবে না রমজান, কমজাতের তো নয়-ই। অকৃতজ্ঞ ছোটলোকের দল, বোঝে কী ওরা উপকারের। ওরা বোঝে রক্ত চক্ষুর শাসন, ওরা বোঝে ডাণ্ডা, গুঁতো, উঠতে বসতে পায়ের লাথি।

আবার ওরই বিরুদ্ধে জোট বাঁধা হচ্ছে মাস্টারকে নিয়ে? বেশ, বেশ, কত ধানে কত চাল সে আমারও জানা আছে। বিড় বিড় করে যেন নিজেকেই শোনাল রমজান।

যা ঘটেছে এবং যা ঘটেনি সব মিলিয়ে রং চড়াল রমজান। তিলকে করল তাল। সুবিস্তৃত এক ষড়যন্ত্রের গোপন জাল উদ্ঘাটিত হল ফেলু মিঞার চোখের সুমুখে। গুম হয়ে সবই শুনল ফেলু মিঞা। খাজনা নেবার মালিক ফেলু মিঞাই। মাফ করনেওয়ালাও ফেলু মিঞাই। তার কাছে না এসে প্রজারা গেল মাস্টারের কাছে?

সহসা রামদয়ালের পরিবর্তে সেকান্দরকেই আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে হল ফেলু মিঞার। আপনার অশিক্ষার পাশাপাশি সেকান্দরের দুটো পাস কেন যেন বড় হয়ে দেখা দিল আজ।

ছোটলোকের বাড় দিন দিন বেড়ে চলেছে স্যার। সময় থাকতেই ওদের থুতনিগুলো ভেঙে দিতে হবে। নইলে বোল ছাড়লে কী যে বলে বসবে আর কী যে করে বসবে তার কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। আর ওই যে সেকান্দর–মিনিমুখো, চুপচাপ থাকে ও, আসলে কিন্তু শয়তানের আলি খুঁটা। দুটো পাস করেছে বলে মনে করে নবাব সলিমুল্লা হয়েছেন তিনি! ছোটলোকগুলোকে ওইতো ক্ষেপিয়ে তুলছে। একটু থামল রমজান, বুঝি দেখে নিল মুনিবের মুখের প্রতিক্রিয়াটা। বলল আস্তে আস্তে : মিঞার পুত আপনি। আপনার জ্ঞানগম্যি আর বুদ্ধির কাছে আমি আদনা কোন্ ছার তবু আপনার দোয়ার বরকতে দেশ-বিদেশ যা ঘুরেছি স্যার তাতে যেমন মুনিব বাছতে ভুল করিনি তেমনি কমজাত কমদিলের লোকগুলোকেও চিনেছি রোঁয়ায় রোঁয়ায়। আমি বলছি স্যার এখুনি যদি ওই মাস্টারকে সজুত না করা যায় তবে বড় দুর্ভোগ এই গ্রামের। দুটো পাসের দেমাকেই হয়ত কোনোদিন বলে বসবে–গ্রামের বিচার আমিই করব। কিচ্ছু বিশ্বাস নেই, কিচ্ছু বিশ্বাস নেই।

ফেলু মিঞার মুখটাই আবার পড়তে চেষ্টা করল রমজান। অস্বাভাবিক গম্ভীর মুখ। রমজান কী বেশি বলে ফেলেছে? অথবা কম বলেছে। ভাবতে ভাবতেই আবার মুখ খুলল রমজান : আমি ও শুনিয়ে এসেছি স্যার, বললাম–এই গ্রামে মিঞার

পুত ফেলু মিঞা থাকতে তুই আবার কে রে? ব্যাটা গোলামের বাচ্চা! তুই কেন আসিস রাজাপ্রজার ব্যাপারে নাক গলাতে?

এরপর বলার মতো কিছু খুঁজে পায় না রমজান। শ্রোতা পক্ষ নীরব, কেমন যেন নিরুৎসাহিত। অনেকক্ষণ চুপ থেকে বলল ফেলু মিঞা, কাচারিতে আসতে খবর দাও ওদের।

.

বাবা, আমার জমিগুলো একটু ভালো লোক দেখে লাগত করে দাও। তুমি ছাড়া আর কাউকে দিয়ে হবে না এ কাজ। কথাটা শেষ করে রাবু, আরিফা এবং মাস্টার সাহেবের মাঝখানের খালি চেয়ারটিতে বসলেন সৈয়দগিন্নি।

ব্যাপারটার আগামাথা বুঝতে না পেরে, সৈয়দগিন্নীর দিকে একবার তাকিয়ে চুপ থাকে সেকান্দর।

সৈয়দ সাহেব লিখেছেন, ঈদের ছুটিতে আসছেন তিনি। সবাইকে নিয়ে যাবেন কোলকাতায়। গিন্নি যেন প্রস্তুত হয়ে থাকেন। তাই জমিজমার বিলি ব্যবস্থাগুলো স্বহস্তেই করে যেতে চায় সৈয়দগিন্নি। কিন্তু আমাকে…

সেকান্দরের কথাটা শেষ হবার আগেই বলে উঠেন সৈয়দগিন্নি, হ্যাঁ বাবা, তুমি ছাড়া এই কষ্টটা আমার জন্য আর কে করবে বল? ফেলুকে যে আমার বিশ্বাস হয় না, নইলে ওর জিম্মাতেই সব ছেড়ে দিয়ে যেতাম। সহসা কোনো উত্তর জোগায় না সেকান্দরের মুখে। সৈয়দ গিন্নীর গ্রাম ত্যাগের অর্থ ওর দশটি টাকার নিয়মিত আয় বন্ধ হওয়া।

ব্যাপারটা আচমকা কিছু নয়। সেই দু বছর আগে বুড়ো সৈয়দ গত হবার পর থেকেই সৈয়দ গিন্নী যাই যাই করছেন। বাড়ির বড় বৌর বিদেশ বাসের প্রধান অন্তরায় ছিলেন বুড়ো সৈয়দ। সে বাধা অপসারিত হবার পরও বোধ হয় সব দিকে সামাল দিতে দিতে দুটো বছর লেগে গেছে ওদের। এবার যে সৈয়দ বাড়িতে সত্যি সত্যি তালা পড়বে তাতে কোনো সন্দেহ নেই সেকান্দরের।

পুকুরগুলো বড় দূরে দূরে। তোমার পক্ষে নজর রাখা সম্ভব হবে না। ওগুলো ইজেরা দিয়ে দিও। আর খেয়াল রেখ, ফসলে কিন্তু ভারি ঠকায় ভাগচাষীগুলো। পনেরো মণ ফসল হলে বলবে দশ মণ। তোমাকে পাঁচমণ দিয়েই বুঝ দেবে। মিথ্যে আর ফাঁকির রাজা ওই চাষাগুলো, সে তো জানই…।

উঠি স্যার? সৈয়দগিন্নীর কথার মাঝেই বলে উঠল মালু। অনেকক্ষণ ধরেই উঠবার জন্য উসখুস করছে ও।

যা যা, আজ ছুটি। রাবেয়া আরিফা তোমরাও যাও। এশার নামাজটা পড়ে নাও। আমি এসে ভাত দেব। সৈয়দগিন্নীই ছুটি দিলেন ওদের।

মুন্‌শীজীরা থাকবেন। মক্তবটা দেখবেন মুন্‌শীজী। ওর মাইনেটা খাজনা আদায়ের টাকা থেকে দিয়ে দিও। আর বছরের খোরাকিটা খন্দ শেষে এক-সাথেই আলাদা করে দিয়ে দিও ওঁদের। এত কাজ হয়ত একলা সামলাতে পারবে না তুমি। একটা গাবুর রেখ, মাইনেটা আমার খরচা থেকেই যাবে। এতটুকু বলে থামলেন সৈয়দগিন্নী। বুঝি ভাবলেন। ভেবে চিন্তে বললেন, তোমার বাড়ির পেছনে আমাদের তিন কানি জমি আছে না? সেই জমির ফসলটা তোমার খরচা বাবদ নিয়ে নিও তুমি।

যেন সব ব্যবস্থাই পাকাপাকি হয়ে গেছে এমন ভাবে বলে গেলেন সৈয়দগিন্নী।
ইপাব তৈরিঃ আল মোস্তাইন বিল্লাহ

.

সেকান্দরের মনে হল আপন ভাইয়ের প্রতি অবিশ্বাসের চেয়েও সৈয়দগিন্নীর অনুগ্রহ বিতরণের ইচ্ছেটাই যেন প্রবল। সেকান্দরের বাঁধা আয়টা বন্ধ হয়ে যাবে। হয়ত সেটাই পুষিয়ে দিতে চান সৈয়দগিন্নী তে-গুনা কিংবা চৌ-গুনা আয়ের ব্যবস্থা করে। কিন্তু সৈয়দগিন্নীর অনুগ্রহ ফেলু মিঞার সাথে যে চির শত্রুতার সূত্রপাত করে যাবে তার কী হবে? তাছাড়া আদায় তহশিল বিলি বণ্টনের অত ঝঞ্ঝাট কী সামলাতে পারবে সেকান্দর? অথচ লোভনীয় আয়ের কেমন একটা অপ্রত্যাশিত সুযোগ। দু বছরেই হয়ত নিজের কোনো-রকমে-চলে-যাওয়া সংসারের অবস্থাটা পাল্টিয়ে ফেলতে পারে সেকান্দর।

সেকান্দরের দ্বিধাটা এতই স্পষ্ট যে এবার আর চোখ বুজে থাকা সমীচীন মনে করলেন না সৈয়দগিন্নী। সোজা জিজ্ঞেস করলেন, বাবা! এত সংকোচ কেন তোমার? তুমি তো আর পর নও আমাদের।

সৈয়দগিন্নীর এই অযাচিত আত্মীয়তায় বুঝি আরও সংকুচিত হয়ে আসে সেকান্দর। কিন্তু সৈয়দগিন্নীর তিরস্কারের চোখ দুটো এখনও ধরা ওর মুখের উপর। ও বলতে পারে না কিছু।

রাবু আরিফা যখন পর্দা নিল তখনই তো কথাটা উঠেছিল। সবাই বলল এখন তো ওরা আর বেগানা পুরুষের সামনে যেতে পারবে না, মাস্টারকে বিদেয় দাও। আমি বললাম, তা কেন হবে? সেকান্দর তো আমার জাহেদেরই মতো, ঘরের ছেলে। বলতে বলতে অপত্য স্নেহে সত্যি বুঝি নরম হয়ে আসে সৈয়দগিন্নীর চোখ জোড়া।

ভেবে দেখি বলে বেরিয়ে এল সেকান্দর।

ফুটফুটে জ্যোৎস্না, কুয়াশার সাথে মিশে গাঢ় ধারায় ঝরে পড়ছে। শীত মাটির খটখটে রাস্তা। জ্যোৎস্না রাতের সৌন্দর্যটা কী এক সোহাগী আলস্যে শয্যা নিয়েছে ওই লক্ষ পায়ে মন্থন-করা পথের বুকে। আর সেকান্দরের পায়ে পায়ে বুলিয়ে দিচ্ছে স্নেহসিক্ত স্পর্শ। আশ্চর্য হয় সেকান্দর, আজকের এই জ্যোৎস্নাসিক্ত মাটির আর্দ্র স্পর্শটি ওর মাঝে সঞ্চারিত হবে বলেই যেন দিন কয় আগে ওর কেম্বিসের জুতোর তলাটা ফেটে গেছিল। নিজের মনেই হাসল ও। দারিদ্র্যকে সহনশীল এমন কী মহান করে তুলবার কত যুক্তিই না রয়েছে পৃথিবীতে। আপন অক্ষমতা আর ব্যর্থতাকে ঢাকবার জন্য দরিদ্রকুলই কত সান্ত্বনা আর দর্শনের প্রলেপ আবিষ্কার করে নিয়েছে। সেকান্দরের মনে পড়ল ওই তালতলি স্কুলেই ছোট বেলায় শোনা সতীশ স্যারের নীতি কথা : যারা দরিদ্র, নিরন্ন তাদের ভেতর থেকেই তো জন্মেছে যত মহাপুরুষ–ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, আব্রাহাম লিংকন, আরও অনেক নাম বলতেন সতীশ স্যার। সে সব নাম যথা সময়ে অর্থাৎ কলেজ ছেড়েই ভুলে গেছে সেকান্দর। বক্তৃতার শেষে বলতেন সতীশ স্যার–দারিদ্রকে হেলা কর না।

কলেজে এসে সেকান্দর নজরুলের দারিদ্র-বন্দনা পড়েছিল আর সতীশ স্যারের নীতি কথাটা নিজের জীবনে প্রয়োগ করার ব্রতও নিয়েছিল। বিশ্বাস করিয়েছিল নিজেকে প্রতিভা আছে তার, দারিদ্র্যের সাথে সংগ্রাম করেই সে প্রতিভার বিকাশ ঘটবে। কিন্তু অভিভাবকহীন দরিদ্র সংসারের অভাব নামক নিষ্ঠুর দৈত্যটি গুঁড়িয়ে দিয়েছে ওর শৈশব আর কৈশোরের সেই বিশ্বাস। বি.এ. পাস করার স্বপ্নটা চিরতরে বিসর্জন দিয়ে যেদিন মা আর ভাইবোনের মুখে অন্ন তুলে দেবার দায়িত্ব নিয়ে ও ফিরে এসেছিল বাকুলিয়ায় সেদিনই সে বিশ্বাসের মিনারটা ভেঙে চুরমার হয়েছিল। সেই ভগ্ন বিশ্বাসের জঞ্জালের উপরই জন্ম নিয়েছিল আর একটি বিশ্বাস–বিপুল ঐশ্বর্যের লালনার অভাবে এ দেশ রবীন্দ্র প্রতিভা নামক কোনো বস্তুর সাক্ষাৎ পেত না কোনোদিন। সেদিন থেকে নিজের উপর কোনো মোহ ছিল না সেকান্দরের।

.

বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের নামটাই যে কেন মনে পড়েছিল বলতে পারে না সেকান্দর। আজ একটু অবাকই হল ও।

অবশ্য এইটুকু লেখাপড়া নিয়েই বিদেশ গিয়ে নিজের ভাগ্যটা একবার পরখ করে দেখতে পারত সেকান্দর। কিন্তু ওর মনটা গ্রাম ছাড়তে সায় দেয়নি। কী যেন আছে বাকুলিয়া গ্রামে আর তালতলির স্কুলে যা ওকে বন্দী করে রেখেছে এই কয়েক মাইল পরিধির জগতে।

কিন্তু আজ তো অতি সহজেই ও ফিরিয়ে ফেলতে পারে নিজের অবস্থাটা। টেনেটুনে কড়া ক্লান্তির হিসেব করে করে দিন গুজরানের যে অভিশাপ তা থেকে মুক্তি পেতে পারে অতি সহজে। ছোট ভাই সুলতানের উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থাটা করে ফেলতে এতটুকু বেগ পেতে হবে না ওর। একটা সহজ সচ্ছলতায় সুন্দর আর শ্রীময় করে তুলতে পারে সংসারের চেহারাটা। আর, যে চিন্তাটাকে মনের ধারে কাছেও ঘেঁষতে দেয় না ও, মা ঘেনর ঘেনর করে শুধুই ধমক খায় ওর, সেই একটি লাজুক লাজুক লক্ষ্মীমতী বৌর কথাটাও ভাবতে পারবে বই কী সেকান্দর। জমাতে হবে দুটো পয়সা, একটি বাড়তি মুখ মানে সেই আশায় জলাঞ্জলি। তাই তো ওই চিন্তাটাকে কখনো মনের কিনারে ঠাঁই দেয়নি সেকান্দর।

সমস্ত দুর্ভাবনা আর দুশ্চিন্তার হাত থেকে মুক্ত হবার এমন অভাবনীয় সুযোগ পেয়েও সেটা গ্রহণ করতে এত দ্বিধা কেন ওর? ফেলু মিঞার রোষবহ্নির ভয়? অপরের অনুগ্রহ করে আপনাকে ছোট করতে চায় না সেকান্দর? অথবা অন্য কিছু! নিজের মাঝেই কোনো স্পষ্ট উত্তর খুঁজে পায় না সেকান্দর।

শীত রাতের কুয়াশামাখা জ্যোৎস্নাটা কেমন যেন থকথকে। মুখে আর হাতে পায়ে মেখে দেয় কী এক ভালোলাগার পরশ। ক্ষণিকের জন্য এই ভালোলাগাটা অন্য সব দুর্ভাবনাকে বুঝি দূর করে দেয় সেকান্দরের মন থেকে কিন্তু রোমাঞ্চ নেই এই ভালোলাগায়। নেই কোনো শিহরণ। এ যেন সদর রাস্তার লম্বা বাঁকটি এড়িয়ে কোনাকুনি মেঠো পথ ভেঙে সময় এবং শ্রম বাঁচিয়ে ওই তালতলির স্কুলে পৌঁছানোর আনন্দ। আনন্দটা ফাঁকির, প্রাপ্তির নয়। কতই বা রাত হয়েছে। সন্ধ্যে সন্ধ্যে গিয়েছিল সৈয়দ বাড়ি। বড় জোর ঘণ্টাখানিক ছিল সেখানে। এরি মাঝে গ্রামটা নিঝঝুম, যেন মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে রাতের বুকে। হঠাৎ ওর মনে হল দুটো ছায়ামূর্তি চলছে ওর পিছু পিছু, যেন ওকেই অনুসরণ করছে। ফিরে দাঁড়াল সেকান্দর। কুয়াশাটা বোধ হয় বেড়েছে তাই, চাঁদের আলোটা সাদা পর্দার মতো আড়াল করে রেখেছে ওদের। আগন্তুকদের ছায়াগুলো একটু এগিয়ে আসতেই

সামনের ছায়াটি চিনতে কষ্ট হল না সেকান্দরের। ওটা মালু। কিন্তু, আপাদমস্তক চাদরে মোড়া পেছনের ছায়াটি কার? আরো এগিয়ে আসতে বুঝি চিনে ফেলল সেকান্দর।

হুরমতি? আর একটু হলে বুঝি চেঁচিয়েই উঠছিল সেকান্দর। এরি মাঝে কী সেরে উঠল হুরমতি? সেরে উঠে আবার রাস্তায় বেরিয়েছে? আরো আশ্চর্য, সামনে আসতেই হুরমতি মাথার চাদরটা ফেলে দিয়ে যেন সেই ছেঁকা খাওয়া কপালটা ওকে দেখাবার জন্য দাঁড়িয়ে পড়ল।

মালু নাকি রে? যাস্ কই? জিজ্ঞেস করল সেকান্দর।

তালতলি। কবির গানে। ভয়ে ভয়েই বলল মালু। পড়ার বইগুলো দেরাজে রেখেই তো ছুট দিয়েছে ও। হুরমতি তৈরি হতে দেরি করেছিল, তাই তো এভাবে মাস্টার সাহেবের মুখোমুখি পড়তে হল।

হঠাৎ মনে পড়ল সেকান্দরের এ কয়দিন পড়াশোনায় নিয়মিত ফাঁকি দিয়ে আসছে মালু। ও নিজেও বুঝি একটু ঢিল দিয়েছে এ কয়টা দিন। বলল সেকান্দর–যা। পড়াশোনায় বড্ড ফাঁকি দিচ্ছিস কিন্তু।

চাঁদের আলো হুরমতির কপালের কলঙ্কটা ঢেকে রেখেছে। তবু কেন যেন ওর দিকে তাকাতে পারল না সেকান্দর। মেয়েটির স্বভাবের প্রতি এক আধলাও শ্রদ্ধা নেই সেকান্দরের। কিন্তু ওর সাহসের কাছে মাথা নত না করে পারে না সেকান্দর। সেই ছেঁকা দেবার দিনও দেখেছে, আজও দেখল। গোটা গ্রাম মিলে কলঙ্কের দুরপনেয় স্বাক্ষর এঁকে দিয়েছে ওর ললাটে, একঘরে করেছে। তবু এই গ্রামের পথ দিয়েই ও হেঁটে চলেছে অকুতোভয়ে। ওর অপসৃয়মাণ ছায়াটির দিকে তাকিয়ে নিজকে আজ কেমন অপরাধী মনে হল সেকান্দরের। লঘু পাপে গুরু দণ্ডের মতো অন্যায়টিকে ওরা কেউ রুখতে পারল না, না সেকান্দর, না লেকু কসির মিলে গ্রামের যে মানুষ, তারা।

.

ফেলু মিঞার কাচারির দিকে তাড়াতাড়ি পা বাড়াল সেকান্দর।

সেলামের পর্ব সেরেই কথাটা পাড়ল সেকান্দর। ধৈর্য ধরে শুনল ফেলু মিঞা। শোনার পর বলল, তোমার যদি অসুবিধে হয় যা পার দিয়ে দাও আপাতত, বাকীটা দিও যখন খুশি।

রমজানের বর্ণনায় সেকান্দরের উপর বিরক্ত ও উত্তেজিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ ছিল ফেলু মিঞার। একটু যে উত্তেজিত হয়নি, তাও নয়। কিন্তু ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে নিজের রাগটার রাশ টেনেছে ফেলু মিঞা। হাজার হোক এই গ্রামের অপর দশটা পরিবারের মতো সেকান্দরের বাপ-দাদারাও মিঞাদের খেয়ে, মিঞাদের ক্ষেতে মেহন্নত করেই বেঁচেছে, মানুষ হয়েছে। সেই মিঞাদের বংশধর হয়ে ফেলু মিঞা বদদেমাগী হবে কেমন করে। লেকু ফেকুদের ব্যাপার নিয়ে তুমি কেন মাথা ঘামাতে যাও? ওটার জন্য আমার নায়েব আছে, আমি আছি। ক্ষতি করব না কোনো প্রজার–এটা তো মান? হিতাকাক্ষীর সদুপদেশের মতো ধীর কণ্ঠে বলে ফেলু মিঞা।

দু বছর পরপর দুর্যোগ গেল, ওরা কোত্থেকে খাজনা দেবে? ওদেরও কিছু মাফ করে দিন, নতুবা যা নেবার সে নেবেন আগামী সনে। অনুরোধের স্বর ফোটাল সেকান্দর।

সহসা ভ্রূজোড়া কুঁচকে চোখ দুটোকে ছোট্ট এতটুকু করে আনল ফেলু মিঞা। ছুরির মতো তীক্ষ্ণ আর ধারালো স্বরে বলল, রাজস্টেট কী খাজনাটা মাফ দেয় আমাকে?

এর পর সেকান্দরের বলার কিছু থাকে না, আস্তে উঠে পড়ে ও। বাড়ি ফিরতে ফিরতে ভাবে সেকান্দর। বিছানায় শুয়ে শুয়েও শেষ হয় না ভাবনাটা। কাল সকালেই তো আসবে ওরা। কী বলবে সেকান্দর? দিও না খাজনা, ক্রোক আসুক! ক্রোকই বা লাগবে কেন? রমজান কালুর দল লাগিয়ে ফেলু মিঞা যদি ভেঙেই দেয় ওদের ঘরগুলো, লাঙ্গল চালিয়ে সমান করে দেয় ভিটি-ভুটি, কী করবে ওরা? কী করতে পারে? বাধা দিতে গেলে, বড় জোর দু একটা খুন জখম হবে। আর খুন হলেই বা কী! এই পড়তি অবস্থায়ও দুচারটা খুন হজম করে নেবার শক্তি এবং বুদ্ধি দুই-ই আছে মিঞাদের। ইপাব তৈরিঃ আল মোস্তাইন বিল্লাহ

কী যে করবে ওরা সেটা যেন স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছে সেকান্দর। ওরা যাবে রামদয়ালের কাছে। টাকা নেবে, মিটিয়ে দেবে মিঞার পাওনা। বাকুলিয়ার আরো কিছু জমি যাবে রামদয়ালের পেটে আর ওই লোকগুলো সম্বৎসর উপবাসের চিত্রটা কল্পনা করে এখুনি আধমরা হবে। যদি তাকত পায় শরীরে তা হলে চলে যাবে পূবে অথবা উত্তরের পাহাড়ে। যখন ফিরে আসবে সেই তখন দুটো ভাত পেটে পড়বে বৌ বাচ্চাদের। কিন্তু জমি? যে গেল সে তো আর উদ্ধার করতে পারবে না ওরা। এমনই হয় এমনই হচ্ছে, সেই ছোটবেলা থেকেই তো দেখে আসছে সেকান্দর। রেহানী জমি কখনো ফিরে আসে না কৃষকের হাতে।

এ ছাড়া অন্য উপায় আছে কী? মাঝ রাতেও চিন্তার হাত থেকে রেহাই পায় সেকান্দর। কী হল সেকান্দরের? এ সব চিন্তা তো কোনোদিন গিঁঠ পাকায়নি ওর মাথায়? পাঁচজনে মিলে বিশ্বাস করে ওকে একটা দায়িত্ব দিয়েছে, তাই বলে এমন অস্থির হতে হবে কেন ওকে? ফেলু মিঞার দয়া হয়নি অতএব যার যা করার কর গিয়ে। সেকান্দর মাস্টারের কিছুই করার নেই। সব চিন্তা দূরে সরিয়ে ঘুমের আরাধনায় মন দিল সেকান্দর।

ঘুম বুঝি হল না। দুটো পাশ ফিরতেই সকাল হয়ে গেল। কী সব অশ্রাব্য গালিগালাজ কানে এসে ওর চোখের পাতাগুলো আত্মা করে দিল। চোখ মুখে এক কোশ পানি ছিটিয়ে মুখটা মুছতে মুছতে বেরিয়ে এল সেকান্দর।

হারামজাদা বেজন্মা, কুত্তার বাচ্চা। গর্দান তোর মটকিয়ে ভাঙব, রক্ত তোর চুষে চুষে খাব। বেজন্মা কুত্তার বাচ্চা...

কার বিরুদ্ধে আস্ফালন করে চলেছে রমজান, আর গিরোয় গিরোয় টিনের পাত দিয়ে বাঁধা বাঁশের লাঠিটা অনবরত শূন্যে ঘুরিয়ে চলেছে। লাঠি ঘুরোতে ঘুরোতেই, ডাঙ্গা পেরিয়ে দৌড়ে যাচ্ছে রমজান, যেখান থেকে লেকুদের বাড়ির কলা গাছের ঝাড়টা চোখে পড়ে সেই উঁচুমতো ফাঁকা জায়গাটিতে।

রমজানের এমন হিংস্র ক্রুদ্ধ মূর্তি ক্কচিৎ দেখেছে সেকান্দর। সদ্য ঘুম ভাঙা চোখে ও ঠাহর পায়নি, উঠোনের মাঝখানে বাঁধা রমজানের গাই-গরুটি। গাইটির গা-ময় ছোপ ছোপ রক্ত। মাঝে মাঝে গাইটির দিকে তাকিয়ে রমজান যেন হিংস্রতর হয়ে উঠছে। আক্রোশে ফুলে উঠছে ওর শরীর। বাতাস চিরে চিরে হুংকার ছাড়ছে। সেই হুংকারের সাথে গালভর্তি পানের পিক ছিটকে পড়ছে ওরই গায়ে, আশপাশে। ভারি পায়ের গোড়ালিগুলো ঠনঠনে উঠোনের মাটিতে যেন ঠং ঠং করে বাজছে, যেন কাঁপছে উঠোনটা। কে না চেনে রমজানের এই হিংস্র বীভৎস চেহারা বাকুলিয়ায়, গোটা মৌজায় এ চেহারা মূর্তিমান ত্রাস। প্রমাদ গোণে সেকান্দর, একটা খুনখারাবি কাণ্ড বাধিয়ে তুলবে রমজান।

ঘটনাটা ঘটেছিল সেই সোবেসাদেকের সময়। আম্বরি উনুনের ছাই ফেলতে গিয়েছিল বাড়ির পেছনে। ছাই গাদাটা একেবারে বাড়ির শেষ সীমায়। তারপর একটা গড়। গড়ের ওপারে ওদের এক ফালি ক্ষেত। কার্তিকের শেষাশেষি ওই ক্ষেতটায় লেকু ছিটিয়ে দিয়েছিল খেসারি, ওরা বলে বাউলা। ছাই ফেলতে এসে ক্ষেতটার উপর একবার চোখ বুলোন আম্বরির রোজকার অভ্যাস।

ও দেখত, শীষ গজাল বাউলার। শীষ থেকে বেরিয়ে এল কচি কচি পাতা। শীষটা বাড়তে বাড়তে লতিয়ে গেল। সেই লতা থেকে লকলকিয়ে উঠল চিকন চিকন সবুজ শাখা। সবটা মিলে পুষ্ট হল, থলথলিয়ে উঠল সবুজ লতানো দেহগুলো। ফুল হল, ফুলের বুক চিরে বেরিয়ে এল ছড়া।

ছাইয়ের ডালাটা কোমর থেকে নাবাতে ভুলে গিয়ে তন্ময় হয়ে চেয়ে থাকত আম্বরি। লতানো দেহগুলো ছড়ার ভারে নুয়ে পড়েছে। পাতারাও ঢাকা পড়েছে ছড়ার আড়ালে, এত ঘন হয়েছে বাউলার ছড়া। গড়টা পেরিয়ে একবার আলের উপর গিয়ে দাঁড়াত আম্বরি; মাটি দেখা যায় না, গোটা জমিনটা যেন এক হাত পুরু সবুজ কাঁথায় ঢাকা পড়েছে।

ধীরে ধীরে ফিকে হতে থাকে বাউলা পাতার রং, ছড়াগুলোও হলদেটে হয়ে ওঠে। ওরা ঠিক করেছিল, আর কয়টা দিন গেলেই, তুলে আনবে বাউলাগুলো। ইতিমধ্যে কাঁচা বাউলাও দুচারিদিন খোলায় ভেজে খেয়েছে ওরা। লেকুর বেজায় আপত্তি, বলেছিল–কাঁচাই শেষ করবি নাকি!

আজ ক্ষেতটার দিকে ভালো করে তাকাবার আগেই গাদায় ছাই ফেলল আম্বরি। কোদাল নিয়ে এসেছিল ও, ছাইয়ের গাদাটা ঢিপির মতো উঁচিয়ে উঠেছে। কোদাল চালিয়ে ওটাকে সমান করে দিল ও। কিন্তু, গড়ের পারে উঠে ক্ষেতের দিকে তাকিয়েই বুকটা ওর ধড়ফড়িয়ে উঠল, এ কী দেখছে ও। দুটো গরু অসম্ভব দ্রুততায় সংহার করে চলেছে বাউলা ক্ষেতটা। অদূরে উত্তর কোণে যেখানে রমজানের বাড়ির একটা সীমানা এসে মিশেছে ক্ষেতের সাথে সেখানে দাঁড়িয়ে রমজান। ডালা কোদাল ফেলেই পড়ি মরি ছুটে আসে আম্বরি ওর মানুষটিকে জাগিয়ে তোলে। লেকু এসে দেখে প্রায় সিকি ক্ষেত নিঃশেষ। ক্ষেতটার মাঝে খেজুর কাঁটা বিছিয়ে রেখেছিল লেকু আর তিন দিক থেকেই চোখা চোখা কাঁটাওয়ালা খেজুর ডালের থের তৈরি করে দিয়েছিল। গরু ছাগলের সম্ভাব্য আক্রমণের বিরুদ্ধেই এ সব সতর্কতা। দু হাতে দুটো খেজুর ডাল উপড়ে নিয়ে লেকু তাড়া করল গরু দুটোকে। একটি ছুটে কোনো রকমে পালিয়ে গেল। কিন্তু গাইটা পালাবার পথ পেল না। উন্মাদের মতো লেকু পিটিয়ে গেল গাইটাকে। লম্বা লম্বা কাঁটাগুলো গভীর ক্ষত করে বসে গেল গাইটার গায়ে, ভেঙে ভেঙে লেগে রইল গোশতের ভেতর। কসির যাচ্ছিল তালতলি কামলার কাজে। সে-ও একটা কাঁটা ডাল তুলে নিয়ে লেগে গেল পিটুনী যজ্ঞে। কাঁটায় কাঁটায় বুঝি জর্জর হল গাইটার শরীর। রক্ত ঝরল ফোঁটা ফোঁটা। থক থক রক্ত জমল চামড়ার উপর।

অবশেষে প্রাণভীতু পশুটাও শেষ শক্তি টেনে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড় দিল। লেকু কসিরের রাগটাও বোধ হয় পড়ে এসেছে ততক্ষণে।

রমজান ভাবেনি এতদূর গড়াবে ব্যাপারটা, এমন মারাত্মকভাবে জখমি হবে গাইটা। পয়লা বিয়ানের গাই। রোজ দেড় সের করে দুধ দিচ্ছিল। ও জখমি সেরে উঠবে গাইটা, ভরসা কম। গাইটার শোকেই অমন ক্ষিপ্ত হয়েছে রমজান।

গাইটার গায়ে হাত রেখে চমকে উঠল সেকান্দর। কাঁটায় কাঁটায় একসার গোটা শরীর। ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরছে, নিচের মাটিটা রক্তে ভিজে লাল হয়ে গেছে। ইস্ নির্বোধ পশুটাকে এমন ভাবে জখম করল লেকু? রমজানের প্রতি নয়, অবুঝ পশুটার প্রতি সহানুভূতিতে সেকান্দরের মনটা বিরূপ হল লেকুর উপর।

হি হি হি হি, তীক্ষ্ণ হাসিতে রমজানের হু হুংকার চিৎকারটাও বুঝি তলিয়ে গেল।

রমজানের উঠোনের দক্ষিণ পাড়ে ডাঙ্গা। ডাঙ্গা ঘেঁষে পায়ে চলা পথ। সেখানে দাঁড়িয়ে হাসছে হুরমতি। কপালের পোড়াটি ওর বীভৎস এক হাঁ মেলে চেয়ে রয়েছে। এখনো পুরোপুরি শুকোয়নি ঘা-টা। রাতজাগা ফ্যাকাশে মুখটা যেন হঠাৎ আলো লেগে কেমন ঝলকে উঠেছে। তালতলির কবির গান শুনে এই মাত্র বুঝি ফিরছে হুরমতি।

কেম-ন? হার্মাদির ফলটা কী খুব তিতো লাগছে এখন? হি হি হি। আবার হাসে হুরমতি। সেকান্দরের চোখে চোখ পড়ে গিয়ে যেন আরো বেশি করে হাসে ও। আর ওর হাঁ মেলা ঘা-টাও কী এক ক্রুর বীভৎসতা নিয়ে যোগ দেয় সে হাসিতে।

চিৎকার থামিয়ে কুঁতকুঁতে চোখ দুটোকে সরু করে হুরমতিকে একবার দেখে নিল রমজান। হাতের লাঠিটা ছুঁড়ে মারল হুরমতির দিকে। কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে লাঠিটা ঝুলে রইল কলা গাছের মাথায়।

বাহরে আমার মরদ। মেয়েমানুষের উপর বাহাদুরি কেন? যাওনা লেকুর কাছে? যেন জিঘাংসার একখানি ছুরি ঝিলিক দিয়ে গেল হুরমতির ঠোঁটের আগায়। রমজান কুঁদে উঠবার আগেই মিলিয়ে গেল হুরমতি। হারামজাদি কুচকি, নিষ্ফল আক্রোশে গর গর করে রমজান।

উন্মত্ত রমজান কী যে করে বসবে কে জানে? আশঙ্কায় বুক কাঁপে সেকান্দরের। লেকুদের বাড়ির খেজুর পাতার আব্রুটার বাইরে দাঁড়িয়ে ও ডাক দেয়–লেকু বাড়ি আছ?

দাওয়ায় বসে কোঁচের শলায় ধার তুলছিল লেকু। সেকান্দরের ডাক শুনে কোঁচটা এক পাশে সরিয়ে চলে যায় ঘরে। আম্বরির নক্সা আঁকা বঠনীটা বাইরে এনে বিছিয়ে দেয় দাওয়ায়। আম্বরি ঘোমটা তুলেছে কিনা একবার আড়চোখে দেখে ডাক দেয়–আসেন, মাস্টার সাব!

বঠনীতে পা তুলে বসে সেকান্দর। তারিফ করে বনীর নক্সার, বলে আম্বরি করেছে, না?

ছোট্ট একটা হুঁ বলে লেকুও তাকায় রুইতনের ঘরের মতো নক্সাগুলোর দিকে নক্সাটা যে সুন্দর, এ কথাটা কোনোদিন মনে হয়নি ওর।

আম্বরি আমাদের খুব কামের বৌ, না রে লেকু? লেকুর জমাট গাম্ভীর্যটাকে একটু তরল করার উদ্দেশেই বুঝি বলল সেকান্দর।

নিরুত্তর লেকু তাকায় আম্বরির দিকে। বুঝি লজ্জা পেয়ে ঘোমটাটাকে আরো কয়েক ইঞ্চি মুখের উপর নাবিয়ে নিয়েছে আম্বরি। প্রথমে ফেলু মিঞার সাথে গত রাত্রির আলাপের কথাটাই পাড়ে সেকান্দর। মেহেরবানী হয়নি তার, এখন ওরা করবে কী? লেকুর উত্তরের জন্য অপেক্ষা করে সেকান্দর।

লেকুদের ঘরের সামনে উঠোনটুকু মাত্র কয়েকহাত। তারই মাঝে উত্তরের কোণটা খেজুর পাতার বেড়া দিয়ে চলে এসেছে আম্বরি। ঘরের দিকটায় বেড়া নেই, ওটা খোলা। উপরেও কোনো আচ্ছাদন নেই। শীতকালে উন্মুক্ত আকাশের তলায় এমনি ভাবেই রান্নার ব্যবস্থা করে এদিকের কৃষকরা। বৃষ্টি-বাদলার ভয় নেই দিব্যি খটখটে আবহাওয়া। এই আবহাওয়ায় খোলামেলা জায়গায় চুলো বসিয়ে রান্না করাটা চমৎকার একটি আনন্দ। খড়কুটো, শুকনো ডালপালার আগুন জ্বলে লকলকিয়ে। রান্নাও হয়, আগুন পোহানোর কাজও চলে।

শুকনো সব আম জামের পাতা, পটপটির মতো শব্দ তুলে ফাটছে, জ্বলছে। খোলায় চাল ভাজছে আম্বরি। ঠুটঠার লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ছে চালগুলো। চালগুলোর সেই কাতর ছটফটানীর সাথে তাল রেখেই আম্বরির হাতের কলা ডগাটি দ্রুত সঞ্চালিত হচ্ছে। তারপর আঙ্গুলের আগায় করে দুটো চাল তুলে আম্বরি পট করে ছুঁড়ে দেয় মুখের ভেতর। মুড় মুড় করে গুঁড়িয়ে গেল চালগুলো ওর দাঁতের নিচে। বুঝল আম্বরি ঠিক মতোই হয়েছে করই ভাজাটা। খোলাটা উপুড় করে নামিয়ে নিল করই। তারপর এক চিমটে লবণ মিশিয়ে দু মুঠ বাউলা ছেড়ে দিল খোলার উপর।

আজ তো আমার ওখানে যাওয়ার কথা ছিল তোমাদের, যাবে না? লেকুকে নিরুত্তর দেখে শুধাল সেকান্দর।

নাঃ যা করার আপনারাই ঠিক করেন, এতক্ষণে মুখ খুলল লেকু। কিন্তু গলাটা ওর মুখটার মতোই কেমন ভার ভার।

লেকুর নিরুৎসাহ দেখে যে কথাটা প্রথমেই বলবে ভেবেছিল সেটাই বলল সেকান্দর : অবোধ পশুটা, ওটা তো বেকসুর। কেন অমন অমানুষের মতো মারলে ওটাকে?

লেকু তাকায় মাস্টারের দিকে, দপ করে জ্বলতে গিয়েই নিভে যায়।

শুধু বলে, মাস্টার সাব, আপনি আপনিও?... শেষ করতে পারে না লেকু।

কণ্ঠনালির কোনো গ্রন্থিতে যেন আটকে গেছে কথাগুলো। অপ্রকাশিত ব্যথার মোচড়ে নীল শিরা জাগা বিকৃত মুখখানি অন্যদিকে ফিরিয়ে নেয় লেকু। কী এক কষাঘাতে যেন জর্জর হল সেকান্দর। লেকুর অসমাপ্ত বাক্যের না-বলা কথাগুলো সাজিয়ে গেল মনে মনে : তুমি তো রমজানের জ্ঞাতি ভাই, জমি আছে, মাস্টারী আছে তোমার। পেট ভরে মাছ ভাত খাও দু বেলা। তুমি তো বলবেই ও কথা। রমজান তোমার কাছে মানুষ, তার গরুটাও বোধ হয় মানুষ তোমার চোখে। কিন্তু লেকু, সে অমানুষ, অমানুষ ... সেকান্দরের মনে হল প্রচণ্ড ঘৃণা মিশিয়ে এ কথাগুলোই বলতে চেয়েছিল লেকু।

আম্বরি ওদের সামনে দু খোরা বাউলা মেশানো করই ভাজা রেখে যায়। একটা খোরা টেনে নেয় সেকান্দর। কিন্তু খোরাটার উপর চোখ রেখেই জ্বলে উঠল লেকু। এতক্ষণের সংযমের বাঁধটা বুঝি ভেঙে পড়েছে ওর। কী রে আম্বরি: বাউলা কোথায় পেলি? চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল ও। ইপাব তৈরিঃ আল মোস্তাইন বিল্লাহ

কেন ক্ষেত থেকে আনলাম তো?

কার হুকুমে, কার হুকুমে ক্ষেতের বাউলা ধরলি তুই? একশো বার যে না করেছি?

ইস, গরু-ছাগলে খেতে পারে আর মানুষে খেলে দোষ? হঠাৎ কেমন ঠেস দিয়ে বলল আম্বরি।

ওরা যেন ভুলেই গেল ভিন্ বাড়ির লোক সেকান্দর মাস্টার উপস্থিত ওদের মাঝে।

মানুষ? কে? তুই? আমি? পশুর চেয়েও অধম। অমানুষ অমানুষ। বলতে বলতে খোরাটা হাতে তুলে নিল লেকু। ছুঁড়ে মারল আম্বরির মাথাটা লক্ষ্য করে। খা তোর বাউলা তুই খা।

মাটির খোরা, আম্বরির কপালে লেগে দুটুকরো হয়ে ভেঙে পড়ল। আর আম্বরির চোখের কোণ থেকে কান পর্যন্ত চামড়াটা দু ফাঁক করে রেখে গেল। অল্পের জন্য বেঁচে গেছে চোখটা। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটছে আম্বরির গাল বেয়ে। হতভম্ব আম্বরি! যন্ত্রণাটা ব্যক্ত করার ভাষাটাও হারিয়ে ফেলেছে বুঝি।

অমানুষের জাত, বাউলা খাবার শখ? অকারণেই সেই পাশে ফেলে রাখা কোঁচটা হাতে তুলে নিল লেকু। আর বাকী রাগটুকু সেই কোঁচটার উপরই ঝেড়ে ফেলল। সজোরে উঠোনের দিকে সোজা করে ছুঁড়ে দিল কোঁচটা। ঘচাং ঘিং একটা আওয়াজ তুলে মাটির গায়ে গেঁথে রইল কোঁচের তীক্ষ্ণ শলাগুলো। অপরাধীর মতো মাটির দিকে চেয়ে রইল সেকান্দর। না পারল লেকুর দিকে চাইতে, না পারল আম্বরিকে একটা সহানুভূতির কথা শোনাতে। ত্রস্তপদে যেন পালিয়ে এল সেকান্দর। কী জন্য এসেছিল সে, আর কী হয়ে গেল। কিছুদূর এসে পেছনে তাকিয়ে দেখল খেজুর পাতার দরজাটা আলগা করে বেরিয়ে এল লেকু; হন হন করে চলে গেল তালতলির রাস্তাটার দিকে।

অপরাধ গ্লানিমার বোঝা ঠেলে অবশেষে একটা স্বস্তির নিশ্বাস উঠে এল সেকান্দরের বুকের ভেতর থেকে। যাক, কপালের খুন ঝরিয়ে পিঠটা আজ বাঁচাতে পেরেছে আম্বরি।

১১-১৫

কেন ওসব ছুতানাতা নিয়ে পেরেশান হও? তার চেয়ে চল তিন নম্বরের কথাবার্তাটা পাকা করে ফেলি রামদয়ালের সাথে। রমজানের নালিশটা আমলে নিতে চায় না ফেলু মিঞা।

সবই তো শুনেছে ফেলু মিঞা। ক্ষতবিক্ষত গাইটাও রমজান দেখিয়েছে। তবু এমন কথা ফেলু মিঞার? তা হলে বিচার কোথায় পাবে গাঁয়ের মানুষ! অবশ্য নিজ হাতেই বিচারটা করতে পারে রমজান। কিন্তু ফেলু মিঞা না তার মুনিব, বাকুলিয়ার মিঞা? মুনিব থাকতে কেমন করে বিচারের দণ্ড নিজের হাতে তুলে নেবে রমজান?

মিঞা আভিজাত্যে একটু ঘা দিয়ে, সাথে সাথে তোয়াজ করে নানা ভাবে কথা বলতে জানে রমজান। এ যে ওর বিদেশে শিক্ষা। ওর ক্ষেতে গরু ছেড়েছ তুমি। সে মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে। ওরও ফসলের ক্ষতি হয়েছে, তোমারও গাইটি জখমী হয়েছে। অতএব শোধবোধ, দু পক্ষই সমান, আমি বলি চেপে যাও। বিচার-ফিচার করতে গেলেই হ্যাঙ্গাম-মজলিশ ডাক, সাক্ষী আন, কম ঝামেলা নাকি?

মুনিবের নিস্পৃহতায় ক্ষুণ্ন হয় রমজান। এ যেন ইচ্ছে করেই একান্ত অনুগতকে উপেক্ষা করা, অ-খুশি করা। তবে কী রমজানকে ওই লেকু কসির চাষাভূষোদের সাথে একই কাতারে ফেলে বিচার করে ফেলু মিঞা? একক করে, পৃথক করে রমজানের কোনো মূল্য নেই তার কাছে? রমজানের মনের হিসাবগুলো কেমন যেন গুলিয়ে যায়। বিরস মুখে জমা খরচের খাতাটা টেনে নেয় রমজান। মাঝে মাঝে আড় চোখে লক্ষ করে মুনিবের মুখ চোখের হাবভাবটা। ইংলন্ডেশ্বর ভারত সম্রাটের খাস কর্মচারীদের তৈরি করা নক্সাগুলোর মাঝে ডুবে আছে ফেলু মিঞা। চারিদিকে তার যেন একটি ব্যূহ, কত সব নক্সা-খতিয়ান আর মানচিত্রের সযত্ন মোড়ক, কত বোস্তানী দলিল-দস্তাবেজের স্তূপ। এটা খুলছে ওটা মুড়ে রাখছে, কোনোটা বা প্রচণ্ড বিরক্তিতে ছুঁড়ে ফেলছে। এ বান্ডিল সে বান্ডিল তন্ন তন্ন করে কী যেন খুঁজছে ফেলু মিঞা। হঠাৎ একটা আলো এবং লাল রেখাঙ্কিত কাগজের উপর যেন হুড়মুড় করে পড়ে ফেলু মিঞা। কী এক আগ্রহে চোখজোড়া তার চিক চিক করে ওঠে। পেয়েছি পেয়েছি, সহসা আনন্দ আতিশয্যে চেঁচিয়ে ওঠে ফেলু মিয়া। নক্সাটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে আসে দলিল দস্তাবেজের ব্যূহ থেকে। রমজানের সুমুখে নক্সাটি বিছিয়ে দিয়ে বলে : পেয়েছি, দেখ, এই যে মেঘনার মোহনা, ছোট ছোট দ্বীপগুলো দেখছ? ওই সব দ্বীপ বড় বড় চর আর গোটা উপকুলটা তো

আমাদেরই ছিল। তারপর ওই যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাবুর্চি না বেয়ারা ছিল একটা সাহেব, কার্জন নাম, সে একশো বছরেরও আগের কথা হে। সেই ব্যাটা সাহেব, নিজের ঘাড়ে একটা বন্দুক আর দুটো ভাড়াটে বন্দুকধারী পেয়াদা নিয়ে একদিন কোত্থেকে হাজির হল বলল এ আমার জমিদারী তখনকার দিনে ওই দুটো বন্দুক আর সাহেবের সাদা চামড়া, এর উপর আবার কথা? ব্যাস রাতারাতি গোটা তল্লাটটা হয়ে গেল কার্জনের জমিদারী। সেই বছরই তো আমার আব্বাজানের দাদা এক রকম বিনা যুদ্ধেই কার্জনের হাতে ওই তল্লাটটা তুলে দিয়ে চলে গিয়েছিলেন হজ্বে। এইটুকু বলে নক্সাটার উপর ঝুঁকে পড়ে আবার কী যেন দেখতে থাকে ফেলু মিঞা। তন্ময় হয়ে যায়। ডুবে যায়। আঙ্গুলের নখ দিয়ে এখানে সেখানে দাগ কাটে। এক মনে দাগ কাটে ফেলু মিঞা।

মুহূর্তের জন্য নিজের অভিযোগটা যেন ভুলে যায় রমজান। রমজানেরও হাসি পায়। চেপে রাখতে পারে না হাসি। মুখ ঘুরিয়ে দাখিলা মুসাবিদার কাজে মন দেয় ও।

আল্লার কী কেরামতি জান? কয়েক বছর বাদেই তিন চারটে দ্বীপ রীতিমতো পুরনো আর অরণ্যময় দ্বীপ, কার্জন ব্যাটা কাঠের ব্যবসা ফেঁদেছিল সে সব দ্বীপে, একদিন সব ডুবে গেল স্রোতের তলায়। সে সব দ্বীপ আবার জেগে উঠেছে। আবার ভেসে উঠেছে পানির উপর। বুঝলে রমজান? সমস্ত কাগজপত্র আমার তৈরি। জলদি জলদি সদরে যাবার ব্যবস্থাটা করে ফেল। কার্জন ব্যাটা কবে মরে ভূত হয়ে গেছে। ও সব সম্পত্তির আমরাই তো হক মালিক। সরকারকে সমস্ত অবস্থাটা জানিয়ে ফেরত চাইতে হবে আমাদের প্রাচীন সম্পত্তি। হঠাৎ থেমে যায় ফেলু মিঞার কথার তোড়। তার মনে হল রমজান যেন মন লাগিয়ে শুনছে না। একটু তীক্ষ্ণ ভাবে ওকে নিরীক্ষণ করে বলল আবার : ও বিশ্বাস হচ্ছে না তোমার? আরে রমজান। মুনিব তোমার! স্কুল কলেজ পাস না দিলে কী হবে, এলেম রাখে হে। ওই তোমার ব্রিটিশ গভর্নমেন্টেরও ক্ষমতা নেই ফাঁকি দিয়ে যায় এই ফেলু মিঞাকে! আত্মগর্বে স্ফীত হয়ে আসে ফেলু মিঞা! চাবির গোছাটা নিয়ে উঠে যায়। নিজেই সিন্দুক খুলে বের করে আনে সাদা লাল সবুজ কাপড়ে বাঁধা নানা আকারের কতগুলো দলিলের পোঁটলা। আলবোলার নলটা মুখে পুরে নতুন দলিলে আবার মন দেয় ফেলু মিঞা। হিসেবের খাতাটা বন্ধ করে রমজান লক্ষ করে মুনিবের কাণ্ড-কারখানা। এই রাগ এই আনন্দ আতিশয্য, মুনিবের বিচিত্র স্বভাবটার থৈ পায় না রমজান। কর্ন ওয়ালিসকে ছেড়ে আবার কোত্থেকে কোন কার্জন সাহেবকে নিয়ে পড়ল ফেলু মিঞা। রমজানের বুদ্ধিতে ধরে না এ রহস্য। তাও দুটোই মরা সাহেব, জ্যান্ত হলে না হয় একটা বোধগম্য হেতু পেত রমজান।

কালু কালু, ডেকে ওঠে ফেলু মিঞা।

কালু দৌড়ে এসে কলকিটা তুলে নেয় হুঁকো থেকে। নতুন তামাক সাজাতে শুরু করে।

আরে ব্যাটা তামাক না। আমাদের নতুন বিয়ানের গাইটা পৌঁছে দিবি রমজানের বাড়ি। ওর গাইটা বোধ হয় বাঁচবে না। চকিতে একবার রমজানকে দেখেই আবার দলিলের স্তূপে ডুব দেয় ফেলু মিঞা।

এ হল গিয়ে মিঞার বেটা ফেলু মিঞা। দিল তার দরাজ। এ দিলের পরিচয় আগেও পেয়েছে রমজান। কিন্তু এতে কী অপরাধীর সাজা হল না ন্যায় বিচার হল? রমজানের মাথার গরম ঠাণ্ডা হয় না। পাল্টা প্রতিশোধ না নিয়ে কেমন করে ঠাণ্ডা হবে রমজান! তবু প্রত্যক্ষ পাওয়াটা উপেক্ষণীয় নয়। মুনিবকে খুশি করার জন্য উঠে আসে রমজান, বলে স্যার তিন নম্বর তালুকটার ব্যাপারে তা হলে রামদয়ালের সাথে বসে একটা কবালার মুসাবিদা করে ফেলি?

হ্যাঁ হ্যাঁ। নিশ্চয় নিশ্চয়। তুমি পারবে তো না কী আমাকেও যেতে হবে? খোলা দলিলগুলো বন্ধ করে বলে ফেলু মিঞা।

তা আপনাদের দোয়ায় অ আ ক খ টা তো শিখেছিলাম ছোট বেলায়, তারপর তো সব দেখে শেখা দেশে আর বিদেশে। আপনার কাজে কোনোদিন গলতি পেয়েছেন স্যার? মাটির সাথে যেন মিশে যায় রমজান।

আরে কী যে বল, ওই দেখে শেখাটাই তো আসল শেখা। দেখছো না আমাকে? তুমি তো আমার যোগ্য সাকরেদ।

সাকরেদ না স্যার, অধম গোলাম আপনার। বিনীত নম্রতায় আর এক ধাপ নেবে আসে রমজান। অধম শব্দটা ছোটবেলায় মক্তবের মৌলভী সাহেবকে একবার ব্যবহার করতে শুনেছিল রমজান। শব্দটা কেন যেন খুব পছন্দ হয়েছিল ওর। তাই মনে রেখেছিল। আজ সেই শব্দটার এমন সার্থক প্রয়োগে খুশি হয়ে উঠল রমজান। ভাগ্যিস সৈয়দদের মক্তবে বসে বাংলা বর্ণমালাটার সাথে একটু পরিচয় করে নিয়েছিল রমজান। সে জন্য আজ আল্লার দরবারে তার হাজার শোকরগুজার।

এবার ফেলু মিঞা পরগনা আমিরাবাদ আর দখিন ক্ষেতের নক্সাটাই খুলে ধরল চোখের সামনে। সেই সুলতানপুরের জেলে পাড়া, তালতলির একশো ঘর তাঁতী, চাটখিলের যুগিরা, সব ওই তিন নম্বর তালুকের প্রজা। মুহূর্তের মাঝে কার্জনের

কল্পিত চেহারাটা অদৃশ্য হয়ে ফেলু মিঞার চোখের সামনে ভেসে উঠে রামদয়ালের মুখখানি। আর সঙ্গে সঙ্গেই সেই দরাজ দিলটা যেন সহস্র সাপের ছোবল খেয়ে বিষিয়ে উঠল। ফেলু মিঞার চোখে ঘৃণা আর প্রতিহিংসা। মিঞা আভিজাত্যের কলঙ্ক সেই তিন আর চৌদ্দ নম্বর তালুক, পুনরুদ্ধারের জন্য এখনো টাকার ব্যবস্থা নেই ফেলু মিঞার। একমাত্র আগামের টাকাটারই ব্যবস্থা হয়েছে। স্ত্রী হালিমার কয়েক ছড়া অলংকার সরিয়ে রেখেছে ফেলু মিঞা।

স্ত্রী হালিমার কথাটা মনে হতেই ছ্যাপরা খেল ফেলু মিঞা। কী এক ভয় এসে যেন গ্রাস করল ওকে।

কাকুতি মিনতি করেও যখন কিছু হয়নি, সোজা হুকুম দিয়েছিল, ধমক ছেড়েছিল ফেলু মিঞা। তাতেও কাজ হয়নি, উল্টো বলেছিল বউটি, গায়ের সোনা ঘরের লক্ষ্মী। গা থেকে এক রত্তি সোনাও খুলব না। ওসব কুসংস্কারের বালাই রাখে না ফেলু মিঞা। ঝট করে বউয়ের গলার মফ চেইনটা খুলে নিয়েছিল। আর খপ করে হাত দুটো ধরে চুড়িগুলো টেনে বের করেছিল। সেই সাথে বিবি হালিমার হাতের একটুখানি চামড়াও হয়ত উঠে এসেছিল। অভিসম্পাত দিয়েছিল হালিমা : কুষ্ঠ হবে কুষ্ঠ হবে ওই হাতে! খোদার কহর পড়বে, লানত পড়বে! ইপাব তৈরিঃ আল মোস্তাইন বিল্লাহ

ফেলু মিঞার মনে হয়েছিল কুলবধূর অভিসম্পাতে দালানের ইটগুলোও বুঝি সত্যি কেঁপে উঠল। মনে হয়েছিল যে হাতটার চুড়ি কয়টা ধরেছিল ফেলু মিঞা চুড়িশুদ্ধ সেই হাতখানি বুঝি তখখুনি খসে পড়বে। এমন সাংঘাতিক কহর দিল বৌটি? তাও মাত্র কয়েক ভরি সোনার জন্য? অভিসম্পাতকে বড় ভয় ফেলু মিঞার। তাই তো সেদিনের সেই দৃশ্যটা মনে জাগলেই ছাপরা খায়, চমকে ওঠে ফেলু মিঞা। কিন্তু ফেলু মিঞা তো এটাই জানতো–বান্দীর মেয়ে, ছোট লোকের বউ, ওরাই মুখ খারাপ করে, চেঁচামেচি করে, গালি দেয়, কহর দেয়। কিন্তু মিঞা বাড়ির বৌ বা মেয়েকে কে কবে উঁচু গলায় কথা বলতে শুনেছে? সেই মিঞা বাড়ির বৌ কিনা কমজাত ছোট লোকদের মতো চেঁচাল? কহর দিল? ছিঃ ছিঃ। ফেলু মিঞার গাটা ঘিন ঘিন করে ওঠে। স্ত্রী হালিমাকে সত্যি সত্যিই ঘৃণা করতে শুরু করেছে ফেলু মিঞা।

চারদিকে রাষ্ট্র হয়ে গেছে খবরটা। সবাই জেনেছে সাত নম্বর তালুক ফিরে এসেছে মিঞাদের। প্রজারা এসে সেলাম দিয়ে যাচ্ছে কাচারিতে। কেউ বা নিয়ে আসছে নজরানা।

কিন্তু আনন্দ কোথায় ফেলু মিঞার? অর্ধেক আনন্দই তো কেড়ে নিয়েছে স্ত্রী হালিমা।

তাছাড়া আর একটা ভয় এত ব্যস্ততা আর চিন্তার মাঝেও ধুক ধুক করছে ওর মনের ভেতর। বিছে হার, বাজুবন্দ, নোলক আর গলার নারকেল ফুলগুলোর খবর তো এখনো হালিমার অজানা। স্ত্রীর অজান্তেই বাক্স থেকে অলংকারগুলো সরিয়েছে ফেলু মিঞা। যথা সময় ব্যাঙ্কে বন্ধক রেখে টাকাও এনেছে। যখন জেনে যাবে হালিমা আরও কী কঠিন অভিশাপ দেবে সে কে জানে! জমিজিরাত ঘরবাড়ি ফেলে সোনার প্রতি কেন যে মেয়েদের এত লোভ আজও বুঝতে পারল না ফেলু মিঞা। অদ্ভুত এই মেয়ের জাত।

সংস্কার বা কুসংস্কার কোনোটাকেই তেমন আমলে আনে না ফেলু মিঞা। তবু স্ত্রী হালিমার অভিশাপকে এত ভয় কেন ওর? এ প্রশ্নেরও কোনো সদুত্তর খুঁজে পায় না ফেলু মিঞা।

এত প্রশ্ন, এত দ্বন্দ্ব, এত দুশ্চিন্তা। কপালের রেখাগুলো কুঁচকে আসে। চোখ দুটো দপ দপ করে জ্বলে ওঠে। ফেলু মিঞা মাথার চুল ছেড়ে দু হাতের তালুতে মাথাটাকে চেপে ধরে। ফেলু মিঞা কী পাগল হবে? তা হলে আজ বিকেলেই তালতলিটা ঘুরে আসি স্যার। দলিলের বোঁচকায় সুতো প্যাঁচাতে প্যাঁচাতে বলল রমজান।

ফেলু মিঞা বুঝি সম্বিৎ ফিরে পায়।

আলবত আলবত। শুধু ঘুরে আসা নয়, একেবারে পাকা করে আসবে।

নক্সাটার উপর আবার ঝুঁকে পড়ে ফেলু মিঞা।

রমজানের সেই ছোট ছোট গোল গোল চোখ দুটি কেন যেন লাল হয়ে থাকে সারাক্ষণ, চকচকিয়ে ওঠে সে চোখ। সেই পাঁচশো টাকার নোটের তোড়াগুলো, কামিজের নিচের দিকে ভারী পকেটটায় এখনো যেন অনুভব করছে রমজান। তিন নম্বরে আরো বড় দাঁও। আহ্, রমজানের গায়ের লোমগুলো কী এক নাচন দিয়ে গেল। একটু আগে মুনিবের উপেক্ষায় যে ক্ষোভ জমেছিল ওর মনের ভেতর মুহূর্তে উবে গেল সে ক্ষোভ।

শোন। নক্সা থেকে মুখ তুলে রমজানের দিকে তাকাল ফেলু মিঞা। বাকী বকেয়া আদায়, সে তো আছেই। তা ছাড়া...। থামল ফেলু মিঞা। কী যেন ভাবল। বলল

আবার, আমি ভাবছি কিছু জমি বিক্রী করে দেব। আজকাল জমির বেশ দাম আছে।

মুনিবকে সত্যিই বোঝে না রমজান। লোকে আজকাল তালুক বেচে জমি কিনছে। কেননা জমিতেই এখন টাকা, ফসল বিক্রীর নগদ মুনাফা। একটু বুদ্ধি খরচ করলেই তো ব্যাপারটা বুঝতে পারে ফেলু মিঞা। কিন্তু ফেলু মিঞা বুঝবে না। ফেলু মিঞা জমি বেচে তালুক কিনবে।

কেমন একটা ধূর্ত হাসি ঝিলিক তুলে যায় রমজানের ঠোঁটের কোণে।

বলল রমজান তা তিন নম্বরের জন্য দরকার পড়লে জমি কিছু বেচতে হবে বই কী?

ততক্ষণে নক্সাটার আঁকাবাঁকা টানের বিচিত্র মায়ায় আবার হারিয়ে গেছে ফেলু মিঞা। সব রাগ, সব ক্ষোভ, স্ত্রীর অভিমান ভুলে গেছে ফেলু মিঞা। এখন শুধু ওই আঁকাবাঁকা টানের নক্সা, ডিসিমলের হিসাব। ওই নক্সা। ধন গৌরব আভিজাত্য আর মর্যাদার কিংখাব মোড়া সেই অতীত যেন বন্দী ওই নক্সার গোলক ধাঁধায়। উদ্ধার করতে হবে তাকে, মুক্ত করতে হবে তার পুনরুজ্জীবনের পথ। কঠিন সংকল্পের মুখে ভেঙে যাচ্ছে সব বাধা-বিপত্তি ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিত পদক্ষেপেই এগিয়ে চলেছে ফেলু মিঞা। কী এক রোমাঞ্চে দুলে দুলে যায় তার সারা অঙ্গ।

১২.

সেলামালাইকুম।

ওয়ালাইকুম। নক্সাটা গুটিয়ে রেখে ওদের দেখল ফেলু মিঞা। ওরা সবাই এসেছে, কসির, বুড়ো ট্যান্ডল, সারেংদের বড় হিস্যার মজু সারেং, ফজর আলী। আরো অনেকে।

ওদের মতলবটা আঁচ করে আগেভাগেই সিদা কথাটা শুনিয়ে দেয় ফেলু মিঞা। শুনেছি সব। মাফটাফ হবে না। বকেয়া মিটিয়ে দাও। তারপর অন্য কথা। নইলে।

নইলে কী, সে বলার অপেক্ষা রাখে না। ওরা জানে।

কোত্থেকে দেব? সেই পুরনো কথা কসিরের।

কো-থেকে দেব? ভেংচি কাটে ফেলু মিঞা। আপনার হাজারো অসহায় অপদার্থতার ক্ষোভে অহর্নিশ জ্বলে চলেছে ফেলু মিঞা। তাই কসিরের হতাশ

কান্নার মতো ঝরে পড়া কথাটা যেন বারুদের স্তূপে আগুন ধরিয়ে দেয়। দাঁত মুখ খিঁচিয়ে অশ্লীল হয় ফেলু মিঞা! দুই মাগীরে দুই পাশে নিয়ে শোবার সময় জিজ্ঞেস করিস আমাকে? কোত্থেকে দিবি সে আমি জানি?

থামে না ফেলু মিঞা। একটি কথার সূত্র ধরে বলে চলে অনেক কথা। মুসলমান, তার উপর ছোট লোক। ওদের স্বভাবটাই তো ওই। কামাই নেই রোজগার নেই। কিন্তু শাদী? মাশাল্লাহ্, এক গণ্ডা, কমসে আধ গণ্ডা। এই জন্যই তো গোটা জাতটার এই দুরবস্থা।

কসির অবশ্য তেমন গায়ে মাখে না কথাটা। দুই বউ নিয়ে সে নিজেও পস্তায় এখন। খেতে দিতে পারে না। তার উপর দুই সতীনে খিটিমিটি চুলোচুলি লেগেই আছে হরদম।

মুখ নীচু করে ফজর আলি। ওর দু বউর সংসারে এতটুকু কোঁদল নেই। তা নিয়ে ওর অনেক গর্ব।

কিন্তু উসখুস করে রমজান। হঠাৎ সরাশরিয়তের খেলাপ বলতে শুরু করল কেন ফেলু মিঞা? মুসলমানের শাদী হল ফরজ কাম। যে শাদী করবে না বেহেশত তার হারাম। দুই বৌ চার বৌ সে তো সুন্নত, পুণ্যের কাজ। একপত্নীক হলেও মিঞার কথাটায় ধর্মের দিক দিয়ে যেন সায় নিতে পারে না রমজান। তবু মিঞার কথা তো? ভালো হোক মন্দ হোক শুনে যেতে হবে। লেখাপড়া আমাদের নেই কিনা! তাই–। জাহাজে নানা দেশের নানা লোকের রুচির সাথে পরিচয় ঘটেছে মজু সারেংয়ের। তাই ওর চিন্তাটা অন্য ধরনের।

লেখাপড়ার কথায় আবার খিঁচিয়ে ওঠে ফেলু মিঞা; ঝাঁটা মার লেখাপড়ার কপালে। দেখছ না আমার দিগগজ ভাইগুলোকে! হ্যাঁ যদি বল ওই মিত্তিরদের মতো, দুটো ছেলে জজিয়তি করে, মাস মাস টাকা পাঠায় গ্রামে। সে টাকায় শুধু কী মিত্তিরদের উন্নতি? কত কাজে লাগে সে টাকা। একটা ডিসপেন্সরী চলে আর ওই মেয়েদের স্কুলটা তো সম্পূর্ণ মিত্তিরদের টাকাতেই চলে। এমন লেখা পড়ার দাম আছে, বুঝি।

বিলকুল ঠিক। বিলকুল ঠিক। এবার সবাই ফেলু মিঞার সাথে সায় না দিয়ে পারে না। মিঞা বাড়ির চাকুরে ছেলেরা কিছু টাকা পাঠালে বাকুলিয়ার অভাগারাও তার কিছু উপকার হয়তো পেতো। সে কথাটাই ভাবে ওরা। আর দেখ ওর রামদয়ালকে। পাস সেও তো একটা করেছে। গোটা বাড়িতে ঝুড়ি ঝুড়ি বি.এ.

পাস। তবু দেখ সুদী কারবার, তেজারতি, চাষ–সবটাতেই আছে ওরা। তাই তো এত উন্নতি ওদের।

আশ্চর্য হয় রমজান। উঠতে বসতে হিন্দুদের বিশেষ করে ওই রামদয়ালের আর ওই মিত্তিরদের চৌদ্দ পুরুষের মুণ্ডপাত করা যার অভ্যাস তার মুখেই আজ হিন্দু প্রশস্তি?

এত কথার মাঝে আসল কথা বুঝি চাপা পড়ে যায়। হাঁটুর উপর ভর রেখে একটু নড়েচড়ে বসে কসির, ফজর আলি।

কসিরের হয়ে সুপারিশ করে ফজর আলি।

হুজুর... সেই ভীরু ভীরু স্বর কসিরের।

আবার হুজুর? তিন দিনের সময় দিলাম। যা, ভাগ।

আপনি হলেন মিঞা, গেরামের মাথা, আপনি দয়া করলে বাঁচি, নইলে মরি।

দেখেছ রমজান? রামদয়ালের সাথে থেকে থেকে কেমন কথা বলতে শিখেছে ফজর আলি। ফেলু মিঞার খানদানী মেজাজটা সত্যি খুশি হয়ে উঠে।

পুরনো খতিয়ানের বোঁচকাগুলো তাকে তুলতে তুলতে আড় চোখে কসিরের দিকেই তাকায় রমজান। ভেসে উঠে ওর চোখের সুমুখে সেই লেকুর বাউলা খেতের ছবিটি। ইস দুই বদমাশ মিলে কী নিষ্ঠুর মারটাই না মারল গাই গরুটাকে। হঠাৎ কেউটের ছোবল খেয়ে যেন সচকিত হল রমজান। বিষের জ্বালাটা কী এক অস্থিরতা চড়িয়ে চলেছে ওর স্নায়ু শিরায়। এত বড় মারটা কী রমজানকে নীরবেই হজম করতে হবে?

দরিয়ার মতো দরাজ হয়েছে আজ ফেলু মিঞার দিলটা। নতুন বিয়ানো গাই গরু দান করে দিল রমজানকে। তিন নম্বর তালুক কেনার হুকুমটা দিয়ে দিল। এতগুলো খুশিতে কিছুক্ষণের জন্য বুঝি হারিয়ে গেছিল রমজান। কসির বা ফজর আলি যে ওই কমজাত লেকুটারই দোসর কথাটা মনে হতে হয়ত তাই একটু দেরি হল।

শা-লা। দুই বৌর সোয়াদ তোদের আচ্ছা করেই মিটাচ্ছি আমি। আলমারির তালাটা টিপতে টিপতে বিড় বিড় করে রমজান। নিজের জায়গাটায় এসে বসে। সোজা করে তাকায় ওদের দিকে আজ। বুঝি অনেক কেউটের অনেক ছোবল জ্বালা ধরিয়েছে ওর সর্বাঙ্গে। হৃৎপিণ্ড তার বিষের মন্থনে ক্রমাগত পাক খেয়ে

চলেছে। মনটা তার তড়পায় বোশেখের শেষে শুকিয়ে যাওয়া ডোবার মাছগুলোর মতো। হ্যাঁ, মুনিবের মদদ থাক বা না থাক প্রতিশোধ সে নিবেই। সে যে কছম খেয়েছে দাদ না তুলতে পারলে বাপের ব্যাটা নয় সে। সে কছম ভুলেনি রমজান।

আরে মাস্টার এস, এস। ডাকল ফেলু মিঞা। নিজের পাশেই বসবার জায়গা করে দিল।

আজকের কাগজে খবরটা দেখেছ?

জী না কাগজ তো স্কুলে গিয়ে দেখি। কী খবর? শুধাল সেকান্দর।

আবার বেধেছে গোলমাল। এবার ইউ, পিতে।

কিসের গোলমাল? জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে সেকান্দর।

কিসের আবার গোলমাল! হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা রায়ট রায়ট। বলে ওর দিকে কাগজটা বাড়িয়ে দিল ফেলু মিঞা।

তা-ই তো। খবরটা পড়ে আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল সেকান্দর। যেন নিজের কাছেই ছোট্ট একটা প্রতিবাদ জানিয়ে রাখল।

শোন মাস্টার। এই ফেলু মিঞা একটা কথা বলে রাখছে–ওই হিন্দুরা একটা একটা করে সব মুসলমান খতম করবে এ দেশ থেকে। এখন তো রায়ট হচ্ছে কালে ভদ্রে! কিন্তু আমি তো স্পষ্ট দেখছি, এমন দিন আসছে প্রতি মাস, প্রতি দিনই রায়ট হবে! মনে রেখ কথাটা।

আলবোলায় ঘন ঘন কয়েকটা টান মারে ফেলু মিঞা। ধোঁয়াগুলোকে একেবারে তলপেট অবধি টেনে নেয়। তারপর একটা লম্বা হাঁ মেলে উঁচিয়ে রাখে মুখটা, কুণ্ডুলি পাকানো ধোঁয়া মিছিল করে বেরিয়ে যায়।

ইংরেজ থাকতেই এই অবস্থা? ইংরেজ চলে গেলে, হিন্দুদের হাতে স্বরাজ এলে কী অবস্থাটা হবে, ভেবে দেখ তো? একটা মুসলমানেরও অস্তিত্ব খুঁজে পাবে না এ দেশে। একটাও না। সব মুসলমান, ধনী নির্ধন, আমীর ফকির সবাই যদি আজ একট্টা না হতে পারি আমরা তবে এই, এই আমাদের ভবিষ্যৎ। জেনে রেখো মাস্টার। একদিন নিজের চোখেই এ সব দেখবে আর বলবে-হা বলেছিল বটে ফেলু মিঞা।

তা কেন হবে! ছোট্ট একটা প্রতিবাদ জানায় সেকান্দর। যে আর্জি নিয়ে এসেছে সেটা পেশ করার জন্য একটু ঝুঁকে আসে সুমুখে।

হুজুর, গরিবের দিকে একটু দেখবেন না? সেকান্দরের আগেই মজু আর কসির প্রায় এক সাথেই বলে উঠল।

এই তো, এই তো আমাদের মুসলমান। দেখ, চেয়ে দেখ। খাজনা দেবার পয়সা নেই। পরনে কাপড় নেই। পেটে ভাত নেই। শুধু জানে হাত পাততে। শুধু জানে নফরদারী। বেহায়া বেসরম বেল্লিক। ওদের দিকে আঙ্গুল উঁচিয়ে আর সেকান্দরের দিকে মুখ করে বলল ফেলু মিঞা। আবার লাল হয়ে এসেছে তার মুখ। আবার সেই ক্ষোভ আর ঘৃণা যেন একটানা ঝাঁকুনি দিয়ে চলেছে তার শরীরে।

মুসলমান তো নয়, কাঙ্গালের জাত, ভিক্ষুকের জাত–এ কথাটা চিৎকার করেই বলে ফেলু মিঞা। আর সেই, কাঙ্গালের জাতটার কথা যখন ভাবতে বসে ফেলু মিঞা তখন এমনি ক্ষুব্ধ রাগে দিশে হারায়, চোখ মুখ তার লাল হয়ে আসে, ঠিক যেমনটি হয় মিঞাদের লুপ্ত আভিজাত্যের কথা ভাবতে গেলে।

এই এই এখনো বসে আছিস তোরা? এখনো গেলিনা আমার সমুখ থেকে? এই কালু, কুঁড়ের বাদশা।

কালুকে আসতে হয় না। তার আগেই ওরা উঠে যায়। শুধু অন্যায়ের কাতর চোখগুলো একবার সেকান্দরের দিকে তুলে ধরে। বেরিয়ে যাবার আগে ওদের অনুক্ত আবেদনটা যেন রেখে যায় ওরই হাতে। সে যেন কিছু করে ওদের জন্য।

কী বলবে সেকান্দর! সে-ই তো পাঠিয়েছিল ওদের বলেছিল, আমার একলার কথায় তো হল না কিছু। তোমরা সবাই মিলে ধর্না দাও মিঞার কাচারিতে। কিন্তু ফলে বুঝি বিপরীত হল।

উত্তেজনাটা চচ্চড় করে বেড়ে চলেছে, উঠে দাঁড়িয়েছে ফেলু মিঞা। আলবোলাটা সরাতে গিয়ে ফেলেই দিল মেঝেতে। কলকিটা ভেঙে দু টুকরো হল, ছাইগুলো ফরাসময় ছড়িয়ে পড়ল।

কী হবে কী হবে এই ভিখিরীর জাতের, বলতে পার মাস্টার? তুমি কী ভাবো, দিলে আমার রহম নেই? দুঃখে আমারও বুক ফেটে যায় মাস্টার। কিন্তু কী করব? মিঞা বাড়ির ইজ্জত, মিঞা বাড়ির নাম নিশানা মুছে ফেলতে চায় তালতলির ওই মালাউনের গোষ্ঠীটা। টাকা যে আমার চাই, যেমন করে হোক। নইলে শুধু আমার

হার নয়, বাকুলিয়ার, ওই সুলতানপুরের, গোটা পরগনার মুসলমানের হার। কোনোদিন কোনোদিন ওরা মাথা উঁচিয়ে দাঁড়াতে পারবে না। পারবে না।

নিজের উত্তেজনায় নিজেই যেন বেহুঁশ ফেলু মিঞা। খালি পায়েই পায়চারি শুরু করেছে মেঝের উপর।

কিন্তু…

না না তোমার কথা আলাদা, তুমি যখন খুশি দিও, তবে ওই ব্যাটাদের বলে দাও টাকা চাই আমার, টাকা নগদ টাকা নতুবা জমি। চটিতে পা ঢুকিয়ে চট চট শব্দ তুলে অন্দর মহলের দিকে চলে যায় ফেলু মিঞা।

১৩.

আম্বরি আম্বরি। তোর খুব লেগেছে না রে? দেখি? আম্বরির মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে লেকু।

কপাল থেকে কান অবধি ন্যাকড়ার পট্টিটা টেনে টেনে আল্গা করার চেষ্টা করছে আম্বরি। কচু ডগার কষ ভেজানা তেনা, শুকিয়ে চিমসে গেছে ক্ষতের সাথে। ও শুয়ে আছে, ঘরের একমাত্র আসবাব, ওদের জাম চৌকিটায়। আম্বরির শ্বশুরের নিজের ব্যবহার করা শখের চৌকিখানা। সেই লেকুর বিয়ের সময় বুড়ো ছেলেবৌকে খুশি হয়ে ছেড়ে দিয়েছিল বাড়ির প্রাচীন জাম গাছটা ফেড়ে তৈরি করা এই চৌকিখানা।

উ উ আহ। কঁকিয়ে ওঠে আম্বরি। ওর অসাবধানে কখন লেকু হাত বাড়িয়ে টান মেরেছে পট্টিতে, চচ্চড় করে উঠে এসেছে ন্যাকড়া। বেশ শুকিয়ে এসেছে ক্ষতটা, যতটা মারাত্মক ভেবেছিল লেকু, তেমন কিছু নয়। মাগো! কী ডাকাত। আম্বরি বলে আর আঙ্গুল বুলোয় আধশুকনো ঘা-টার উপর। লেগেছে ওর। পানি এসে পড়েছে চোখে। আর সেই ফাঁকে ওই ডাকাতটা যে কখন ওর পলকা শরীরটাকে নিবিড় বেষ্টনে ধরে নিয়েছে বুঝি টেরই পায়নি ও।

পাটার মতো চওড়া বুকটার উপর মাথা রেখে নিথর পড়ে থাকে আম্বরি।

তুই এ রকম কেনরে আম্বরি?

কী রকম?

জানিস তো আমার শুয়রের মতো রাগ। যখন রাগি তখন হাতের মুখে না থেকে পালিয়ে গেলেই পারিস!

আম্বরি চুপ। ওই হাতগুলো যখন আদর দেয় ওকে তখন কেমন যেন বোবা বনে যায় ও। বলার থাকলেও বলতে ইচ্ছে করে না কথা। ছোট ছোট আঙ্গুল দিয়ে টিপে টিপে ও যেন পরখ করে মানুষটার হাত, বুক, হাতের পেশী। সোহাগ ভরা হাত। কে বলবে এই হাতের আঙ্গুলগুলোই এক সময় লোহার মতো শক্ত হয়ে যায়, লোহার শলার মতো দাগ কেটে কেটে বসে যায় আম্বরির পিঠে। দুটো হাত কী একই মানুষের? সে হাতের আদরে বুঝি মট মট করে ভেঙে যায় আম্বরির কাঠির মতো শরীরটা। কোনো গহিন সায়রের পানি যেন ধেয়ে আসে ওর দু চোখ ঠেলে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে আম্বরি।

মানুষটার বুকে মুখ রেখে কাঁদতে কত যে সুখ আম্বরির! মানুষটা কী বোঝে সে কথা?

আস্তে আস্তে শাড়িটা সরিয়ে ওর পিঠে হাত রাখে লেকু। পিঠটা স্পর্শ করেই যেন চমকে ওঠে লেকু। ওর হাতের বাঁধনটা যায় আল্গা হয়ে। ওর বুকের উপর থেকে ঢলে পড়ে আম্বরি। মুখ তুলে আম্বরির পিঠটা দেখে লেকু। নীল আর কালো দাগে একাকার ওর পিঠ, একটুও ফাঁক নেই বুঝি। আর কেমন অমসৃণ প্রথম চাষ দেওয়া জমিটার মতো। ইস্ এমন করে ওকে পিটিয়েছে লেকু? এ দাগ কী শুধু পিঠে? লেকুর মনে হল এই নিষ্ঠুর নির্যাতনের দাগ আম্বরির সারা অঙ্গে। চামড়ার নিচে যে মাংস আর মাংস ঢাকা যে সব হাড়, সেই হাড়গুলোও বুঝি এমনি কালো আর নীল হয়ে গেছে। সেখানেও দাগ ধরেছে।

শোন্ আম্বরি। অনেকক্ষণ পর বলল লেকু। ইপাব তৈরিঃ আল মোস্তাইন বিল্লাহ

আম্বরি শোনে। কিন্তু, জবাব দেয় না। পিঠের উপর লেকুর খরখরে হাতের স্পর্শটা অদ্ভুত মোলায়েম লাগছে ওর।

আমি পাহাড়ে যাচ্ছি। একটা খেপ নিয়ে আসি। তারপর চল্ দুজনাই চলে যাই রঙ্গম।

রঙ্গম? আম্বরির বুকের ভেতর হঠাৎ বুঝি একটা খুশির লহর দৌড়ে এসে নেচে নেচে যায়। কিন্তু পরমুহূর্তেই উবে যায় ওর আনন্দটা। বলে সে কী গো? জমিজিরাত ঘরবাড়ি ফেলে রঙ্গম যাবে?

জমিজিরাতের ভাবনা আর ভাবতে হবে না রে আম্বরি। জমি রেহান দিয়েছি দয়াল কাকার কাছে।

রেহান? বুঝি বিশ্বাস করতে চায় না আম্বরি।

হ্যাঁ রে হ্যাঁ।

কেন গো? উঠে বসে আম্বরি।

চট করে কোনো উত্তর দেয় না লেকু। কী যেন ভাবে। কেমন অন্যমনস্ক চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে আম্বরির শাড়ি পরা। তারপর আচমকা ধাক্কার মতো মুখের ভেতর থেকে ঠেলে দেয় কথাগুলো : আমি যাব ফেলু মিঞার পায়ে ধরতে? ওই বদমাশ রমজানটার মোজাত হতে? আমি মরদ না? এই যে মুগুরের মতো হাত দেখছিস দুটো, এ হাত দিয়ে এখনো বহুত কামাই করতে পারি আমি। জমি বন্ধক রেখে ফেলু মিঞার সব বকেয়া শোধ দিয়ে এসেছি। কারো ধারি না আমি, কারো খাই না। কামাই করব, আবার ফিরিয়ে আনব আমার জমি। উত্তরে যদি কামাই ভালো না হয় যাব রঙ্গম। তোকে নিয়ে যাব আম্বরি। তুই যাবি?

মানুষটার দিকে ভয়-ভয় চোখে চেয়ে থাকে আম্বরি। এতো বছর ঘর করেও যেন চিনতে পারল না মানুষটাকে। কেমন ফুলছে, ফুঁসছে মানুষটা, কী ক্ষোভে, কী রাগে। বুকটা তার হাঁপরের মতো উঠছে আর নামছে, ঘাড়ের পেশীগুলো ফুলে ফুলে কেবলি যেন পাক খেয়ে চলেছে।

আমাদের জমি নেই? লোক যে তোমায় ফকিরা বলবে গো? কী এক ব্যাকুলতায় লেকুর হাতখানা আঁকড়ে ধরে আম্বরি।

হ্যাঁ, আর তোকে বলবে ফকিরার বৌ, ফকিরনী। ঘাবড়াসনে আম্বরি, এই গতর যখন আছে তখন অনেক হবে। অনেক হবে আমাদের।

হবে কী? সেই পাটার মতো চওড়া বুকের আশ্রয়ে মুখ লুকিয়ে অস্ফুটে শুধায় আম্বরি।

১৪.

মস্তবড় ধনী। অগুনতি তাঁর রায়ত প্রজা। কত যে লয়লস্কর। ঘোড়া-শালে ঘোড়া, হাতিশালে হাতি। কাচারিবাড়ি, কোঠাবাড়ি, তেতলা দালান। ধন দৌলতের শেষ নেই তার।

তেতলার একটি ছোট্ট ঘরে থাকেন তিনি।

খালাম্মা, কী নাম তাঁর? ফস করে প্রশ্নটা বেরিয়ে আসে মালুর মুখ থেকে। সঙ্গে সঙ্গে গুম করে একটা কিলও নেবে আসে ওর পিঠে। কিলটা রাবুর। তাই চুপ মেরে যেতে হয় মালুকে।

বারান্দায় পাটি পেতে ওরা সব গোল হয়ে বসেছে। পীর পয়গম্বরের কিস্সা শোনাচ্ছেন সৈয়দগিন্নী। রাবু, আরিফা ছাড়াও হুরমতি, আম্বরি, সেকান্দরের মা; ট্যান্ডলদের বৌ মাথায় আঁচল দিয়ে বসেছে ওরা। বড়রা শুনতে শুনতে পান চিবোচ্ছে। ছোটরা জোড়া হাঁটুর উপর মুখ রেখে তন্ময় হয়েছে।

এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর, তিন লক্ষ আওলিয়া, পীর দরবেশ। সবার নাম কী মনে রাখা যায় রে! স্মিত হেসে মালুর প্রশ্নের জবাব দেন সৈয়দ-গিন্নী।

ধনী হলেও পরহেজগার নেকবক্ত লোক। চব্বিশ ঘণ্টার মাঝে ষোল ঘন্টাই তাঁর কাটে এবাদত বন্দেগিতে। এত ধন দৌলত নিয়েও কিন্তু সুখ নেই তাঁর। জীবনের একমাত্র সাধ তাঁর আল্লাকে দেখবেন। তাই দিনে দিনে এবাদত যায় বেড়ে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা পড়ে থাকেন সেজদায়। রাতে এশার নামাজ সেরে তাহাজ্জত পড়েন সেই রাত অবধি। বুঝিবা একটু চোখ বোজেন, কিন্তু উঠে পড়েন মোরগ ডাকারও আগে। সোবে সাদেকের সময় যিকির করেন, ফজরের নামাজ সারেন। তারপর কোরান তেলাওয়াত করেন সেই বেলা অবধি। এ ভাবেই দিন যায়। মাস যায়। বছর গিয়ে আবার ঘুরে আসে।

কত বছর যে কেটে যায়। তবু আল্লার সাক্ষাৎ পান না তিনি।

নামাজ এবাদত আরো বাড়িয়ে দিলেন তিনি। খোদার ধ্যানেই মগ্ন রইলেন সারাদিন। এক একটা সেজদা দেন, ঘণ্টা যায় কেটে, মাথা তোলেন না। যে ঘরে খাওয়া সেই ঘরেই এবাদত সেই ঘরেই শোয়া, ঘর ছেড়ে বের হন না তিনি। এক রাত, সোবে সাদেকের একটুখানি আগে ঘুমিয়ে পড়েছেন তিনি, ঘুমের ঘোরেই শুনতে পেলেন ছাদের উপর কারা যেন চলে বেড়াচ্ছে। শব্দ হচ্ছে ধুপধাপ খুটখাট। ঘুম তার ভেঙে গেল। অমনি শব্দটাও থেমে গেল।

দ্বিতীর রাত।

তৃতীয় রাত।

চতুর্থ রাত।

একই শব্দ ধুপধাপ খুটখাট। ঘুম ভাঙতে না ভাঙতেই মিলিয়ে যায় সব রকমের শব্দ। এ কী ব্যাপার? কিসের শব্দ? মানুষই যদি হবে তবে তাঁর ঘুম ভাঙতে না ভাঙতেই ধুপধাপটা থেমে যাবে কেন?

তিনি ছাড়া আর কেউ থাকেন না তেতলায়। ছাদে উঠবার সিঁড়িটাও তাই ঘরের ভিতর দিয়ে। সে সিঁড়িতে মস্ত বড় তালা। তবু শব্দ হয় প্রতি রাতে, কারা যেন চলে বেড়ায়। ইয়া আল্লা। এ কী তোমার লীলা! আল্লার দরবারে কেঁদে পড়েন সাধক পুরুষ। কেঁদে কেঁদে জায়নামাযটা ভিজিয়ে ফেললেন। সে রাতে আল্লার নাম করে শুলেন তিনি। শোবার আগে সেই পুরাতন প্রার্থনাটিও করলেন, আল্লা, তোমার দর্শন চাই। কী আশ্চর্য। সেই একই ধুপধাপ খুটখাট শব্দ শুনলেন। সঙ্গে সঙ্গে শুধালেন–তুমি যেই হও ওখানে কর কী? উত্তর এল–গরু ঘোড়াকে খাওয়াই।

অবাক হলেন সাধক পুরুষ। এ কী তাজ্জব ব্যাপার। আমার তেতলার ছাদে গরু ঘোড়া কখন আর কেমন করেই বা উঠবে! আর সেখানে গরু ঘোড়াকে ঘাস খাওয়াবার স্পর্ধাই বা কার? পরের রাতে আবার একই শব্দ। শুধালেন, যেই হও জবাব দাও, গরু ঘোড়ার ঘাস কী আমার তেতলার উপর? অমনি উত্তর এল–খোদা কী তেতলায় থাকেন?

গায়ে যেন কাঁটা বিঁধল সাধক পুরুষের। চমকে উঠলেন তিনি। ভাবলেন দিন ভর, রাত ভর। দিলে তাঁর সদমা এল, ছটফটিয়ে সময় কাটে তার। বুঝলেন এ হচ্ছে খোদারই গায়েবী আওয়াজ। ডাকলেন ছেলেদের, বললেন, বাবারা, তোমাদের বিষয় সম্পত্তি তোমরাই বুঝে নাও, আমি চললাম খোদার রাহে।

কিছু খানা আর সামান্য বিছানাপত্র নিয়ে রওয়ানা হলেন তিনি, যে দিকে দুচোখ যায়।

যেতে যেতে দেখলেন একটা লোক পুকুরের ঘাটে নেমে আঁজলা ভরে পানি খাচ্ছে। প্রশ্ন এল সাধকের মনে, আমি চলেছি খোদার সন্ধানে, আর থালা বাটি গেলাস না হলে খাওয়া চলে না আমার? থালা বাটি গ্লাস ওই পুকুরেই ছুঁড়ে ফেলে দিলেন তিনি।

চলতে চলতে এবার দেখলেন, পথের পাশে গাছতলায় শিকড়ে শিথান দিয়ে দিব্যি আরামে ঘুমুচ্ছে একটি লোক। ঘুমন্ত লোকটার দিকে তাকিয়ে ভাবলেন সাধক; তোষক চাদর বিছানা কিছু নেই লোকটার অথচ কী নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমুচ্ছে : আর আমি চলেছি খোদার অন্বেষণে বিছানা বালিশের গাঁটরি লয়ে? গাছতলায় ওই নিদ্রিত লোকটার পাশেই বিছানা বালিশগুলো রেখে এগিয়ে চললেন সাধক।

পথ চলেন সাধক। পথের যেন শেষ নেই। খোদারও সাক্ষাৎ নেই। তবু তিনি চলেন। বৃষ্টিতে ভেজেন। রোদে গা শুকিয়ে নেন। তবু বিরতি আসে না তার চলার।

এক জায়গায় দেখলেন রাস্তার উপর একেবারেই উলঙ্গ একটি লোক নামায পড়ছে। তাঁর সন্দেহ হল লোকটা নিশ্চয়ই পাগল। তবু জিজ্ঞেস করলেন ল্যাংটা যে নামাজ পড়ছ বড়, ল্যাংটা কী নামাজ হয়? ত্বরিতে জবাব এল লোকটির–আমি ল্যাংটাই এসেছি পৃথিবীতে, সেই ল্যাংটা ভাবেই ডাকি খোদাকে।

উত্তর শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন খোদা-অন্বেষী সাধক। নিঃসন্দেহ হলেন তিনি, পাগল নয় লোকটি, হয়ত কোনো আওলিয়া দরবেশ। প্রশ্ন জাগল সাধকের মনে, তবে আমিইবা কেন এত কামিজ, জামা-জোব্বা আলখাল্লা পরে রয়েছি? গায়ের বাহুল্য লেবাসে তিনি ছুঁড়ে ফেললেন পথের ধূলোয়।

দিন যায়, মাস যায়, খাবার গিয়েছে ফুরিয়ে। পথে পথে চেয়ে মেঙ্গে খান। না পেলে উপোস দেন। উপোস চলে কখনো দিনের পর দিন। তবু সাধক পথ চলেন আর একমনে ডাকেন খোদাকে। গ্রীষ্মের খরতাপে, শান্তিতে তৃষ্ণায় বুকের ছাতি তার ফেটে যেতে চায় তবু মুখ থেকে আল্লার নাম পড়ে না। সম্পূর্ণ রিক্ত, সর্ব লোভ সর্ব বিলাস মুক্ত কামিল পুরুষ তিনি। তাঁর ডাকে কেঁপে ওঠে খোদার আরশ। এবার সাড়া না দিয়ে পারেন না খোদা। খোদা হুকুম দিলেন জিব্রাইলকে; যাও দুনিয়াতে। দেখ, কী চায় আমার ওই ভক্ত বান্দা।

জিব্রাইল তীরের বেগে নেমে এসে শুধাল, কী চাও সাধক?

আমি চাই খোদাকে দেখতে, অকুতোভয়ে বললেন সাধক।

ফিরে গিয়ে জিব্রাইল খোদার নিকট পেশ করল সাধকের আর্জি। শুনে খোদা বললেন তুমিই খোদা, সেই পরিচয় দাও তার সামনে।

তথাস্তু।

জিব্রাইল সাধকের কাছে এসে বলল আমিই খোদা।

কেন যেন সায় দেয় না সাধকের মন। জিজ্ঞেস করেন, খোদাতালাই কী তোমায় পাঠিয়েছেন?

মিথ্যে বলতে পারল না জিব্রাইল, বলল, খোদাই আমাকে পাঠিয়েছেন। ক্ষোভে অভিমানে কান্না এসে যায় সাধকের চোখে। সর্বস্ব ত্যাগ করেছেন তিনি, গায়ের শেষ বস্ত্রটিও পথের ধারে নিক্ষেপ করে নিঃস্বের মতো ছুটে বেড়াচ্ছেন। এক ধ্যান,

এক জপ তাঁর–আল্লা আল্লা। তবু কী আল্লার দর্শন পাবেন না তিনি? চোখের পানিতে বুক ভাসিয়ে বললেন সাধক, জিব্রাইল, খোদাকে বল আমি যে তাঁরই দর্শনপ্রার্থী।

উত্তর নিয়ে ফিরে এল জিব্রাইল। না, খোদা বলেছেন, কোনো আদম সন্তান তাঁকে দেখতে পায় না, দেখতে পাবে না।

হা আল্লা, এত পরীক্ষার পর এই তোমার কথা? কিন্তু ধৈর্য হারালেন না সাধক, শান্ত আর দৃঢ় স্বরে বললেন : জিব্রাইল, আবার যাও তুমি। বিশাল অদৃশ্য এই সৃষ্টির মালিক সেই পরোয়ারদেগারকে আমি দেখবই।

অদৃশ্য ডানায় ভর দিয়ে উড়ে যায় জিব্রাইল। চক্ষের নিমেষেই ফিরে আসে। একই উত্তর খোদার। কিন্তু স্বীয় প্রার্থনা থেকে এক ইঞ্চিও টললেন না সাধক। ব্যর্থ যাবে তাঁর আজন্ম এবাদতবন্দেগী সাধনা? তিনি বলেন, যাও জিব্রাইল, আবার যাও।

কতবার যে জিব্রাইল যায় আর আসে তার বুঝি কোনো ঠিক ঠিকানা থাকে না। অমন যে ফেরেশতা জিব্রাইল সেও বুঝি দৌড়াদৌড়িতে হয়রান পেরেশান হয়ে ওঠে। শেষবার জিব্রাইল এসে বলল : হে রসুলের উন্মত। প্রস্তুত হও! সর্বশক্তিমান প্রভু তোমাকে দর্শন দেবেন।

জিব্রাইলের কথাটা ফুরোতে না ফুরোতেই কোত্থেকে যেন কোটি তারা আর লক্ষ চাঁদ নেবে এল পৃথিবীর বুকে, আলোয় আলোয় ভরে গেল পৃথিবী। অপূর্ব সে আলো, সেই আলোর ছটায় উদ্ভাসিত দিগদিগন্ত। সাধককে ঘিরে যেন লক্ষ আলোক শিখার নাচন। ঝলসে গেল সাধকের চোখ। বেহুঁশ তিনি লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে।

কাহিনী শেষ করে চোখের পানি মুছলেন সৈয়দগিন্নী, তসবির ছড়াটা কোল থেকে জায়নামাযের উপর রেখে মুনাজাত করলেন। তার দেখাদেখি শ্রোতারাও হাত তুলল আকাশের দিকে, ওদেরও চোখ অশ্রুসজল। আ-মি-ন। আমিন সবার আগে সশব্দে এবং টেনে টেনে দুবার উচ্চারণ করল মালু। তারপর উঠে এল পড়ার টেবিলে।

বসে আছে সেকান্দর, কখন গল্প শেষ হবে, উঠে আসবে ওর ছাত্র-ছাত্রীরা। ধর্মকর্মের কথা তেমন করে ও ভাবে না। ভাববার ফুরসুতই বা কোথায়? তবু সৈয়দগিন্নীর কাহিনীটা শুনে মনটা ওর ভিজে যায় আর কেমন অবাক হয় ও। ইহলোক আর পরলোকের সুস্পষ্ট সমন্বয় যে ধর্মে সেখানে কেমন যেন বেখাপ্পা

এই কাহিনী। দীনে আর দুনিয়ায়, আখেরাত আর বাস্তবের পৃথিবী, এ দুয়ের মাঝে প্রত্যক্ষ সমন্বয় সৈয়দবাড়ি। চল্লিশের ওপারের পুরুষ মহিলারা সবাই হজ্জ সেরে এসেছেন। কর্তা সৈয়দ দুদুবার হজ্জ করেছেন। নিজের ইংরেজি ডিগ্রী আর ইংরেজের আপিসে বড় চাকুরিটার সাথে লম্বা দাড়ি, লম্বা কোর্তা আর মদিনা শরীফের গোল টুপীর লেবাসটাকে অতি সহজে মানিয়ে নিয়েছেন তিনি। সেই সৈয়দ বাড়ির কর্ত্রীর মুখে ত্যাগী সাধকের কাহিনীটি কেমন যেন বেমানান মনে হয় সেকান্দরের কাছে। এ বুঝি একান্ত দেশজ উপাদান, বাংলার মাটিতে লালিত নারীমন, ত্যাগব্রতী সাধকের পায়ে যেমন অর্ঘ্য ঢেলেছে যুগে যুগে।

আখেরাতের নেয়ামত পেতে হলে ছাড়তে হবে দুনিয়ার লালসা। যিনি সেই নির্লোভ এবাদতী, খোদার নেয়ামত তাঁরই জন্য। তিনিই পাবেন খোদার সান্নিধ্য। মোনাজাত শেষ করে কাহিনীর চুম্বকটি শোনালেন সৈয়দগিন্নী। কাহিনীর রেশ এখনো বুঝি আচ্ছন্ন করে রেখেছে ওদের। ফ্যাচ ফ্যাচ করে নাক ঝাড়ছে হুরমতি। দূরে রাখা হ্যারিকেনের টিমটিমে আলোটা ওর মুখের কাছটিতে এসে কী যেন ঔজ্জ্বল্যের সন্ধান পেয়ে চিকচিকিয়ে উঠছে। মাথায় ঘোমটা নেই ওর। সেকান্দরের দৃষ্টিটা অজানতেই হুরমতির কপালের উপর স্থির হয়ে থাকে। ক্ষতটা শুকিয়ে গেছে। দূর থেকে নজরে পড়ে একটি গোল কালচে মতো দাগ, যেন বড় রকমের একটা টিপ পরেছে হুরমতি। ওকে যতই দেখছে অবাক হয়ে যাচ্ছে সেকান্দর মাস্টার। এত যে ঝড় বয়ে গেল মেয়েটার উপর দিয়ে, একটুও দমাতে পারেনি ওর উদ্ধত বেপরোয়া স্বভাবটাকে। পঞ্চায়েতের নিষেধ কোনো বাড়িতেই বন্ধ করতে পারেনি ওর যাতায়াত। বন্ধ করতে পারেনি প্রকাশ্য দিবালোকে গ্রামের পথ দিয়ে ওর চলা। সেকান্দরের চোখটা কেমন নির্লজ্জের মতো পড়ে থাকে হুরমতির মুখের উপর। আরিফার পাশেই, বসে আছে ও, একই কাঁচা হলুদ গায়ের রং, টিকোল নাক, টলটলে চোখ; সাদা শাড়ির শুভ্র মোড়কে ধরা নিখুঁত প্রতিমার মতো। মেয়েটির দিকে তাকিয়ে কে বলবে এ বাড়ির মেয়ে নয় ও!

ভেঙে গেল আসর। মাথার কাপড় টেনে পড়তে এল রাবু আর আরিফা। কাহিনীটি থেকে কী শিখলে বল তো? জিজ্ঞেস করল সেকান্দর। ওদের বিমূঢ় মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে নিজেই উত্তরটা দিয়ে গেল ও! অসম্ভবও সম্ভব হয় যদি থাকে নিষ্ঠা, সুদৃঢ় মনোবল আর ত্যাগের স্পৃহা। দেখলে না কত দুঃখ কত ক্লেশ পদে পদে মাড়িয়ে এগুলেন ওই মহাসাধক, এক মুহূর্তের জন্যও দ্বিধা আসেনি, সংশয় আসেনি তার মনে। এক মুহূর্তের জন্যও দুর্বল হয়নি, হতাশায় ঢলে পড়েননি তিনি। এমন সাধনায় কখনো সিদ্ধি না এসে পারে? এই সাধনা কী শুধু ওই মহাসাধকের? সত্য দর্শনের এই সাধনা সকল মানুষের। সমস্ত পৃথিবীর, যুগে যুগে

মানব সভ্যতার অগ্রগতির ভিত গড়েছে অজেয় মনের এই অক্লান্ত সাধনা। শ্রোতাদের চেয়েও নিজেকে শোনাবার জন্যই যেন কথাগুলো বলে গেল সেকান্দর, কী এক আবেগ ঢেলে, গভীর কোনো অনুভূতির রস নিঙড়িয়ে। আর ওর কচি শ্রোতারা হাঁ করে গিলে গেল মূল্যবান উপদেশগুলো।

কিন্তু, একি? রাবুর চোখে পানি কেন?

সেই তখন থেকে কাঁদছে ও, চাচাজানের কথা মনে পড়েছে হয়ত, বলল আরিফা।

না ছিঃ কেঁদো না। আচ্ছা যাও, আজ আর পড়তে হবে না। সুমুখে খোলা বইটা বন্ধ করে দিল সেকান্দর। মালুর খাতাটা টেনে নিয়ে মন দিল ওর হাতের লেখায়।

আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে উঠে যায় রাবু। বুঝি অনেক কিছুই মনে পড়ছে ওর। কোনো ঝাপসা স্মৃতি, অস্পষ্ট কোনো মুখ, মুখের আদল। হয়ত টুকরো কোনো কথা সেই মৃতা মায়ের কোলে বসে শোনা। এখন সে সবের কিছুই মনে নেই ওর। তবু কী যেন মনে পড়ে আর চোখ ফেটে কান্না আসে।

দশের উপর তিন বসিয়ে অর্থাৎ মালুকে ফেল করিয়ে খাতাটা ওকে ফেরত দেয় সেকান্দর। একটা দীর্ঘশ্বাস পাক খেয়ে খেয়ে উঠে আসে ওর বুক ঠেলে। কবে দেখেছে রাবুর আব্বাকে মনে করতে পারে না সেকান্দর। সৈয়দবাড়ির বুজুর্গ এলেমদার পুরুষ। দেশি বিদেশি, ইংরেজি আরবি ফারসি, কত বিদ্যে তাঁর। সেই মানুষ, হঠাৎ কী যেন হয়ে গেল, তাজা বউ আর তিন মাসের মেয়েটিকে ছেড়ে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে। সে তো প্রায় তের-চৌদ্দ বৎসর আগের কথা। কোথায় কোথায় যে ভেসে বেড়াচ্ছে লোকটা, আজ যদি খবর আসে নোঙ্গর ফেলেছে বেরিলীতে তবে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, চলে গেছে দেওবন্দে। হঠাৎ হয়ত খবর পাওয়া গেল বড় পীর সাহেবের মাজার জিয়ারতে গেছে বাগদাদে, সেখান থেকে কারবালায়। মাঝে দুএকবার বাড়ি এসেছিল, কয়েক ঘণ্টা, বড়জোর একদিনের জন্য। শেষবার এসেছিল বোধ হয় বছর পাঁচ ছয় আগে। মহাসাধকের গল্প শুনে সেই দেওয়ানা বাপটির কথাই কী মনে পড়ে গেছে রাবুর।

কী ঠিক করলে, বাবা? পাশে এসে শুধালেন সৈয়দগিন্নী।

জী, এখনো যে বুঝতে পারছি না! আমতা আমতা করে কানের উপরকার চুলগুলো টানতে টানতে বলে সেকান্দর। ইপাব তৈরিঃ আল মোস্তাইন বিল্লাহ

এতে আবার বুঝাবুঝির কী আছে, বাবা? লোক রাখবে, তারা তদারক করবে, তুমি শুধু দেখবে যাতে নষ্ট না হয় কিছু। তাতে সময় লাগবে তোমার। এটা ঠিক। কিন্তু

সেটা তো আমি পুষিয়ে দেব, বাবা? বুঝি এখুনি ওর মুখের হাঁ-টা শোনার জন্য তাকিয়ে থাকেন সৈয়দগিন্নী।

গরিব স্কুল মাস্টারের মনে কেন এত দ্বিধা, কেন এত সংশয়, সৈয়দগিন্নী কী কখনো বুঝবেন? সেকান্দর মাস্টার নিজেও তো বুঝতে পারছে না সৈয়দগিন্নীর অযাচিত অনুগ্রহদানের এই উগ্র ইচ্ছাটাকে। হয়ত উপকারের ইচ্ছে আদৌ নেই সৈয়দগিন্নীর। সৎ আর বিশ্বাসযোগ্য লোকের হাতে আপন সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দিয়ে প্রবাসে তিনি নিশ্চিন্ত হতে চান মাত্র। আর কিছু নয়।

নিরুত্তর সেকান্দর মাথা চুলকায়। স্যান্ডেলের উচ্চ শব্দে অসন্তোষ জানিয়ে রসুই ঘরের দিকে চলে যান সৈয়দগিন্নী।

১৫.

গ্রামের চাঁদনিটা মনকে বুঝি উন্মনা করে, নিভৃত কোণ থেকে টেনে নেয় বাইরের জগতে। বাইরের বিশাল প্রকৃতিটার সাথে মিলিয়ে মিশিয়ে একাকার করে দেয় মনের নিজস্ব কোনো অস্তিত্বের জগৎকে। মনটা পাখা মেলে, জোছনার তরঙ্গে দোল খেয়ে খেয়ে গলে পড়া রাতের রহস্যে উধাও হতে চায়। সেই চাঁদজাগা রাতে সৈয়দবাড়ি থেকে ফেরার সময় এত কথা মনে হয়নি সেকান্দরের, কিন্তু মনে আছে, কেমন ভালো লেগেছিল ওর।

আজকের রাতটা অন্ধকার। জমাট ঘন এই অন্ধকারের রূপ। খোলামেলা বিস্তীর্ণ পৃথিবীটাকে সে যেন মুঠোর মাঝে একটুকু করে নিয়েছে। চেতন-অচেতনের দূরত্ব ঘুচিয়ে দিয়ে বস্তুটাকেই করে তুলছে মুখ্য।

মনের চিন্তাগুলোকেও যেন সমস্ত অস্বচ্ছতা আর দ্বিধামুক্ত করে স্পষ্ট ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে তুলেছে। এই বুঝি অন্ধকার রাতের প্রকৃতি। পথ ঠাওর করে হাঁটতে হাঁটতে ভাবে সেকান্দর, সত্য আর অপরাধকে গোপন করার জন্যই নাকি অন্ধকারের সৃষ্টি। সজাগকে ঘুমের অচৈতন্যে বিলীন করাই নাকি অন্ধকারের কাজ। অথচ কথাটাকে ঘুরিয়ে বললেই যেন সত্য বলা হয়। অন্তত সেকান্দরের তাই মনে হল। অন্ধকার ওর বিক্ষিপ্ত চেতনাকে এদিক ওদিক থেকে কুড়িয়ে এনে সুষ্ঠু এক সংহতির রূপ দিয়ে গেল। ওর মনের সুপ্ত অথবা জাগ্রত চিন্তাগুলোকে অবয়ব দিয়ে স্পষ্ট করে তুলে ধরল ওরই চোখের সুমুখে! সহসা কী এক তীক্ষ্ণতায় আপনাকে অনুভব করল সেকান্দর। এমন করে নিজেকে কখনো অনুভব করেনি ও। সেই চকিত অনুভবটাই বুঝি একটি প্রশ্নের আকারে এই অন্ধকার রাতে ঘিরে ধরল ওকে। অখ্যাত গ্রাম্য জীবনে, গরিব শিক্ষকের বিড়ম্বিত প্রাত্যহিকতার

মাঝেও কোনো সাধনার ধন কী খুঁজে পাওয়া যায় না? সাধকের গল্পটি মনে মনে নাড়াচাড়া করতে গিয়ে এ কী প্রশ্ন উঠে আসে! চঞ্চল আর দ্রুত হয় সেকান্দরের পদক্ষেপ। বিদ্যায় বুদ্ধিতে মানুষ করতে হবে ভাইটিকে, নিজের যত অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা তারই মাঝে রূপায়িত হবে, এতদিন এটাকেই তো এক মাত্র সাধনা বলে জেনে এসেছে সেকান্দর। আজকের অন্ধকারে মনে হলো ওটা আরো হাজারটি স্বার্থবোধের মতোই একটি সংকীর্ণ স্বার্থ চিন্তা। যে স্বার্থ জ্ঞানে ফেলু মিঞা উন্মাদ, রমজান হিংস্র, রামদয়াল নিষ্ঠুর সৈয়দগিন্নী চতুরা, সেকান্দর মাস্টারও তেমনি একটা স্বার্থপর বুঝি। তবে…?

সহসা মনের মাঝে গজানো অনেক আগাছা যেন ছেঁটে ফেলে দেয় সেকান্দর। না সৈয়দগিন্নীর অনুগ্রহটা গ্রহণ করবে না ও। ওতে ছোট করা হবে নিজেকে, নিজের শিক্ষকতার পবিত্র ব্রতকে। গ্রাম্য কোন্দলে জড়িয়ে পড়ে শুধু ঝন-ঝাট আর নোংরামিই ডেকে আনবে নিজের উপর। আর ছোট ভাই সুলতান? নিজের আয়ে নিজের শ্রমেই ওকে মানুষ করবে সেকান্দর।

সুঁচ চলে না এমনি ঘন আর নিরেট অন্ধকারে কী যেন আলোর সন্ধান পেয়ে গেল সেকান্দর মাস্টার। এমনিই বুঝি হয়। আচম্বিতেই ঘুরে যায় জীবনের মোড়।

কিন্তু, লেকুটার হল কী? কতদিন ধরে সেকান্দরের ধারে কাছে ঘেঁষছে না ও। সবাই মিলে গেল ফেলু মিঞার কাছে, লেকু যায়নি। নিজেকেই অপরাধী মনে হয় সেকান্দরের। সেদিনকার সেই সকাল বেলায় কেমন ঘৃণা আর খেদ মিশিয়ে বলেছিল লেকু, আমরা তো অমানুষের জাত। সেই কথা আর ক্রুদ্ধ লেকুর সেই মুখটা মনে পড়ল সেকান্দরের। ওর এতটুকু ভরসা নেই সেকান্দরের উপর। তাই নিজের পথেই বুঝি চলেছে ও। রামদয়ালের কাছে জমি রেহান দিয়ে টাকা এনেছে লেকু। মিঞার বকেয়া পাওনা শোধ দিয়েছে। ইস্ কী বিষ মিশিয়েই না রমজান সেকান্দরকে শুনিয়ে গেল কথাটা। এত বিষ ওর হিংসায়? গতরাতে নিজের ঘর থেকেই চেঁচিয়েছিল রমজান : হল তো এখন? জোট বাঁধ ওই ছোট লোকদের নিয়ে? কেমন সটকে পড়ল জোটের পালোয়ানটা। জ্ঞাতি ভাইয়ের দুশমনি করলে এমনিই হয়। আরো দুর্ভোগ আরো অপমান সেকান্দরের নসিবে আছে এটা হলফ করেই বলে দিতে পারে রমজান।

অবশ্য রমজানের ক্রোধের হেতুটা অন্য। তলে তলে একটু আধটু সুদী কারবার করছে ও, সবাই জানে। সেটা জানা সত্ত্বেও বাকুলিয়ায় ওর স্বধর্মী ভাই বেরাদাররা ছুটে যাবে বিধর্মী রামদয়ালের কাছে, এটা ওর পক্ষে অসহ্য। রামদয়ালের কাছে জমি বন্ধক রেখেছে লেকু, এ খবরটা পেয়ে তাই গোটা শরীরে আবার আগুন

ধরেছিল রমজানের। তেতে উঠেছিল ওর মাথার ঘিলুটা। শুধু তো একটা দাঁও ফসকে গেল না, আরও একটা প্রতিশোধ নিল লেকু, আচ্ছা রকম জব্দ করল রমজানকে। গাই গরুটাকে জখমী করেও বুঝি ওকে এতটা বেচাইন করতে পারেনি লেকু।

সহসা মুসলমান জাত সম্পর্কে দিব্যজ্ঞান লাভ করল রমজান। মুনিব ফেলু মিঞার সাথে আজ একমত হল ও।

মুসলমান–তায় আবার কমজাত, ছোট লোকের বাচ্চা। কী হবে এই জাতের? মুনিব ফেলু মিঞার অনুকরণে মনে মনেই আফসোস করে রমজান। ফেলু মিঞার এই উক্তিটা বিশেষ ভাবেই আজ ভালো লেগে গেল রমজানের। শালা কমজাত কমিনা; কী ক্ষতি হত জমিটা রমজানের কাছে বন্ধক দিলে? টাকা কী কম পেত লেকু, নাকি কম দিত রমজান? গ্রামের জিনিস গ্রামেই থাকত, তারই জাত ভাইয়ের জিম্মায়। হাজার শত্রুতা থাকুক, রমজান তো মুসলমান, রামদয়াল হিন্দু–মুসলমানের শত্রু। শালা যদি মরিস এখন, কে যাবে তোর গোর খুঁড়তে? ওই রামদয়াল, না তোর পড়শী জাত ভাইরা? ফেলু মিঞার দুর্বোধ্য সেই বিক্ষোভের উৎসটা এমনি করে দিনের মতো পরিষ্কার হয়েছিল রমজানের কাছে। মুনিবের প্রতি মনে মনে সালাম জানিয়েছিল রমজান। আর রাত্রে খেতে বসে মনের জ্বালা ঝেড়েছিল জ্ঞাতি দুশমন সেকান্দরকে উপলক্ষ করে।

কিন্তু বলা নেই কওয়া নেই, জমিগুলো রেহান দিয়ে দিল কেন লেকু? দরজার হুড়কোটা টেনে দিয়ে বিছানায় গাটা এলিয়ে দিতে দিতে ভাবে সেকান্দর মাস্টার। পাশের চৌকিতে অঘোরে ঘুমুচ্ছে ছোট ভাই সুলতান। ওর নিশ্বাসের বাতাসটা সেকান্দরের গায়ে এসে লাগছে। অন্ধকারেই ওর দিকে একটা সস্নেহ দৃষ্টি পাঠিয়ে পাশ ফেরে সেকান্দর।

হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছিল ও। হঠাৎ দরজার বেড়ার উপর কী যেন খস খস করে ওঠে। বেড়ার উপর কোনো ছোট হাতের কয়েকটা ধাক্কাও পড়ল বুঝি। ঘুমটা ভেঙে গেল সেকান্দরের। কানটা খাড়া করে ও শুনতে পেল নীচু মেয়েলী কণ্ঠস্বর–মাস্টার সাব, মাস্টার সাব।

ওকেই ডাকছে। কিন্তু, এত রাতে কে-ই বা ডাকবে ওকে! তার উপর মেয়েলী স্বরে? অন্ধকারেই পায়ের ইশারায় এগিয়ে এসে দরজায় হুড়কোটা খুলে ফেলল সেকান্দর।

হুরমতি? কী হল হুরমতির? এই গভীর রাতে সেকান্দর মাস্টারের কাছে কী প্রয়োজন পড়ল ওর? হুরমতির সঙ্গে মালু। সেকান্দর কোনো কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই হড় হড় করে লম্বা এক বৃত্তান্ত দিয়ে গেল মালু যার সবটা বুঝে নেওয়া দুঃসাধ্য। ঘরে ফিরে পিরানটা গায়ে চাপিয়ে বেরিয়ে এল সেকান্দর।

রাস্তায় পড়ে ওর ভুলটা ভেঙে গেল। রাত গভীর নয়, শেষ প্রহরটা যাই যাই করছে। চাঁদটা মরার আগে ম্লান আর বিমর্ষ মুখে চেয়ে আছে পৃথিবীর দিকে। কয়েকটা বাদুড় ফর ফর বাতাস কেটে উড়ে গেল মাথার উপর দিয়ে। এই রাতের বেলা কোত্থেকে একটা বাজপাখি ডেকে উঠল। কী বিশ্রী আর কর্কশ গলাটা।

শীতটা ফুরিয়ে আসছে। মাঝে মাঝে ঠাণ্ডা হাওয়ার দমক কামড়ে যাচ্ছে গাটা। পায়ের তলায় শিশির ভেজা মাটিটা কেমন মৃদুল কোমল। মাঝে মাঝে সিক্ত ঘাসের শীর্ষ পায়ে পায়ে কী যেন আদর বুলিয়ে দিচ্ছে। সব মিলিয়ে কেমন এক ভালো লাগা জড়িয়ে থাকে সেকান্দরকে ঘিরে। আর যেন অনেক বিস্ময় সহসা আঘাত করেছে ওর দুয়ারে তেমনি করে ও তাকায় পাণ্ডুর চাঁদটার দিকে, শেষ রাতের ফিকে জামায় আবৃত গাছের ঝোঁপগুলোর দিকে। বাকুলিয়ার শেষ রাত যে সুন্দর, এ কথাটা এতদিন কেমন করে অজানা থেকে গেল ওর কাছে। কী এক স্নিগ্ধতার পরশে গাটা ওর জুড়িয়ে যায়। মিষ্টি একটা স্বাদে ভরে যায় মুখটা। এমনি আরো অনেক স্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়েই বুঝি কেটে গেছে জীবনের আটাশটি বছর। চিন চিন করে জেগে ওঠা কোনো ব্যথার মতোই কথাটা মনে এল সেকান্দরের। বাতাসে কেমন থকথকে হয়ে লেগে রয়েছে হুরমতির ফুলেল তেলের গন্ধটা। কী এক উদ্বেগে কাতর ওর মুখটা। কিসের যেন ব্যাকুলতায় দ্রুত, আর এলোমেলো ওর পদক্ষেপ। ওকে ঘিরে শেষ রাতের রহস্য। মনে পড়ল সেকান্দরের এই রাতেই প্রথম প্রহরে দেখেছিল ভক্তির রসে উদ্বেল হৃদয়টা ভাসিয়ে কাঁদছিল মেয়েটি। আর এই শেষ প্রহরের রহস্য মোড়া মেয়েটির বুকে কত দুর্ভাবনার দুরু দুরু কম্পন কে জানে!

হুরমতির খবরে আর মালুর বয়ানে এতটুকু অতিরঞ্জন নেই। কসিররা চলে যাচ্ছে।

ওদের দোচালা ঘরটির সামনে সাদা উঠোনটুকু ফিকে জোছনায়ও কেমন ধবধবে। দু বউ এক ছেলের সংসারে যা কিছু সম্পত্তি উঠোনে নামিয়ে গাঁটরি বাঁধছে কসির। কী-ই বা সম্পত্তি। খান তিনেক কাঁথা, মাটির হাঁড়ি, মাটির বাসনখোরা, একটা এলমিনিয়ামের বাটি, দুটো এনামেলের ছড়া-ওঠা গামলা, পিঁড়ি। কথাগুলোর আলাদা একটা গাটরি করে ওর ভেতর দা কাস্তে আর কুঠারটা

সেঁদিয়ে দেয় কসির। একটা কোরায় হাড়ি পাতিলগুলো ভরে মাছ ধরার কোঁচটা হাতে নেয়, তারপর বউদের ডাকে–চল্। লম্বা ঘোমটা টেনে কাঁদছে বউরা। আঁচলের খুঁটে চোখ মুছছে ঘন ঘন। ভিটির প্রতি মেয়েদেরই বুঝি টান বেশি। নীড় রচনায় হৃদয়ের অবদানটা পুরুষদের চেয়ে ওদেরই বেশি, তাই নীড়ের প্রতি এত মমতা ওদের। কসির ঘর গড়েছে আবার গড়বে। তাই ভাঙতেও বুঝি দ্বিধা নেই ওর। কিন্তু বউরা? তৈরি করা ঘর ফেলে যেতে কলজেটা ওদের ছিঁড়ে যাচ্ছে।

এই খবরদার। ফ্যাঁস ফ্যাঁস করবি তবে চোখের উপর বসিয়ে দেব এই কোঁচ। খেঁকিয়ে ওঠে কসির। ওর হাতের চাপে ঝনঝনিয়ে ওঠে কোঁচের শলা। কাঁথার গাঁটরিটা কাঁধে নিয়ে বলল লেকু, হয়েছে বউদের উপর আর মরদগিরি ফলিয়ে কাম নেই, এগোও তুমি।

সত্যি কী চলে যাচ্ছে কসির? রাত্রির আবরণ নিয়ে সকলের অলক্ষে ফেলু মিঞার বকেয়া খাজনা আর রামদয়ালের ঋণ ফাঁকি দিয়ে? ওকে কেমন করে ঠেকাবে সেকান্দর? ওর কাঁধে হাত রাখল সেকান্দর, বুঝি বলতে চাইল যাসনে ভাই কসির, সুখ দুঃখ আহার অনাহার সবই আমরা সমানভাবে ভাগ করে নেব। ছাড়িসনে বাপ-দাদার ভিটিটা। ঠিক এ কথাগুলো বলার জন্যই তো হুরমতি ঘুম ভাঙিয়ে তুলে এনেছে ওকে। কিন্তু, বলতে পারল না সেকান্দর। কিসের ভরসায় ওকে থেকে যেতে বলবে সেকান্দর।

ফজর আলী যেন একেবারে ছিপি এঁটে দিয়েছে মুখে। মনমরা হয়ে চলেছে। সবার পেছনে। অথচ সেদিন ও-ই-তো পয়লা মনে করিয়ে দিয়েছিল বাপ-দাদার ভিটির কথা। আজ সে-ও বুঝি খুঁজে পায় না কোনো কথা।

ভাড়া-করা নৌকাটা বাঁধা আছে বড় খালে। লেকু আর কসির বোঝাগুলো নামিয়ে রাখল। তারপর কসিরের হাত ধরে বাচ্চা কোলে বড় বউ আর ছোট বউ উঠে গেল। এক পা পাটাতনে আর এক পা কাদায় রেখে কসির বিদায় নিল ওদের কাছ থেকে। সেকান্দরের হাতে হাত রেখে। অকস্মাৎ ডুকরে কেঁদে উঠল ও– মাস্টারসাব মানুষ হয়ে লই, মানুষ হয়ে আবার আসব!

মানুষ হবে কসির? তাই ঠিক। তাই ঠিক। কসির, মানুষ হয়েই ফিরে এস তুমি। পানিতে ভরে গেল সেকান্দরের চোখ।

কলকলিয়ে চলেছে জোয়ারের পানি। জোয়ারের টানে যেন উড়ে চলল নৌকোটা। পাড় থেকে চেয়ে থাকে ওরা, যতক্ষণ না মিলিয়ে যায় নৌকোটা। ছইয়ের বাইরে মাথাটা উঁচিয়ে কসিরও বুঝি জন্মভূমির শেষ ছবিটা দেখে নিচ্ছে, বুক ভরে টানছে

বড় খালের চেনা বাতাস। আর আজন্ম চেনা মানুষের ছায়াগুলোও যখন হারিয়ে যাবে দৃষ্টির বাইরে তখন হয়ত ওদের মুখগুলোই সে ভাসিয়ে তুলবে আপন মনের পটে।

কোথায় যাবে কসির? হয়ত আসামের গহিন অরণ্যে। পূর্ববঙ্গের কত কৃষক সেখানে নীড় বেঁধেছে, ভয়ঙ্কর নিস্তব্ধ অরণ্য অঞ্চলকে মানুষের কাকলিতে মুখর করে তুলেছে। তাদেরই সাথে নতুন করে ঘর বাঁধবে কসির। ওর কুঠারের আঘাতে পায়ে পায়ে পিছু হটবে জঙ্গল। হিংস্র পশুর দেহ খণ্ড বিখণ্ড হবে ওর বর্শাফলকের মুখে। বশ মানবে বিরোধী প্রকৃতি। তারপর সবল দুটি হাতের সঞ্চালনে লতাগুল্মের ঘন আগাছা, ছিন্নকাণ্ড উপরে ফেলবে ও, বের করবে তুলতুলে নরম মাটি। সে মাটিতে ফসল বুনবে। মাটি আর ফসলের সে-ই হবে অধীশ্বর। ইপাব তৈরিঃ আল মোস্তাইন বিল্লাহ

কিন্তু, সেখানেও কী সুখের মুখ দেখবে কসির? আরো কত ফেলু মিঞা আরো কত রামদয়ালের পাওনার হাত কী হন্যে হয়ে পিছু পিছু তাড়া করবে না ওকে?

নাঃ, কসির ফিরবে না। বুঝি অসাবধানেই সেকান্দরের মনের চিন্তাটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

ওরা চমকে উঠল। সত্যিই তো, যারা গেছে তারা ফিরেছে কেউ? কেউ ফেরেনি। ষোল ঘর লোক নিয়ে কেমন জম-জমাট থাকত মাঝি বাড়িটা। আজ মোটে তিন ঘর, তিনটি পরিবার। মৃধা বাড়িটা তো বিরানাই হয়ে গেল। একমাত্র রহমত বুড়ো বুঝি তার চেয়েও বয়সে বড় ভাঙাচোরা গরুর গাড়িটা নিয়ে টিম টিম করছে অতবড় বাড়িটাতে। পরিত্যক্ত ভিটিগুলোতে এখন শুধু আগাছার জঙ্গল।

নাঃ কসির ফিরবে না, ভরা গাঙ্গের কুলকুল জোয়ারেও বুঝি সেই একই প্রতিধ্বনি।

চল ফিরি।

ওরা বসে পড়েছিল। সেকান্দরের ডাক শুনে বুঝি চমকে উঠে শেষ বারের মতো বড়খালের দূরতম বাঁকটির উপর অন্বেষা দৃষ্টি বুলিয়ে আনে। বড় খালের কোলে কী যেন চিরদিনের জন্য বিসর্জন দিয়ে গেল ওরা।

চাঁদটা যে কখন ডুবে গেছে টের পায়নি কেউ। যে ঈষৎ ভেজা হিমটা এতক্ষণ লেগেছিল পায়ের ডগায় সেটা উঠে এসেছে হাঁটু অবধি। একটু পরেই, বুঝি ফর্সা

হয়ে যাবে। এখনকার আকাশটা দেখা না দেখার কেমন এক রহস্য আর দখিন ক্ষেতের বুক চিরে মাটির রাস্তাটা অস্পষ্ট ইশারা।

বইয়ে পড়া, ছোট বেলায় কিছুটা বুঝি চোখেও দেখা সোনার বাংলা সোনার গ্রাম। ভেঙে যাচ্ছে সেই গ্রাম বাংলার গাঁথুনি।

এদিক ওদিক ছিটকে পড়ছে মানুষগুলো। ঘুঘু চড়ছে শূন্য ভিটায়। কে রুখবে, কেমন করে রুখবে এ ভাঙন?

কেমন মুঠো হয়ে আসে সেকান্দরের হাতজোড়া। বুঝি অস্বাভাবিক রকমের শব্দ করেই বেরিয়ে আসে ওর মনের বিক্ষোভটা। হকচকিয়ে তাকিয়ে থাকে বাকুলিয়ার লেকু আর ফজর আলী, কলঙ্কিনী হুরমতি আর মায়ের মার খাওয়া ছেলে মালু : কী হল সেকান্দর মাস্টারের?

১৬-২০

এসো, একটু চা খেয়ে যাও। বাড়ির সীমানায় পা রেখে ওদের ডাকল সেকান্দর। চা খাওয়াটা ওর অনুপানের মতো। বাড়িতে চায়ের পাট নেই। কেবল ঘোর কোনো বর্ষার দিনে অথবা সর্দি জমে মাথাটা যখন টনটন করে তখন আদা তেজপাতার সাথে এক চিমটে চা পাতা সেদ্ধ করে তার সাথে কিছু চিনি লবণ মিশিয়ে চুমুক চুমুক টানে। শরীরটা চাঙ্গা হয়ে ওঠে। মাথা ধরাটা ছেড়ে যায়। আসলে চা খাওয়াটা বাহানা, ওদের সঙ্গটা বুঝি ছাড়তে চায় না সেকান্দর। নির্ঝঞ্ঝাট সবল জীবনটা ওর কেমন ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে। স্থির বাসনা-স্কুল-ক্ষেত-বাড়ি। নির্ধারিত বৃত্তের মাঝে সীমিত জীবন। হঠাৎ সেই বৃত্তের আড়ালটা যেন অপসারিত হয়ে গেছে। ওর অজানতেই কখন বিস্তৃত হয়ে গেছে জীবন আর চিন্তার পরিধিটা। গৎ ধরে চলা আর বাঁধাধরা ভাবনা, সব কিছুই কেমন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। বাকুলিয়ার সকলের সাথে সব কিছুর সাথেই কখন সে জড়িয়ে পড়েছে। কারো বিশ্বাস, কারো অবিশ্বাস, কারো বা ঘৃণা–সব কিছু মিলিয়ে এ জীবনটা কেমন? ইচ্ছে করলেও যেন এর মায়া কাটানো যায় না।

দু হাতের চেটোর মাঝে ধরা গরম এনামেলের বাটিটা একটু বুঝি নড়ে উঠল। নিজের ভেতরেই চমকে ওঠে সেকান্দর। গত রাত অর্থাৎ মাত্র ঘণ্টা পাঁচ ছয় আগে সৈয়দ বাড়ি থেকে ফেরার পথে ঠিক এ কথাগুলোই কী ভাবছিল না সেকান্দর? হয়ত একটু অন্য ভাবে ভাবছিল, অন্য কোনো ঘটনার সাথে মিলিয়ে। তালতলির শ্যামচরণ দত্ত হাইস্কুলের জুনিয়ার মাস্টার আবুল বশর মোহাম্মদ সেকান্দরের কী হল? ও কী ভাবতো কখনো? ভাবলেও কোনোদিন কী বেচাইন হত ও?

চায়ের বাটিটা এক পাশে ফেলে রেখে বেড়ার গায়ে ঢলে পড়েছে মালুর ঘুম ঘুম দেহটা। সেদিকে চোখ পড়ে হঠাৎ চটে গেল সেকন্দর : এই মালু। লেখা পড়া নেই, খালি ডাং ডাং। ঘর বাড়ি ছেড়ে রাত বিরেতে যার তার সাথে ঘুরে বেড়াচ্ছিস? এখনি বখে যেতে শুরু করেছিস, না? দাঁড়া আজ স্কুলের বেতটা নিয়ে আসব, তোর পিঠেই ভাঙতে হবে ওটা। মালুর দিকেই উঠে যাচ্ছিল সেকান্দর। হঠাৎ হুরমতির চোখে চোখ পড়ে পা-টা যেন তুলত পারে না ও। অসাবধানে এমন একটা রূঢ় কথা বলে ফেলল ও? হুরমতির চোখের পাতাগুলো কেমন লাল নীল আর ভারি ভারি। ও কী কেঁদেছে এতক্ষণ? কেমন যেন লজ্জা পেয়ে নিজেই চোখ নামিয়ে নিল সেকান্দর। না, আজ হুরমতিকে এতটা অশ্রদ্ধা করত পারল না ও।

মালুকে শুইয়ে দাও আমার চৌকিটায়, সারারাত ঘুমোয়নি, কতক্ষণ আর ঘুমটাকে ঠেকিয়ে রাখবে। হুরমতিকে উদ্দেশ্য করেই বলল সেকান্দর। স্বাভাবিকের চেয়েও বুঝি নরম ওর স্বরটা।

না গিয়ে কী করবে? দ্যাশে গেরামে কী ভাত মিলে, না কাম মিলে? চা শেষ করে খোরাটা দাওয়ায় রেখে বলল ফজর আলি। এতক্ষণ ধরে এসব কথাই বুঝি তোলপাড় খাচ্ছিল ওর মনে।

আরো যাবে, দেখবেন মাস্টার সাব। ওই মিঞা আর বাবুরা মিলেই খেদাবে। সেকান্দরের দিকে তাকিয়ে লেকু মুখ খুলল এতক্ষণে।

অকস্মাৎ ক্ষেপে গেল সেকান্দর। তর্জনীটা উঁচিয়ে চেঁচিয়ে উঠল : খবরদার লেকু, খবরদার ফজর আলি। যাবার টাবার কথা বলেছ কী এখুনি বের হও আমার বাড়ি থেকে। গেরামটাকে কী তোমরা গোরস্থান বানাবে?

কাঁচু মাচু করে মুখ আর বুক এক করে ওরা। ওরা হয়রান মানে, আজ কী হয়েছে সেকান্দর মাস্টারের?

সেদিন আমার মাথাটা ঠিক ছিল না মাস্টার সাব। আপনি মাফ করে দিন। সেকান্দরের আকস্মিক রাগটাকে গলিয়ে দেবার জন্যই বুঝি পেছনের কোনো কথা পাড়ল লেকু। কুণ্ঠিত নীচুস্বর লেকুর। এমন স্বরে লেকুকে কোনোদিন কথা বলতে শোনেনি কেউ।

ওর কথা আর ওর স্বর, দুটোই যেন রাগ তাড়িয়ে বিস্ময় ফোঁটায় সেকান্দরের মুখে। অনেক চিন্তা করেও বুঝতে পারে না সেকান্দর, মাফ চাইবার মতো এমন কী করেছে লেকু। হঠাৎ মনে পড়ে হেসে দিল ও, বলল, কী যে বল। একটু থেমে বলল আবার, গেরামটা ছাড়বে না তো?

মাস্টারের স্বরটা কেমন যেন কেঁপে কেঁপে বেরিয়ে এল। ওদের বুকে গিয়ে ঢেউয়ের মতো আছড়ে পড়ল।

না। অদ্ভুত এক জোর লেকুর গলায়।

জাহাজের ভাড়াটা আলাদা করে মাটিতে পুঁতে রেখেছিল লেকু। খোঁড়া জায়গাটাকে ঢাকতে গিয়ে সারা ঘরটাই লেপতে হয়েছে আম্বরিকে।

পাহাড় থেকে ফিরে এসেই রওনা দিবে রঙ্গম, এবার একলা নয়, আম্বরিকে সাথে করে। এই তো ঠিক ছিল। কিন্তু, এই একটি মুহূর্তে ওর সব ঠিক বেঠিক হয়ে গেল!

আচ্ছা উঠি। সেলাম দিয়ে উঠে গেল ওরা।

একটু গড়িয়ে নেবার জন্য নিজের চৌকিটায় গা রাখল সেকান্দর। ঘুমিয়ে পড়ল।

কিন্তু বেশিক্ষণ ঘুমুতে পারল না। মায়ের চেঁচামেচি আর হাতের টান খেয়ে ঘুমটা ভেঙে গেল ওর। ঘরের ছায়াটা দাওয়া ছেড়ে উঠোনে নাবতে শুরু করেছে, এত্তেলা দিচ্ছে মা।

হাঁ, স্কুলের সময় পেরিয়ে যাচ্ছে বই কী! তাড়াতাড়ি মালুকে একটা ধাক্কা দিয়ে উঠে গেল সেকান্দর। পুকুরে একটা ডুব দিয়ে এল, নাকে-মুখে দুটো হুঁজে নিল।

খুন হলরে। খুন হলরে। খুন–হঠাৎ চিৎকার ভেসে এল। কান খাড়া করল সেকান্দর। গলাটা চেনা চেনাই মনে হচ্ছে। উত্তর দিক থেকেই ভেসে আসছে চিৎকারটা।

মুখে একটা পান পুরে ছাতাটা টেনে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল সেকান্দর। কত টুকুই বা এগিয়েছে। পেছন থেকে কে যেন গলা ফাটিয়ে ডাকছে–মাস্টার সাব মাস্টার শীগগীর আসেন। পেছন ফিরে দেখল সেকান্দর। ঊর্ধ্ব শ্বাসে দৌড়াচ্ছে ফজর আলী, চিৎকারের সাথে সাথে হাতের ইশারায় থামতে বলছে ওকে।

খুন খারাবিটা কালে ভদ্রে হলেও কাইজা ফ্যাসাদ তো বাকুলিয়ায় নিত্য ব্যাপার। কিন্তু সে সব ঝগড়া বিবাদে সেকান্দর মাস্টারের আবার ডাক পড়েছে কবে! গায়ের জোরে যে যা পারল, বাকিটুকুর জন্য তো রয়েছে মাতব্বর আর পঞ্চায়েত। খিঁচানো মেজাজটা আরো যেন খিঁচিয়ে যায় সেকান্দরের। ওরা বুঝি একটুও রেহাই দেবে না ওকে, স্কুলে যাবার মুখেও না। হাজারো ঝামেলা ঝঞ্ঝাট চাপিয়ে দেবে ওর মাথায়।

মারামারি করেছে তো আমি করব কী? পঞ্চায়েত ফেলে আমার কাছে কেন? ফজর আলীর কথাটা না শুনেই খেঁকিয়ে ওঠে সেকান্দর।

মারামারি কী বলছেন, এ যে খুন!

খুন!

হ্যাঁ, খুনই তো। জানটা তো যায় যায়। কতক্ষণ টিকবে কে জানে! যেন সম্বিৎ পেয়ে পড়ি মরি ছুট দেয় সেকান্দর মাস্টার। গাঁও মুল্লুকে যেমন আরো দশটি বিবাদ সামান্য শুরু থেকে মারাত্মক আকার নেয় তেমনি মামুলি ঘটনাটা রক্তারক্তি

পর্যায়ে পৌঁছেছে। শেষ হয়নি, শেষের জেরটা কোথায় এবং কতদিন চলবে কে জানে।

লেকুর ঘরের পেছনের চালটা চুইয়া পানি পড়েছে গেল বর্ষায়। সেই তখন থেকেই নতুন চাল তুলবার কথাটা ভেবে আসছে ও। মুফতে নয়, নগদ দিয়ে কসিরের চাল দুটো তাই কিনে রেখেছে ও। সেকান্দরের বাড়ি থেকে ওরা আর ঘরে ফেরেনি। এ বাড়ি সে বাড়ি থেকে দু একজনকে ডেকে ওরা দুজনে কসিরের পরিত্যক্ত ঘরের চালগুলো নামাতে লেগে যায়। মাত্র একটা চাল নামিয়েছে এমন সময় রমজান এসে হুংকার ছাড়ে–খবরদার, ও চাল ধরবে না, নেমে এস শীগগীর। খাজনা বাকি রেখে পালিয়ে গেছে কসির। অতএব ওই ঘর মিঞার প্রাপ্য। স্পষ্ট কথাটা জানিয়ে দিয়ে রমজান বুঝি কালু পেয়াদাকে নিয়ে নাবানো চালটা দখল করতে যায়। তখুনি তর্ক। আর তর্ক থেকে হাতাহাতি বেধে গেল লেকুর সাথে। ফজর আলী ছিল চালের উপর, বাকি চালটার বেতের বাঁধনগুলো কেটে কেটে আলগা করছিল। লেকু ছিল নিচে তাই অত লক্ষ করেনি ফজর আলি। হঠাৎ চিৎকার শুনে নিচের দিকে তাকিয়ে দেখল ফজর আলী, উন্মাদের মতো দা চালাচ্ছে রমজান, একটার পর একটা কোপ বসিয়ে চলেছে লেকুর গায়ে। জলদি চাল থেকে নেমে আসে ফজর আলী, পেছন থেকে পা-টা পটকান দিয়ে মাটিতে ফেলে দেয় রমজানকে। নইলে তো টুকরো টুকরো হয়ে যেত লেকু।

ঘটনার জায়গায় এসে দেখল সেকান্দর এতটুকু অতিরঞ্জন নেই ফজর আলির বর্ণনায়। দার কোপে কোপে জর্জর লেকুর পেশীবহুল শরীরটা। উরুর উপরকার ক্ষতটাই সবচেয়ে বড়। এক দলা গোশত ঝুলে পড়ে ক্ষতটা একটি বীভৎস রূপ নিয়েছে, সাদা হাড় পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। এখনো রক্ত পড়ছে গল গল করে। ঘাড়ে কাঁধে পিঠে বাহুতে শুধু দার কোপ, এতটুকু জায়গা যেন খালি রাখেনি রমজান। ঘা-গুলোর মুখে রক্ত এখন দলা পাকিয়ে জমে আছে চিটে গুড়ের মতো। অবচেতন লেকু যেন ডুবে আছে রক্তে, মাটিটাও রক্তে জবজব।

একবারের বেশি তাকাতে পারল না সেকান্দর। মানুষকে মানুষ এমন করে আহত করতে পারে, দলা দলা মাংস এমন করে কেটে কেটে তুলে নিতে পারে আর একটি মানুষের দেহ থেকে? এ কী বর্বর প্রতিশোধ নিল রমজান! ওর গরুটাকে যেমন করে কাঁটা ফুঁড়ে কুঁড়ে জর্জর করে ছিল লেকু, এ তো তার চেয়েও নৃশংস, তার চেয়ে বীভৎস। সারা গায়ে দায়ের কোপে কোপে কী বন্যক্রূরতা আর বর্বরতার ভাষা রেখে গেছে রমজান।

সবাই বে-দিশা, সবাই লেকুকে ঘিরে, কিন্তু ওর ধুক ধুক হৃদয়ের স্পন্দনটা যে কোনো সময় থেমে যেতে পারে সেদিকে যেন কারও খেয়াল নেই। ইপাব তৈরিঃ আল মোস্তাইন বিল্লাহ

এই যাও। রহমত মৃধার গাড়িটা নিয়ে আস। জলদি কর। ফজর আলির দিকে তাকিয়ে আদেশ করল সেকান্দর। মাস্টারের এ মূর্তি অন্য মূর্তি, এ মূর্তিকে আমল না দিয়ে চলে না। ফজর আলি ছুটে যায় বাড়ির দিকে।

এই মালু তুই, দৌড় তো। গগন ডাক্তারকে নিয়ে আয়। এই ছেপ ফেললাম এটা শুকোতে না শুকোতেই চলে আসা চাই কিন্তু। মালু ছোটে তালতলির পথে।

ক্রোধে গোটা শরীরটা কাঁপছে সেকান্দরের : এ কী মগের মুল্লুক নাকি? ইংরেজের আইন কানুন কী নেই দেশে? থানা পুলিশ উঠে গেছে দেশ থেকে? চিৎকার শুনে যে যার কাজ ফেলে ছুটে এসেছে, বড় রকমের ভিড় জমে গেছে। সেই ভিড়টার উদ্দেশ্যেই যেন চেঁচিয়ে চলে সেকান্দর মাস্টার। কয়টা হার্মাদ মাতিয়েছে দেশের মধ্যে। আজ এর ছাগল চুরি, কাল ওর ক্ষেতের ফসল চুরি, মারামারি অশান্তি লাগিয়েই রেখেছে। এই হার্মাদ শয়তানগুলোকে শায়েস্তা করতে হবে, ওদের হাত-পা ভেঙে দিতে হবে। অনর্গল চেঁচিয়ে চলেছে সেকান্দর।

এতক্ষণে বুঝি খবরটা আম্বরির কানে গেছে। আলুথালু বেশে দৌড়ে আসছে ও। পেছনে হুরমতি, কিছুতেই সামলে রাখতে পারছে না আম্বরিকে, রক্তমাখা জ্ঞানহীন মানুষটাকে দেখেই ডুকরে কেঁদে ওঠে ও। নিথর দেহটার উপর আছড়ে পড়ে।

আহু হুরমতি, থামাতো ওকে, নিয়ে যা এখান থেকে। বলল সেকান্দর। কিন্তু বললে কী হবে, আম্বরির গায়ে এখন দুনিয়ার জোর। এই হট হট। ছুবিনা ওকে এখন। খবরদার। নিজেই তেড়ে আসে সেকান্দর। ওর ধমকে এই শোকের মাঝেও বুঝি হকচকিয়ে যায় আম্বরি। পলকের জন্য কান্নাটা ওর থেমে যায়। হুরমতি টেনে নিয়ে যায় ওকে।

বেশিদূর নিতে পারে না। ওর হাতের বাঁধন থেকে ছিটকে পড়ে মাটিতে গড়াগড়ি খায় আম্বরি। মাথা আছড়ায় মাটিতে। টেনে টেনে বিলাপ করে, ওরে আল্লারে, আমার কপালটা পুড়ল রে। এরি মাঝে আবার বিলাপ ছেড়ে খনখনিয়ে উঠছে ওর অভিসম্পাতের জিহ্বা, কোনো হার্মাদ, কোনো কুত্তার বাচ্চা, কোন্ শুয়োরের জন্ম শুয়র আমার সর্বনাশ করল রে। আল্লার কহর পড়ুক, নির্বংশ হোক সেই বেজন্মা।

কহর থামিয়ে আবার ডুকরে কেঁদে ওঠে আম্বরি। মাথার চুল ছেড়ে, কাপড়ের আঁচল টেনে টেনে ছেঁড়ে। হুরমতি কোলে নিতে চেষ্টা করে ওকে। কামড়ে দেয় হুরমতির হাত! আবার গড়াগড়ি খায় মাটিতে। তারপর অভিশাপের সম্ভাব্য পরিণতিগুলোও সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে বয়ান করে চলে আম্বরি : হাত ভাঙবে, পা ভাঙবে, হাঁটু ভাঙবে। লুলো হবে, অন্ধ হবে, খোদার আকাশ থেকে ঠাডা পড়বে মাথায়, সারা গোষ্ঠী জাহান্নামে যাবে।

এই চুপ। খালি কাঁদবি নাকি তুই? কান্না ছাড়া আর কী পারিস? আম্বরির সামনে এসে খেঁকিয়ে ওঠে সেকান্দর। তারপর হুরমতির দিকে তাকিয়ে বলল ও, এই হুরমতি নিয়ে যা ওকে বাড়িতে। ওর ধমকের চোটে ভিড়টাও বুঝি পিছু হটে যায় দুপা। ক্ষিপ্ত ক্রুদ্ধ সেকান্দর মাস্টার। নিজেকেই যেন ও আর সামলে রাখতে পারছে না। মিনিমুখো মুচকি শয়তান, আড়ালে বলত রমজান। ভালো মানুষ শান্ত সরল মাস্টার সাব, বলত বাকুলিয়ার মানুষ। সেই শান্ত মানুষটির এই অগ্নিমূর্তির দিকে বিস্ময় মেলে চেয়ে থাকে বাকুলিয়ার মানুষ।

গ্রামের কোথাও দাঙ্গা-হাঙ্গামা মারপিট, এক কথায় ভয়ংকর কিছু ঘটলেই মিঞা বাড়ির কর্তারা আসেন অকুস্থলে। ওটা ওদের প্রজা হিতৈষণার ঐতিহ্য। ফেলু মিঞাও এল। শুনলো দেখল। বলল : বড় আফসোস, এমন নাহক কাণ্ড ঘটে গেল। যাক, ডাক্তার ডাক। টাকা পয়সা যা লাগে নিও আমার কাছ থেকে। আর রমজানটা বাড়াবাড়ি রকমের গোঁয়ার বই কী? ওকে শাসন করে দেব আমি। তোমরাও রাতে এস আমার কাচারিতে।

রহমত গাড়িওলাকে নিয়ে ফিরে এসেছে ফজর আলি। ফেলু মিঞার শেষের কথাগুলো ওর কানে যায়। ফস করে বলে ও, বিচারের জন্য ফৌজদারিই আছে, সেখানেই দেখব আমরা।

গ্রামের মেল আছে, জমাত আছে। ও সব ছেড়ে ফৌজদারি কেন? শান্ত ভাবেই বলল ফেলু মিঞা।

হয়েছে হয়েছে। জমাত পঞ্চায়েৎ যে কী বিচার করে সে আমাদের দেখা আছে। সেকান্দরের কর্কশ রুক্ষ স্বরে ফেলু মিঞাও বুঝি চমকে ওঠে। তবু মাথাটা ঠাণ্ডা রাখে ফেলু মিঞা, বলে তা হাজার দোষ আছে জমাতের তা বলে কী গ্রামের কাইজা লয়ে পুলিশ ডাকবে, কোর্টে যাবে?

যাবোই তো ফেলু মিঞার চোখে চোখ রেখেই বলে সেকান্দর। ফেলু মিঞার নীল রক্তটা অকস্মাৎ সমুদ্র ঘূর্ণির মতো কয়েকটা পাক খেয়ে গেল। গর্জে উঠল

মিঞার ব্যাটা : মেলের বিচার, মজলিসের বিচার, বিচার নয়? যাও তবে ফৌজদারিতে, দেখি কী বিচার পাও! এ হুমকিরও জবাব আছে। জবাব দিতে যাচ্ছিল সেকান্দর, কিন্তু থেমে যেতে হয়। গগন ডাক্তার এসে গেছে। পর পর দুটো সুঁই ফুটিয়ে দিল গগন ডাক্তার। ওষুধ দিয়ে পিঠ আর উরুর বড় দুটো ঘা ধুয়ে ব্যান্ডেজ করে দিল। বলল, মারাত্মক জখম, নিয়ে যাও শহরের হাসপাতালে।

ওরা ধরাধরি করে লেকুকে তুলে নিল গরুর গাড়িতে। ফজর আলিকে গাড়ির সাথে রওনা করে দিয়ে সেকান্দর চলে এল বাড়িতে। বাক্স খুলে তুলে নিল কিছু টাকা। দ্রুত পা চালিয়ে মন্থর গরুর গাড়ির নাগাল ধরল। ফেলু মিঞার চোখের সুমুখ দিয়েই, ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেল গাড়িটা। এত বড় স্পর্ধা? যাকে কখনো দেখেনি সেই দাদুর জামানার কথাটা মনে পড়ল ফেলু মিঞার। শুধু বাকুলিয়া কেন, দশ-বিশ গ্রামে মিঞার চোখে চোখ রেখেছে কেউ কোনোদিন? মিঞার সুমুখে কথা বলত তারা মুখ নীচু করে, হুকুম তামিল করত নিঃশব্দে।

ফেলু মিঞার চোখ ঠিকরে বেরিয়ে এল আগুনের ফুলকি। বিচারের আশ্বাস দিল, তবু এই উদ্ধত অবাধ্যতা? কেন, হক বিচার কী করত না ফেলু মিঞা? নাঃ ছোট লোককে মোটেও আসকারা দিতে নেই। বাপদাদার অভিজ্ঞতার সেই শোনা কথাটাই দাঁতে দাঁত চেপে উচ্চারণ করল ফেলু মিঞা।

হঠাৎ কী যেন মনে পড়ল ফেলু মিঞার। সন্দিগ্ধ দৃষ্টিটা এদিক ওদিক বুলিয়ে আনল একবার। তারপর দ্রুত পা চালাল তার কাচারির দিকে। আর ওর পিছে পিছে ভেসে চলে আম্বরির অভিসম্পাতগুলো : এত হার্মাদি সইবে না খোদা। খোদা জ্যান্ত কবরে নিবে তোকে। খোদার ঠাডা পড়বে, পুত মরবে ঝি মরবে, সর্বস্বান্ত হবি। নিজের বিষ্ঠা নিজে খাবি। অভিসম্পাতগুলো যে রমজানের উদ্দেশে সেটা বুঝি বলার প্রয়োজন করে না। নিরক্ষর কিষাণীর অশ্লীল মুখরতায় এত উত্তেজনার মাঝেও না হেসে পারে না ফেলু মিঞা। এমনিই ওদের স্বভাব, যেন মুখটা খারাপ করলেই সব শোধ নিয়ে নেওয়া হল। কিন্তু মুহূর্তও স্থায়ী থাকে না তার মুখের হাসিটা। কেন যেন মনে হল ফেলু মিঞার, আম্বরির ওই অভিসম্পাতগুলো তারই উদ্দেশে ব্যথিত মনের বদ দোয়া, ফলে যায় সেই বদ দোয়া। এতে যে কোনো সন্দেহ নেই ফেলু মিঞার! বৌ হালিমার সেই অভিসম্পাতটাও মনে পড়ল। কুষ্ঠ হবে, কুষ্ঠ হবে ওই হাতে। খোদার কহর পড়বে। কী এক ভয়ে গায়ের লোমকূপগুলো তার দাঁড়িয়ে যায় আর সেই ভয়টাকে এড়াবার জন্যই আরো জোরে পা চালায় ফেলু মিঞা।

কাচারিতে উঠে বুঝি বেকুব বনে যায় ফেলু মিঞা। কোত্থেকে ছুটে এসে ধড়াস করে তার পায়ের উপর পড়ে যায় রমজান। দু হাতে জড়িয়ে থাকে মুনিবের পা জোড়া। সেই অবস্থাতেই বলে চলে : আপনি মিঞা। আপনি মুনিব। আপনি রিজিকের মালিক। চাবুক মারতে হয় আপনার হাতেই মারবেন এই অধমের পিঠ। কিন্তু, হুজুর ওই ছোট লোক কুত্তার বাচ্চাগুলোর সুমুখে নাজেহাল করবেন না। দোহাই আপনার।

কোনো রকমে পা জোড়া ছাড়িয়ে নেয় ফেলু মিঞা, বলে, ব্যাটা চাষা, তোরে কী খুনাখুনি করতে বলেছিলাম? এতটুকু হয়ে যায় রমজান ফেলু মিঞার ধমকে। ফেলু মিঞার যদি ন্যায়বিচারের রোখ চেপে বসে তবে সর্বনাশের কিছু কী বাকি থাকবে?

চাষার পুত চাষা, শোন। ওকে শুনতে বলে নিজের জায়গাটিতে এসে বসে ফেলু মিঞা। রমজান কাছে এসে হাতজোড় দাঁড়িয়ে থাকে। জামার খুটটা ধরে হ্যাঁচকা টানে পাশে বসিয়ে দেয় ফেলু মিঞা, বলে, শীগগীর যা শহরে। গত মাসের পয়লা কী দোসরা তারিখ দিয়ে মামলা দায়ের করবি কসিরের বিরুদ্ধে। টাকা নিয়ে যা। যা লাগে তাই খরচ করবি। আর...হুঁ, আর একটা মামলা ঠুকে দিবি চুরির। ট্রেসপাস বুঝিস? অন্যের জায়গায় অনধিকার প্রবেশ করেছে লেকু... হা শোন। এদিক ওদিক তাকায় ফেলু মিঞা। নিশ্চিত হয়ে নেয় কেউ নেই ধারে কাছে। তার পর মুখটা রমজানের কানের কাছে এনে ফিস ফিস করে বাতলিয়ে দেয় বুদ্ধিটা।

মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে যায় রমজানের মুখের দুশ্চিন্তার কালি। খুশির চোটে বুঝি লাফিয়ে উঠবে ও। কুতকুতে চোখের মণিগুলো সাপের জিবের মতো লিকলিকিয়ে বুঝি বেরিয়ে আসতে চায় কোটর ছেড়ে। ঠোঁটের কোণে কৃতজ্ঞতা স্বস্তি আর নেমকহালালির একটা বিচিত্র হাসি অনেকক্ষণ ধরে রাখে রমজান।

সাধে কী আর সে রমজান–মালিও না, সারংও না, একেবারে চাষার পুত চাষা; আর ফেলু মিঞা, যাকে বলে মিঞার ব্যাটা মিঞা, তার বুদ্ধির সাথে আঁটবে এমন মাথা এই পরগনায় আছে কয়টা?

টাকা নিয়ে রমজান দৌড় মারে মেঠো পথে। কোনাকুনি আলের পথে সেকান্দর মাস্টারের আগেই সে পৌঁছে যাবে শহরে, আগেই যে ওর পৌঁছানো দরকার।

১৭.

বাকুলিয়ার ছোট্ট ছেলে মালু। তালতলির মেলাটা কত কী দিয়ে গেল ওকে! গান সুর আর কথা দিয়ে যেন ভরে দিয়ে গেল ওর ছোট্ট বুকটা। কিষ্কিন্ধ্যার সেই বীর পুরুষটি যে চমক লাগিয়েছিল ওর মনে, সেটা প্রথম দুটো রাতের বেশি স্থায়ী হয় না। পরের চমকটা দিয়ে যায় গণি বয়াতি। সে চমক কাটে না, কাটবার নয়। দিনে দিনে সে চমকের ঘোরে মালু যেন কত কিছু খুঁজে পাচ্ছে, যা ওর ছোট্ট মাথার বুদ্ধি দিয়েও ধরতে পারে না, ছোট্ট মনটা দিয়ে বুঝতেও পারে না।

কত কিসসা কত গান গণি বয়াতির। আর ঢং কী শুধু একটি? কত ঢংয়ে কত সুরে কত রকমের নাচে ভাবে বলা কথা আর গাওয়া গান। শুধু কী গণি বয়াতি? সুলতানপুরের মধু গায়েন, উদবাজপুরের গফুর কবিয়াল, চাটখিলের রতন বড়ুয়া। ওরা যেন এ দুনিয়ার মানুষ নয়, জিনপরীর দেশের মানুষ। ফেরেশতাদের সাথেও নিশ্চয় ভাব আছে ওদের। সেই ফেরেশতাদের কাছেই বুঝি জাদু শিখেছে ওরা।

জাদু না জানলে অমন করে মাতিয়ে যেতে পারত তালতলির মেলাটা? আর মালুকে তো সে জাদু একেবারেই বশ করেছে। সেই নেচে নেচে কোমর দুলিয়ে দুলিয়ে গাওয়া, সেই স্বর, সেই সুর, সেই মুখ; সব সময় ওরা যেন ভাসছে মালুর চোখের সুমুখে। আর ওদের সুরটা বেজে চলেছে মনের ভেতর। ঘুমের মাঝেও ওদেরই দেখছে মালু। এই তো, এটাকেই তো বলে জাদু করা। ওদের ভেতর জাদু আছে, কথাটা প্রথমে শুনেছিল ভটাচায্যিদের ছেলে মাখনের কাছে। তারপর নিজের চোখেই তো দেখেছে মালু, একটা নয় দুটো নয়, রীতিমতো গোছা গোছা তাবিজ ওদের বাজুতে বাঁধা। কী যে সাধ জাগে মালুর, এমন একটা তাবিজ কী সংগ্রহ করতে পারে না ও?

গানের মতো করে গাওয়া সেই আরবী ফার্সি বয়াতগুলোকে রোজ সকালেই আম্মার মুখে শুনে আসছে মালু। তা ছাড়া রাখালের গান, বিয়ের সময় নেকো সুরে গাওয়া মেয়েদের গান, এ সব তো হামেশাই শুনছে। কিন্তু তালতলির মেলার বয়াতিদের গানের সাথে তার যেন কোনো তুলনাই হয় না। তার জাত, তার শব্দ, তার টান সবই যে আলাদা।

ওদের ঢংটা নকল করে মালু। ওদের গানগুলো গায়, যখন লোক থাকে ধারে পাশে তখন মনে মনে। যখন থাকে না কেউ তখন দিব্যি গলা ছেড়ে। আর সে কী ফুর্তি, সে কী মজা ওর! সকালের ওই মক্তব, রাবুর ফরমাশ সব ফেলে দিয়ে শুধু ওর গান গাইতে ইচ্ছে করে। আর ইচ্ছে করে ওদের মতো নেচে নেচে ঘুরে ঘুরে

অনেক লোকের সুমুখে গাইবে সে। আহা, ওদের মতো করে কবে গাইতে পারবে মালু?

এমন সব মানুষ আছে দুনিয়াতে যারা দিনভর শুধু গান করে? শুধু গান আর গান? সে গান গেয়ে খুশির বান ডেকে দেয় মানুষের মনে? হাসির সুড়সুড়ি জাগিয়ে পাগল করে তোলে হাজার হাজার মানুষকে? কাঁদায়? হ্যাঁ সে তো নিজেই দেখল, রতন বড়ুয়ার গান শুনে অতগুলো মানুষ ফ্যাচ ফ্যাচ করে কাঁদল। এই মানুষগুলোর খবর এতদিন জানত না মালু। ভাবতেও মনটা খারাপ হয়ে যায় মালুর।

কত দূর-দূরান্তর থেকে এসেছিল ওরা। তারও দূরে, তার চেয়েও অনেক দূরে নিশ্চয় দুনিয়া রয়েছে, মানুষ রয়েছে। সেই দুনিয়ার মানুষগুলো কেমন কে জানে? সেই অজানা দুনিয়ার অচেনা মানুষগুলোর কথা ভাবতে ভাবতে মালু যেন অনেক দূর চলে যায়।

হঠাৎ মনে হল মালুর, তালতলি আর তালতলির ওপারে তামাম দুনিয়াটাই গানে ভরা। গান নেই শুধু বাকুলিয়ায়। আব্বার দরুদ, মিঞা মসজিদের আজান? ধ্যৎ, সে কী গান? তালতলির স্কুলের ছেলেরাও গান করে। মেয়েরাও। রানুদি তো কী একটা যন্ত্র বাজায় প্যাঁপু করে। সেই যন্ত্রটার সাথে গানের যে কী সম্পর্ক এতদিনেও বুঝতে পারল না মালু। নইলে নিশ্চিয়ই তার অন্ধিসন্ধিগুলো জেনে নিত রানুদির কাছ থেকে।

রানুদির প্রসঙ্গে বড় আপা আর রাবু আপার কথা মনে পড়ল মালুর। গান করে না কেন ওরা? এত লোক গেল মেলায়, তালতলিটা তো ভেঙেই পড়ল, অথচ আপারা গেল না। একদিন বলেই ফেলেছিল মালু। বলে কী ধমকটাই না খেয়েছিল বড় আপার কাছে। কিন্তু রাবু আপা বড় ভালো। খুব ভালো। এতোগুলো রাত যে তালতলির মেলায় কাটাল মালু, সে তো রাবু আপার বরাতেই। ইপাব তৈরিঃ আল মোস্তাইন বিল্লাহ

গুন্ গুন্ করে মালু গণি বয়াতির মুখে শোনা গানের কলি। গলা ছেড়ে গাইবার উপায় নেই। শুনবে সবাই। আর শুনলে রক্ষে আছে? সেদিন তো অল্পের উপর দিয়েই বেঁচে গেছে মালু। দুপুর বেলায় কোরান পড়তে লাগিয়ে দিয়েছিলেন আব্বাজান। সম্প্রতি শুরু হয়েছে উৎপাতটা। মুনশীজীর উদ্দেশ্য ছেলেকে কেরাত শেখাবেন। কেরাত শেখাতে শেখাতে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন মুন্শীজী। মালুও গলাটাকে খাট করতে করতে এক সময় চুপ মেরে যায়। ওর মনের কোণে লুকিয়ে

থাকা সুরগুলো গুটি গুটি বেরিয়ে আসে। মালুকে ঘিরে সুরগুলো যেন নাচতে থাকে। মনে মনে গাইতে থাকে মালু। মনে মনে গাওয়া গানটা কখন যে জিবের ডগায় এসে ধ্বনি তুলল টের পায়নি ও, শুধু বুঝলো একটি উর্দু কিতাব ওর কানের পাশ দিয়ে সাঁ করে চলে গেল। ছিটকে পড়ল অদূরে। মুন্‌শীজীর হাতখানা ওর কান অবধি পৌঁছবার আগেই তিন লাফে অনেক দূরে চলে এসেছিল মালু।

দেখেছিস বড় আপা, মালু আমাদের কেমন সেয়ানা হয়ে উঠেছে। বাইরে তার কত কাজ আজকাল। মুচকি মুচকি হাসে আর বলে রাবু।

লজ্জায় এতটুকু হয়ে আসে মালু। গানের সাথে সাথে কোত্থেকে লজ্জা এসেও যেন ভর করছে ওর উপর। এই প্রথম লজ্জার সাথে পরিচয় হল মালুর।

রাবুর কথাটা অনেকক্ষণ ঘুর ঘুর করে ওর মনের ভেতর। কেমন যেন অন্য রকম মনে হচ্ছে মালুর। মধুর চেয়েও মিষ্টি রাবু আপার কথা, রাবু আপার শাসনটাও। আদরটাও। আর কী সুন্দর চাপা ফুলের গন্ধঘেরা রানুদি। সেই রাবু, সেই রানু, ওদের চেয়েও মিষ্টি মনে হয় গণি বয়াতির গান। স্পষ্ট বুঝতে পারছে মালু, ওদের কথা শুনে, ওদের ফরমাশ খেটে আগের মতো মনটা ওর খুশিতে নেচে উঠে না।

কী বিপাকেই না পড়ল মালু। মধু গায়েনের বধুয়ার সুরটি মনে মনে ভাজতে গিয়েও মুখটা ওর লাল হয়ে ওঠে। কান যেন গরম হয়ে আসে। ও ছুটে যায় সৈয়দদের সেই মজা দীঘির পাড়ে। সেখানে চারিদিকে শুধু ধান ক্ষেত। লোকজন থাকে না ধারে কাছে। গলা ছেড়ে গান ধরে মালু। ঘরে ফিরেও লজ্জাটা ওর থেকে যায়। ওর মনে হয় কেমন যেন অন্যায় করছে ও, ধরা পড়লে কী যে শাস্তি হবে কে জানে! আপাদের কাজের ছুঁতো বের করে মক্তব ফাঁকি দেওয়া, একটা বাহানা খুঁজে সন্ধ্যায় মাস্টার সাহেবের পড়াটা ফাঁকি দেওয়া, এ যেন তেমনি কোনো অন্যায়, শাস্তি যার ভীষণ। তাই রাবুর সুমুখেও কেমন এক লজ্জায় এতটুকু হয়ে থাকে মালু।

ইস শরমে যে মরে যাস। শুধু বলেই কী ক্ষ্যান্ত হয় রাবু? মালুর থুতনিটা টিপে দেয়। তারপর যেন আকাশ থেকে পড়েছে তেমন করে আবার বলে : ও মা। এ যে ডেং ডেংয়িয়ে বেড়ে উঠেছিস রে! আমাকেও তো ধরে ফেললি!

রাবু আপাটা যে কী! দেখছে লজ্জায় মরে যাচ্ছে মালু, তবু ওকে কাছে টেনে ওর মাথার সাথে নিজের মাথাটা মিলিয়ে রীতিমতো মাপ-জোখ করতে লেগে যায়। না, এখনো আমি আধা ইঞ্চি লম্বা তোর থেকে। ছাড়া পেয়ে যেন বাঁচল মালু।

কিন্তু, রাবু আপার হাত থেকে কী বাঁচার উপায় আছে মালুর? সেদিন তো একটা কাণ্ডই করে বসল রাবু। বলা নেই কওয়া নেই দুটো নতুন লুঙ্গি ওর হাতে দিয়ে বলল : সেয়ানা হয়েছিস, হাফপ্যান্ট পরতে লজ্জা করে না তোর? নে পর এগুলো। কথা শেষ করেও হাসি থামায় না রাবু। মুখ টিপে টিপে হেসেই চলে। কেন যে এত হাসে রাবু আপা! ছুটে পালাতে চেয়েছিল মালু। রাবুর সুমুখে সে সাহসটাও খুঁজে পায়নি ও। সত্যিই তো, কেমন লকলকিয়ে বেড়ে উঠেছে ও। হাফপ্যান্টগুলো কেবলই ছোট হয়ে যাচ্ছে। গানের লজ্জা, বড় হওয়ার লজ্জা, দুয়ে মিলে কেমন যেন লাগে মালুর। ঠিক ঠিক ধরতে পারে না ও, আঁচও করতে পারে না ব্যাপারটা। শুধু মনে হয় আশেপাশের মানুষ, এই গোটা বাকুলিয়া আর সৈয়দ বাড়ির আপারা, ওদের কাছ থেকে কেমন আলাদা হয়ে যাচ্ছে ও।

বড় হওয়াটা যে এত মুশকিলের, এত লজ্জার মালু সেটা জানত না। অথচ মেজো ভাই যখন আসত শহর থেকে, মেজো ভাইকে দেখে ওর বড় হওয়ার সাধটা কী তীব্র ভাবেই না জাগত। কিন্তু এখন যেন আফসোস হয় ওর, যেন পারলে বড় হওয়াটা এখানেই বন্ধ করে দিত ও।

মায়ের অভিসম্পাতেও এই বড় হওয়া বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। কথায় কথায় শুধু বড় হওয়ার গঞ্জনা। দামড়ার মতো বেড়ে উঠছে মালু। দামড়ার মতোই নাকি গুঁতগুঁতিয়ে চলে ও। দেখতে দেখতে কেমন শাল্টি গাবুর হয়ে চলেছে অথচ লেখাপড়ায় অষ্টরম্ভা। মায়ের কথা সেই লাল-কালো পিঁপড়েগুলোর মতোই এসে কামড়ে ধরে মালুকে। তবু যেন সহ্য হয়, রাবু আপার মতো লজ্জা দেয় না মায়ের এই গঞ্জনা। কিন্তু ভেঙে গেল মালুর লজ্জা, ভেঙে দিল রাসু আর মেজো ভাই।

রাসুদের বাড়ির পেছনের সেই ডোবা মতো পুকুরটা। বড় নির্জন। রাসুদের ঘর থেকেও বেশ দূরে। একেবারে পশ্চিমের পাড়টায় বসে গুন গুন করে মালু। একটু বাদেই রাসু এসে পড়বে, ও জানে।

.

ও তুই বুঝি বয়াতি হয়েছিস? একেবারে কানের কাছেই রাসুর স্বরটা শুনতে পায় মালু। কেমন একটা নাকসিঁটকানো ভাব রাসুর। অদম্য একটা ইচ্ছে জাগে মালুর একমণি একটা ঘুষি বসিয়ে দিক ওর থুতনিতে। নাক সিঁটকালে কী হবে, রঙ্গমিবুয়ার গান শুনে কেঁদে দেয় রাসু। কে না শুনেছে রঙ্গমিবুয়ার গান! রাসুও শুনেছে বই কী। তবু মালুর কণ্ঠে এ গান কলজেটাকে পানি করে চোখের ধারায় বইয়ে দেয়।

রঙ্গমিবুয়ার কাছে বাংলার বধূর সকরুণ মিনতি : বিবাগি খসমটাকে যেন পাঠিয়ে দেয়। হিসালামতে। রঙ্গমিবুয়ার তো ঘর আছে, বেটা আছে, বেটি আছে। তার দিলে কী রহম হবে না? পথ চেয়ে চেয়ে যে বধূর চোখে ছানি পড়ে গেল। গাছের ফল ঝরে গেল, আমের বোল থেকে আম এল। তবু তো কসম তার ফিরে আসে না। রঙ্গমিবুয়া জাদুর বাহুটা এক দিনের জন্যও কী মুক্ত করতে পারে না?...

মালুর কণ্ঠে সুর তো নয়, এ যে সেই প্রতীক্ষারতা বধূর বিলাপ, বুক ভাঙা কান্না। আর সেই সাথে রঙ্গম রঙ্গিলাকে কত ধিক্কার।

রঙ্গম রঙ্গিলারে...
রঙ্গম রঙ্গিলার সনে
রঙ্গে দিছ মন,
সেইমত দেওয়ানা হইয়া
রইল কতজনরে...

চুপচাপ বয়ে যায় সময়। বিরহিণীর দীর্ঘশ্বাসটা বুঝি ওদের ঘিরে থাকে। সেই কল্পিত হতভাগিনীর দুঃখের সায়রে ওরাও ডুবে যায়। মন যখন কচি, বুদ্ধিটা যখন স্বার্থবোধে অপরিণত, হাত জোড়া নরম–বিপন্নের সাহায্য তো দূরের কথা, নিজের জন্যও বুঝি বিশেষ কাজে আসে না সে হাত; অথচ বুকে আকুলতা জাগে অন্যের দুঃখে, ঠিক সেই বয়স ওদের। রঙ্গমিবুয়ার ফাঁদে-পড়া খসমের শোকে অসহায় আবাগী বধূর ব্যথাভরা বিলাপে ওদের ছোট্ট দুখানি বুক ভার হয়ে আসে।

হঠাৎ আঁচলটা মাথায় টেনে বাড়ির দিকে ছুট দেয় রাসু। রান্না ঘর থেকে বুঝি ওর মায়ের আওয়াজটা ভেসে আসছে। নির্নিমিষ চেয়ে থাকে মালু ওর ছুটে যাওয়া ছায়াটির দিকে। কেবলি দূরে সরে যাচ্ছে রাসু।

সেদিন যে সারা সকাল বেলাটা ওদের ঘরে ঘুমিয়ে কাটাল, কই রাসু তো একবার এসে দেখল না ওকে! আর আজকাল তো ওকে চুপিসারে ডেকে-ডুকে আনতে হয়।

কিন্তু গানের শরমটা একেবারেই ভেঙে দিয়েছে রাসু। এখন আর ঠাট্টাও করে না ও বরং নিজ থেকেই সেধে শুনতে চায়। আর কেমন মিষ্টি করে বলে : মালু বয়াতি। মালু বয়াতি, গান শোনাও না! ওর মুখের বয়াতি ডাকটি ভালো লাগে মালুর।

মেজো ভাই এসেছে, মেজো ভাই এসেছে। যেন মহাধুম পড়ে গেল সৈয়দ বাড়িতে। ইস প্রায় বছরটা কাবার করে এল মেজো ভাই! মালু তো রীতিমতো ছটফটিয়ে মরছে সেই থেকে, কবে আসবে মেজো ভাই।

কী মজারই না কাটল রাত্তিরটা। মালুর জন্য সুন্দর একটা সার্ট এনেছে মেজো ভাই, আর বিস্কুট। সার্টটা তক্ষুণি পরে ফেলল মালু। তারপর রাত ভর চলল কত কিস্সা কত গল্প। রাবু-আরিফারও তো দেবার খবর কম নেই। সারা বছরের খবর সবই যেন এক নিশ্বাসেই শোনাতে হবে মেজো ভাইকে।

কিন্তু এমন মজার রাতটা শেষ হতে না হতেই শুরু হয়ে গেল মেজো ভাইর উৎপাত। সকালে উঠেই, শুধু মালুর নয়, রাবু-আরিফা, সকলের হাতের লেখা আর পড়া পরীক্ষা করতে লেগে গেল মেজো ভাই। ওইতো একটা দোষ মেজো ভাইর, যে দোষ কোনোদিন শোধরাবে বলে মনে হয় না মালুর।

কিন্তু পড়া পরীক্ষার পর যে কথাটা বলল মেজো ভাই সে ঠিক মেজো ভাইর মতোই। বলল–চল তোকে স্কুলে ভর্তি করে দিয়ে আসি। কী রকম ধারি হয়ে গেছিস খেয়াল আছে? মেজো ভাইর কথাতেও সেই বড় হওয়ার ধিক্কার। কিন্তু মেজো ভাইর ধিক্কার তো? গায়ে লাগে না মালুর। নেচে ওঠে মালু। এত আনন্দ কোথায় ধরে রাখবে ও? ওই স্কুলটার সুমুখ দিয়ে যেতে যেতে কতদিন কত কথা ভেবেছে মালু। ওই স্কুলকে ঘিরে ওর ছোট্ট বুকখানিতে কত ভয়-বিস্ময়, কত স্বপ্ন জেগে উঠেছে, আবার মরে গেছে। সে স্কুলটিতেই প্রবেশ করবার অধিকার পাবে ও? ইপাব তৈরিঃ আল মোস্তাইন বিল্লাহ

মেজো ভাইর যেই কথা, সেই কাজ। সেইদিনই তালতলির শ্যামাচরণ দত্ত উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে গেল মালু।

১৮.

মানুষ আর আজরাইলে টানাটানি চলল গোটা একটি মাস। শেষ পর্যন্ত আজরাইলকে পিঠটান দিতে হল। সেরে উঠল লেকু। স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ল সেকান্দর।

উৎকণ্ঠা মুক্ত হয়ে মামলার তদ্বিরে মন দিল সেকান্দর! কিন্তু কোর্ট আদালতের কারবার, সে এক অথৈ ব্যাপার। সেকান্দর মাস্টারের দুটা পাস সেখানে একেবারেই অকেজো।

মামলা ওরা যথাসময়েই রুজু করল। কিন্তু দু দিন বাদেই টের পেল সেকান্দর, বুদ্ধির খেলায় রমজানের মুনিব ফেলু মিঞার কাছে ও নিতান্তই শিশু। কেননা ওদের মামলাটা রুজু হওয়ার আগেই আর একটা মামলা রুজু হয়ে গেছে ওদের বিরুদ্ধে। বাদী রমজান। আসামী সেকান্দর মাস্টার এবং লেকু। অভিযোগ অনধিকার প্রবেশ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা। কোন্ কেরামতিতে এটা সম্ভব হল সেকান্দরের লেখাপড়া শেখা মাথায় সেটা কিছুতেই বোধগম্য হল না। নেহাৎ খাতির করেই অথবা অন্য কোনো ইঙ্গিতে দারোগা আসছে না ওকে চালান দিতে। গ্রেফতারী পরোয়ানাটা ঝুলিয়ে রেখেছে। যে কোনোদিন ধরে চালান দেবে কোর্টে। তাছাড়া আইনেরই যে ফাঁক আছে, এ কথাটা সেকান্দর মাস্টারের স্কুল-কলেজে পড়া বিদ্যায় জানা ছিল না মোটেই। মেলা ফাঁক আইনের। ফাঁক সাক্ষী-সাবুদের। যা ঘটে তা প্রমাণ করা দুঃসাধ্য। যা ঘটে না তাই প্রমাণিত হয়ে পড়ে পেনাল কোডের ধুরন্ধরদের কেরামতিতে। থানা আর মিঞা বাড়ির যতটা নৈকট্য সেকান্দর আর থানার মাঝে বুঝি ঠিক ততটাই দূরত্ব। সে দূরত্বে সেতুবন্ধের সামর্থ্য কোথায় সেকান্দরের? অল্প দিনের মাঝেই এই রূঢ় সত্যটা আবিষ্কার করল সেকান্দর মাস্টার।

সৈয়দদের সমস্ত সম্পত্তির দেখভালের ভার নিচ্ছে সেকান্দর। রমজানের মুখে খবরটা শুনে প্রথমে স্তম্ভিত হয় পরে বিষম ক্রোধে ফেটে পড়েছে ফেলু মিঞা। ভগ্নিপতিরা গ্রামের পাট গুটিয়ে চলে যাচ্ছে বিদেশে–এ তথ্যটার উপর ভিত্তি করে অনেক হিসেব করে রেখেছে ফেলু মিঞা। সে হিসেব বানচাল করে দেবে দু কলম পড়ালেখা জাননেওয়ালা গোলামের বাচ্চাটা? ও, তাই শালার পিঠে এত তেল হয়েছে, দল পাকিয়েছে লেকুকে নিয়ে। তা আর বলতে স্যার : আগুনে বাতাস দেয় রমজান।

শম্বুক গতিতে চলে মামলা। কিছুদূর গড়াতেই দেখা গেল যারা ছিল মুখ্য অর্থাৎ লেকু-রমজান, ওরা এখন গৌণ। অনেক পেছনে সরে গেছে ওরা। আর যারা ছিল পেছনে তারাই এসে গেল সুমুখে। লড়াইটা শুরু হল সামনাসামনি, একদিকে তালতলি স্কুলের তিরিশ টাকা মাইনের জুনিয়ার মাস্টার সেকান্দর অন্য দিকে মিঞার বেটা ফেলু মিঞা।

চোখে অন্ধকার দেখেও হাল ছাড়ল না সেকান্দর। আইন তার পক্ষে, ঘটনা দিবালোকের প্রকাশ্য জনসমক্ষে। কাজেই রমজানকে নিদেনপক্ষে দশ বছর ঠুকে দেয়া যাবে এ সম্পর্কে নিশ্চিত সেকান্দর।

কিন্তু টাকা? টাকার দিকটা কেমন করে সামলাবে সেকান্দর? লেকুকে সারিয়ে তুলতে, মামলার প্রাথমিক দৌড়াদৌড়ির কাজে ওর স্বল্প সঞ্চয়টা যে ফুরিয়ে গেল। এখন? অথচ খরচ তো সবে শুরু। ওদিকে লেকু বেঁচে উঠলেও হাঁটা-চলার মতো সুস্থ হতে আরো সময় নিবে। সে সময়টা ওষুধ খেতে হবে। ভালো পথ্য দিতে হবে ওকে। সে খরচটাই বা আসবে কোত্থেকে। লেকু তো জমিজমা রেহান দিয়ে ফতুর হয়ে বসে রয়েছে। উপায়?

ফেলু মিঞার হাত ধরে কেঁদে দেয় সেকান্দরের বুড়ি মা : আপনি মিঞার বেটা মিঞা। গ্রামের মাথা। ছেলেকে ডেকে শাসিয়ে দিন, শাসন করুন। দু ঘা দিতে হয় আপনিই দেবেন, সে হক কী নেই আপনার? কিন্তু দোহাই আপনার পুলিশে হাজতে বেইজ্জত করবেন না ছেলেটাকে। ছেলের বিপদে ছুটে এসেছে মা।

হাত ছাড়িয়ে উঠে দাঁড়ায় ফেলু মিঞা। আতরমাখা রুমালটা একবার নাকের কাছে ধরে আবার পাট করে রেখে দেয় বুক পকেটে। কাচারির দিকে পা বাড়িয়ে বলে, আচ্ছা দেখি।

শুধু ওইটুকু কথায় বুঝি নিশ্চিন্ত হতে পারে না উদ্বিগ্ন মা। ফেলু মিঞার পিছু পিছু চলে আসে কাচারি তক। বেড়ার আড়ালে দাঁড়িয়ে কান্না-জড়ান গলায় কত কথা বলে যায় : পোলার কথা শুনবেন না। ওর তো মাথাই খারাপ হয়েছে, নইলে আপনার মুখে মুখে কথা বলে? আপনি ওকে মাফ করে দিন।

কাচারি ঘরটায় গিস গিস করছে লোক। খোদ বড়বাবু এসেছে তদন্তে। প্রাথমিক রিপোর্ট তো কবেই শেষ। সাক্ষী সাবুদও হয়েছে। তবু বড়-বাবু আর একবার এসেছেন দেখতে। এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই যে কসিরের বাড়ি বলে কথিত ঘরগুলো মিঞাদের খাস দখলি জায়গায় মিঞাদেরই ঘর। এতেও কোনো সন্দেহ নেই যে অমুক তারিখে সে জায়গায় বলপূর্বক প্রবেশ করেছে সেকান্দর মাস্টার এবং লেকু। লুঠতরাজ ও দাঙ্গাহাঙ্গামার উদ্দেশেই যে তাদের এই অনধিকার প্রবেশ এতেও কোনো সন্দেহ নেই। কেননা প্রত্যেকটি অভিযোগের পক্ষেই প্রমাণ অকাট্য।

লেখাজোখার পর্ব শেষ করে কিঞ্চিৎ নাশতায় মন দিয়েছে বড়বাবু। হাবিলদার গেছে সেকান্দর মাস্টার এবং লেকুকে ধরে আনতে। ওদের আজই চালান দেওয়া হবে মহকুমা শহরে। বাকুলিয়ার পক্ষে মস্ত বড় ঘটনা। তাই গোটা গ্রামটাই ভেঙে পড়েছে মিঞা বাড়ির কাচারি ঘরে আর দহলিজে। ঘটনার অনিবার্য পরিণতিটা স্বচক্ষে দেখবার জন্য রুদ্ধ নিশ্বাসে অপেক্ষা করছে লোকগুলো।

পাকা আশ্বাস না নিয়ে কিছুতেই বুঝি নড়বে না সেকান্দরের মা। ফেলু মিঞা শুনছে, কী শুনছে না, সে খেয়াল নেই তার, কিন্তু ইনিয়ে বিনিয়ে বলেই চলেছে নিজের কথা : আপনি খাওয়ালে পর গরিব বাঁচে, না খাওয়ালে গরিব মরে। আপনি আছেন বলেই তো গ্রামটা টিকে আছে। আপনি থাকতে আমার ছেলে ফাটক খাটবে?

কথাগুলো মোটেই আস্তে বলছে না সেকান্দরের মা। কাচারি ঘরের অনেক লোকই শুনতে পাচ্ছে। ফেলু মিঞা তো একেবারে ধারেই বসে আছে।

আচ্ছা আমি কথা দিলাম। আপনি খোদাপরস্ত মুরুব্বীজন, আপনার কথা কেমন করে ঠেলি। তা ছাড়া প্রজার-কল্যাণ চিরকালই দেখে এসেছে মিঞারা। আপনি পাঠিয়ে দিন সেকান্দরকে। গোটা কাচারি ঘরটাকে শুনিয়ে শুনিয়েই বলল ফেলু মিঞা।

আমাকে অমন ছোট করলে মা? কথাটা গলা পর্যন্ত এনেও মুখ দিয়ে বের করতে পারল না সেকান্দর। এমন একটা রূঢ় কথা কেমন করে শোনাবে মাকে?

মা ততক্ষণে ওকে জড়িয়ে ধরে বিলাপ জুড়ে দিয়েছে। দু দুটি ছেলেকে মাত্র দুটো দিনের জন্য দুনিয়াটা দেখিয়েই বেহেশতে টেনে নিয়ে নিলেন খোদা। তৃতীয় জন এসেছিল সেকান্দর। খোদার দরবারে কত মাথা কুটে প্রার্থনায় চোখের জলে কত বুক ভাসিয়ে তবে তো সেকান্দরকে ধরে রাখতে পেরেছে মা, বড় করে তুলেছে। সেই সেকান্দর শুনবে না মায়ের কথা? তা ছাড়া সে হল সংসারের খুঁটি। অমন গোয়াতুর্মি দেখিয়ে সে যদি হাজতেই যায় তবে সংসারের কী হবে, আর ওকে ছেড়ে বুড়ি মা-টাই বা বাঁচবে কেমন করে?

ফেলিস না, ফেলিস না মায়ের কথা। ফেললে আমার মাথা খাস্ তুই। যা, তুই শুধু কাচারিতে যাবি। ফেলু মিঞার সুমুখে একবার দাঁড়াবি। কিছু করতে হবে না, কিছু বলতে হবে না তোকে। সেকান্দরকে অরাজি দেখে মায়ের কান্নাটা দ্বিগুণ হয়। আহ্ মা, থাম তো। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে সেকান্দর। কিন্তু করবে কী ও? না হয় আমল দিল না মাকে, সদরে চালান গেল, তারপর যা থাকে কপালে। কিন্তু লেকু? মাত্র দুদিন হল হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে এসেছে। লেকু, ভালো করে বসতেও পারে না। সে কী ভাবে সইবে হাজতের ধকল?

আরো কত কী ভাববার আছে! হাজতে গিয়ে পড়ে থাকবে ওরা। কে করবে মামলার তদ্বির, কে করবে জামিনের ব্যবস্থা! না হয় সুলতানই কয়েকদিন লেখাপড়া ক্ষ্যান্ত দিয়ে পড়ে থাকল শহরে। কিন্তু টাকা? কোর্টের অবস্থাটা নিজের

চোখেই তো দেখে এসেছে সেকান্দর। পায়ে পায়ে ট্যাকের কড়ি ফেলে চলতে হয় সেখানে, নইলে এক পা এগুবার জো নেই। সত্যি সত্যি যখন শুরু হয়ে যাবে দু দিকের দুটো মামলা তখন খরচের কী আর কোনো মা বাপ থাকবে? সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে মিঞা বাড়ির দিকেই এগোয় সেকান্দর।

হ্যাঁ, স্কুল ফান্ডে কিছু টাকা জমিয়েছে ও। সে আর কত। পুরোদমে যখন চলবে মামলা উকিল মোক্তার পেশকারের হাজারো বায়ন্নাক্কা মিটোতে গিয়ে সে তো দু দিনেই উড়ে যাবে। তখন? তাছাড়া ও টাকায় হাত দেবার কোনো অধিকার নেই সেকান্দরের। বিরাট একটা স্বপ্নকে সুমুখে রেখে জমানো এ টাকা। আর কতকষ্টে, এদিকে টানে তো ওদিক ছেঁড়ে এমনি করে সংসার চালিয়ে, মাসে মাসে বছরে বছরে তিল তিল বঞ্চনায় গড়ে উঠেছে ওই সঞ্চয়।

হঠাৎ কী এক ধাক্কা খেয়ে যেন জেগে উঠল সেকান্দর। সমস্ত চিন্তা কখন সরে গিয়ে বুকের পর্দায় ভেসে উঠেছে বিলাপকাতর মায়ের মুখখানি। চারিদিকের কত টান এ সংসারে! কথাটা যেন আজই প্রথম মনে পড়ল সেকান্দরের।

ওকি? লেকুকে অমনভাবে বেঁধে নিয়ে আসছে? হাঁটতে পারছে না। পা দুটো হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে চলছে ও। না, হাবিলদারটার বিবেচনা আছে। দড়িটা লেবুর কোমরে বাঁধা ঠিকই, তবে হাতটা হাবিলদারের কাঁধে রেখে কিছুটা কষ্ট লাঘব হয়েছে ওর। ওর দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠল সেকান্দর। অমন থলথলে স্বাস্থ্য জোয়ান মরদটার একী চেহারা। এক মাসেই যেন দশ বছর বুড়িয়ে গেছে ও।
ইপাব তৈরিঃ আল মোস্তাইন বিল্লাহ

চেনা হাবিলদার। সেকান্দরকে দেখে হেসে বলল, চলেন আপনারও এত্তেলা আছে।

লেকুর সুবিধের জন্য আস্তে আস্তে হাঁটে ওরা।

ওদিকে এক কাচারি লোক রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে ওদের জন্য।

কী করতে বলেন? পেস্তাবাদামের কুচি ছড়ানো জাফরানী শরবতের এক ঢোক গিলে জিজ্ঞেস করে বড় দারোগা।

বুড়িটা অমন করে কেঁদে কেটে গেল। রেখেই যান আজ। পরে অবস্থা বুঝে খবর দেব আপনাকে, এক কাচারি মানুষকে বুঝি অবাক করে দেয় ফেলু মিঞা।

দুটোকেই?

হ্যাঁ, দুজনকেই।

সকলের দিকে একবার তাকাল ফেলু মিঞা। তারপর দারোগাকে উদ্দেশ্য করে বলল আবার, এই জন্যই তো প্রজা শাসন আমাকে দিয়ে হল না দারোগা বাবু। কেঁদে পড়ল পায়ের উপর অমনি সব রাগ আমার পানি। তা ছাড়া ভাবি বেয়াদবি বে-তমিজি যাই করুক মাফ চাইলে মাফ যে আমাকে করতেই হবে। বাপদাদা চৌদ্দ গুষ্টি আমাদেরই খেয়ে মানুষ, আমি যদি ফেরাই তবে ওরা যাবে কোথায়? একটু হাসল ফেলু মিঞা। চোখ জোড়া তার আর একবার কাচারি ঘরটা প্রদক্ষিণ করে এল।

সে আর বলতে?

মারহাবা মারহাবা।

এই তো মিঞার পুত মিঞার মতো কথা!

হাফেজ সাহেব খতিব সাহেব, কারি সাহেব, কত মানুষের কত তারিফ আর বাবার গুঞ্জন। ঘর ভর্তি মানুষগুলোও বুঝি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল, মাস্টারকে তাহলে ধরে নিয়ে যাচ্ছে না।

শুধু কিছু বলে না রমজান। বরাবর দেখে আসছে, আজও দেখল মুনিবের বিচিত্র স্বভাব। নীল রক্তের রাগটাই বুঝি ওরকম। যখন চড়ে রাগটা ফেলু মিঞা তখন দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য আত্মবিস্মৃত, যাই তখন গেলান যাবে তাই গিলবে। কিন্তু একটু তোষামোদ পেয়ে সে রাগটা যখন পড়ে যাবে তখন বুঝি দিল্লীর বাদশা ফেলু মিঞা, দিলটা তার দরিয়ার মতো দরাজ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গাছে তুলে মইটা কী কেড়েই নেবে ফেলু মিঞা? কী এক আতঙ্কত্রাসে ঘরভর্তি লোকের মাঝেও যেন গায়ে তার কাঁটা দিয়ে যায়।

মিথ্যে মামলা লাগিয়ে আবার মেহেরবানী দেখান হচ্ছে? ঠোঁটের গোড়ায় এসেও কেমন করে যেন রুখে গেল কথাটা। লেকুর উপর চোখ পড়তেই নিজেকে সামলে নিল সেকান্দর। মাতবর মোসাহেব পরিবেষ্টিত ফেলু মিঞার দিকে একবার নজরটা বুলিয়ে দহলিজে নেমে এল ও।

ক্রিং ক্রিং সাইকেলের ঘন্টা বাজিয়ে ওর পাশ ঘেঁষেই চলে গেল বড় দারোগা। ইচ্ছে হল সেকান্দরের দারোগাকে থামিয়ে শুধু একটি কথা শুধায়, আইনটা কী তার পকেটে? কিন্তু সে প্রশ্নটা উচ্চারণ করার আগেই কাঁধের উপর কার যেন স্পর্শ অনুভব করল। পেছন ফিরে দেখল সৈয়দ বাড়ির মেজো ছেলে জাহেদ।

কী হে দারোগার পিঠে কী বঙ্গদেশের মানচিত্র দেখছ নাকি? হাসছে জাহেদ।

ও, জাহেদ? তুমি এসেছ, খবর পেয়েছি। কিন্তু, বড় ঝামেলায় পড়েছি ভাই, যেতে পারিনি। কিছু মনে করনি তো?

আহা-হা, ভদ্দরলোকি বিনয়ে যে একেবারে ভেঙে পড়ছ। জীবন থাকলে ঝামেলা। আমি তো বেশ বড় রকমের একটা ঝামেলা নিয়ে এসেছি তোমার জন্য। চল বসা যাক কোথাও।

মিয়া পুকুরের ঘাটলার পাশে লিচু গাছটার তলায় গিয়ে বসল ওরা। জাহেদের প্রত্যাশী চোখজোড়া স্থির হয়ে থাকে সেকান্দরের মুখের উপর, বুঝি ওর কাছে থেকে শুনতে চায় গ্রামের হালফিল অবস্থাটা।

সেকান্দরের মনে হল ওর মাথাটায় যেন ঝিঁঝি লেগেছে। সেই সকাল থেকে মা-টি কেঁদে কেঁদে বুক ভাসিয়েছে, ফেলু মিঞার হাত ধরে ছেলের মুক্তি কিনে এনেছে। ইস্ কেমন ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে হাঁটল লেকুটা! ওকি আর কোনোদিন গতর খাটিয়ে রোজগার করতে পারবে? এসব ভাবনা কেমন দুমড়ে দিয়ে যায় সেকান্দরের মনটা। কিন্তু, এ সবের চেয়েও বুঝি অসহ্য ফেলু মিঞার উদারতার চাবুক। না, এ সময় জাহেদের সাথে দেখাটা না হলেই ভালো হত। নিজেকে নিয়ে একটু নিরিবিলি বসতে পারত ও।

সেকান্দরকে নীরব দেখে জাহেদই মুখ খুলল বলল, আমি সব শুনেছি। শুনেছ? ও, মালু-রাবু দুই গেজেট তো তোমার আছেই।

ফিক করে হেসে দেয় মালু। এতক্ষণ লক্ষ করেনি সেকান্দর, পেছনে নখ কেটে কেটে লিচু গাছটার গুঁড়িতে নাম লিখছিল মালু।

ও, শ্রীমান দেখি পিছে পিছেই। মালুর দিকে তাকিয়ে একটু হাসল সেকান্দর।

হ্যাঁ, সেই আসার পর থেকেই। জাহেদের মুখেও একটা প্রশ্রয়ের হাসি। আবহাওয়াটা বুঝি আলাপের উপযোগী হয়ে আসছে। সেকান্দর তাকায় জাহেদের দিকে, তার কাছ থেকেই তো শুনবে ও। তিন কুলে যার নেই কেউ সেই মেয়েটাকে ধরে অমন একটা বর্বর শাস্তি দিলে? বলিহারি তোমাদের বাহাদুরি। অথচ রমজানের গায়ে একটা আঁচড়ও বসাতে পারলে না। হঠাৎ বলল জাহেদ।

মিঞা-বাড়ির নায়েব-সরকার, তার আবার অপরাধ কী : ব্যঙ্গের স্বরে বলল সেকান্দর। থামল বুঝি গুছিয়ে নিল পরের কথাটা। বলল আবার অবিচার

অনাচার যে কীভাবে বেড়ে চলেছে গ্রামে শুনলে আঁতকে উঠবে। লেখাপড়া শিখে তোমরা হলে দেশান্তরী, নইলে এমন হয় গায়ের অবস্থা? অভিযোগের স্বর সেকান্দরের।

একটু ভুল বললে মাস্টার। লেখাপড়া শিখে নয়, লেখাপড়া শেখবার জন্য গ্রাম ছেড়েছি। সে উদ্দেশে যদি গোটা বাকুলিয়াটা বিরানা হয়ে যায় আমি তাকে স্বাগতম জানাব।

বল কী? তা হলে ওই যে আমরা বলি গ্রাম বাংলা; জাতির প্রাণকেন্দ্র, সে সব কথার কোনো দাম নেই তোমার কাছে?

এক পাইও না। গ্রামের মানুষগুলো যাতে শহরে বাবু সায়েবদের বিলাস দুর্গে হানা না দেয় তাই গাঁয়ে ফিরে যাও বলে তারস্বরে চিৎকার জুড়েছে তারা।

গ্রাম কী তা হলে বাঁচবে না? গ্রামের কোনো ভবিষ্যৎ নেই? কেমন কাতর শোনায় সেকান্দরের গলাটা।

না। যেভাবে আছে ওভাবে বাঁচবে না। তার জন্য কেঁদে বুক ভাসিয়ে লাভ নেই। ভবিষ্যৎ? ভবিষ্যৎ আছে বৈকি। তবে সে হবে অন্য গ্রাম।

কী রকম?

ওই যে দেখছ দখিনের ক্ষেত? অজস্র গুলগুলোর খোপের মতো, হাজার আলের কাটাকুটি, ও সব থাকবে না। গোটা দক্ষিণ ক্ষেতে থাকবে বড় জোর চার পাঁচটা সীমানা। চাষ চলবে কলের লাঙ্গলে। ফসল উঠবে যারা চাষ করবে তাদেরই ঘরে। জমিদার-তালুকদার-মহাজনের বখরাদারী চলবে না। ডায়নামো বসবে। বিজলী বাতি জ্বলবে গাঁয়ের ঘরে ঘরে। ক্লাব থাকবে, রেডিও থাকবে গাঁয়ে গাঁয়ে। স্কুল থাকবে প্রতি গ্রামে, কৃষকের ছেলে মেয়েরা লেখাপড়া শিখবে বিনে মাইনেয়। বলতে বলতে অনাগত সেই স্বপ্নটা যেন ছায়া ফেলে যায় জাহেদের চোখের কোলে। তা কী সম্ভব? জাহেদের কল্পিত ছবিটি এত সুন্দর আর আকর্ষণীয় বলেই যেন বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না সেকান্দরের।

সম্ভব নয় মানে? সেকান্দরের অবিশ্বাসটা যেন মহাপাপ, চোখের দৃষ্টিটাকে অকস্মাৎ তীক্ষ্ণ করে তাই বুঝিয়ে দিল জাহেদ।

শোননি কিছু? পত্রিকা পড় না? দেশ জুড়ে যে বেজে উঠেছে স্বাধীনতার ডঙ্কা। দিকে দিকে আজাদীর বুলন্দ আওয়াজ। দেশ আর কতদিন সহ্য করবে গোলামির

জিঞ্জির? ইংরেজের যাবার দিন এসে গেছে হে, এসে গেছে। স্বাধীনতা না দিয়ে আর উপায় নেই ইংরেজের।

আর স্বাধীনতা মানে

মানে ওই নতুন গ্রাম

আলবত।

কী বিশ্বাস, কী দৃঢ়তা জাহেদের কথায়! মুগ্ধ চোখে চেয়ে থাকে সেকান্দর। জাহেদের থেকে বয়সে ও বছর পাঁচেকের বড়। তবু সেই স্কুলে পড়বার সময় থেকেই দুজনের মাঝে গড়ে উঠেছে একটা আন্তরিকতার সম্পর্ক। বয়স বাড়বার সাথে সাথে সেটা বন্ধুত্বে উন্নীত হয়েছে। বাকুলিয়ার গেরস্ত ঘরের একমাত্র শিক্ষিত ছেলে বলেই হয়ত সে সম্পর্কটা গড়ে উঠেছিল আর তারই সূত্র ধরে সৈয়দবাড়ির অন্দর মহলেও যাতায়াতের সুযোগ পেয়েছিল সেকান্দর। কিন্তু আজ মনে হল ওর, বন্ধুত্বের আর বয়সের সীমানা ছাড়িয়ে অনেক উপরে উঠে গেছে জাহেদ। আজ শুধু বন্ধুত্বের দাবি নয় ওর দাবি শ্রদ্ধা এবং আনুগত্যের।

কিন্তু, স্বাধীনতা মানে স্বরাজ নয়

স্বরাজ নয়? কেন? শুধাল সেকান্দর।

স্বরাজ মানে তো হিন্দুরাজ। এতে মুসলমানদের কী হবে? প্রায় দুশো বছর তো ইংরেজের গুঁতো খেয়ে খেয়ে কাটল। স্বরাজ এলে পর শুরু হবে বেনে মুৎসুদ্দির গুঁতো। এখন কী তার নমুনা দেখতে পাচ্ছ না?

অবাক না হয়ে পারে না সেকান্দর, ফেলু মিঞার কথাগুলোরই প্রতিধ্বনি শুনবে জাহেদের মুখে, কখনো ভাবতে পারেনি ও। কী যেন বলতে চাইল ও, কিন্তু ততক্ষণে রীতিমতো বক্তৃতা শুরু করেছে জাহেদ।

জানো মাস্টার? আলিগড়ে আমি একটি বিরাট সত্যকে উপলব্ধি করেছি। বই বন্ধ করে জাগরণের বাণী নিয়ে ঘুরলাম গোটা উত্তর ভারত।

দেখলাম সারা দেশ জাগছে, হয়ত এগুচ্ছেও। কিন্তু মুসলিম জনতা? কেবলি যেন পিছিয়ে পড়ছে, কেবলি যেন ঝিমিয়ে পড়ছে। শতাব্দীর উপর লড়ে লড়ে অত্যাচার সয়ে সয়ে ওরা যেন রণক্লান্ত, অশিক্ষা অজ্ঞতার বিরুদ্ধে ক্ষণ-ফুলিঙ্গের মতো জ্বলে উঠেছিল যে জেহাদ, সেও যেন স্তিমিত হয়ে আসছে। কেন, কেন এই অবস্থাটা জান?

কেন? ওর প্রশ্নটা ফিরে ওকেই শুধাল সেকান্দর।

কারণ আগত সেই স্বাধীন দেশে, স্বাধীন মর্যাদায় ওরা যে বাঁচতে পারবে সে নিশ্চয়তাটা খুঁজে পাচ্ছে না মনের ভেতর। গলাটা সাফ করে আবার শুরু করল জাহেদ : বাংলাদেশের ছবি তো আরো মর্মান্তিক। কয়েকটা জেলা ঘুরে এলাম। দেখলাম, সেই অন্নহীন বস্ত্রহীন শিক্ষাহীন মুসলিম প্রজাকুলের ব্যর্থ হাহাকার। কেউ কাঁদে না ওদের দুঃখে, কেউ শোনে না ওদের ফরিয়াদ। বুঝি ওই অভাগাজনদেরই দুঃখে ধরে আসে জাহেদের গলাটা। মিঞা পুকুরের টলটলে পানিটার দিকে তাকিয়ে কেমন উন্মনা হয়ে যায় ও। কিন্তু, মুহূর্তের মাঝেই কী এক আলোর ঝিলিক খেয়ে যায় ওর চোখে, উদ্ভাসিত মুখে বলে চলে ও : কিন্তু শহরে? লক্ষ্ণৌ, আলিগড় কানপুর, দিল্লী, কোলকাতায়? সে এক আশ্চর্য উন্মাদনা। জেহাদী প্রাণ যেন টগবগিয়ে উঠছে সেখানে। হাজার হাজার মুসলিম তরুণ আজ এক নতুন স্বপ্নে মেতে উঠেছে। নয়া জাগরণের বাণী ওদের মুখে মুখে। আজ বাকুলিয়ায় সে বাণী আর সে স্বপ্নের ডাক নিয়েই তো এসেছি আমি। সেকান্দর, আমি তোমার মদদ চাই। সে বাণী তোমাকেও যে শুনতে হবে, শোনাতে হবে লক্ষ হাজার মানুষকে। তুমি রাজি?

কী যেন এক শক্তি আছে জাহেদের কথায়। আর সে শক্তিটা ওর তরুণ বয়সের আবেগের সাথে মিশে ঝংকার তোলে বাতাসে। উত্তরের প্রত্যাশায় ও চেয়ে থাকে সেকান্দরের মুখের দিকে।

ইংরেজ, হিন্দু-মুসলমান জন্মভূমি, স্বাধীনতা এসব নিয়ে কখনো মাথা ঘামায়নি বাকুলিয়ার সেকান্দর মাস্টার। তালতলির জোয়ান মাস্টাররা এ সব নিয়ে কত তর্কের তুফান তুলেছে, স্কুলের ময়দানে মিটিংও করেছে ওরা। কেউ কেউ জেল খেটে এসেছে, এখনো খাটছে। পত্রিকাগুলোও নিত্যদিন ছাপার অক্ষরে আগুন ঝরিয়ে চলেছে। দূর থেকে এসব দেখেছে সেকান্দর। শুনেছে আরো অনেক বেশি। কিন্তু নিজে কখনো উৎসাহ বোধ করেনি ও, হাঙ্গামা হুজ্জত বলে এড়িয়েই চলেছে। কেউ ওকে টানতেও আসেনি। তাই ও জগৎটা ওর কাছে এক রকম অজানা, যেমন অজানা ছিল নিজের গ্রাম এই বাকুলিয়াটা। ও তো সবে চিনতে শুরু করেছে বাকুলিয়াকে। তবু সেকান্দরের কথাটা পুরোপুরি জানবার ইচ্ছে হল, শুধাল তোমার স্বপ্নই বা কী বাণীই বা কী, আর একটু খোলাসা করে বলনা কেন?
ইপাব তৈরিঃ আল মোস্তাইন বিল্লাহ

সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর এল জাহেদের : গোটা ভারতের মুসলমানকে আজ এক হতে হবে, এক জমাতে এক আওয়াজে এক নিশানে। গোটা বাংলায়, সারা ভারতে শুরু

হয়ে গেছে সে কাজ। এ অঞ্চলে সে কাজের দায়িত্ব নিতে হবে তোমাকে।

আমাকে? যেন আঁতকে উঠল সেকান্দর। না না ও সব রাজনীতি ফাজনীতির মধ্যে আমায় টেনো না জাহেদ, ওসব আমি বুঝি না।

বোঝ না? যেন ব্যাঙ্গের সুরেই বলল জাহেদ আর দৃষ্টিটাকে শলার মতো তীক্ষ্ণ করে গেঁথে রাখল ওর মুখের উপর।

নানুর কথা মনে আছে তোমার? সেকান্দরের মুখের উপর দৃষ্টিটাকে তেমনি গেঁথে রেখেই শুধাল জাহেদ।

হা মনে থাকবে না কেন?

নানুর সাথে যে তোমার আব্বাও কারাবরণ করেছিলেন সেই একুশ সালে জান সেটা?

বারে, জানব না কেন? আবছা আবছা মনেও রয়েছে আমার।

তবে? তবে কোন লজ্জায় তুমি আজ বল রাজনীতি বোঝ না?

তর্কে বুঝি কোণঠাসা হয় সেকান্দর। কিন্তু তর্কে হারা আর সত্যি সত্যি বুঝে নেয়া, দুটোতে অনেক তফাৎ। দেশ জাতি জন্মভূমি, জনসাধারণ একান্তভাবেই কতগুলো বাংলাশব্দ সেকান্দরের কাছে। তবু ওর পরিবেশ ওর দেখা এবং শোনা সে সব কী কখনও কোনো ছাপ ফেলতে পারেনি ওর মনে? ছাপ যে ফেলেছে এবং মনে মনে ওর নিজস্ব একটা মতও যে গড়ে উঠেছে, সেটাই প্রকাশ পেল ওর দ্বিধা জড়ান কথায়! হিন্দু-মুসলমান আলাদা আলাদা জামাত গড়বে আলাদা রাজনীতি করবে, এটা কেমন ধারা কথা বলছ তুমি?

জাহেদের চোখ জোড়া নেচে যায়, যেন বলে, তবে যে বলছ রাজনীতি বোঝ না। বলল জাহেদ, সে কথাটাই তো এতক্ষণ ধরে বোঝাচ্ছি তোমায়! দেশ জাগছে, স্বাধীনতা আসবেই। স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেবে এদেশের মানুষ। কিন্তু সে স্বাধীনতার মন্ত্রে স্বাধিকার চেতনায় মুসলিম সমাজ এখুনি যদি সঙ্ঘবদ্ধ না হয়, তবে তারা যে শুধু পড়ে পড়ে মারই খাবে, অশিক্ষার দারিদ্র্যের অভিশাপ কোনো দিনই যে ঘুচবে না তাদের, এ সম্পর্কে কী সন্দেহ আছে তোমার?

ঠিক ঠিক। ভালো করে সমঝিয়ে দাও তো মাস্টারকে! হিন্দু স্কুলে চাকরি করে আর দিনরাত হিন্দুদের সঙ্গে উঠে বসে ওর মগজটাও হিন্দু ধাঁচের হয়ে গেছে।

ওরা চমকে ওঠে ফেলু মিঞার কণ্ঠস্বরে।

আসরের নামাজ সেরে মসজিদ থেকে বেরিয়ে এসেছে ফেলু মিঞা। পরনে লাল সিল্কের উপর হলুদ ডোরা কাটা বর্মি লুঙ্গি। গায়ে সাদা মলমলের পাঞ্জাবী। পাঞ্জাবীর বুক পকেটে সে আতর মাখা রুমাল। হাতে ছড়ি। নামাজ সেরে মাথার কিস্তি টুপিটা পাশের পকেটে রেখে দিয়েছে ফেলু মিঞা। একটু পরে ফেলু মিঞা চলে যাবে পুকুরের পূর্ব পাড়ে। সেখানে মিঞাদের পারিবারিক গোরস্থান। পূর্বপুরুষদের কবরগুলো জিয়ারত করে ফেলু মিঞা নেবে পড়বে দখিন ক্ষেতের রাস্তায়। ছড়িটা ঘুরোতে ঘুরোতে সোজা চলে যাবে বড় খাল অবধি। তারপর ফিরে আসবে। বিকেল বেলায় এই কবর জিয়ারত আর ভ্রমণের শৌখিনতাটা ফেলু মিঞার নিয়মিত অভ্যাসের অঙ্গ।

হঠাৎ কেন যে চুপ মেরে গেল ওরা বুঝতে না পেরে কাজের কথায় এল ফেলু মিঞা : শোন জাহেদ। পরশুদিন মিটিং দিয়েছে। তুমি তৈরি থেক কিন্তু।

পরশু? এত জলদির কী ছিল? আমি তো থাকব অনেকদিন।

না না এমনিতেই অনেক দেরি হয়ে যাচ্ছে। ইলেকশানের দিন আসছে ঘনিয়ে। ওদিকে কংগ্রেসীরা তো রীতিমতো বড়গোছের একটা মোল্লার দলকে কিনে নিয়েছে।

কিনে নিয়েছে? সমস্বরেই যেন চেঁচিয়ে উঠলে ওরা।

ওই কেনারই সামিল। বাইরে কী আর সে কথা বলে? তারপর কোত্থেকে পটিয়েছে এক মাওলানা, সে তো চষে বেড়াচ্ছে গোটা অঞ্চল। যা তা বলছে লীগের বিরুদ্ধে।

কিন্তু মামা মিটিংয়ের আগে আমি তো কিছু আলাপ সালাপ করে নিতে চেয়েছিলাম, মাঝে সময় যে রইল মোটে একটা দিন। ইতস্ততা জাহেদের কথায়।

চকচকিয়ে ওঠে ফেলু মিঞার চোখ জোড়া। এক কদম এগিয়ে এসে জাহেদের কাছ ঘেঁষে দাঁড়ায়, কী এক আগ্রহে ঝুঁকিয়ে আনে মুখটা। বলে : হ্যাঁ হ্যাঁ, আমিও ভাবছিলাম ঘরোয়া পরামর্শটা হয়ে যাওয়া দরকার। এইটুকু বলে কেমন লাজুক গোছের একটা হাসি ছাড়ল ফেলু মিঞা। ঢোক গিলল। বলল আবার, অবশ্য আমি যা ভেবেছি, সেটা তোমাকে এখুনি জানিয়ে দিতে পারি। আমি ভেবেছি, সেক্রেটারী হিসেবে মাস্টারই হবে উত্তম ব্যক্তি তুমি শুধু ওর মাথাটা টাইট করে দেবে। আর প্রেসিডেন্ট? সে দায়িত্বটা না হয় আমিই নিলাম।

প্রেসিডেন্ট আপনি? ও, কাজের নেই দেখা, আর এখুনি গদি ভাগাভাগি? মামা, আপনার মতলবটা তো বড় খারাপ! বিদ্রূপ তীক্ষ্ণ জাহেদের কণ্ঠ।

ভাগনের অতর্কিত স্পষ্টবাদিতায় অপ্রস্তুত হয় ফেলু মিঞা। ঠোঁটের কোণে একটা হাসি টেনে বলে : আরে যাহ, কী ফজুল বকছ তুমি।

শুনুন ফেলু মামা। দুশো বছরের ইংরেজ শোষণের অভিশাপ থেকে মুক্তির জন্য লড়ছি আমরা। সে মুক্তির রূপ অতি স্পষ্ট : দেশের মাটি আমার, দেশের সম্পদ আমার, আমার মুক্তি কোটি কোটি মজলুমের পেটে দেবে অন্ন, গায়ে দেবে বস্ত্র আর মুখে ফোঁটাবে হাসির ছটা। আমাদের লড়াইয়ের ঘোড়ায় চড়ে আপনার মতো জমিদার তস্য জমিদাররা তখতে জেঁকে বসবেন সেটি হচ্ছে না কিন্তু। তীরের মতো কথাগুলো ছুঁড়ে মারল জাহেদ।

দেখেছ মাস্টার? আলিগড় থেকে কেমন চমৎকার বক্তৃতা শিখে এসেছে আমার ভাগ্নেটি! সাবাস, পরশুর মিটিংয়ে এমন তেজী জবান আর গরম সামুচার মতো বক্তৃতা চাই কিন্তু।

ফেলু মিঞা হেসেই উড়িয়ে দিল জাহেদের কথার তীর। কিন্তু এই কৃত্রিম হাসিটা বুঝি বেশিক্ষণ ধরে রাখা যায় না, তাই ছড়িটাকে এক চক্কর ঘুরিয়ে কবরস্থানের দিকে পা তুলল ফেলু মিঞা। যেতে যেতে বলল, তোমরা সবাই মিলে যা ঠিক করবে তাতেই আমার সায়।

দেখছ? কী রকম নিশ্চিত বিশ্বাস আমার মামুটির? যেন সে ছাড়া লীগের প্রেসিডেন্ট হবার মতো আর কেউ নেই এ তল্লাটে। ক্ষতি কী? হিন্দুদের সাথে লড়তে হলে তো ও রকম লোকই দরকার। ফস করে বলল সেকান্দর।

আহ্ চুপ কর তো। ফেলু মামা স্বপ্ন দেখছে কবে আবার মোগল বাদশাহীটা ফিরে আসবে হিন্দুস্তানে। তার হাতে পড়ে লীগের দশাটা কী হবে ভেবে দেখ তো? হঠাৎ জাহেদ হাত বাড়িয়ে সেকান্দরের হাত জোড়া ধরে নেয়, বলে, না না সেকান্দর। রাজি হয়ে যাও তুমি। সব দায়িত্ব তুলে নাও তোমার কাঁধে। তুমি, একমাত্র তুমিই পারবে ধনী নির্ধন সকল মুসলমানকে এক পতাকার নিচে শামিল করতে। তোমায় গরিবরা কত ভালোবাসে সে কী আমি জানি না? গভীর আবেগ নিঙড়ান স্বর জাহেদের। আর সে আবেগটা যেন ওর স্পর্শ বয়ে সেকান্দরের সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ে কী এক বিদ্যুৎ সঞ্চারণে।

চট করে কোনো কথা জোগায় না সেকান্দরের মুখে।

ওরা উঠে পড়ে। আস্তে আস্তে হাঁটে।

পরিচিত পথ। চেনাজানা ঘরবাড়ি। তবে অনেকদিন পর এসেছে বলেই যেন নতুন মনে হয় জাহেদের। কিন্তু সেই নতুনত্বে নেই এতটুকু ভালো লাগার আকর্ষণ।

বেপারী বাড়ির ঘরের সুমুখের আম গাছটা এই বছরেই কত বেড়ে গেছে। চৌকিদার বাড়ির বুড়ো পাকুড় গাছটা ভেঙে পড়েছে। তবু একটা চিকন ডাল বুকে লয়ে মোটা গুঁড়িটা হেলে পড়েও ভাঙেনি এখনো, মাটির মায়া কাটাতে পারছে না বুঝি। চৌকিদার বাড়ি থেকে মৃধা বাড়ি অবধি রাস্তাটায় শুধু ভাংনা আর ভাংনা, যেন আস্ত একটা মানব শরীর থেকে খাবলা খাবলা মাংস তুলে নেওয়া হয়েছে। কত বছর মাটি পড়েনি এ রাস্তায় কে জানে! গেল বর্ষায় যে পড়ে গেছিল হাসমত মৃধার ঘরখানা সেটা ডানা ভাঙা মোরগের মতো তেমনি মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে। তবু তারই মাঝে বসত চলছে ওর এক বৌ তিন ছেলে মেয়ের।

ঘিনঘিন করে জাহেদের গাটা। গায়ের পাতলা চামড়াটায় যেন বালি পড়ে খস খস অস্বস্তি ছড়িয়ে যায়। দিনে দিনে নগ্ন হয়ে উঠছে বাকুলিয়ার দারিদ্র আর শ্রীহীনতা।

রাস্তাঘাটের মেরামতই বল আর পয়পরিষ্কারই বল, এ সব কারও মাথা ব্যথা নয়। কে বা একটু নজর দেয় গরিব দুঃখীর দিকে। তোমরাও সব রইলে বিদেশে। বুঝি জাহেদের চিন্তাটা অনুসরণ করেই বলল সেকান্দর। অভিযোগ-ম্লান ওর স্বর।

আড়চোখে একবার তাকায় জাহেদ। নীরবে পথ চলে।

অথচ তালতলিতে কিন্তু এমন হয় না কখনো–উদ্যোগী লোকের অভাব নেই সেখানে। নিজের কথাটাই চালু রাখল সেকান্দর।

শুধু উদ্যোগ কেন, অর্থ বিদ্যা সামর্থ্য দেশপ্রেম কোনটায় ওদের কমতি? তোমাদের সামর্থ্যও নেই তাই উদ্যোগও নেই। কেমন ঝাঁঝিয়ে ওঠে জাহেদের গলাটা।

আবার পলিটিক্স টানছ তুমি? আমি বলি, বেশি নয়, তোমার মতো লেখাপড়া জাননেওয়ালা যদি চারটি ছেলে থাকে এই বাকুলিয়ায়, পারে না তারা এই গ্রামের চেহারাটা বদলে দিতে? নিশ্চয় পারে। অথচ সে দিকে না গিয়ে শুধু বুক চাপড়াও, যত ধন দৌলত শান-শওকত ওই হিন্দু জমিদার মহাজন বাবুমশায়দের, হায় হায় কী হবে আমাদের। কেন, অমন সংকীর্ণ ঈর্ষায় ছোট করি নিজেকে? তার চেয়ে জ্ঞানে গরিমায় সততায় ত্যাগে ওদেরকেও ছাড়িয়ে যাব, এমন একটা প্রতিজ্ঞা কী

নিতে পারি না আমরা? আমি তো বলি এই সুস্থ প্রতিযোগিতা আর সহযোগিতার পথটাই একমাত্র সত্য পথ, ওতে উভয়েরই মঙ্গল।

হঠাৎ যেন কথার বাঁধ ভেঙে দিয়েছে সেকান্দর। আর জাহেদের কাছেও বুঝি ওর মনের কথাটা স্পষ্ট হয় এতক্ষণে।

ওহে মাস্টার, ঘোড়ার আগে গাড়ি জুতছ তুমি। অসমানে কখনো প্রতিযোগিতা চলে? গ্রামগুলোর যেমন দেখছ, গ্রাম হাটবাজার সব কিছুর মালিক ওরা, তেমনি অবস্থা শহরেও, চাকরি বল, ব্যবসা বল–সবই তো ওদের খপ্পরে। সাধ্য আছে সেখানে দাঁত ফুটাও তুমি? নতুন পথ করে নেবে তুমি, সে সুবিধেই বা তোমায় দিচ্ছে কে? আর যতদিন সেই সুবিধেটা আদায় না করতে পাচ্ছে নিজের জন্য তদ্দিন ওই হাসমত মৃধা অমনিই থাকবে, এই বাকুলিয়ায় এমনি দৈন্যের হাহাকার ছাড়বে।

অতএব ফেলু মিঞা রমজান সবাইকে নিয়ে জমাত কর? কেমন ভেংচিয়ে উঠে মাস্টার।

আহ, জমাত তো করতেই হবে। সবাইকে নিয়েই করতে হবে। কাউকে বাদ দিলে চলবে না। কিন্তু সে জমাত তো একটা নীতিহীন সুবিধাবাদীর জোট নয়। তার থাকবে সুস্পষ্ট নীতি। সে নীতি হল স্বাধীন দেশে আমাদের স্বাধীন বিকাশ আর উন্নতির নিশ্চয়তা বিধান, তার জন্য সংগ্রাম। আমি ভেবে পাই না এই সহজ কথাটা বুঝছ না কেন? এবার অসহিষ্ণু নয় জাহেদ, যুক্তি আর ন্যায়নীতির আবেদন দিয়ে বোঝাতে চায় সেকান্দরকে।

ঘুরতে ঘুরতে ওরা পৌঁছে যায় গ্রামের উল্টো সীমানা সৈয়দবাড়ির দরজায়। আসবে না? দাঁড়িয়ে পড়ে শুধাল জাহেদ।

না। সন্ধ্যার পরই তো আসছি। বাড়ির পথ নেয় সেকান্দর।

আমার কথাগুলো আরো ভালো করে ভেবে দেখ কিন্তু। পেছন থেকে ভেসে আসে জাহেদের গলা।

কোনোদিনই তো চিন্তা ভাবনার অনুকূল ছিল না সেকান্দরের স্বভাবটা। সেই মজলিসের দিন থেকেই বুঝি রাজ্যের যত জটিলতা এসে ছেঁকে ধরছে ওকে আর সেই পথে চিন্তা। কিন্তু চৈতি হাওয়ায় উড়িয়ে আনা রাশি রাশি পাতার মতো এই যে ভাবনাগুলো এনে দিল জাহেদ তার কোনো আগা মাথা যেন খুঁজে পায় না ও। প্রশ্ন

তুলেছে মুখে মুখে তর্কও করেছে। কিন্তু মনে? মনের ভেতর যে দ্বন্দ্বের দোলা দিয়ে গেল জাহেদ তার মীমাংসা কী অত সহজ?

লেকুর বাড়ির পাশে এসে থমকে দাঁড়ায় সেকান্দর। চিঁ চিঁ করে কাঁদছে ওর মেয়েটা। আম্বরির খেঁকান গলাটা ভেসে আসছে–খালি খাই খাই। পেটে যেন দোজখের আগুন লেগেছে! কাল তো গিলেছিস এক খোরা ভাত। তবু চিল্লাস? সঙ্গে সঙ্গে ধুপ ধুপ করে বুঝি কয়েকটা কিল বসিয়ে দেয় আম্বরি। হঠাৎ কিল খেয়ে একবার থ মেরে যায় মেয়েটি, চিঁ চিঁ কান্নাটা যায় থেমে। তার পরই তারস্বরে কান্না জুড়ে অবুঝ মেয়ে। ক্ষিধের উত্তর কিল, এতটা হয়ত সইতে পারে না ও।

যা না তোর বাপের ঠাউয়ের কাছে। বাপ তো চলেছে কবরে। ভুনির কান্নাকেও ছাড়িয়ে যায় আম্বরির গলা।

কথাটা হয়ত সেকান্দরকে উদ্দেশ্য করে নয়, তবু মাটির সাথে মিইয়ে যায় ও। খেজুর পাতার দরজাটা ঠেলে ও আঙ্গিনায় এসে দাঁড়ায়, ডাক দেয়–ভুনি শুনে যা।

ঘোমটা তুলে বেরিয়ে আসে আম্বরি। আঁচল দিয়ে পরিষ্কার করে পিঁড়িটা পেতে দেয় দাওয়ায়। আওয়াজ পেয়ে চোখ মুছতে মুছতে ভুনিও বেরিয়ে আসে।

লেকু কোথায়? ইপাব তৈরিঃ আল মোস্তাইন বিল্লাহ

ঘুমায়।

এই অবেলায় ঘুম? থাক থাক ডাকতে হবে না। চল ভুনি।

ভুনির হাতখানা ধরে বেরিয়ে আসে সেকান্দর। দরজার এ পারে এসে আম্বরিকে উদ্দেশ্য করেই বলল : ঘরে চাল নেই, খবর পাঠাতে হয় না? ভুনির হাতে সের দুই চাল পাঠাচ্ছি। কাল আসব আবার।

রাস্তায় পড়ে কেন যেন একটি প্রশ্নই জাগল ওর মনে। জাহেদ কী ভাবে ওদের কথা? যতটুকু বলে ও তার মাঝে সত্যই বা কতটুকু?

১৯.

ঝড় বইয়ে দিল জাহেদ।

মিটিং বক্তৃতার তুফান ছুটিয়ে অদ্ভুত এক উত্তেজনায় মাতিয়ে তুলল মানুষগুলোক।

অন্ন নেই বস্ত্র নেই মর্যাদা নেই, এর নাম কী বাঁচা? কামালের তুর্কি জগলুলের মিসর বোখারা-সমরকন্দ, বোগদাদ-দামেস্ক সর্বত্র মানুষের বুকে নতুন বল নতুন জাগরণ। সারা মুসলিম জাহান জাগছে। স্বাধীনতার উত্তাল তরঙ্গে ফুঁসে উঠেছে নীল নদ, ফোরাত-তাইগ্রীসের তীরে তীরে জেহাদের ডাক। ভারতের দশ কোটি মুসলমান কী ঘুমিয়ে থাকবে? কাফের বিদেশি ইংরেজের হুকুমত আর কতদিন বরদাস্ত করবে ওরা?

কথা তো নয় যেন আগুনের ফুলকি আর মানুষের মুখে মুখে সে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, ঘর থেকে ঘরে। আগুনের আঁচ পেয়ে সহসা বুঝি জেগে উঠে ঘুমন্ত মানুষ। ঝড়ের মতো গ্রাম থেকে গ্রামে ছুটে বেড়ায় জাহেদ।

গাঁয়ের মানুষ মসজিদের সুমুখে বসে তর্কের অছিলায় একটু গরম হয় ওরা। সেও কালে ভদ্রে। সহজে যেমন বিশ্বাস করে না ওরা তেমনি সহজে রা বের হয় না ওদের মুখ দিয়ে। হুজুগ হাঙ্গামাকে বাপদাদার পরামর্শ মতো দূরে রেখেই চলে ওরা। কিন্তু মনের বাতাসটা যখন দোলা দিয়ে ওঠে, ওরা, তখন কালবৈশাখী, কোনো বাধা মানে না ওরা। এমনিতে ঠাণ্ডা রক্ত কিন্তু সে রক্ত যখন চনচনিয়ে গরম হয়ে ওঠে ওরা তখন বেদিশা।

সেই ঠাণ্ডা রক্তের মানুষগুলো মেতে উঠল কী এক উন্মাদনায়। মেতে উঠল ফজর আলি। মেতে উঠল মৃধা বাড়ির সেই রহমত বুড়োও। গরুর গাড়িটা নিয়ে জাহেদের সাথে সাথে সেও পাড়ি দেয় এ গাঁ সে গাঁ। দুর্বল লেকু সেও বসে থাকতে পারে না ঘরে। দূরে যেতে পারে না ও। কিন্তু মসজিদে আর জাহেদের বাড়ির বৈঠকে হাজিরা না দিয়ে থাকতে পারে না। উরুর জখমিটাই ওর সারছে না, পাটা সোজা করতে পারে না। তাই একটা লাঠি নিয়েছে ও। সেই লাঠিতে ভর দিয়ে আস্তে আস্তে চলে আসে সৈয়দ বাড়ি। সেকান্দরও থাকতে পারল না এই উত্তেজনার বাইরে। দুর্বার এক স্রোতের টান ওকে যেন ভাসিয়ে নিল। জাহেদের সাথেই হাটে বাজারে ঘুরল, বক্তৃতা দিল, চাঁদা তুলল। আর এমনি করে বাকুলিয়ার বাইরে আরো কত সমস্যার সাথে জড়িয়ে পড়ল, মাকড়সা যেমন জড়িয়ে পড়ে আপনার তৈরি জালে। কিন্তু, এত উত্তেজনার মাঝেও নিজের সেই ছোট স্বপ্নটুকু স্তিমিত হতে দিল না ও, মানুষ করবে ছোট ভাইটিকে। তাই এ-গাঁ ঘুরে এসেও সুলতানের পড়া নেয়, বসে থাকে পাশে যতক্ষণ না ক্লান্ত হয়ে পড়ে ছেলেটা।

থাক। যা হয়ে গেছে হয়ে গেছে। তুমিও ভুলে যাও সব; রমজানকেও মাফ করে দাও। সেকান্দরের দিকে চেয়ে বলল ফেলু মিঞা।

হাত কচলিয়ে এগিয়ে আসে রমজান। সেও আপস চায়।

হ্যাঁ, হ্যাঁ সেকান্দর। মিটিয়ে ফেল, এসব ঝগড়া বিবাদ এখন ভুলে যেতে হবে। ওদের কথায় সায় দেয় জাহেদ।

ঝগড়া কী বলছ? এ তো স্রেফ হার্মাদি, ডাকাতি, অন্যায়, জুলুম। এর বিচার হবে না? ঝাঁঝিয়ে ওঠে সেকান্দর।

অন্যায় নিঃসন্দেহে। কিন্তু ভাই, এসবের বিচার যে মুলতবি রাখতে হবে আমাদের। আজাদীর মনজিলে না পৌঁছে এ সবের কোনো মীমাংসা আছে বল? চটে যায় না জাহেদ। শান্তভাবেই বোঝাতে চায় ওকে।

তাই বলে একটা কী দুটো লোক যা খুশি তাই করে বেড়াবে? আর গোটা গ্রামকে সেটা সয়ে যেতে হবে? এ তোমার কী ধরনের কথা আমি বুঝি না। স্বরটা এবার উঁচুতে উঠে যায় সেকান্দরের।

ওহ্ তুমি এখনো বুঝছ না সেকান্দর। কার একটা ভিটি গেল, কার এক টুকরো জমি বেহাত হল সেসব নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় এখন? তা ছাড়া একলা তুমি, কার কয়টা সমস্যার সমাধান করবে বল তো? সমস্যা কী একা লেকুর, একা ফজর আলির? সব সমস্যার যে মূল সে মূলেই তো হাত দিয়েছি আমরা। এবার বুঝি অসহিষ্ণুতায় জাহেদের গলাটাও উঁচুতে উঠে আসে।

বেশ, তুমি যা ভালো বোঝ কর। হাল ছেড়ে দেয় সেকান্দর।

আমি দারোগাকে খবর দিয়ে দিয়েছি। এসে পড়ল বলে। মামলাগুলো তুলে নেওয়া হবে। কী বল? মওকা বুঝে সার কথাটা ছেড়ে দেয় ফেলু মিঞা।

হ্যাঁ, তাই করুন। কথাটা বলে আর বসল না জাহেদ। সেকান্দরের হাত ধরে ফেলু মিঞার কাচারি ছেড়ে নেমে এল দহলিজে। চল, মেলা কাজ পড়ে রয়েছে। হুরমতির ছেলেটাকে কবর দিয়ে আবার যেতে হবে সুলতানপুর। হাঁটতে হাঁটতে বলল জাহেদুর।

নিরুত্তর সেকান্দর। ও ভাবছে, কী বলবে লেকুকে। সেদিন সেকান্দরকে না বলে, কারো সাথে কোনো পরামর্শ না করে লেকু জমি রেহান দিয়ে ফেলু মিঞার বকেয়া খাজনা শোধ দিয়েছিল বলে ক্ষুব্ধ হয়েছিল সেকান্দর। আর আজ? লেকুর কাছে কী অর্থ এই আপসের? থলথলে সেই স্বাস্থ্যটা কী ওকে ফিরিয়ে দিতে পারবে কেউ? নাকি মুছিয়ে দিতে পারবে ওর গা ভরা সেই দায়ের কোপগুলো?

যে যারবা শিশুটিকে নিয়ে এত দুর্ভোগ হুরমতির, তার জন্য এত কান্না? গতকাল সেই সাঁঝ রাতে মরে গেছে ওর বাচ্চাটা। সেই থেকে বাচ্চা ছেলেটিকে আগলে ধরে কাঁদছে হুরমতি। লাঠিটা পায়ের তলায় রেখে বেলগাছে হেলান দিয়ে আঙ্গিনায় বসে আছে লেকু। কী যে করবে সেও যেন ভেবে উঠতে পারছে না।

হুরমতির নাকি ইচ্ছে মোল্লা আসুক, কারি আসুক। কারি অথবা খতিব সাহেব নিজের হাতেই মুর্দাকে গোসল করিয়ে দিক। একটু দোয়া দুরুদ পড়ুক। তার জন্য যা পয়সা দেবার রেওয়াজ তার চেয়ে বেশিই খরচ করবে হুরমতি। কিন্তু কে আসবে ওর ডাকে? ও তো একঘরে। ওর পাপের সন্তানকে কোন্ মোল্লা গোসল করাবে? কেউ রাজি হয়নি। লেকু, আম্বরি কত বার গেছে ঘরের ভেতর। বলেছে, দাও গোসল টোসল করিয়ে রাখি, মাস্টার এলেই দাফন করতে নিয়ে যাবে। কিন্তু মুর্দাকে ছুঁতেও দেয় না হুরমতি। হটিয়ে দিয়েছে ওদের। রাবু এসেছিল সকাল বেলায়। ওর কথায়ও কান দেয়নি হুরমতি।

দে তো হুরমতি, ওকে আমার কোলে দে। জাহেদ ওর সম্মতির জন্য অপেক্ষা করে না। মরা ছেলেটিকে কোলে নিয়ে আসে উঠোনে। কোলের উপর রেখেই ওকে গোসল করায় জাহেদ। সেকান্দর ঘড়া ধরে পানি ঢালে আস্তে আস্তে। ইপাব তৈরিঃ আল মোস্তাইন বিল্লাহ

দেখেছ। কী নাদুস নুদুস বাচ্চাটা কেমন টকটকে গায়ের রং! পানি ঢালতে ঢালতে বলে সেকান্দর।

হ্যাঁ, ছোট বেলায় আমিও নাকি এ রকম ছিলাম, আম্মার মুখে শুনেছি। দেখ দেখ, নাক চোখ গোটা মুখের আদলটা যেন আমার সাথেই মিলে যায়। শুকনা গামছা দিয়ে মরা ছেলেটির গায়ের পানি মুছতে মুছতে বলে জাহেদ। কী ইঙ্গিত করছে জাহেদ সেটা বোঝে সেকান্দর। কিন্তু বুঝেও চুপ করে থাকে সেকান্দর, কেননা এ ধরনের রসিকতায় অভ্যস্ত নয় ও।

কবর খুঁড়ে অপেক্ষা করছিল ফজর আলি।

বাচ্চাটাকে কবরের শয্যায় শুইয়ে দিয়ে বলল জাহেদ : যাক একদিক দিয়ে রেহাই পেল হুরমতি।

ছোট্ট একটা হু বলে নীরবে মাটি ফেলে যায় সেকান্দর।

কার ছেলেকে কবর দিয়ে এলে মাস্টার? ফিরবার পথে হঠাৎ শুধাল জাহেদ।

কেন, রমজানের? হুরমতি নাকি তাই বলে।

ফেলু মামার নয় তো? কে জানে!

কিছু দূর এসে রাস্তাটা দুখান হয়ে যায়। জাহেদকে বিদায় দিয়ে বাঁ-মুখী হয় সেকান্দর। ওর পেছনে লেকু আর ফজর আলি।

ওরা আপস চায়। তাই আপসই করে ফেললাম। দুদিকের মামলাই তুলে নেয়া হবে। কী বল? হঠাৎ লেকুর দিকে ফিরে বলল সেকান্দর। কী বলবে লেকু! কোনো অর্থ হয় না ওকে জিজ্ঞেস করার। কেননা কথা তো দিয়েই দিয়েছে সেকান্দর। তবু যেন ওর মতামতের উপরই নির্ভর করছে সব কিছু তেমনি ভাবে লেকুর মুখের দিকে চেয়ে রইল সেকান্দর।

কিছুই বলল না লেকু। চোখ জোড়া ওর পথের উপর স্থির। যেন পথটাকেই শুধু দেখছে ও। আর লাঠিতে ভর দিয়ে ডান পাটাকে একটু টেনে টেনে চলেছে ও। আরও কাছে এসে সেকান্দর যেন তন্ন তন্ন করে জরিপ করল ওর মুখটা। আশ্চর্য হয় সেকান্দর। লেকুর মুখে কোনো ভাব নেই, ভাষা নেই। বাড়ির কাছটিতে এসে একবার চোখ তুলে ও দেখল সেকান্দর মাস্টারকে। সে চোখে রাগ নয়, ক্ষোভ নয়, কেমন যেন ভর্ৎসনা। তারপর খেজুর পাতার দরজাটা ফাঁক করে ভেতরে ঢুকে যায় লেকু। লাঠিটা চাঙের উপর ছুঁড়ে রেখে সটান শুয়ে পড়ে চৌকিতে।

এই চৌকিটার গায়ে বিচিত্র এক গন্ধ। মৃত পিতার সেই বার্ধক্যের আর ওর নিজের কৈশোরের গন্ধ যেন। সে গন্ধের সাথে লেপা মাটি, তেলচিটে বালিশ, আম্বরির সেলাই করা কাঁথা, আম্বরির গায়ের গন্ধ, সব মিলে এমন এক বাস যাকে কিছুতেই সুবাস বলা চলে না। তবু উপুড় হয়ে শুয়ে জাম কাঠের গায়ে এক আস্তর চিটচিটে ময়লা জড়ানো আর ভুনির কত পেচ্ছাব গড়িয়ে যাওয়া সেই প্রাচীন চৌকিটার সাথে মধুর এক আত্মীয়তা অনুভব করে লেকু। আর সব গন্ধ মিলিয়ে সেই যে এক বিচিত্র গন্ধ, নাক ভরে সে গন্ধ টানে লেকু।

শরীরে বল আছে, মনেও যেন জোর পাচ্ছে লেকু। আজ তো গোটা সকাল আর এই দুপুর অবধি একবারও শোবার কথা ভাবেনি ও। হ্যাঁ, ওর মনে পড়ছে, জাহেদ সাহেবের কথা–সুদিন আসছে, সুদিন আসবেই–সে কথাগুলো শোনার পর থেকেই একটু একটু করে যেন শক্তি পাচ্ছে ও।

সেই সুদিনের কথাটা যেদিন থেকে গেঁথে গেছে ওর মনে সেদিন থেকে উরুর ওই ব্যথাটাও যেন ভুলে গেছে ও। ভুলে গেছে অনেক কিছু। সেই রাগ, সেই আক্রোশ

রমজানের বিরুদ্ধে, ফেলু মিঞার বিরুদ্ধে, তেমন করে যেন উন্মাদ করে না ওকে। ওর সেই সুদিনের স্বপ্নের কাছে ওরা যেন কিছুই না, ওদের গ্রাহ্য করে না লেকু।

ও ভাবে, থলথলে সেই শরীরখানি আর সেই তাকত, সে ফিরে পাবেই। আবার সে পাহাড়ে যাবে, বাঁশ কাটবে, ছন কাটবে। একটার পর একটা এমনি করে বারটা কী ষোলটা বাঁশ দিয়ে শক্ত করে বাঁশের ভেলা বাঁধবে। সে ভেলায় চাপিয়ে দেবে ছনের আঁটিগুলো, নিজেও চেপে বসবে। বাঁশের ভেলা ভাসিয়ে দেবে নদীর বানে। সেই বাঁশ আর ছনের সম্পদ এসে ভিড়বে তালতলির হাটে। নগদ পয়সা আসবে লেকুর হাতে। পয়লা কিস্তির টাকা দিয়েই একটা রাঙ্গা শাড়ি কিনবে আম্বরির জন্য। তারপর বর্ষা নামবার আগেই চলে যাবে দক্ষিণে ধান কাটতে, বদলা খাটতে। কার্তিকে যদি না গিয়ে পারে তবে যাবে না কোথাও, বাড়িতেই থাকবে। আর ওই জমিগুলো? সে তো ফিরে পাবেই। সুদিনে সে সব কী আর কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে? ভালোই হল। রমজানের দার কোপ খেয়ে শরীরটা জখমী হয়েছিল বলেই তো বন্ধ হল বিদেশ যাওয়া।

আঃ। বোঁজা চোখে তার মাঝেও বুঝতে পারে লেকু, জোর আসছে ওর বুকে, ওর মনে। তাকত আসছে ফিরে, শক্তি আসছে ধমনীতে। আবার সেই জোয়ান মরদের থলথলে শরীরটা যখন চলবে–মাটি কাঁপবে, থর থর করে মাটি কাঁপবে।

লেকু ঘুমিয়ে পড়ে।

২০.

স্কুল। গান। নতুন নতুন বইখাতা। কত যে খুশি। বাকুলিয়ার মালু, ফনফনিয়ে বেড়ে ওঠা মালু, এত খুশি কোথায় ধরে রাখবে ও?

এত খুশির খবর পেয়ে আপনাদের কথাও যেন খেয়াল থাকে না ওর। খেয়াল থাকে না রানুদি যে বলে দিয়েছে–রোজ টিফিনের ঘণ্টায় জলখাবার খেয়ে যাবি। আর সেই বড় হবার লজ্জা, গানের লজ্জা, সব লজ্জাই যেন চাপা পড়ে যায় এই খুশির তলায়।

কিন্তু এত খুশির মাঝেও কী যেন হয়ে গেল।

তালুর পেছন দিয়ে চোখ ডলতে ডলতে ক্লাস ছেড়ে বেরিয়ে আসে মালু।

কী হলরে মালু? শুধায় মাস্টার সাহেব।

সহানুভূতির ছোঁয়া পেয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে মালু।

আহা কী হয়েছে বল না। কাঁদছিস কেন? আবার শুধায় সেকান্দর মাস্টার।

ওই যতীন আমায় পয়লা বেঞ্চি থেকে তুলে দিয়েছে। ফোঁপাতে ফোঁপাতেই বলল মালু।

ভট্টচার্যি বাড়ির যতীন?

হা। বলে, ব্যাটা ম্লেচ্ছ ফার্স্ট বেঞ্চে বসেছিস কেন? ঠেলে দিল সেকেন্ড বেঞ্চে। উথলে উঠে মালুর কান্না। সার্টের খুঁট দিয়ে চোখ মুছে শুধাল, ও মাস্টার সাহেব, ম্লেচ্ছ কাকে বলে? ম্লেচ্ছ শব্দটা এর আগে শোনেনি ও।

হো হো করে হেসে দেয় সেকান্দর মাস্টার। মানেই জানিস না। আর ফোঁপ ফোঁপ করে কাঁদছিস?

বা রে। আমাকে উঠিয়ে দিল যে! প্রথম বেঞ্চি থেকে উঠিয়ে দেয়ার মতো এত বড় অপমানটার মাঝে হাসির কী আছে বুঝতে পারে না মালু। আর একবার উথলে ওঠে মালুর কান্না।

আচ্ছা ঘণ্টাটা শেষ হলেই মাস্টারদের ঘরে আসবি তুই। আমি যতীনকে ডাকছি। সেখানেই ফয়সলা হবে। সেকান্দর মাস্টার চলে যায়।

কিন্তু, ঘণ্টার শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারে না মালু। ওর ছোট্ট বুকটা যেন ভেঙে গেছে। ভয় বিস্ময় সম্ভ্রম মিলিয়ে ওর মনে যে স্কুলটির কল্পনা সে স্কুল যেন কোথায় মিলিয়ে গেছে। এ স্কুলটি অন্য স্কুল যেখানে ওর কোনো আব্দার খাটে না।

শব্দটার অর্থ সে বোঝে না, কিন্তু যতীনের বলার ঢংয়ে আর ক্লাস শুদ্ধ ছেলেগুলোর বিদঘুঁটে হাসিতে বুঝে নিয়েছে মালু, ওটা একটা গালি ছাড়া আর কিছুই নয়। জায়গা থেকে জোর করে তুলে দিয়ে আবার একটা গালিও দিল ছেলেটা? অনেক দিন আগের সেই সুগ্রীবের কথাটা মনে পড়ল মালুর। নেড়ে না কী একটা শব্দ সেদিন বেরিয়েছিল সুগ্রীবের মুখ থেকে। কিন্তু সেদিন তো সেটা গালি বলে মনে হয়নি মালুর? মালুর সমস্ত রাগটা কেন যেন যতীনের পরিবর্তে স্কুলের উপরই এসে পড়ল। স্কুলটাই খারাপ। এই স্কুলে পড়বে না মালু।

আস্তে আস্তে বাকুলিয়ার দিকে পা বাড়ায় মালু। ইপাব তৈরিঃ আল মোস্তাইন বিল্লাহ

রাসুদের বাড়ির কাছটিতে এসেই খুশি হয়ে ওঠে ও। কে যে কী বলেছে আর কখন যে কেঁদেছে ও সে যেন অনেক কাল আগেকার কথা।

সেই হাজামতো পুকুরটার পানি আরো কমে গেছে। পানির উপর থেকেই হাত দুয়েক নিচের পাঁক নজরে পড়ে। ঘাটের গুঁড়িতে পা ঠেকিয়ে এদিক ওদিক পলো ফেলছে রাসু। ঝপ ঝপ শব্দ তুলছে। আজও বুঝি মাছ ধরবার দরকার পড়েছে ওর।

শাড়িটা যেন রপতো হয়ে গেছে রাসুর। পরেছে গায়ের সাথে বেশ এটে সেঁটে। আঁচলটাকে প্যাঁচিয়ে এনে শক্ত করে কোমর বেঁধেছে। ওকে দেখে মালুর মনে পড়ে যায় তালতলির জেলে পাড়ার জালুনদের কথা। যখন মাছ ধরতে যায় তখন এমনি করে প্যাঁচিয়ে শাড়ি পরে ওরা। ছন্দ মিলিয়ে কথা বানায় মালু :

ও জালুনী
ঠেলা জালে যা ই বি?
বড় গাঙ্গে না ই বি?
সেই সাত পানির তলে
ঘাই মারে বোয়ালে,
জাল যে গেছে ঠেইক্যা
ডুব মারবি এইক্যা?

ও জালুনী
সাত নাইয়ের ঠাঁই
সেই গাঙ্গে যাই,
জাল টানমু হেঁইচকা
মাছ তুলমু ছেঁইক্যা
বিহান বাজার ধরমু
নুন মরিচ কিনমু,
ঘরে আবার ফিরমু।

সুর করে বলা কথাগুলো শেষ করতে পারে না মালু। পলো ছেড়ে রাসু কাদা তুলে নিয়েছে হাতে। সে কাদা ছুঁড়ে মেরেছে মালুর দিকে। জামাটা বুঝি নষ্টই হয়ে গেল মালুর।

চটেমটে থকথকে প্যাঁক ছুঁড়ে ওর জামাটা একসার করে দেবার মতো কী যে কারণ পেল রাসু বুঝতে পারে না মালু। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায় ও। জামাটার দশা

দেখে রেগে উঠতে চায়। কিন্তু রাসুর মুখের দিকে তাকিয়ে টিপ টিপ করে ওর বুকটা।

গোঁ গোঁ করে উঠে আসছে রাসু। ঘাটের গাছের গুঁড়িগুলোর উপর অযথা থপ থপ করে পা ফেলছে। রেগে বুঝি টং হয়েছে ও। গোসা করলি কেন রে? ওর পথ আগলে জিজ্ঞেস করল মালু।

জালুনী বললি কেন? যেন মহা অন্যায় করেছে মালু তেমনি রোষভরা চোখে তাকায় রাসু।

বা রে, জালুনী তো সুন্দর। ওই তোর মতো এঁটে শক্ত গিরো দিয়ে শাড়ি পরে ওরা। কত দেখি আমি বড় খালে। রাসুর ভুল ধারণাটা ভাঙাবার জন্য রীতিমতো উৎসাহিত হয়ে ওঠে মালু।

বেয়াদব কোথাকার। ফের বলবি তো ঠুসিয়ে থুতনি ভেঙে দেব তোর। জালুনী না ছোটজাত?

মালু দেখল বলতে বলতে আরও লাল হয়ে উঠেছে রাসুর মুখখানা। অন্য দিনের মতো চিকন চাকন শরীরটাকে নাচিয়ে ছুট দিল না রাসু। পলোটাকে হাতে নিয়ে আস্তে আস্তে চলে গেল বাড়ির দিকে।

ওর ব্যবহারে, ওর কথার ঢংয়ে আশ্চর্য হয়ে যায় মালু। বোলে চলনে কেমন সেয়ানা ঢং। কেমন সেয়ানা রাগ।

মনটা আবার খারাপ হয়ে যায় মালুর। হঠাৎ স্কুলে যতীনের সাথে সেই ঝগড়ার কথাটাও মনে পড়ে গেল। পানিতে ভরে গেল মালুর দুটো চোখ। একটু আগেও কেঁদেছে ও। এখুনি আবার কান্না পেল। ছোট্ট বুকে কোথায় যে এত কান্নার বাসা আর একটুতেই কেন যে ঠেলে আসে সে কান্না, বুঝতে পারে না মালু।

জামাটা গা থেকে খুলে উল্টে নিল মালু। উল্টো দিকে মাটির দাগটা চোখে পড়ে না। জামাটা তা করে বইয়ের সাথে বগলে পুরে হাঁটা দিল।

হাঁটতে হাঁটতে ভাবে মালু। ওদের মতো তো নয় মেজো ভাই? মালুর গান শোনার জন্য কত হাত বুলানো ওর পিঠে কত মিষ্টি কথার আদর মেজো ভাইয়ের। সেদিনের কথাটা মনে হতে আজও খুশিতে ফুলে ওঠে মালুর বুক।

ও যে গান করে, কথাটা কেমন করে যেন জেনে ফেলেছে জাহেদ। ওকে কাছে ডেকে বলল, তুই নাকি লুকিয়ে লুকিয়ে গান করিস?

আমাদের একটা শোনা তো?

দুনিয়ার লজ্জা এসে ঘিরে ধরে মালুকে। ও বলে, না।

মিথ্যে কথা বলছিস? বলেছি না তোকে, মিথ্যে বলা অন্যায়?

তিরস্কার পেয়ে যেন এতটুকু হয়ে যায় মালু। কিন্তু, লজ্জাটা কেমন করে কাটাবে ও। রেলিঙে ঠেস দিয়ে মুখ টিপে টিপে হাসছে রাবু আপা। বড় আপা তো যেন আকাশ থেকে পড়েছে। মালু বুঝতে পারে মুখটা তার লাল হয়ে উঠেছে, কান দুটো গরম হয়ে আসছে।

অত লজ্জা কিসের? গা। এবার নরম আদরমাখা স্বরে বলে জাহেদ। হাতের জোড়া তালু দিয়ে মুখটাকে বুঝি আড়াল করল মালু। চোখ বুজল। মরিবাঁচি করে গেয়ে ফেলল গণি বয়াতির মুখে শোনা একটি প্রেমের গান। চিরন্তন যে প্রেমের ধারায় সিঞ্চিত মানুষের মন, এ বুঝি তারই বন্দনা। জীবনের নিষ্ঠুর যাঁতাকলে পিষ্ট গাঁয়ের মানুষ যুগে যুগে যে প্রেমের স্বপ্ন দেখে, যে প্রেমের কল্পনা দিয়ে অভাব জর্জর জীবনের নগ্নতাকে ঢেকে দেয়, ভক্তির রসে সিক্ত হয়ে খুঁজে পেতে চায় বাঁচার কোনো অর্থ। স্মরণাতীত কাল থেকে বুঝি এই প্রেম-আকুলতাই সহনীয় করে রেখেছে ওদের দৈন্য ভরা নিরানন্দের দিনগুলোকে।

প্রথমে একটু আড়ষ্ট শোনায় মালুর স্বর। এক লাইন দু লাইন গেয়েই সহজ হয়, স্পষ্ট হয়। তার পর সুর ঝরে ওর কচি কণ্ঠে।

শোনরে আশেকগণ
প্রেমেরই বিধান
প্রেম বিনা বেহেশতো নসিব
না হয় মন।

প্রেমের মরা জলে ডুবে না।
যে না জানে প্রেমের মরমো
তার সনে প্রেম কইরো না।
আহা প্রেমের মরা জলে ডুবে না।

চণ্ডীদাশ আর রজকিনী
তারা যে প্রেমের শিরোমণি-গো
আরো বারো বছর বাইলো বরশি
তবু আদার গিলে না

আহা এমন প্রেমিক কয়জনা
প্রেমের মরা জলে ডুবে না।

গণি বয়াতির গানটা অনেক লম্বা। লাইলি মজনু ইয়সুফ নবী আর জোলেখা বিবি আরো কত কিস্সার বয়ান আছে গণি বয়াতির গানে। কিন্তু মালু এটুকু গেয়েই থেমেছিল।

সাবাশ সাবাশ, মালুকে বুকের কাছে টেনে এনেছিল জাহেদ।

আর রাবু আপা ওর চিবুকটা তুলে ধরে বলেছিল, বাহ্ খাসা গলা তো তোর। এতদিন লুকিয়ে রেখেছিলি?

ইস্ রাসু যদি দেখত সে সব! রাসুর অকারণ গোসাটার কথা মনে পড়ে আবারও বড় খারাপ লাগে মালুর।

কিন্তু জাহেদকে সেদিন গান শুনিয়ে কী যে বিপদে পড়েছে মালু। তক্ষুণি তক্ষুণি ওকে নিয়ে বসে পড়ল জাহেদ। যেন স্কুলের সবক দিয়ে যথেষ্ট হচ্ছে না, গানেরও সবক দিতে হবে।

শোন্ মালু, ওসব গান বাদ দে তুই। আমি তোকে নতুন গান শেখাব।

বাহ্ মেজো ভাই গানও শেখাবে? মালু তো আহ্লাদে আটখানা। ঘাড় নেড়ে সায় দিয়েছিল ও।

কিন্তু আসল কাজে আসবার আগে কত যে বক্তৃতা ভনিতা মেজো ভাইয়ের। সে এক জ্বালা আর কী। এক বর্ণ না বুঝেও শুনে গিয়েছিলো মালু : নতুন গান তোর ওই প্রেমের গান নয়। নতুন গানে থাকবে তলোয়ারের মতো ধার, বিদ্যুতের মতো ঝিলিক আর বজ্রের মতো হুংকার। সে গানে ঘুম ভাঙবে মানুষের জড়তা কাটবে, জেগে উঠবে মানুষ। সে আবার কী? মালুর চক্ষু চড়কগাছ।

তারপর নিজেই গেয়ে গেছিল জাহেদ। চলরে চল–ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল, নিম্নে উতলা ধরণীতল... আর সেই "শিকল পূজার পাষাণ বেদী...কারার ওই লৌহ কপাট..." গানগুলো গেয়ে আবার এক ছোট বক্তৃতা দিয়েছিল জাহেদ।

নজরুলের গান। জেহাদের গান, জেহাদী সুর। সেই রক্ত টগবগান সুরে প্রলয় নাচন তুলবি মানুষের বুকে, মানুষের রক্ত কোষে, শিরায় শিরায়। মালুকে এই নতুন গানগুলো শিখিয়েই ক্ষ্যান্ত হয়নি জাহেদ, মিটিংয়ে সভায় নিয়ে গেছে ওকে। হাজার হাজার মানুষের সুমুখে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলেছে–নে গলা ছেড়ে গা।

মালুর ছোট্ট মন অভিভূত হয়েছে এই নতুন সুরের দমকে। কোনো অগ্নিঝলকে ওর কচি শিরাগুলো গানের সাথে জ্বলে উঠে, সুরের সাথে তাল মিলিয়ে টন টন করে বেজে উঠে ওর ভেতরটা। ওর রক্তেও যেন প্রলয় ডাকে, জেহাদী সুরে কী এক নাচন জাগে ওর শিরায় শিরায়। বেসুমার লোক। ওর গান শুনে হাততালি আর বাহবায় ফেটে পড়ে মানুষগুলো। সাবাস জিতা রহো, ওর পিঠ চাপড়ায় জাহেদ। সেই থেকে মালু তো প্রায়ই এদিক সেদিক ঘুরে আসছে জাহেদের সাথে। আর তা নিয়ে সেকান্দর মাস্টার আর জাহেদের কথা কাটাকাটির অন্ত নেই।

এতে স্বভাব নষ্ট হবে, পড়া শোনারও ক্ষতি হচ্ছে ওর–বলে সেকান্দর।

পড়ার একটু ক্ষতি হবে বৈ কী? তা পুষিয়ে নেবে মালু। তাই না রে? সেকান্দরের কথাটা গায়ে না মেখে যেন মালুরই সম্মতি চায় জাহেদ।

মেজো ভাইয়ের ডাকে মালু তো হরদম এক পা। ঘাড় নেড়ে সায় দেয় ও। মাস্টার সাহেব যেন কী! গান গাইলে স্বভাব নষ্ট হয়, এ কোন ধারা কথা? মাস্টার সাহেবের কথাগুলো একটুও পছন্দ হয় না মালুর। কত লোক। কাতারে কাতারে। সবগুলো চোখ চেয়ে থাকে মালুর দিকে। মালুর সুরে ওদের রক্তও বুঝি নেচে ওঠে। ইস্ একদিন যদি দেখত রাসু। তা হলে অমন করে নাক সিঁটকাতে পারত? বলতে পারত বেয়াদব? তাই সই। মালু যদি বেয়াদবই হয় তবে আর কোনো দিনই মালু যাবে না ওদের বাড়িতে। আর যদি বা যায়ই হাজার তোষামোদ করলেও রাসুর সাথে কখনও কথা বলবে না মালু। আর কথা দু একটা যদিই বা বলে গান আর শোনাচ্ছে না মালু। এটা মালুর কসম।

রাসুকে এমন কঠিন শাস্তি দিতে দিতে কখন যে বাড়ি পৌঁছে গেছে মালু, সেটা খেয়াল পড়েনি। খেয়াল হল জাহেদের ডাকে : জামা লুঙ্গি গামছা সব পরিষ্কার করে রাখ মালু। আসছে কাল বিকেলেই সাম্পান ধরব। এবার যেতে হবে অনেক দূরে।

কাদা ভরা জামা আর বইগুলো টেবিলের উপর রেখে ছুটে যায় মালু। অনেক দূর? কত দূর মেজো ভাই?

এ হাট থেকে সে হাট। এ বাজার থেকে সে বাজার। সাম্পান কুলে ভিড়ে। ওরা উঠে যায় পাড়ে। জাহেদ, সেকান্দর মাস্টার ফেলু মিঞা বক্তৃতা দেয়। মালু গান করে। আবার সাম্পান ছাড়ে। আর এক হাটে গিয়ে ভিড়ে। মাঝে মাঝে রমজানও এসে যোগ দেয় ওদের সাথে। কত কিছু দেখে মালু। নতুন নদী, নতুন নতুন গাঙ, খাল। নতুন জায়গা। দুনিয়াটা যে এত বড় কোনো দিন ভাবতে পেরেছিল মালু?

সাম্পানে চড়ে ঘুরতে ঘুরতে মনে হয় মালুর, ওর ভেতরে ভেতরে কে যেন সাধারণ গান গেয়ে চলেছে। সে গানের বিরাম নেই, যতি নেই। ঘুমের মাঝেও সে গান যেন গুন গুন করে বাজে। মালু ছাড়া আর কেউ শুনতে পায় না সে গানের সুর।

সাম্পান তীরে বেঁধে কখনো বা ওদের হেঁটে যেতে হয় অনেক দূর। হাঁটতে হাঁটতেও নিজের ভেতর সেই নিঃশব্দ তান শুতে পায় মালু, বুকটা যেন ওর ভরে যায় কথায়, সুরে গানে। কত যে কথা। কত যে সুর। সবটার হদিস করতে গিয়ে মাথাটা কেমন গুলিয়ে যায় মালুর। এইটুকু বয়সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। ওর কৈশোরটা যেন হঠাৎ হাত বাড়িয়ে জানা অজানা অনেক কিছুকে জড়িয়ে ধরেছে। কিন্তু ছোট্ট সে হাতের বেড়ি, সামান্য তার শক্তি তাই সবটাকে ধরে রাখতে পারছে না ও।

এই তো খাসা খুলেছে তোর গলা। ইস্পাতের ধার, বজ্রের ডাক অগ্নিবীণার ঝংকার এই তো আসল সুর। প্রাণ মাতানো জীবন জাগানো সুর। মালুর পিঠ চাপড়ে উচ্ছ্বসিত হয় জাহেদ। ঠিক এই সময়টিতেই মালুর মনে পড়ে যায় রাসু আর রাবু আপার কথা। রানুদির কথাও।

কেমন যে দেমাক দেখায় রাসুটা। অথচ ঠিক তার উল্টো রাবু। মুচকি মুচকি হাসে রাবু আর বলে, তুই বুঝি শেষ পর্যন্ত গায়েন হবি রে? তার পরই হয়ত বলে বসল রাবু, শোনা তো একটা নতুন কিছু। সেই মুহূর্তেই হয়ত প্রস্তুত নয় মালু। না করে বসল ও। আর যায় কোথায়, অমনি রাবু বলবে বেশ আমিও বলে দিচ্ছি মুনশীজীকে।

মুন্‌শীজী অর্থাৎ মালুর আব্বাকে জানানোর অর্থ তো ভয়াবহ। প্রথমেই বেত্রাঘাত, অতঃপর যে কী, ভাবতেও গাটা বরফ হয়ে যায় মালুর। মালুকে যে মৌলভী বানাবেন এ আশা এখনো ছাড়েননি তিনি। তাই যে দু চারদিন জাহেদের সাথে বাইরে কাটায় সে কয়টা দিন বাদ দিয়ে সকাল বেলার আরবী ফারসী সবকের জ্বালাতনটা নিত্যদিন সয়ে যেতে হচ্ছে মালুকে। মুচকি মুচকি হেসে মজা দেখে রাবু। শেষ পর্যন্ত গান শুনিয়ে তবে রেহাই পায় মালু।

কেমন করে যেন রানুর কানেও পৌঁছে গেছে খবরটা। ভারি খুশি রানু। বলেছে, আসিস হারমোনিয়ামটা শিখিয়ে দেব তোকে। ভালো কথা। দু একদিন গিয়ে যন্ত্রটা যে টিপে টুপে দেখেনি মালু তা নয়। কিন্তু কেমন যেন ওটা ধাতে আসে না মালুর। তাছাড়া বসে বসে প্যাঁপু করার সময়ই বা কোথায় তার? দুদিনেই হারমোনিয়ামের উৎসাহে ভাটা পড়ে গেছিল মালুর।

কিন্তু সেদিন অমন গম্ভীর হয়ে গেছিল কেন রানু? অমন রূঢ় আর কর্কশ গলায় ধমকেই বা দিল কেন মালুকে?

জাহেদের সাথে সফরে বেরুবার দিন। টিফিনের ঘণ্টায় রানুদের বাড়ি গেছিল মালু। প্রথম কথায়ই শুধিয়েছিল মালু : আচ্ছা রানুদি ম্লেচ্ছটা কী গাল?

কে বলেছে? গম্ভীর হয়ে শুধিয়েছিল রানু।

ওই ভট্টচায্যিদের ছেলে যতীন। রানুর অকারণ গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে ভয়ে ভয়েই বলেছিল মালু।

ওসব পাজী ছেলেদের থেকে দূরে থাকলেই পারিস? ওদের সাথে গা ঢলাঢলি করলে কী চলে না তোর?

শোন রানুদির কথা। এক ক্লাসে পড়ে, পাশাপাশি বেঞ্চিতে বসে আবার দূরে থাকা যায় কেমন করে?

আচ্ছা, মালু, না হয় দূরেই থাকলো। কিন্তু অমন করে খেঁকিয়ে উঠবার কী কারণ ঘটল রানুদির? সভা সমিতি বক্তৃতার এত হুল্লোড় আর ওর মনের ভেতর এত যে গানের উত্তেজনা, তার মাঝেও কথাটা মনে পড়ে মালুর। রানুদির সেই গম্ভীর মুখখানি যেন উড়ে উড়ে চলেছে ওর পাশে পাশে। ইপাব তৈরিঃ আল মোস্তাইন বিল্লাহ

নদী ছেড়ে গাঙ্গ, এ গাঙ্গ সে গাঙ্গ ঘুরে আবার উল্টোমুখী হয় ওরা। চাটখিলে এসে নেমে পড়ে জাহেদ আর সেকান্দর মাস্টার।

এখানে তোর দরকার নেই। আমরা হেঁটে হেঁটে কয়েকটা বাড়ি ঘুরনী দিয়ে চলে আসছি। তুই যা।

জাহেদের কথা মতো সাম্পানে চড়ে একলাই ফিরে এল মালু। বড় খালে সামপানটাকে বিদায় দিয়ে কোনাকুনি দখিন ক্ষেতটা পেরিয়ে এল। মিঞাদের সুপরি বাগানটা আড়াআড়ি কেটে ভুঁইঞা বাড়ির পাটিপাতার বাগানটা দু ফাঁক করে একটু ডান ঘেঁষে রাসুদের বাড়ির পেছনের সেই না-ডোবা না-পুকুরটির পাড়ে উঠে আসে মালু। রাসুদের সীমানা পার হলেই পর পর সৈয়দদের কয়েকটা গড়। সে গড়গুলোর পর সৈয়দ বাড়ির অন্দর মহলের পাড়-উঁচু পুকুর। সেদিকেই পা বাড়ায় মালু। কিন্তু পা-টা একটু খানি উঠেই থমকে থাকে, মাটিতে পড়ে না। ওর কানে আসছে :

মালু বয়াতি! মালু বয়াতি!
যাও কই?
উধমপুর।
রান্ধ কী?
কইতরের ঠ্যাং।
খাও কী?
কচুর শাক!

রাসুর গলা। একটুও ভুল নেই তাতে। পশ্চিমের পাড়টা কচুর জঙ্গলে ভরে গেছে। সেখানে লতি তুলছে রাসু। মাথাটা একবার উঁচু করেই একটা বড় রকমের কচু গাছের আড়াল নিয়ে বসে পড়ে রাসু।

মুহূর্তে কয়েকদিন আগের কসমটি ভুলে গেল মালু। এক দৌড়ে রাসুকে ধরে ফেলল। হাতটি ধরে ঝটকা টানে নিয়ে এল কচু পাতার জঙ্গলের বাইরে। একটুও বাধা দিল না রাসু। পথের ধারে পড়ে থাকা ঝুমকো লতার মতোই মালুর হাতের সাথে প্যাঁচিয়ে চলে এল ও। একটু ফর্সা জায়গা দেখে বসে পড়ল ওরা। কিন্তু ওর চোখের দিকে তাকিয়ে মালু যেন বোকা বনে যায়। মিঞাদের বড় পুকুরটার অথৈ জলের মতো কেমন শান্ত আর গভীর রাসুর চোখ। এমন চোখ আগে কখনো দেখেনি মালু। এতদিন কোথায় ছিল রাসুর এই চোখ?

ছাড়, বলে হাতটা ছাড়িয়ে নেয় রাসু। আর হাসে ও, যে হাসিটা সেই শাড়ি পরার দিন থেকেই জায়গা পেয়েছে রাসুর ঠোঁটের কোণে।

একি হল মালুর? কথা বানিয়ে সে সুর দেয়। কথা তার গান হয়ে বাতাসে ভাসে। সেই মালুর সব কথা গুলিয়ে যায়! এমনটি তো কোনোদিন হয়নি মালুর? অথচ কত কথাই তো শোনাবার রয়েছে রাসুকে। মালুকে সত্যি সত্যি বোকা বানিয়ে আরও একবার হাসল রাসু। দুষ্টুমির রেশ নেই, কেমন বাঁকা টানের আলাদা কিসিমের হাসি। অনেক বড় হয়ে গেছে রাসু। রাসু সবই বোঝে সবই জানে। ওই হাসিতে আর একটু রাংগা মুখের আদলে সে কথাই তো লেখা আছে। কিন্তু মালু রয়াতি, যতই গান জানুক সে, রাংগা মুখ আর চোখের ঠারে ফুটে ওঠে যে সব কথা, সে সব কথার যে কী জবাব, সে তো শেখা নেই তার।

মিঞা পুকুরের অথৈ জলের মতো শান্ত আর গভীর চোখ জোড়া রাসু সোজা তুলে ধরল মালুর দিকে। ওর মুখে সেই সেয়ানা হাসিটা যেন এখন ঠাঁই নিয়েছে ওর

চোখের ক্ষেতে। হেসে খেলে যেন নেচে উঠল সেই শান্ত চোখ। ছড়ার মিলে বলল রাসু :

ইস মুরোদ নাই দুই আনা
বউ চাই সেয়ানা?

এতক্ষণ কথা আসেনি মুখে, এবার মাথাটাও বুঝি গুলিয়ে গেল মালুর। এর পর আর এক অবাক কাণ্ড করল রাসু। হঠাৎ মুখখানি গুঁজে দিল মালুর কোলে। নিথর পড়ে থাকল যেন ঘুমিয়ে গেছে।

কোলের উপর রাখা মালুর হাতখানি রাসুর বুকের তলার ত্রস্ত্র শালিকের ডানার মতো কেঁপে উঠল। সে কাঁপুনিটা যেন আচমকা ঝিলিক তুলে ছড়িয়ে পড়ল ওর গোটা শরীরে। অবাক! অবাক মানে মালু। এমন করে তো কোনোদিন কাঁপেনি ও? তারপর ওর মনে হল কোত্থেকে যেন এক দমক গরম হাওয়া ছুটে এল। সে হাওয়ার আঁচ লেগে যেন পুড়ে গেল ওর মুখ, গলা, হাত, ওর সমস্ত শরীর।

রাসুর খোঁপায় এক জোড়া কদম ফুল। কুণ্ডলী পাকানো সাপের মতো কেমন উদাসীন আলসেমিতে পড়ে থাকা খোঁপার দুধারে ঝুলে রয়েছে ফুলগুলো। আস্তে করে নাকটা ওর খোঁপার চুলে ডুবিয়ে দিল মালু। কদমের গন্ধ আর ওর চুলের খোসবু টানল বুক ভরে। যেন ফিসফিসিয়ে বলতে চাইল মালু : মুরোদ আমার আছে রে, মিছে ভয় পাচ্ছিস তুই। আচমকা উঠে দাঁড়ায় রাসু। মালুর হাত দুটো অকারণ জোরে ছুঁড়ে দেয়। ফোঁস ফোঁস করে নিশ্বাস ছাড়ে, যেন দারুণ অপমানিত হয়েছে ও। মালু দেখল অথৈ পানির শান্ত গভীরতা হারিয়ে চোখ দুটো রাসুর জোনাকির মতো জ্বলে উঠেছে।

কী আমার মুরোদ রে!... ফোঁসফুসিয়েই বলল রাসু আর কী যে ঝাঁঝ ছড়াল। কোথা থেকে এত ঝাঁঝ এল রাসুর গলায়? ওর দিকে তাকিয়ে যেন দিশে হারায় মালু।

আর কিছু বলল না রাসু। মালুর দিকে চাইলও না একটিবার। লতির আঁটিটা হাতে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল কচু পাতার জঙ্গলের ওপারে।

মালুর বুকটা কেন যেন ভারি হয়ে গেল। মনে হল ওর কী এক কান্না জমেছে সেখানে। কিন্তু চোখ দুটো ওর জ্যৈষ্ঠের ক্ষেতের মতোই শুকনো। এতদিন মালুর শরীরটাই বুঝি ফনফিনিয়ে বেড়ে উঠছিল। আজ হঠাৎ করে ওর মনটাও যেন বয়সের ছোঁয়া পেল, এক লাফে যেন বেড়ে গেল মালু অনেকখানি।

সূর্যটা লাল হয়ে এসেছে। সন্ধ্যা নাববে এক্ষুণি। গড়গুলো পেরিয়ে সৈয়দ বাড়ির অন্দর মহলের পুকুর পাড়ে উঠে এল মালু। হঠাৎ ঢোলের আওয়াজ শুনে কানটা ওর খাড়া হয়ে ওঠে। কিছুক্ষণ ধরেই ঢোলের আওয়াজ আসছিল, কিন্তু সে দিকে কান ছিল না মালুর। বাকুলিয়ায় ঢাক-ঢোলের রেওয়াজ নেই। বছরে শুধু একদিনই ঢোল বাজে এ গাঁয়ে, মিঞাদের পুইন্যার সময়। কয়েক পা এগিয়েই মালুর আর সন্দেহ রইল না, সৈয়দবাড়ি থেকেই ভেসে আসছে ঢোলের আওয়াজ। ঢোলকের তালের সাথে সাথে টুং টুং কী এক বাজনাও বাজছে যেন। সৈয়দবাড়িতে বাজনা? সূর্যের পশ্চিম দিকে ওঠার মতোই এ এক অসম্ভব অকল্পনীয় ব্যাপার। ঢাক-ঢোল বাজনা ওসব হল সেরেকি ব্যাপার, হিন্দুয়ানী কারবার। তাই সব রকমের বাজনাই নিষিদ্ধ এ বাড়িতে। পুইন্যার সময়ও কোনো ঢোল বাজতে পারে না সৈয়দবাড়িতে। পায়ের গতিটা বাড়িয়ে দেয় মালু।

২১-২৫

কাচারি বাড়ি পৌঁছে চক্ষু স্থির মালুর। এলাহি কাণ্ড কাচারি বাড়ির ময়দানে। কারা যেন মাতম জুড়েছে। অদ্ভুত ওদের ভাব-ভঙ্গি। সংখ্যায় ওরা তিরিশ কী চল্লিশ হবে, কিন্তু গোটা মাঠ জুড়ে ওদের বিচিত্র তাণ্ডব। কেউ বা এলোপাতাড়ি লাফ ঝাঁপ দিয়ে চলেছে। কেউ বা বুক চাপড়ে কপাল থাপড়ে মাতম করছে। গায়ে ওদের জামা নেই কারও। পরনে শুধু কম্বল, তাও মাতমের ঘোরে কখন যে কোমর থেকে খসে পড়ছে–খেয়াল নেই ওদের। কেউবা কোনো রকমে আঙ্গুল দিয়ে কম্বলটাকে ধরে রেখেছে মাত্র।

ওরা যে যিকির করছে তাতে সন্দেহ নেই মালুর। কেননা মুখে ওদের আল্লাহর কালাম। কিন্তু এ কোন্ ধারা যিকির! এমন তো কখনো দেখেনি মালু?

ওদের চোখ বোঁজা মুখে বিচিত্র তন্ময়তা। ওরা যেন বেহুঁশ দেওয়ানা। কিন্তু হাত-পায়ের সঞ্চালন কেমন উগ্র। সে উগ্রতাকে ছাড়িয়ে হঠাৎ কী এক করুণ বিলাপের সুরে ভেঙে পড়ছে ওরা, পর মুহূর্তেই যেন লড়াইয়ের হুংকার ছেড়ে লাফিয়ে উঠছে, ধপ করে পড়ছে মাটিতে। একই সাথে হু হু বিলাপ আর হুংকার মিলিয়ে বিচিত্র এক শব্দ নির্ঘোষ বাতাস দুলিয়ে মাটি কাঁপিয়ে কোনো ভিন্ন জগতের আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে কাচারি বাড়ির মাঠে। কেমন ভয় ভয় করে মালুর। গায়ের লোমগুলো ওর দাঁড়িয়ে যায়। পর মুহূর্তেই আবার ওদের ঢোলকের তাল দেহের শিরায় কী এক নাচন তুলে যায়, ওদের দেওয়ানা নৃত্য বুঝি দর্শকদেরও ডাক দিয়ে যায়। বড় গোছের একটা ভিড় জমেছে ওই মস্তানাদের ঘিরে।

কিছু দূরে কয়েকজন কম্বলধারী একান্ত বৈষয়িক কাজে ব্যস্ত। কেউ হ্যাজাক জ্বালাচ্ছে, কেউ শান দিচ্ছে ছুরিতে। কয়েকজন মাটি খুঁড়ে ইট বসিয়ে কাজ-চালান উনুন বানাচ্ছে। এক পাশে গোটা তিন জবাই করা খাসি-ছাগল ছটফট করছে এখনো। আরও একটা খাসি বাঁধা রয়েছে মাঠের কোণে নারকেল গাছটার সাথে। চমকে উঠল মালু, এ-যে রাবু আপার খাসিটা! রক্ত জবজব মাটিতে ছটফটিয়ে কী কাতর গোঙানি তুলছে জবাই করা খাসিগুলো, রাবুর খাসিটা সেদিকে চেয়ে রয়েছে, করুণ ভয়ার্ত ওর চোখ জোড়া। কাচারি ঘরের পেছন দিয়ে ঘুরে সেই নারকেল গাছটার কাছে পৌঁছে গেল মালু। চটপট খুলে দিল দড়িটা। পরিচিত লোক দেখে চোখ তুলে তাকাল খাসিটা। গলা দিয়ে কেমন অস্ফুট একটা শব্দ করল। গভীর এক অন্তরঙ্গতায় মাথাটা বার দুই ঘষে দিল মালুর পায়ের সাথে। তার পর ছাড়া পেয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল পাশের গেণ্ডারী ক্ষেতের নিরাপত্তায়।

মস্তানারা যিকিরে ব্যস্ত। এদিকে কম্বলধারীরা ব্যস্ত রান্নার আয়োজনে। কেউ লক্ষ করল না মালুকে।

মস্তানাদের কাছাকাছি সরে এল মালু। দাড়ি-গোঁফের আড়ালে মুখগুলো ওদের ঢাকা। বাবরি চুলের গোছা তেল-সাবানের অভাবে জটা পাকিয়েছে, যেন অনেক যুগের কালি-ঝুলি মাথার চাঁদি থেকে ঝুলে রয়েছে। খতিয়ে খতিয়ে দেখেও একটা চেনা লোক বের করতে পারল না মালু। অবাক হয় মালু। দিব্যি জাঁকিয়ে বসেছে লোকগুলো, যেন ওদেরই ঘর-বাড়ি। অথচ বাড়ির লোক মালু চিনতে পারছে না কাউকে।

সহসা যিকির থেমে গেল। ঢোলের আওয়াজ স্তব্ধ হল। মস্তে মাওলারা বুঝি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। গোল হয়ে বসে পড়েছে সবাই। শুধু জনা দুই হাঁটু গেড়ে মাটিতে মুখ গুঁজে উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে। থর থর কাঁপছে ওদের শরীর। ওদের ক্লান্ত কণ্ঠ ভেঙে নিঃসারিত হচ্ছে ক্ষীণ আওয়াজ–আল্লাহু আল্লাহু। এখনি হয়ত যযবা উঠবে ওদের। এটা তারই পূর্ব লক্ষণ।

হঠাৎ সন্ধ্যার আনমনা বাতাসকে চমক দিয়ে ঝংকার তোলে দোতারার মিষ্টি বোল। আর যেন মন্ত্র নির্দেশে থেমে যায় সমস্ত কোলাহল। যারা খাসির ছাল ছাড়াচ্ছিল, যারা রান আর সিনার গোসতগুলো কেটে কেটে পৃথক পৃথক ভাণ্ডে রাখছিল তারাও ছুরিটাকে পাশে রেখে উৎকর্ণ হয়। যারা তামাশা দেখছিল তারাও কান খাড়া করে।

নিবিষ্ট দোতারার মারফতি সুর পাখা মেলে দেয় সন্ধ্যার মিঠেল বাতাসে। এক মনে অনেকক্ষণ ধরে তারের গায়ে আঙ্গুল চালিয়ে যায় মস্তানা শিল্পী। সুরের দমকে শিল্পী বুঝি মানুষগুলোকে টেনে নিয়ে যায় মাটির ঊর্ধ্বে কোনো দূরের দুনিয়ায়। হঠাৎ সুর পাল্টায় ও, গান ধরে। সকল মস্তানা কণ্ঠ মিলায়। গানের প্রথম কলিটা কানে যেতেই চোখ যেন খুলে গেল মালুর। মস্তানাদের পরিচয় পেয়ে খুশিই হল ও। রাবু আপার আব্বার কীর্তিই। তা না হলে সৈয়দ বাড়িতে এমন শেরেকী তাণ্ডব অনুষ্ঠানের দুঃসাহসটা কারই বা হবে! কিন্তু, কোথায় তিনি? সেই কবে একদিন কী দুদিনের জন্য তাকে দেখেছিল মালু। ছোট্টটি ছিল ও, মনেও নেই তার মুখ। তবু ওর মনে হয় সমবেত গানে যার ভূমিকাটা প্রধান, তিনিই হবেন রাবু আপার আব্বা। হ্যাঁ নাকে চোখে আর কপালে ঠিক রাবু আপার মুখের ঢক। তার পাশেই উপুড় হয়ে যে মস্তানা যিকিরের ক্ষীণ আওয়াজ তুলে চলেছে তার শরীরের কাঁপুনিটা যেন বেড়ে গেছে।

ঢোলকের মৃদু তালে একতারার ঝংকারে শির দুলিয়ে দুলিয়ে গেয়ে চলেছে মস্তানার দল!

ভাণ্ডারিতে আজবী কারবার
ওহহ কী চমৎকার।
সাজাইল মারফতের তরী
দেখবি যদি আয়
চড়বি যদি আয়-আহা মাইজ ভাণ্ডার,
ওহো কী চমৎকার।
ভাণ্ডারীতে আজবী কারবার।
ওরে হিন্দু-মুসলমান।
তোরা দেশে দশে এক প্রাণ
তোরা ভক্তি কর আওলিয়ার চরণ
ওরে চিন্তা ভবে নাই আর
ওহো কী চমৎকার,
ভাণ্ডারীতে আজবী কারবার।

কী-ই-বা গানের কথা, কী-ই-বা তার ভাব। তবু অন্তর নিঃসৃত ভক্তির রস ঢেলে ওরা সৃষ্টি করে অপূর্ব এক সুর দ্যোতনা। ওরা বুঝি জাত-শিল্পী। মজনু হৃদয়ের গভীর অনুভূতি আর ভাব-জগতের কোনো অদৃশ্য অপার্থিবকে স্পর্শ করার আকুলতা, বুঝি গানের সুরে ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্ব চরাচর কাঁদিয়ে তুলেছে এই সাঁজ রাতের মৌন প্রকৃতিটাকে। মালু দেখল মস্তানাদের চোখ ভাসিয়ে দর দর বেগে নেবে আসছে পানির ধারা।

কাচারি ঘরের দোরগোড়ায় এসে মালুর চোখটা যেন হোঁচট খেয়ে থমকে দাঁড়ায়। সেখানেই বুঝি আজকের এই মস্তানা দঙ্গলের সব চেয়ে বড় বিস্ময়। ঘন নীল পশমী গালিচা বিছিয়ে বসে রয়েছেন ফর্সা নুরানী চেহারার এক বুজুর্গ। মেহেদী রঞ্জিত দাড়ির ঢলে বুক তার ঢাকা। তেল চকচকে মসৃণ কলপ দেওয়া বাবরি। মেয়েদের মতো মাথার মাঝ বরাবর সিঁথি কাটা। দুটি পুষ্প স্তবকের মতো কোঁকড়ানো বাবরি দুভাগ হয়ে ঝুলে পড়েছে দুপাশে, কান জোড়া ঢেকে রেখেছে। অন্যদের অঙ্গাবরণের অভাবটি তিনি একলাই যেন পুষিয়ে দিয়েছেন। জামা জোব্বায় ভরা তাঁর গা। পরনে তার পাজামা। গায়ে আচকান। আচকানের উপর পাতলা চীনা সিল্কের ঢিলা চোগা। চোগার গায়ে বিচিত্র বুটি, বুকের পাড়ে, বোতামের ঘরে জরি সুতোর সূক্ষ্ম কারুকার্য। হ্যাজাকের আলো পড়ে ঝিকিমিকি

ছড়ায় তাঁর জরি চুমকির রেশমি পোশাক, ঝিলিক দিয়ে যায় চেহারার নুরানী চমক। গানের সুরে তিনিও হেলছেন-দুলছেন, কখনো বা চোখ বুজছেন ধ্যানের তন্ময়তায়। এক সময় থেমে যায় দোতারার ঝংকার।

পূর্ণ বেশ বুজুর্গ একটু নড়েচড়ে আচকানের খুঁটটা টেনে চোগার ছড়ান প্রান্তটাকে আর একটু মেলে দিলেন। পর পর তিনটে হাততালি দিলেন। মেহেদীরাঙ্গা দাড়ির অরণ্যে ঘনঘন আঙ্গুল চালিয়ে একটু কেসে গলাটা পরিষ্কার করে নিলেন। তারপর আবৃত্তি আর কাওয়ালির মাঝামাঝি এক বিচিত্র ঢংয়ে গলা ছাড়লেন :

লাইলাহা ইল্ললাহ
মাফিকলমা গায়রুল্লাহ
হাসরে রাব্বি সাল্লেল্লাহ

বিস্ময়ে যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চায় মালুর চোখ জোড়া। এমন কণ্ঠ কখনো শোনেনি ও। মিহিও নয়, দরাজও নয়। মিষ্টিও বলা চলে না। অথচ কান পেতে শুনতে ইচ্ছে জাগে। কী এক মরমি আবেগে যেন জাদুময় এ কণ্ঠ।

লোকটির পোশাক-আশাক চেহারার চমক দেখে আগেই ধরে নিয়েছিল মালু এ-ই মস্তানা দলের নায়ক।

এবার বুঝি নিঃসন্দেহ হল ও। কেননা গোটা মস্তানার দল গভীর এক ভক্তির সাথে শুনে গেল তার বচন। দলপতির শেষ হবার সাথে সাথেই ওরা বাকীটা ধরে। সুর তুলে, তাল ঠুকে গেয়ে চলে। বিচিত্র এক সুরের সাথে পরিচয় হল মালুর। মাতমের উন্মত্ততা নেই। মারফতী টানের অন্তর নিঙড়ানো আবেগ নেই। কখনো উচ্চতানে, কখনো নীচু খাদে একটি শান্ত পবিত্রতা যেন ধীরে ধীরে শব্দ তরঙ্গে উৎসারিত হয়ে চলেছে।

ভালো লাগে মালুর। ওদের সাথে মালুও তাল ঠোকে।

এ পর্বও শেষ হয়ে গেল।

তারপর যে অবাক কাণ্ডটি ঘটলো তাতে মালুর গায়ের লোমগুলো সজারুর কাঁটার মতো দাঁড়িয়ে পড়ল। বুকের রক্ত হল হিম।

যে দুজন মস্তানা বেহুশের মতো এতক্ষণ উপুড় হয়ে পড়েছিল, তারই একজন এই নবকাণ্ডের নায়ক। উপুড় হয়ে পড়ে আছে তো পড়েই আছে লোকটি। ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে এসেছে মুখের বোল। মনে হয় যেন বিকারের ঘোরে কঁকাচ্ছে

একজন নেতিয়ে পড়া মানুষ। হঠাৎ বুঝি দৈত্যদানোর শক্তি ভর করল ওর গায়ে। হাত-পা তেমনি গোটানো অবস্থায়ই বিকট চিৎকার করে লাফিয়ে উঠল ও। এতক্ষণে বুঝি যযবা এসেছে ওর। শক্ত মাটির আঘাতে নিশ্চয় চামড়া ফেটে একাকার হয়েছে লোকটার, চোখা চোখা ঘাসের কামড় নিশ্চয় ঘা তুলেছে ওর সর্বাঙ্গে। সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই ওর। ডাঙ্গায় পড়া মাছের মতো কী এক অস্থিরতায় লাফিয়ে লাফিয়ে ও চলে যায় অনেক দূর। তারপর পুকুর পাড়ের বেত ঝোঁপে আটকা পড়ে কাঁটায় কাঁটায় ক্ষত বিক্ষত হয়। একটু পরেই হাত-পা ছেড়ে দেয়। বোধ হয় পুরোপুরি জ্ঞান হারিয়েছে লোকটি।

সাথীরা গিয়ে ধরাধরি করে নিয়ে এল ওর দিগম্বর দেহটা। একমাত্র পরিধেয় সেই কম্বলখানি রয়ে গেল বেতের ঝোঁপে।

এমনি করেই চলে ওদের মারফত লাভের সাধনা, পুলসেরাতের পুলটা পার হবার শক্তি আরাধনা। এমনিভাবে দেওয়ানা হয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়ায় ওরা। পথের উপরে মাইজভাণ্ডারী কোনো শিষ্যের আতিথ্য নিয়ে যিকির করে বিশ্রামও করে।

মালুর মনে হল সুবেশ বুজুর্গ বোধ হয় মারফতের তীরটা পেয়ে গেছেন। অন্যদের এখনো সাধন-ভজনের পালা চলছে। তাই বুজুর্গ দলপতি। সেই কারণেই বুঝি তার এই আভিজাত্যিক দূরত্ব, ওই চমকদার লেবাস। রাবুর আব্বা বলে যাকে স্থির করে নিয়েছে মালু সেই দেওয়ানা দঙ্গল ছেড়ে অন্দর বাড়ির দিকে পা ফেলল। মালু তার পিছু নিল।

অন্দর বাড়িতে বেধেছে হুলুস্থুল কাণ্ড। বাক্স তোরঙ্গ আর মাল টানাটানির ঘড় ঘড় শব্দে মুখর দালান ঘর। ছুটোছুটি করছে চাকরানীর দল। আরিফা কাঁদছে।

হুরমতি মেহেদী মাখছে রাবুর হাতে আর গজ গজ করছে : পাগলের কথা আর বলেছে কাকে? বউটাকেও খেয়েছে, এখন মেয়েটাকেও খেতে এসেছে। সৈয়দগিন্নী শুয়ে রয়েছেন নামাজের চকিতে। গোটা ব্যাপারটায় তাঁর যেন কিছুই বলার বা করার নেই।

এই রাবু, খবরদার বলছি।-ঘর থেকে এক পা নড়েছিস কী কখনো তোর মুখ দেখব না। কান্না থামিয়ে চিৎকার করে উঠে আরিফা। দরবেশ, রাবুর আব্বাকে এই নামেই ডাকে সবাই, ঘরে ঢুকতেই উঠে দাঁড়ায় রাবু। ইপাব তৈরিঃ আল মোস্তাইন বিল্লাহ

যাও, এবার গোসল করে এসো–বলেই আবার বেরিয়ে যায় দরবেশ। রাবু আপার বিয়ে? বুঝি একটি আর্তচিৎকার বেরিয়ে এল মালুর গলা ছিঁড়ে। রাবু, একবার চোখ তুলে চাইল, যেন বলল–চুপ। ঘর ছেড়ে বারান্দায় এল রাবু। গোসলখানার দিকে মোড় নিল। দুহাত মেলে ওর পথটা আগলে দাঁড়াল আরিফা। উন্মাদ ব্যাকুলতায় চেঁচিয়ে উঠল আরিফা : তুইও কী পাগল হলি রাবু?

ওই বুড়োটাকে বিয়ে করবি তুই? চালচুলো আছে ওর? আর আমি হলফ করে বলছি ও ব্যাটার নিশ্চয় বউ রয়েছে কয়েক জোড়া। শেষে কী সতীনের পানি টানবি তুই? রাবুর কোমরটা শক্ত করে জড়িয়ে ধরে আরিফা।

ছাড় বড় আপা। কেমন বিরক্তিমাখা রাবুর কণ্ঠ।

কখনো না। চল, ঘরে খিল এঁটে শুয়ে পড়ি আমরা। তুই রাজি না থাকলে কখনো হতে পারে বিয়ে?

তুই তো বলছিস বড় আপা। কিন্তু আব্বা ক্ষেপলে কী কাণ্ড বাধাবে ভেবে দেখেছিস?

ক্ষিপ্ত দরবেশ যে কী অনর্থ ঘটাতে পারে সে কাহিনী শুনেছে ওরা। এত শুনেছে যে মনে হয় ওদেরই চোখের দেখা ঘটনা। সে বছর দশেক আগের কথা। রাবু-আরিফা ছোট্টটি তখন। ঘর ছাড়া হয়েও দরবেশ তখন বার দুই ঘুরে গেছে বাকুলিয়ায়।

সেই উন্মত্ত রাতে দরবেশের রাগের কী যে কারণ ঘটেছিল জানে না কেউ। শুধু কয়েকটা কথা কাটাকাটি, তারপর গোটা দুই লাথি। পরদিন একটি মরা ভাই এল রাবুর। দুদিন বাদ রাবুর আম্মাকেও গোর দেয়া হয়েছিল। যে কাহিনী স্মরণ করে আজও রাবু-আরিফা শিউরে ওঠে।

তবু বলল আরিফা : যা খুশি দরবেশ চাচা করুকগে। তুই শুধু বলবি–না। আর লম্বা হয়ে শুয়ে থাকবি চল। আরিফা ওকে টেনে নিয়ে যায় ঘরের দিকে।

আহা ছাড় বড় আপা। এক ঝটকায় ছুটে যায় রাবু।

তবে মর হতভাগী। থপথপ করে পা ফেলে চলে যায় আরিফা। তারপর কাঁদতে বসে। অনেকক্ষণ থেকেই রাবুকে বিরত করার চেষ্টা করেছে আরিফা। ব্যর্থ হয়েছে। ও আর পারে না। আগুনে ঝাঁপ দিয়ে মরবে বলে যে কৃত-সংকল্প তাকে কেমন করে ঠেকিয়ে রাখবে ও। কিন্তু রাবু কী জানে কোন্ আগুনে ঝাঁপ দিচ্ছে ও?

মাঝ রাতে কলেমা পড়ে নিকাহ্ হয়ে গেল রাবুর।

শুধু টিপ টিপ করে মালুর বুকটা। একী কাণ্ড ওর চোখের সুমুখে।

দেওয়ানা হলেও বৈষয়িক বুদ্ধিতে বুঝি কম যায় না ওরা। খবর দিয়ে কাজী আনিয়েছে। কাজীর দস্তখতে পাকাপোক্ত হয়েছে বিয়ে। কাবিন তৈরি হল। রসুলে করীমের অনুকরণে দেনমোহর ধার্য হল নামমাত্র এক টাকা পাঁচ পয়সা।

নামাযের চৌকিতে সেই যে শুয়েছিলেন, শুয়েই ছিলেন সৈয়দগিন্নী। অবাক হচ্ছিল মালু। ইচ্ছে করলে তিনি, একমাত্র তিনিই দরবেশকে ধমকে দিতে পারেন, দুঘর প্রজাকে খবর পাঠিয়ে ওই মস্তানাগুলোকে খেদিয়ে দিতে পারেন বাড়ি থেকে। অথচ তিনি নির্বাক। রাবু না হয়ে যদি হত আরিফা অমন নির্লিপ্ত থাকতে পারতেন সৈয়দগিন্নী? কথাটা হঠাৎ মনে হল মালুর আর সৈয়দগিন্নীর উপরই ওর মনের যত রাগ গিয়ে স্তুপীকৃত হল। কিন্তু কাবিনের কথা শুনেই ধড়ফড়িয়ে উঠে বসলেন সৈয়দগিন্নী। যেন বলক খেয়ে উঠল তার খানদানী রক্তটা। দেওরের কাছে রীতিমতো কৈফিয়ৎ চেয়ে বসলেন : এ সব বিয়ে সাদির ব্যাপার, ফাজলামো, না ইয়ার্কি? কোন কালে কে শুনেছে সৈয়দ বাড়ির মেয়েদের কাবিন তিরিশ হাজারের নিচে? দেওর নিরুত্তর। অতএব দেওরকে ছেড়ে বুজুরগকে নিয়ে পড়লেন সৈয়দগিন্নী। বুজুরগ নির্বিকার। কাবিনের অংক নিয়ে এমন ঠেলাঠেলি, বাদানুবাদের ঝামেলা অনেকবারই হয়ত পোহাতে হয়েছে তাঁকে। মিঞা-বিবির কবুল যখন হয়েই গেছে তখন আর ভাবনা কী!

চল্লিশ হাজারের কম দেনমোহরে সৈয়দ বাড়ির মেয়ে কেউ ছুঁতে পারবে না, পষ্ট জানিয়ে দিচ্ছি আমি। বুঝি চরম কথাটা জানিয়ে দিলেন সৈয়দগিন্নী।

কিন্তু কলেমা খতম। উভয় পক্ষেরই সই পড়ে গেছে কাবিননামায়। দেওয়ানারা তাই একটুও বিচলিত হল না সৈয়দগিন্নীর চরম নোটিশে। দস্তখত করা কাবিননামাটা ভাবীর চোখের সুমুখে মেলে ধরলেন দরবেশ দেওর। একবার দস্তখত করা কাবিনের উপর চোখ বুলিয়ে সেই নামাযের চৌকিতেই আবার শয্যা নিলেন সৈয়দগিন্নী।

মুখ টিপে টিপে মিষ্টি মিষ্টি হাসত সেই মেয়েটি। চৌদ্দ বছরের রাবু। মৃতা মায়ের বিয়ের শাড়ি বেনারসি আর বিয়ের হার বিছে হারখানা পরে ও এল বাসর ঘরে। পিতার বৃদ্ধ পীরের আলিঙ্গনে ও পেল নারীত্বের প্রথম অভিজ্ঞতা। হয়ত শেষ। পুরুষ অভিজ্ঞতা হয়ত আর কখনো আসবে না ওর জীবনে। হয়ত চিরকালের

জন্যই ওর অচেনা থেকে গেল পুরুষের সেরা সম্পদ যৌবন নামের সেই পরম বিস্ময়।

২২.

সবে সকাল হয়েছে।

সূর্যটা মাটি ছেড়ে মাত্র কয়েক হাত উপরে উঠে এসেছে।

আল ছেড়ে গ্রামের রাস্তায় উঠল ওরা।

ইস, ধকল কী কম গেল? হাঁটাই বা কম হল কী! আমার তো গা হাত পা টনটন করছে দিন দুই কোনো কথা নয়, স্রেফ ঘুম। কথাটা শেষ করে সেকান্দরের মুখের দিকে তাকায় জাহেদ। বলে আবার : মাস দুয়েকের ছুটি নিয়ে নাও তুমি, নইলে স্কুল কামাই করছি, ছেলেদের ক্ষতি হচ্ছে; এসব খুঁতখুঁতি যাবে না তোমার মন থেকে। ছুটি নিলে বিবেকটাও তোমার সাফ থাকবে, কাজও হবে ভালো।

আচ্ছা দেখি, সংক্ষেপে বলল সেকান্দর।

কী দেখবে, সে সম্পর্কে বুঝি নিশ্চিন্ত হবার জন্যই ওর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল জাহেদ। তারপর পাল্টিয়ে দিল প্রসঙ্গটা। যাই বল বড় জাঁহাবাজ ওই কংগ্রেসী মৌলভীগুলো। ওদের বোঝায় কার সাধ্য। কিন্তু এখনো ওদের মিটিংয়ে লোক জমে এটা যে কেমন করে সম্ভব হয় আমি বুঝতে পারি না!

ওদের কেউ কেউ সেই খেলাফতে, তারপর সেই তিরিশের যুগে জেল ফেল খেটেছে। হয়ত তাই। তোমাদের তো সে সব বালাই নেই। কেমন বাঁকা শোনাল সেকান্দরের স্বর।

আরে রাখ। বানের তোড়ে কোথায় সব ভেসে যাবে, দেখ না?

মুশকিল হল লীগের নামটা এখনো পৌঁছায়নি অনেকের কাছেই। কিন্তু, আমি তো যতই ঘুরছি ততই উৎসাহিত হচ্ছি। আমাদের শত্রু যে এক নয়, আমাদের শত্রু যে দুই–এক ইংরেজ দোসরা হিন্দু বানিয়া মহাজন, তুমি কী মনে কর এ কথাটা বুঝতে মুসলিম সমাজের খুব দেরি লাগবে? ওই গাদ্দারগুলোকে চিনতে খুব বেশি সময় লাগবে?

তা তোমার মতো লোকেরা যখন উঠে পড়ে লেগেছে তখন বেশি দেরি হবে বলে তো মনে হচ্ছে না।

সেকান্দরের উত্তরটা একটুও ভালো লাগে না জাহেদের। এখনো কোথায় যেন ওর দ্বিধা, সংকোচ। আর ফাঁক পেলেই একটু তেড়া কথার খোঁচা মেরে জাহেদকে আঘাত দিতে বাধে না ওর। কেন? ওর গ্রাম বাকুলিয়ার আর ওর সমাজের নাড়ির স্পন্দনটা কী এখনো পড়তে পারছে না সেকান্দর মাস্টার?

কেন যে এত সন্দেহ তোমার, আমি বুঝি না। শুধাল জাহেদ।

উত্তরে শুধু বোঁচকাটা বগল বদলে নিল সেকান্দর। বলল না কিছুই।

এই সকাল বেলায় মাটির রাস্তাটা কেমন নরম আর ঠাণ্ডা। রাতের বিশ্রাম পাওয়া পথের উপর যেন লেপে রয়েছে কী এক কোমল শী। সেই কোমলতাটা পায়ে জড়িয়ে জড়িয়ে চলতে সুন্দর একটি ভালো লাগায় রোমাঞ্চিত হতে চায়। শরীরটা, মনটা। মাটির সাথে গভীর এক অন্তরঙ্গতাবোধ সুর তুলতে চায় নাড়িতে, গান হয়ে বাজতে চায় কণ্ঠে। কিন্তু মাঠটার দিকে চোখ ফিরিয়ে নিমেষের মাঝেই হয়ে যায় জাহেদের সেই ভালো লাগার অনুভূতিটা।

খাঁ খাঁ করছে মাঠ। এখানে সেখানে পোড়া সবুজের মর্মন্তুদ কান্না। এক পশলা বৃষ্টি হয়েছিল সেই ফাল্গুনের শেষাশেষি। যাদের তাড়াহুড়ো তারা তখুনি জলদি দুটো চাষ দিয়ে ধান ছিটিয়ে ছিল। কিন্তু, অন্যরা জানে প্রথম বৃষ্টিতে একটা চাষ দিয়ে মাটির বাঁধুনি দাও খুলে পরের বৃষ্টিতে পানি খেয়ে মাটি যখন ভুর ভুর করবে তখন ছিটোবে ধান, ফসল পাবে দ্বিগুণ। তাই অপেক্ষা করে আছে ওরা।

কিন্তু বৃষ্টি আর কৃপা করেনি। ঝাঁ ঝাঁ রোদে শুধু তেতে চলেছে ক্ষেতের মাটি। যারা ধান বুনেছিল তাদের ক্ষেতের দগ্ধ সবুজ আতঙ্ক জাগায় মনে। আর যারা প্রথম বর্ষাতে লাঙ্গলের ফলায় মাটিটাকে শুধু উল্টে রেখেছে তাদের বন্ধ্যা ক্ষেতগুলো তপ্ত ধুলো আর ধূসর রুক্ষতা মাখিয়ে অমঙ্গলের হাওয়া ছাড়ছে লোকালয়ের দিকে। একেবারে আ-চষা ক্ষেতগুলো ফাটল তুলেছে বিরাট, যেন বিদীর্ণ বক্ষের কোনো আকুতি মেলে চেয়ে রয়েছে নির্দয় আকাশের দিকে। কখন দয়া হবে আকাশের কখন পানি পাঠাবে, ফাটলের পিপাসা মিটবে।

সেকান্দরের চোখেও দগ্ধ সবুজের আতঙ্ক। ও বলল দেখেছ? এখনো বৃষ্টি হল না। লোকগুলো এবছরও উপোস করে মরবে।

কী যে হয়েছে জাহেদের। রোদপোড়া দীর্ণবুকে ক্ষেতের দিকে তাকিয়ে যে আশঙ্কা ওর মনে জেগেছে তাই তো প্রকাশ পেয়েছে সেকান্দরের কণ্ঠে অথচ খিঁচিয়ে উঠল জাহেদ : গত বছর মরেছে, তার আগের বছর, তারও আগের বছর, সব

সময়ই এরা মরছে। এ বছরও মরবে, সামনের বছরও মরবে। দ্যাট ইজ হোয়াট দে ডিসার্ভ, ইট ডিসার্ভ। নির্বিবাদে মৃত্যুবরণ ছাড়া আর কোন্ কাজটা করতে পার তোমরা?

সেকান্দর বুঝল একটু আগে যে খোঁচাটা দিয়েছে সে, এ তারই পাল্টা বিস্ফোরণ। ক্ষুণ্ণ হল সেকান্দর। কিন্তু ভেতরটা ওর কী এক অপমান বোধে জ্বলে উঠল। বলল, এ মৃত্যুকে আমি রুখব। আমি মৃত্যুঞ্জয়ী হব। আমি মরণ-জয়ের ডঙ্কা বাজাব, সবাইকে শোনাব মৃত্যুহীনের ডাক।

যেন ঠোক্কর দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে জাহেদ। অবাক হয়ে চেয়ে থাকে সেকান্দরের দিকে। এমন সংকল্পের দৃঢ়তা, এমন প্রত্যয়ের ডাক কখনো শোনা যাবে তালতলি স্কুলের জুনিয়ার মাস্টার সেকান্দরের কণ্ঠে জাহেদের কাছে এ ছিল অভাবনীয়। কিন্তু যতটা খুশি হল তার চেয়ে বেশি শঙ্কিত হল জাহেদ। কেননা ও, জানে অনুভূতির এই তীব্রতা মাস্টারকে নিয়ে যেতে পারে অন্য কোথাও স্বদেশিদের খপ্পরে নতুবা শ্রেণী সংগ্রামের পথে। আর এ দুটোকেই পরিহার করে চলে জাহেদ।

মরণজয়ের ডঙ্কা বাজাও সে তো আমারও কথা কিন্তু কিসের জন্য? মুক্তির জন্য।

কার মুক্তি? শুধাল জাহেদ।

রোদে যাদের ক্ষেত পোড়ে, ক্ষিধেয় যাদের পেট জ্বলে, অকালমৃত্যু যাদের কপালের লিখন তাদের মুক্তি।

হিন্দুস্তানের সকল মুসলমানই কী তোমার এই সংজ্ঞায় পড়ে না?

না। বলেই কী এক কৌতুকে হেসে দিল সেকান্দর। হাসতে হাসতেই বলল আবার অদ্ভুত প্রশ্ন তোমার। তুমি আমাকে বোঝাতে চাও, সৈয়দপুত্র তুমি, মাতুল ফেলু মিঞা আর লেকু, ফজর আলি তোমরা সবাই এক সারিতে, এক শ্রেণীতে, বঞ্চিতের দলে, হা হা হা।

চুপ কর। চিল্লিয়ে উঠল জাহেদ।

ওর চিৎকারে চমকে দুপা পিছিয়ে গেল সেকান্দর। ভয় পেল। জাহেদের এমন ক্রুদ্ধ মূর্তি আগে কখনো দেখেনি ও।

ওরা নিঃশব্দে হাঁটছে, রাস্তার দুপাশ ধরে, পরস্পর থেকে যতটা সম্ভব দূরত্ব রেখে। ওরা এখন বন্ধু নয়, ওরা যেন দুই শত্রু শিবিরের প্রতিদ্বন্দ্বী পুরুষ, মুখোমুখি মোকাবিলার পূর্বে নীরব প্রস্তুতি চলছে ওদের। সেকান্দরের দৃষ্টিটা নিচে মাটির

দিকে। জাহেদের চোখ সেকান্দরের দিকে। চোখ নয় যেন দুটো বিষ মাখা তীরের ফলা, বিঁধে ফুঁড়ে একাকার করে চলেছে সহসা বিদ্রোহী হয়ে ওঠা এককালের নিরীহ মাস্টারকে।

তুমি জান কী করে এ জমি গড়ে উঠেছিল? আবার ঝলসানো ক্ষেতের দিকে চোখ ফেরাল জাহেদ। জান? যাদের হাতের মায়া আর শ্রমের ছোঁয়া পেয়ে এ জমি শস্যময়ী হয়েছিল তারা আর এ জমির কেউ নয়?

জানি।

জান ইংরেজ আসবার আগে এ অবস্থা ছিল না?

উল্টো দিক থেকে এবারও ভেসে আসে সেই ক্ষুদ্র কিন্তু আক্রমণাত্মক জবাব, জানি।

দিনে দিনে ক্ষয় পাচ্ছে জমির উর্বরা শক্তি। অনাবৃষ্টি আর অতিবৃষ্টির খামখেয়ালী তাণ্ডবে হাহাকার জাগছে ঘরে ঘরে। জনসংখ্যা বাড়ছে, খাদ্য নেই দেশে। সর্বত্র এই অভিযোগ। কিন্তু আমি বলি এটাই তো স্বাভাবিক, এ-ই তো বিদেশি শাসন আর শোষণের পরিণতি। ইংরেজ কী তবে বেহেশত বানাবার জন্য এসেছে এদেশে। ঠুক ঠুক পেরেক ঠোকার মতো করেই যেন কথাগুলো সেকান্দরের মাথায় ঢোকাতে চাইল জাহেদ।

সে তো বুঝলাম...

বুঝেছ কচু। বুঝলেই যদি তবে কেন গোটা জাতির কথা ভাবছ না। বুঝতে পারছ না, পরপদানত কোনো মানুষের একমাত্র লক্ষ্য স্বাধীনতা আজাদী? কারণ তোমার কাছে স্বাধীনতার অর্থ শুধুমাত্র ইংরেজ বিতাড়ন।

আমার কাছে তার অর্থ আরও ব্যাপক, ইংরেজ বিতাড়ন তো বটেই সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা জমি রুটিরুজি জীবনের নিরাপত্তা। চাপা দৃঢ়তায় উত্তর দিল সেকান্দর।

রাবিশ? চিল্লিয়ে উঠল জাহেদ আর ছিনিয়ে নিল সেকান্দরের বগলের বইগুলো। ছুঁড়ে ফেলল রাস্তায়। চেঁচিয়ে চলল এই বইগুলোই যত নষ্টের মূল। তোমায় সাবধান করে দিচ্ছি সেকান্দর, তালতলীর ওই হিন্দু মাস্টারগুলো থেকে দূরে থেকো রাজনীতিটা বুঝবার আগেই তোমার মাথায় একগাদা পোকা ঢুকিয়েছে। এরপর আস্ত মাথাটা চিবিয়ে খাবে।

সেকান্দর নীরবে বইগুলো কুড়িয়ে নেয়। নীরবেই পথ চলে।

সহসা দু হাত বাড়িয়ে সেকান্দরের পথটা আগলে দাঁড়ায় জাহেদ, হাতের মুঠোতে চেপে ধরে ওর জামার গলাটা। তারপর তীরের মতো ছুঁড়ে মারে প্রশ্নটা, বল তুমি মুসলমান কিনা?

না।

তবে তুমি কী!

মানুষ।

অপমান বোধে মুখটা লাল হয়ে আসে জাহেদের। তুমি কী বলতে চাও আমি মানুষ নই?

না। তুমি মুসলমান।

আলবৎ। আমি প্রথমে মুসলমান তারপর মানুষ।

সেজন্যই কী অমন বর্বরের মতো আচরণ করছ? গলাটা ছাড় তো এবার। যেন বিরক্ত হয়েই বলল সেকান্দর।

আমি মুসলমান। আমি মুসলমান। এ পরিচয়ে আমার গৌরব, অগৌরব তো নয়ই। বলতে বলতে মাথাশুদ্ধ সেকান্দরের গলাটাকে দোলনার মতো একবার পেছনে ঠেলল, আবার সামনে টানল, তারপর ছেড়ে দিল মুঠিটা। দুজনই ওরা পরিশ্রান্ত। রাস্তার মাঝেই ওরা বসে পড়ল। আর ফোঁস ফোঁস হাঁপিয়ে চলল।

ভুল করছ জাহেদ ভুল করছ। প্রথমে মানুষ, তারপর ধর্ম। মানুষের জন্যই তো ধর্ম। ধর্মের জন্য মানুষ নয়।

শ্রান্ত কিন্তু কী এক হিংস্র চোখে ওকে নিরীক্ষণ করল জাহেদ।

মুখ খুলল না। মুখ খুলল অনেকক্ষণ পর। তা হলে তুমি মুসলিম লীগ করছ না?

করছি। সংক্ষেপে বলে উঠে দাঁড়াল সেকান্দর।

এখুনি তো তোমাকে স্কুলে ছুটতে হবে। চল আমাদের বাড়ি।

গোছল করে কিছু খেয়ে নাও। ইপাব তৈরিঃ আল মোস্তাইন বিল্লাহ

২৩.

রাস্তা ছেড়ে বাড়ির উঁচু মাঠে উঠে এল ওরা।

কাচারি ঘরের ময়দানে উনুনের কয়লা তখনো জ্বলছে। আধপোড়া কাঠ ধোঁয়া ছাড়ছে। একমণি দুমণি ডেগগুলো উনুনের চার পাশে, কোনোটা কাত হয়ে পড়ে রয়েছে, কোনোটা বা ঢাকনি দেয়া। রাতের ভোজের ইতস্তত ছড়ানো কলাপাতাগুলোর মতোই এদিক ওদিক বিক্ষিপ্ত মস্তানার দল। পুকুরের শান বাঁধাই চত্বরে কেউ ঘুমোচ্ছে অঘোরে, কেউ হাই তুলছে কাচারি বারান্দায়, কেউ বা সটান ঘরের লম্বা ফরাশে। কেউ চোখ বুজে হুঁকো টানছে।

ওদের চিনতে কষ্ট হল না জাহেদের। সেকান্দরের পিঠে একটা খুশির কিল বসিয়ে বলল ও : বরাত ভালো হে! বিরিয়ানী-ফিরিয়ানী বাসি হলেও কিছু জুটে যাবে মনে হচ্ছে।

কাচারি ঘর ছেড়ে দেউড়ির কাছাকাছি এসে যেন আপন মনেই আবার বলল জাহেদ : চাচার সাঙ্গোপাঙ্গোর দলটা এবার বেজায় ভারি। ব্যাপার কী? দেউড়িটা পেরিয়ে প্রশস্ত উঠোন। উঠোনের উল্টোপার লম্বালম্বি বারান্দা টানা বড় দালান। জাহেদকে দেখেই বারান্দার কোন্ ঘুপচি থেকে ছুটে আসে মালু। এসেই ঝর ঝর কেঁদে দেয়।

কী রে, কী হল? ওর হাতটা ধরে জিজ্ঞেস করে জাহেদ।

আঙ্গুলের ইশারায় বারান্দার উত্তর কোনটা দেখিয়ে দেয় মালু। সেখানে বদনার সরু নলে পানির চিকন চিকন ধারা ঢালছে বাড়ির চাকর। ওজু করছে নতুন জামাই। ভিজে হাতের তালুজোড়া কলপ দেয়া বাবরির উপর দিয়ে বুলিয়ে নিয়ে তায়ামমুমের জন্য মাথাটা উঁচু করতেই চোখাচোখি হয়ে যায় জাহেদের সাথে। কে রে? অবাক হয়ে শুধাল জাহেদ।

রাবু আপার বর। সংক্ষেপে বলে সার্টের খুঁটে চোখ মুছল মালু।

বর? রাবুর বর? কে বলেছে? বুঝি বিশ্বাস করতে চায় না জাহেদ। কান্নাটা সামলে নিয়েছে মালু। গড় গড় করে বলে গেল আজব রাতের কাহিনী।

নতুন জামাই এবার পা-টা বাড়িয়ে দিয়েছে বদনার নলের নিচে। প্রত্যেকটি নখে আলাদা আলাদা করে পানির ধারা নিচ্ছে। আঙ্গুলগুলোর ফাঁকে ফাঁকে হাতের আঙ্গুল চালিয়ে ধুয়ে নিচ্ছে। ঠোঁট তার নড়ছে মৃদু মৃদু। ওজুর দোয়া পড়ছে বুজুরগ জামাতা। সে ফাঁকেই চোখটা তার এদিক ওদিক ঘুরে জাহেদের মুখের উপর এসে ক্ষণকাল স্থির হয়ে রইল। নড়ল না, কাঁপল না। জাহেদের মনে হল ধূর্ত

শৃগালের কোনো চতুর ইঙ্গিত যেন হেসে উঠল সেই চোখে। কিন্তু সে শুধু মুহূর্তের জন্য। তারপরই কী এক অবজ্ঞার উদাসীনতা ছড়িয়ে সরে গেল চোখ জোড়া।

এবার বুঝি বিশ্বাস হয় জাহেদের। আর সেই মুহূর্তে ওর শরীরের রক্ত ধারাটা যেন বলক খেয়ে টগবগিয়ে উঠল, সমস্ত রক্ত যেন উঠে এসেছে ওর মাথায়। লম্বা পায়ে উঠোন ডিঙিয়ে দাওয়ায় উঠে এল জাহেদ।

কী আম্মা! কী সব শুনছি?

আম্মার যেন বলার কিছু নেই। নীরবে তছবির ছড়া গুণে চলেছেন তিনি। কিরে আরিফা কী হয়েছে বল না।

সবে ঘুম ভেঙেছে আরিফার। চোখ কচলাচ্ছে। ভালো করে তাকাতে পারছে ও। সেই অবস্থাতেই বলল, দরবেশ চাচা.. শেষ করতে পারে না ও। কোথায় দরবেশ চাচা, খেঁকিয়ে উঠেছে জাহেদ।

যা হবার হয়ে গেছে। এখন আর চেঁচামেচি করিসনে বাপু। ছেলে চাচার সন্ধান করছে দেখে অবশেষে মুখ খুললেন সৈয়দগিন্নী।

হয়ে গেছে মানে? জাহেদের চড়া স্বরটা গুম গুম করে ঘরের দেওয়ালে। আমরা কত বললাম মেজো ভাই। কিন্তু..আরো কিছু বলতে চায় আরিফা। তার আগেই ফেটে পড়েছে জাহেদের ক্রুদ্ধ গলাটা : কী করেছিস তোরা! লোকজনের কী অভাব ছিল গ্রামে? ঠেঙিয়ে বের করে দিতে পারলি না বাড়ি থেকে?

ছিঃ বলে না ওসব কথা, নতুন জামাই শুনবে যে। প্রমাদ গোণেন সৈয়দগিন্নী। নেমে আসেন নামাজের চৌকি ছেড়ে।

কাঁথা পুড়ি নতুন জামাইর। খিঁচিয়ে উঠে জাহেদ। এদিক ওদিক কী যেন খোঁজে ও।

তা তার মেয়ে যদি সে কেটে গাঙ্গে ভাসিয়ে দেয় আমরা কেমন করে ঠেকাব? শুনলে তো আমাদের কথা? আর মেয়েটিও যেমন বাপ বলতে এক পা। বাপ বলেছে, ব্যাস, কার কথা শুনে ও ... সৈয়দগিন্নীর পুরো কথাটা শোনার জন্য অপেক্ষা করে না জাহেদ। দৌড়ে বেরিয়ে আসে উঠোনে। সেকান্দরকে টানতে টানতে চলে যায় দেউড়ির দিকে।

মুনশীজী কোথায়?

জি, উনি মসজিদে। মালুর হয়েই জবাব দিল বাড়ির চাকর।

মুন্‌শীজী গোঁড়া সুন্নী। সহি হাদিসের বাইরে এক কদম চলতে নারাজ তিনি। ফুঁকফাঁক তুকতাকের ঘোর বিরোধী। চিশতিয়া নকশবন্দিয়া মাইজভাণ্ডারি ইত্যাকার যত তরীকার তীব্র সমালোচক তিনি। তাই দরবেশ বাড়ি এলেই আপন মেজাজ এবং ঈমান দুটোরই নিরাপত্তার জন্য আত্মগোপন করেন তিনি। এবারও কম্বলধারীদের শোভাযাত্রাটা দূর থেকে দেখেই মিঞা বাড়ির মসজিদে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন মুন্‌শীজী।

বেশ তুই এক কাজ কর। লেকু, ফজর আলি, রহমত, ট্যান্ডল বাড়ি আর সারেং বাড়ির সবাইকে ডেকে নিয়ে আয়, এক দৌড়ে। চাকরটাকে হুকুম দিয়ে এদিক ওদিক তাকায় জাহেদ, কী যেন খোঁজে। দেউড়ির পেছনে নজরে পড়ে চেলা কাঠের স্তূপ। তারই পাশে মাটির ঢেলা ভাঙবার কয়েকটা মুগুর। দুটো মুগুর তুলে নিল জাহেদ। একটা সেকান্দরের হাতে দিয়ে বলল : শক্ত করে ধর। আমার দেখাদেখি ডানে বাঁয়ে ঘুরিয়ে চলবে। শুধু প্রাণে মারবে না কাউকে।

আরে, মারামারি করবে নাকি?

আহা, চল না। ওকে এক ধাক্কায় সামনের দিকে ঠেলে দেয় জাহেদ। বাবারা খোদার খাসিরা–ওই যে সড়কটা দেখছ সোজা ওই পথে গিয়ে ওঠঁ। টুটা করছ কী...। কী সেটা মুখে না বলে মগুরটা ওদের মাথার উপর দিয়ে বার কয় ঘুরিয়ে আনে জাহেদ।

হয়ত অসাবধানেই কারো কলকেতে লেগে যায় মুগুরের আগাটা। সাজান কলকেটা মেঝেতে পড়ে ভেঙে টুকরো হয়। কারো বা হুঁকোটা কাত হয়ে পড়ে যায়। গল গল করে বেরিয়ে যায় বাসি হুঁকোর পিঙ্গল পানি। ভিজে যায় ওদের ফরাশ।

এমন অতর্কিত অভদ্রতার জন্য প্রস্তুত ছিল না ওরা। ভুরি ভোজনের পর যে ঘুম, সে ঘুমের মিঠে মৌতাত এখনো লেগে রয়েছে ওদের চোখে।

শীগগীর শীগগীর জলদী ভাগো। একটু আড়মোড়া ভাঙবার সময় দিতেও নারাজ জাহেদ।

টেবিল চেয়ারগুলো এক কোণে সরিয়ে রাখা হয়েছিল। পর পর কয়েকটা চেয়ার তুলে ওদের দিকে ছুঁড়ে মারল জাহেদ।

হুড়োহুড়ি পড়ে গেল মস্তানার দলে।

এরি মাঝে কে যেন প্রতিবাদ করে ওঠে। নিমিষের মাঝেই মুগুরটা নেমে আসে ওর গর্দানে। কোঁত করে বসে পড়ে অসহায় মস্তানা।

এ্যা আপনি পয়গম্বরের উম্মত নন? এ ভাবে অপমান করছেন মেহমানদের? বারান্দা থেকে চেঁচিয়ে উঠে আর এক বেপরোয়া মস্তানা।

ও-রে আমার মেহমা-ন-রে! বে-রো-বে-রো, মুগুরটা উঁচিয়ে দৌড়ে যায় জাহেদ।

পলায়নের হিড়িক পড়ে যায়। ওরা ছুটে যায় রাস্তার দিকে। একমাত্র সম্বল কম্বলটাকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে গিয়ে কেউ বা হোঁচট খেয়ে বসে পড়ছে, কেউ বা গড়িয়ে পড়ছে পাশের শুকনো নালায়। মালু, সেকান্দর, বিশ্বাস নেই ওদের, দৌড়াও ওদের পিছু পিছু। একেবারে গাঙ পার করিয়ে তবে ফিরবে। বাড়ির চাকরগুলোকেও মস্তানাদের ধাওয়া করতে বলে দিল জাহেদ। ততক্ষণে লেকুর দলটা এসে গেছে। ওদের নিয়ে অন্দর বাড়িতে ফিরে এল জাহেদ। এত যে কাণ্ড ঘটে গেল কাচারি বাড়িতে তার খবরটা বুঝি পৌঁছায়নি এখানে। অথবা পৌঁছালেও অটল বুজুরগ। বিভিন্ন শ্বশুর বাড়ির বিভিন্ন আর বিচিত্র ধরনের আপ্যায়নের সাথে নিশ্চয় পরিচয় তার দীর্ঘদিনের।

দস্তরখান পাতা হয়েছে বারান্দায়। একটা একটা করে নাশতার রেকাবিগুলো এসে জমছে সেখানে। রেশমি গালিচায় আসন নিয়ে দেয়ালের দিকে ঈষৎ হেলে রয়েছেন নতুন জামাই। চোখ বুজে মোগলাই ব্যঞ্জনের খোশবু টানছেন হয়ত। বুজুরগ মানুষ। অতএব আহারটাও তার এবাদতের অঙ্গ। হয়ত তাই এতক্ষণ ধরে ওজুর ঘটা চলছিল।

ওই যে বসে আছে বাবাজী। পাঁজা কোলা করে তুলে ফেলবি। রহমতের গাড়িতে চড়িয়ে সোজা স্টেশনে নিয়ে যাবি। টিকেট কেটে চড়িয়ে দিবি রেল গাড়িতে। গাড়িটা চোখের আড়ালে চলে গেলে তবে ফিরে আসবি। লেকুর দলকে হুকুমটা দিয়ে উঠোনেই অপেক্ষা করে জাহেদ।

যেন ছোঁ মেরে অতবড় শরীরখানা ওরা তুলে নিল কাঁধের উপর। সতর্ক হবার, একটু সজাগ হবার সামান্য সুযোগও পেলেন না বুজুরগ। কিন্তু হলে কী হবে বুড়ো, বেশ ওজনী বুড়ো। রীতিমতো শক্তি ধরে। দুই জোয়ানের অমন ভার সওয়া কাঁধেও মট করে শব্দ হল, একটুক্ষণের জন্য কুঁজো হয়ে এল ওদের পিঠ। ততক্ষণে বুঝি শ্বশুর বাড়ির এই বিচিত্র তামাশার অর্থ ধরে ফেলেছেন

জামাতাজী। হাত পা ছোঁড়েন জামাতাজী। প্রায় ফসকে পড়ে যায় ওদের কাঁধ থেকে। কিন্তু পা আর গলার দিকটা ওরা শক্ত করে ধরে রেখেছে, পড়বার জো নেই। তবু গোটা শরীরটা কাঁপিয়ে দুলিয়ে গির গির আলোড়ন তুলে যান জামাতাজী। শেষে প্রচণ্ড হিংস্রতায় কামড় বসিয়ে দেয় ফজর আলির কাঁধে। সেই হিংস্র কামড়ে বুঝি এখুনি উঠে আসবে ফজর আলির কাঁধের মাংস। নিরুপায় হয়ে ডান হাতটাকে ঘুরিয়ে জামাতাজীর গালে জোর একটা ঘুষি বসিয়ে দেয় ফজর আলি।

কেয়া বাত জী, কেয়া বাত আ-জী। কেয়া কসুর কেয়া কসুর। প্রথমে লঘু স্বরে, তারপর চিৎকার করে প্রতিবাদ জানান নতুন জামাই। কিন্তু কে গ্রাহ্য করে তার প্রতিবাদ।

বারান্দা ছেড়ে উঠোনে নেমে আসে ওরা।

ছুটে আসে দরবেশ। এতক্ষণ ঘুমিয়েছিল ঘরের ভেতর। দরবেশ আগলে দাঁড়ায় ওদের পথটা–ছাড় ছাড় হারামজাদা বেতমিজ, শীগগীর ওনাকে ছেড়ে দে বলছি!

চাচা, আপনি ঘরে গিয়ে বসুন। বুঝি বজ্রের আওয়াজ জাহেদের কণ্ঠে। ভাইপোর মাথা থেকে পা পর্যন্ত রক্তিম চোখ দুটো একবার শুধু ঘুরিয়ে আনল দরবেশ। বুঝি থমকে রইলে মুহূর্ত খানিক। সঙ্গে সঙ্গেই চেঁচিয়ে উঠল কর্কশ গলায়–বেয়াদব বেতমিজ বেশরম বেলায়েক, এ বাড়ির কর্তা আমি না তুই? তারপর এগিয়ে এসে এলোপাথাড়ি ঘুষি কিল থাপ্পড় বসিয়ে দিল লেকুর পিঠে।

থর থর কাঁপছে দরবেশ। অন্ধের মতো হাত পা চালাচ্ছে চলমান লেকুর পিঠে। সে আঘাতে আর কাঁধের উপর প্রায় চারমণি ওজনের জামাতা মিঞার দাপাদাপিতে বুঝি ভেঙে যাবে লেকুর শিরদাঁড়াটা।

নিমিষের মাঝে একটা কারবালার কাণ্ড ঘটে গেল উঠোনে। দরবেশকে আড়পিছা ধরে ফেলল জাহেদ। হাঁ হাঁ করে ছুটে এলেন সৈয়দগিন্নী। রাবু এসে ওদের সুমুখে গড়িয়ে পড়ল, মাথা কুটতে লাগল উঠোনের মাটিতে : মেজো ভাই পায়ে পড়ি তোমার আব্বার দিলে কষ্ট দিও না। অনেক কষ্ট আব্বার। ছেড়ে দাও আব্বাকে, ছেড়ে দাও।

এই হুরমতি, দড়ি আন্ জলদি চিৎকার করে উঠে জাহেদ।

দেখছ দেখছ শুয়রের কাণ্ড। মুরুব্বীর গায়ে হাত দিলি তুই? জাহান্নামে যাবি, দোজখে পুড়বি তুই। জাহেদের শক্ত বাহুর বেষ্টনে ঝুটোপুটি খায় দরবেশ।

ওদিকে দরবেশের লাথির চোটে হাতের বাঁধনটা বুঝি একটু শিথিল হয়েছিল লেকুর। সে ফাঁকে জামাতাজী মুক্ত করে নিয়েছে পা জোড়া। সঙ্গে সঙ্গেই ভীষণ পদাঘাতে ছিটকে পড়েছে লেকু।

কিন্তু, জামাতাজীর মাথা আর গর্দানটা তখনো আটক ফজর আলির বাজুর বন্ধনে। পা জোড়া মাটিতে ঠেকিয়ে একবার পলট খেল জামাতাজী। সঙ্গে সঙ্গে আলগা হল ফজর আলির হাত জোড়া। মাথাটা মুক্ত করে টান হয়ে দাঁড়ায় নতুন জামাই।

ক্ষিপ্র-হস্তে দরবেশের হাত দুটো পেছনে এনে বেঁধে ফেলল জাহেদ। মাটিতে শুইয়ে হাত পিঠে জড়িয়ে দড়িটাকে তিন চারটি প্যাঁচ কষে শক্ত করে গিঁঠ বেঁধে দিল ও।

দোহাই তোমার মেজো ভাই, আব্বাকে বেঁধো না অমন করে। এত নিষ্ঠুর তুমি? ও, মেজো ভাই। রাবু এসে ধরে ফেলল হাত দুটো। ঠিক সেই মুহূর্তেই জামাতাজী কুড়িয়ে নিয়েছে জাহেদেরই ফেলে রাখা মুগুরটি। শক্ত করে বসিয়ে দিয়েছে দুর্বিনীত শ্যালকের মাথায়। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছোটে জাহেদের কপাল ফেটে। বাঁ হাত দিয়ে রক্তের ফিনকিটা চেপে ধরে জাহেদ চেঁচাতে গিয়ে ফাটা বাঁশের মতো শব্দ ওঠে ওর গলা দিয়ে। কোনো রকমে বলে, ওহ্। ছেড়ে দিলি ভণ্ডটাকে? ধর শীগগীর। নিয়ে যা স্টেশনে। জলদি কর।

বিমূঢ় স্তব্ধ হয়ে যায় লেকু। ফজর আলিও। জ্ঞানটা ওদের লোপ পেয়েছে যেন। জাহেদের রক্ত জবজব বা কপালটার দিকে একবারটি তাকিয়ে লেকু যেন ওর হারান শক্তিরই আরাধনা করল। অমন জোয়ান মরদ সে, না হয় কয়েকটা কোপই পড়েছে গায়ে, কিছু রক্ত ঝরে পড়েছে, তা বলে আজ হার মানবে সে, দার কোপে খাঁজ পড়া ওর পেশীগুলো যেন কী এমন মন্ত্রবলে ফুলে ফুলে উঠল। অস্ফুট এক চিৎকারে হিংস্র নেকড়ের মতো ও ঝাঁপিয়ে পড়ল। শূন্যে তুলে নিল অশিষ্ট জামাতাজীর শরীরখানি। ফজর আলি এসে কাঁধ দিল। ওরা ছুটে চলল।

মস্তানা বাহিনীকে গাঙ পার করিয়ে ফিরে এসেছে মালু সেকান্দর আর সারেং বাড়ির লোকেরা।

বিধ্বস্ত রণাঙ্গনটির দিকে তাকিয়ে সেকান্দরের চোখ বুঝি চড়কে ওঠে। আরিফা হুরমতি এমন কী রাবুও কান্না থামিয়ে থ মেরে রয়েছে। বুদ্ধি ভ্রষ্টের মতো কেমন শূন্য দৃষ্টি ওদের। একটি রাতের মাঝে কত কী যে ঘটে গেল! আর এত দ্রুত, কোনো লোমহর্ষক নাটকের ঘটনার মতো। এতে কারই বা হুঁশ থাকে, দিশা থাকে।

পাশে দাঁড়িয়ে কপালে করাঘাত করে চলেছেন সৈয়দগিন্নী। তাঁর চেতনাটা এখনো বুঝি লোপ পায়নি।

একটু তুলো। অনেক কষ্ট করেই যেন বলল জাহেদ। বুঝি হুঁশ এল মেয়েদের। আরিফা দৌড়ে গিয়ে তুলো আর আইডিনের শিশি নিয়ে এল। রক্তগুলো মুছে নিল সেকান্দর। মাথার চুল সরিয়ে ক্ষতের উপর আইডিন মেখে দিল। তারপর ব্যান্ডেজ বেঁধে ওকে নিয়ে এল ঘরে। বিছানায় শুইয়ে দিতে দিতে আপন মনেই বলে ও : এত অসহিষ্ণু তুমি। হুট করে কোনোদিন কোথায় কী কাণ্ড বাধিয়ে মরে থাকবে, আল্লাই জানেন। ওর আব্বার বাঁধনটি খুলে দেয় রাবু। অপরাধীর মতো দাঁড়িয়ে থাকে পাশে। উঠে দাঁড়িয়ে গায়ের ধূলো ঝাড়ে দরবেশ। কম্বলটা ভালো করে এঁটে নেয় কোমরে। তারপর ক্রুদ্ধ চোখের দৃষ্টি বিঁধে যেন এ ফোঁড় ওফোঁড় করে গেল লজ্জায় নুয়ে থাকা মেয়েটিকে। কহর দিল ওকে : জাহান্নামে যাবি, জাহান্নামে যাবি। দোজখের আগুনে জ্বলে পুড়ে খাক হবি, খাক হবি।

শুধু মেয়েকে অভিশাপ দিয়েই ক্ষ্যান্ত হল না দরবেশ। এ বাড়ির সকলের বিরুদ্ধেই তার নালিশ। মুনাজাতের ভঙ্গিতে আকাশের দিকে হাত তুলল দরবেশ, কাঁপা কাঁপা গলায় ফরিয়াদ পাঠাল আল্লার দরবারে, ইয়া আল্লাহ, গজব নাজেল কর, গজব নাজেল কর। গোনাহগার শয়তানগুলোকে শাস্তি দাও তুমি। লা-নত ঢাল তুমি, লা-নত ঢাল। ছারখার কর এই শয়তানের আড্ডা।

চমকে উঠেন সৈয়দ গিন্নী। দরবেশ এমন অভিশাপ দিল সৈয়দ বাড়ির উপর? তওবা, তওবা, উচ্চৈঃস্বরে তওবা পড়তে থাকেন সৈয়দগিন্নী। আব্বা, আব্বা, আমাকে ফেলে চলে যাবেন? পিছু পিছু ছুটে আসে রাবু। কাচারির পেছনে এসে লুটিয়ে পড়ে আব্বার পায়ে। জড়িয়ে ধরে তার পা জোড়া।

ঝুঁকে আসে দরবেশ। রাবুর এলো খোঁপার এক গোছা চুল মুঠোয় ধরে টেনে তোলে ওকে। উহঃ উহঃ চেঁচিয়ে ওঠে রাবু। যন্ত্রণায় নীল রাবুর মুখ। সে দিকে ভ্রুক্ষেপ নেই দরবেশের। কিন্তু যন্ত্রণাকাতর সে মুখের দিকে তাকিয়ে কেন যেন স্তব্ধ হয়ে যায়, উন্মনা হয় দরবেশ। চুলের মুঠিটা ছেড়ে দিয়ে দু হাতের কোলে রাবুর মুখটা টেন নিল দরবেশ। অশ্রুর ধারা নামছে রাবুর গাল বেয়ে। অশ্রুভরা সে মুখের দিকে নিস্পলক চেয়ে থাকে দরবেশ। কী এক কোমলতা এসে সহসা যেন মুছে নিয়েছে দরবেশ-মুখের সেই ক্রুর কঠিন রেখাগুলো। স্নেহ-মায়া আর মমতা, পার্থিব দুনিয়ার একান্ত মানবিক দুর্বলতাগুলো যেন ঘন এক ছায়া ফেলেছে দেওয়ানা চোখের কোলে।

দুটি মুহূর্ত, বুঝি দূর অতীতের কোনো স্মৃতির মাঝে থুয়ে গেছে সংসার ত্যাগী স্ত্রী-ঘাতী দেওয়ানা। কিন্তু সে শুধু মুহূর্তের জন্যই। আচমকা ওকে ছেড়ে দেয় দরবেশ। ধপ করে পড়ে যায় রাবু। জীবনে এই প্রথম পিতৃস্নেহের স্পর্শটি পেতে পেতে হারিয়ে ফেলল ও।

খবিস খবিস। নাপাক, নাপাক। চাপা গলায় ঘৃণা ছড়ায় দরবেশ। থুতু ফেলে, হাতের দশটা আঙ্গুল একই সঙ্গে বাতাসের দিকে ছুঁড়ে মারে, যেন কোনো অস্পৃশ্য ছুঁয়ে আপনাকে অপবিত্র করেছে দরবেশ। তারপর মিলিয়ে যায় কাচারির ওপারে। ইপাব তৈরিঃ আল মোস্তাইন বিল্লাহ

২৪.

শাখায় পাতায় পল্লবিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে খবরটা। বড় বাড়ির বড় খবর। আলোচনা তার মুখরোচক।

ছিঃ ছিঃ আল্লাওয়ালা মানুষ ওরা। মেজো মিঞা পিটিয়ে পুটিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দিল ওদের? সাধে কী আর শাস্ত্রে বলেছে, আলেমের ঘরে জালেমের পয়দাস! মাবিয়ার ঘরে না এজিদের জন্ম?

আহা কী বুজুরগ আদমি। হার্মাদ না হলে কেউ অমন ওলি আল্লাহ মানুষের গায়ে হাত তোলে? মেজো মিঞাটা যে নাস্তিক এতে কোনো সন্দেহ আছে? নির্ঘাত আল্লাফাল্লা মানে না ছোকরা। আহা, কী নূরানী চমক চেহারার! কত এলেমদার যে সে আদমী? দেওবন্দের কামিল মোহাদ্দেস। তাঁকে এমন অপমান? আরে অপমান কী বলছ হে! মেরে মুরে হাড্ডি মাংস একসার করে বড় গাংয়ে ভাসিয়ে দিয়েছে। হয়ত মরেই গেছে। বেপারী বাড়ির ফজু বেপারী স্বচক্ষে দেখে এসেছে। বিশ্বাস না করে উপায় আছে? রমজানের বৈঠকখানায় বসে এমনি সব কথার পিঠে কথা ভেঙে চলেছে ওরা।

মাস কয়েক আগে ছোট্ট গোছের এই বাইর ঘরটি বানিয়েছে রমজান। দেশি পালার গায়ে এখনো পচা পানির গন্ধ লেগে রয়েছে। বৈঠকটাও চালু হয়েছে হালে। রাতের বেলায় নেহাৎ মুনিবের ডাক না পড়লে মিঞা কাচারিতে আর হাজিরা দেয় না রমজান। কুপি জ্বালিয়ে খালি চৌকিটায় বসে ও। দু চারজন মাতবর, পেয়াদ কালু, ওরা আসে। পানটা তামাকটা নিজের হাতেই বাড়িয়ে দেয় রমজান। নিজের বৈঠকখানা হবে, সেখানে আড্ডা জমবে; পান তামাক চলবে, এটা অনেক দিনের শখ রমজানের। এতদিনে সে শখটা বুঝি পূরণ হল রমজানের।

মুনিব ফেলু মিঞার সাথে টেক্কা দেবার ইচ্ছে নয় তার। ফেলু মিঞার ডান হাতের যে মর্যাদা আর স্বীকৃতিটুকু একান্তই প্রাপ্য তার, শুধু সেইটুকু। এর জন্য পান তামাকের খরচাটাকে মোটেই বাড়তি খরচ মনে করে না ও। এ ছাড়া যারা খাতক তারাও এই সময়টিতেই আসে। যার যা দেবার থোবার, এই বাঁধা সময় কাচারিতে আসবে তারা। রাস্তা-ঘাটে কায়কারবারের কথা বড় না-পছন্দ আমার–নিয়মটা চালু করে দিয়েছে রমজান। তাই লোকের অভাব হয় না। রমজানের মর্যাদার আসরে।

এতক্ষণ চুপ করে ওদের কথাগুলো শুনে চলছিল রমজান। এবার গলাটা বাড়িয়ে বলল : আরে, আরো ব্যাপার, রহস্য আছে অনেক। কুঁতকুঁতে চোখ দুটো পাকিয়ে থুতনির নিচে গলগণ্ডের মতো ফোলা মাংসের দলাটা কেমন করে কাঁপিয়ে তোলে রমজান।

মাতবরও বটে।

বেফার কী? বলেই ফেল না। জিজ্ঞেস করে গ্রামের একমাত্র হাফেয, তক্ষুণি তক্ষুণি কিছু বলে না রমজান। কালো ব্যাঙের পিঠের মতো খরখরে আর মোটা ঠোঁটখানা কিম্ভুত বেঁকিয়ে কেমন এক শব্দ তোলে ও। তারপর মাথাটাকে একেবারে হাফেযের কানের কাছে নিয়ে আসে, যেন এখুনি সাংঘাতিক এক গোপন রহস্যের সন্ধান দিয়ে চমকে দেবে ওদের। আরে দরবেশের এই যে মেয়ে, এটার সাথেই তো আমাদের মেজো মিঞার, ওই যে আজকাল কী বলে–এশকে না। আশনাই, কিনা বলে, সেই কাণ্ড আর কী? অবশেষে বলেই ফেলল রমজান।

তোবা, তোবা, নাউজুবিল্লাহ, নিজের গালেই চড় মারেন খতিব সাহেব। যাচ্ছিলেন পথ দিয়ে, এক খিলি পানের আকর্ষণে উঠে এসেছিলেন। পরে কিস্সার রসটা না নিয়ে চলে যেতে পারেন নি। কিন্তু সৈয়দ গিন্নী–বাবা, মিঞার মেয়ে, গিঁঠে গিঁঠে তার বুদ্ধি। ছেলে বাইরে, ব্যাস এ সুযোগে বিদেয় করে দিল আপদটা। ছেলে যে একেবারে এশকে, মশগুল তা কী আর জানত সৈয়দগিন্নী? কথাগুলোকে কেমন চটকে চটকে বলে রমজান।

ও ও, তলে তলে এত কারবার? তাই তো বলি সৈয়দ বাড়ির বিয়ে, নিশি রাতে চুপি চুপি? দাওয়াত নেই, যেয়াফত নেই? এই তো সেদিন বছর চার হবে বড় জোর, জাহেদের ছোট ফুফুর বিয়ে হল, একশো খাসি জবাই হল, তিন গেরাম দাওয়াত খেল। দাওয়াতটা মার গেল বলে বড় আফসোস হাফেয সাহেবের।

আরে হ হ, এতক্ষণে তাহলে বুঝলে আসল ব্যাপারটা। বেচারা বুজুর্গ আমার বড় আফসোস তার জন্য। সৈয়দগিন্নী নাকি শুধু পায়ে ধরতেই বাকী রেখেছিল। শেষে এক রকম ধরে বেঁধেই গছিয়ে দিয়েছে মেয়েটাকে। কিন্তু, সৈয়দগিন্নীরও তকদীর মন্দ, চোরা বুজুরগ, তারও শনির দশা। সমবেদনায় বুঝি কাতর হয়ে আসে রমজানের গলাটা।

এ সব গল্পে সুখ পায় রমজান। বলতে বলতে দিলটা বড় ঠাণ্ডা হয়ে আসে ওর। বড় ছোট, বড় ছোট সে। অর্থে মর্যাদায় এত ছোট যে গাঁয়ের কমজাত মিসকিনগুলোও পথে যেতে সালাম দেয় না, বড়জোর এক পাশে সরে পথ করে দেয়। রেঙ্গুন ঘুরে এসে আরো তীব্র হয়েছে এই ছোট হওয়ার জ্বালাটা। আর উগ্র হয়েছে ওর মনের আকাঙ্ক্ষা। মিঞা সৈয়দদের আভিজাত্যের মিনারে একটুখানি কাদা লেপে অনেক খেদ মিটে যায় ওর। বুকের অনেক জ্বালা জুড়িয়ে যায়।

কালু এসে খবর দিল এত্তেলা দিয়েছে ফেলু মিঞা।

আসরটা ভেঙে যায়। একে একে উঠে যায় হাফেয সাহেব, খতিব সাহেব। উঠি উঠি করেও বসে থাকে সতুর বাপ।

সতুর বাপ, একটু থাক। কথা আছে। তারপর কালুকে উদ্দেশ্য করে বলল রমজান : যাতো কালু ভিতর বাড়ি, পান নিয়ে আয়। কালু চলে গেলে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে সতুর বাপ। বলে, সব এন্তেজাম তো ঠিক। টাকা লাগবে আরো কয়টা।

আরে টাকার কথা ভাব কেন, সতুর বাপ। যা লাগে নিয়ে যাও। বলেই জিব কাটল রমজান। স্বরটা বে-আন্দাজ উঁচু হয়ে গেছে। ওই যে বাঁশের বেড়া আর টিনের চাল ওদেরও তো কান আছে।

তা ব্যবস্থা সব ঠিক তো? শেষ সময় গিয়ে তোমার লোকজন সব বেঁকে বসবে না তো? এবার একেবারে ওর কানের কাছে এসে ফিসফিসিয়ে শুধাল রমজান।

আরে না, কী যে বল। বিশ্বাসী লোক, তায় আবার টাকা খেয়েছে। কিছু বলা যায় না সতুর বাপ। বার্মা মুল্লুকে এ সব খেল তো কম দেখে আসিনি, টাকা খেয়ে শালারা কাম করে উল্টো। তা ছাড়া সৈয়দদের মেজো মিঞাটা বড় বেজাহান। আর শালার লোকগুলোও যেমন ক্ষেপেছে ওর পিছে। একেবারে শেষ সময়টিতেই হয়ত বলে বসবে, মেজ মিঞার মিটিংয়ে আমরা গোলমাল করতে পারব না। তখন? তাই বলছি সতুর বাপ, তৈরি থেক সব দিক দিয়ে।

কিছু ভেব না তুমি। যাদের ঠিক করেছি ওদের মাঝে কিছু লেঠেলও আছে। লেঠেলের ভাবনা সুলতানপুরের। তুমি তোমারটা ভাব। মৃদু একটা ধমক দেয় রমজান। তারপর যেন হঠাৎ মনে পড়েছে তেমনি ভাবে বলল : মেজো মিঞার দফা তো রফা করে গেছে তার ভগ্নিপতি। তোমাদের কামটা কিছু কমিয়ে দিয়ে গেছে। কিন্তু, ওই মাস্টার হারামিটা যেন আচ্ছা শিক্ষা পায়, এটা তোমাকে বিশেষভাবে দেখতে হবে।

সে আমার খেয়াল আছে।

নাও, এটা তোমার, এটা ওদের, যাকে যেমন মোনাসিব মনে কর দিয়ে দেবে। শুধু কাম চাই, পাকা কাম, বুঝলে? তবনের গেরোর নিচে থলি, সেই থলি থেকে কিছু নোট বের করে দু ভাগে ওর হাতে তুলে দিল রমজান।

উঠে পড়ে সতুর বাপ।

এগিয়ে এসে ওর কাঁধে হাত রাখে রমজান, বলে : কিন্তু ভাই সাবধান। ফেলু মিঞার পক্ষেও আছি আমরা, বিপক্ষেও আছি। এ বড় কঠিন খেইল। জবাবে এক টুকরো রহস্যকুটিল হাসি ফেলে বেরিয়ে যায় সতুর বাপ।

পান নিয়ে এসে গেছে কালু। গোটা দুই তিন পান এক সাথে দলা পাকিয়ে মুখে পুরে নিল রমজান। সুপুরিটা হাতের চেটোয় ডলতে ডলতে শুধাল, কিরে, এই রাতের বেলায় কী আবার দরকার পড়ল তোর মুনিবের?

কী এক দলিল নাকি খুঁজে পাচ্ছে না, বলল কালু।

তুই যেমন পেয়াদা, তেমন তোর মুনিব, দলিল দলিল করেই শালা মরবে। কালু জিব কাটে। মুনিব সম্পর্কে এমন অসম্মানের কথা রমজানের মুখ থেকে ইদানীং শুনছে ও। এখনও অভ্যস্ত হতে পারছে না। সুপুরিটা মুখের ভিতর ছুঁড়ে দিয়েছে রমজান। আয়েশ করে পান চিবোচ্ছে। চলেন। তাড়া দেয় কালু।

তাড়া নেই রমজানের। বলে, এই তো চলছি, তা তুই কী করলি? মুখ নীচু করে মাথা চুলকায় কালু।

চোখ চালিয়ে এদিক ওদিক একবার দেখে নিল রমজান। আস্তে আস্তে খুলে ফেলল তবনের গিঁঠটা। বের করল সেই থলেটা। সুতো দিয়ে প্যাঁচানো থলে। প্যাঁচ খুলে বের করল একখানি পাঁচ টাকার নোট। আর দুটো রূপোর টাকা। আবার সুতো প্যাঁচিয়ে থলির মুখ বন্ধ করে তবনের নিচে লুকিয়ে রাখল থলেটা।

এটা তোর বখশিস। আর ওই দুটো টাকা তোর পোলাকে মিঠাই কিনে খাওয়াবি। টাকাগুলো ওর আড়ষ্ট হাতে গুঁজে দিল রমজান। তবু বুঝি দ্বিধাগ্রস্ত, ইতস্তত ভাব কালুর। মুনিবের নিমকহারামি করতে বাধছে ওর। তাছাড়া, অমন জলজ্যান্ত জিনিসগুলো চুরি করে আনতে যদি ধরা পড়ে যায়? হাতে নাতে না হয় ধরা না-ই পড়ল, কিন্তু যদি কোনো রকমে টের পেয়ে যায় ফেলু মিঞা? রমজানের বলার পর থেকে এই পাঁচ সাত দিন ধরে সে কথাটাই তো ভাবছে কালু।

সাবেক আমলের একটা বাংলা ঘর। এককালে হয়ত দাসী বান্দীরা থাকত। এখন কোনো কাজেই আসে না। তাই ঘরটা ভেঙে ফেলেছে ফেলু মিঞা। কিন্তু পুরোনো হলে কী হবে, কাঠগুলো তার এখনো আনকোরা মনে হয়। বিশেষ করে শাল কাঠের পালাগুলো তো একেবারে অক্ষত। সেই ঘরেরই দশটা লোহা কাঠের পালা আর এক বান টিন চেয়েছে রমজান। চুপিসারে পাচার করে দিতে হবে রমজানকে।

কাজটা তো তেমন কিছু না। তা ছাড়া রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে নষ্টই হবে অমন ভালো পালাগুলো। না কোনো কামে আসবে ফেলু মিঞার, না তার মনে থাকবে। অথচ ওই আটটি লোহা কাঠের পালায় রমজানের বড় ঘরটা সত্যি মজবুত হবে। কালুরও লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই।

সে তো বুঝলাম কিন্তু মুনিবকে না বলে...এই উত্তরটাই দিয়েছিল কালু আর এ কয়দিন ধরে সে দ্বন্দ্বের দোলায় দুলছে ও। মুনিবকে না বলে তার জিনিসে হাত দেওয়া সে তো চুরিই হল। বেশ বেশ, আমিই না হয় তুলে আনবার ব্যবস্থা করব। তুই শুধু ফাঁস করে দিবি না ব্যাপারটা। তা হলে?

তা হলে যে কী করবে কালু, এ কয়দিন ভেবে ভেবে সেটাও ঠিক করতে পারেনি ও।

ফেলু মিঞার পেয়াদাগিরি করে কয়টি টাকাই বা পায় ও। এমনিতেই মাঝে মাঝে হাত পাততে হয় রমজানের কাছে। তবু কী চলত সংসারটা মুনিব গিন্নীর যদি একটু দয়া না থাকত। বড় ভালো ফেলু মিঞার বেগম সাহেবা। চেয়ে কোনোদিন তাঁর কাছ থেকে খালি হাতে ফিরে আসেনি কালু। না চাইতেও কতদিন চালটা, মাছটাও ন্যাকড়া বেঁধে তুলে দিয়েছেন ওর হাতে। বলেছেন, নিয়ে যাও।

সেই মুনিব গিন্নী যদি জেনে ফেলেন ব্যাপারটা, তা হলে? মুনিবের চেয়ে মুনিব গিন্নীর জন্যই বুঝি এত দ্বিধা কালুর।

শোন কালু তোকে আমি খুশি করে দেব। অকস্মাৎ বলল রমজান।

পাঁচ টাকার কাগজটা কালুর হাতের মুঠোয় কেমন কর কর আওয়াজ তুলছে। রূপোর টাকাগুলো কেমন গরম হয়ে এসেছে কালুর মুঠোর ভেতর।

আচ্ছা। সরাবার ব্যবস্থা আপনার। উঠে দাঁড়ায় কালু।

কুঁতকুঁতিয়ে হাসে রমজান। ওর খুশির হাসিটাও কেমন বীভৎস। গায়ে যেন কাঁটা ফোঁটায়।

কামিজটা কাঁধে ফেলে উঠে দাঁড়ায় রমজান। আর সেই মুহূর্তেই একটি টিকটিকি টুপ করে লাফিয়ে পড়ে ওর খালি কাঁধটায়। ত্রস্তে ওর গা বেয়ে নেমে যায়। কোত্থেকে একটা ইঁদুর এসে ধাওয়া করে টিকটিকিটাকে। হেসে দেয় কালু, বলে আপনি তোয়াঙ্গর হবেন।

তোয়াঙ্গর, মানে ধনী। টাকা পয়সা ধনদৌলতের মালিক?

কাঁধে টিকটিকি পড়লে তোয়াঙ্গর হয় না কী রে? আবারও শুধাল রমজান। হয়। ডান কাঁধে। ওই যে রামদয়ালের বাপ। সেই অল্প বয়সে যখন ইস্কুলে যেত, তখন তারও ডান কাঁধে টিকটিকি পড়েছিল। সেই থেকেই তো ইস্কুল ছেড়ে ব্যবসায় নামল দত্ত। আর এখন?

হাঁ, এখনকার কথা কে না জানে। কিন্তু সত্যি কী তাই হবে? তোয়াঙ্গর হবে রমজান? কথাটা ভাবতেও অদ্ভুত সুখ পায় রমজান। খুশির চোটে ওর বুকের ভেতরটা যেন লাফিয়ে ওঠে। এ কী কথা শোনাল কালু! এ যে ওর মনের কথা। রাত দিন খতিব সাহেবের তসবি গোনার মতো মনে মনে ও এই কথাটাই তো জপে চলেছে।

কিন্তু হঠাৎ যেন সন্দেহ জাগে রমজানের মনে, বলে, আমি তো শুনেছি টিকটিকি মাথায় পড়লে রাজা হয়, কাঁধে পড়লে কী হয় সে কথা তো শুনিনি? ওই একই কথা। কাঁধ আর মাথায় তফাত কতটুকু। বলেই ঘর ছেড়ে অন্ধকারে নেবে পড়ে কালু।

তা বটে। কাঁধ আর মাথার তফাত কতটুকু। কালুর কথাটায় সায় দিয়ে খুশি হয় রমজান।

রাতটা বড় অন্ধকার। কিন্তু পথ ঠাহর করতে একটুও যেন কষ্ট হচ্ছে না রমজানের। আজ বুঝি চোখ বুজেই বাকুলিয়ার পথ চলতে পারবে ও। চারিদিকে

সবই সুসংবাদ আজ। সতুর বাপ যদি কামটা নির্বিঘ্নে সারতো সেতো মোটা দাও। তা ছাড়া এ-তো সবে শুরু। ইলেকশনের বছর এ পথ দিয়ে যে বিস্তর টাকা গড়িয়ে যাবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই ওর। আর ওর হাত দিয়েই তো সব গড়াবে, অত টাকা ধরে রাখবার ব্যবস্থারই হয় তো অভাব পড়বে শেষ পর্যন্ত।

তিন নম্বর তালুকটাও গিলছে ফেলু মিঞা। খুশিতে বাগ বাগ হয়ে কসিরের ছাড়া ভিটিটা পাঁচ বছরের জন্য মোফতে ভোগ করতে দিয়েছে রমজানকে। ইতিমধ্যেই ভিটিটাকে সমান করে ফেলেছে রমজান। কালোজিরা ধানের বীজ ফেলবে। হিসেব করে দেখেছে রমজান, হেলে ফেলেও অন্তত বিশ মণ ধান উঠবে। সরু সুগন্ধি কালোজিরা চালের দাম আছে বাজারে। কথার মানুষ রামদয়াল। ঠকায়নি রমজানকে।

আরো খুশির খবর, সৈয়দদের সম্পত্তি সবই দেখভাল করবে ফেলু মিঞা। সৈয়দ সাহেব চিঠি লিখেছেন, জরুরি কাজের জন্য ছুটি তাঁর মঞ্জুর হয়নি। তাঁর সম্পত্তির ব্যবস্থাটা ওই চিঠিতেই জানিয়ে দিয়েছেন। রমজানকে বলেছে ফেলু মিঞা, তায়তদারক তুমিই তো করবে, ওদের চাকরটাকে সঙ্গে নিয়ে ফসলি জমিগুলো বুঝে নাও। অন্য সব তো দলিলেই রয়েছে। যা ভাবা যায়নি, চিন্তা করা যায়নি, তেমনি সব সুযোগ এসে ধরা দিচ্ছে রমজানের হাতে। এ বুঝি কোনো মুরব্বীর দোয়ার বরকতে আল্লার রহম। নইলে এক সাথে এত সুযোগ?

তার উপর আজ টিকটিকি পড়ল ডান কাঁধে? না, কালুর কথাটা মিথ্যে হতে পারে না। সমস্ত আলামতই তো রমজানের পক্ষে। তোয়াঙ্গর সে হবেই। ধন দৌলত বালাখানা দাস-দাসী সবই হবে। সবই হবে। ইস, বুকটা ফুলে ওঠে খুশির চোটে, ভেতরের কইলজাটা বুঝি লাফ দিয়ে বেরিয়ে আসতে চায়।

খুঁজে না পাওয়া দলিলের বোস্তানিটা ফেলু মিঞার হাতে দিয়ে এমনি খুশির চোটে সারা গ্রামটাই যেন ঘুরে বেড়ায় রমজান। কখন ভূঁইয়া বাড়ি ছেড়ে পশ্চিমের রাস্তায় চলে এসেছে ও; টের পায়নি। অথবা ওর মনের খুশিই ওকে টেনে এনেছে পশ্চিমের রাস্তায়, ওর অজানতেই। ইপাব তৈরিঃ আল মোস্তাইন বিল্লাহ

কিন্তু ততক্ষণে ওর মনের ফুর্তিটা কী এক উত্তেজনায় রূপান্তরিত হয়েছে। মনের ফুর্তি দেহের রাজ্যে যেন আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। দেহের রাজ্যে প্রচণ্ড এক ক্ষুধার আগুন। মোটা সোটা দেহের থল থল গোশত আর পুরু মেদের আস্তর পুড়িয়ে সে আগুনের জিহ্বা যেন রাতের আঁধারে লকলকিয়ে উঠছে। পা চলে তাড়াতাড়ি। শ্বাস পড়ে ভারি ভারি। হুরমতির বাড়ির পেছনে যে সরু পায়ে কাটা পথ, সেখানে

এসে থামল রমজান। সেই ছেঁকা দেবার পর থেকে এ তল্লাট মাড়ায়নি রমজান। সাহস পায়নি। তাই গোশতের চাহিদাটা যখন অসহ্য ঠেকেছে। সব ডিভিশন শহরে গিয়ে ক্ষিধেটা মিটিয়ে এসেছে। কিন্তু আজ অন্য কোথাও যাবার কথাটা ভাবতে পারল না রমজান।

তোয়াঙ্গর হতে চলেছে সে, তোয়াঙ্গরীর আয়োজন একটার পর একটা সুসম্পন্ন হতে চলেছে। ভাগ্যের শিকা একটার পর একটা ছিঁড়ছে আর ওর করায়ত্ত হতে চলেছে।

কিন্তু, হুরমতিকে বাদ দিয়ে তোয়াঙ্গীর ছবিটা যেন অসম্পূর্ণ। হুরের মতো সুন্দরী মুখ, চিকন মুলোর মতো লাল আর তাজা সেই দেহখানি।

ঘন ঘন দুটো নিশ্বাস ছাড়ে রমজান। তবনের উপর হাত রেখে অনুভব করে থলেটা। শুকনো পাতার মতো মড়মড়িয়ে যেন কথা কয়ে গেল নোট গুলো। গোটা থলেটাই আজ তুলে দেবে হুরমতির হাতে। আর যদি নিকা বসতে রাজি হয় হুরমতি তবে তিন কানি জমি যা রমজানের সাকুল্য জমির অর্ধেক সবটাই লিখে দেবে ওর নামে।

না, না, শাদী-নিকার কথা আজ পাড়বে না রমজান। এই নিকার ব্যাপার নিয়েই তো এত গণ্ডগোল। সাফ দিলেই কথাটা পেড়েছিল রমজান। কিন্তু মুখিয়ে উঠেছিল হুরমতি, আবার বলবি তো জিব কেটে ফেলব। তবু আবার বলেছিল রমজান। তারপর দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছিল হুরমতি। মাফ চেয়েও হুরমতির মনটা গলাতে পারেনি রমজান। তবেই না অমন চটেছিল রমজান। আজ শুধু, মাফ চাইবে না, টাকার থলে দিবে না, আজ হুরমতির পায়ে ধরবে রমজান।

কিন্তু আজব মেয়ে হুরমতি। ঢাকে নক্সায় নমুনায় যেমন অবিকল মিঞা বাড়ির মেয়ে তেমনি ওর জিদটা। একেবারে খানদানী মেজাজ। কতদিন খবর দিল ফেলু মিঞা গেলই না। শেষে মিঞার মান সম্মান সব বিসর্জন দিয়ে নিজেই এসে হাজির হয়েছিল মিঞা। রা-ই করল না হুরমতি। অসুখ বিসুখ, তাও নয়। ঘন ঘন শহরে যাচ্ছে। যেদিন শহর কামাই সেদিন লেকুকে নিয়ে শুয়ে থাকছে ঘরে, এ সব খবর তো রাখত রমজান।

শাসিয়েছিল ফেলু মিঞা। সে শাসানি আর সুপুরি বাগিচায় রাতের নিমন্ত্রণ দুটোই এক সাথে বহন করে এনেছিল রমজান। শুনে বলেছিল হুরমতি, আমি তার বাঁদি? জিজ্ঞেস করে এসো তোমার মিঞাকে। আল্লা মালুম মিঞার উপর কেন যে অমন রুষ্ট হয়েছিল হুরমতি। অথচ লাভটা কী হল?

না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বড় বেশি ইতস্তত করছে রমজান। আর যা ওর ভাবার কথা নয়, সে সব কথা ভেবে মনের ভয় আর ইতস্ততটাকেই বাড়িয়ে তুলেছে সে। ডান হাতের তালুটাকে নাকের ফুটোর নিচে ঠোঁটের উপর ঠিক ঢাকনির মতো করে ধরল রমজান। আলাজিহ্বাটায় সামান্য চাপ দিয়ে আওয়াজ তুলল : কু-উ কু–উ। এটাই সংকেত।

অধীর রমজান। নালাটা পর্যন্ত এগিয়ে আবার ফিরে আসে। আবার দু-পা এগিয়ে পিছিয়ে আসে। না, আজ যদি হুরমতি জবাব না দেয় সংকেতের জোর করেই ওর ঘরে গিয়ে উঠবে রমজান। দেখে নেবে কত জোর আছে মেয়ে মানুষের গায়। কু-উ কু-উ। আবার সংকেত পাঠাল রমজান। রাতের শিকারী পশুদের চোখের মতো জ্বলছে ওর চোখ, সে চোখ চেয়ে থাকে একটা দূরের গাছপালা ঘেরা ওই জমাট অন্ধকারটুকুর দিকে। গোটা শরীরের জ্বালাটা এবার যেন মাথায় উঠে এসেছে। মাথায় যেন পটকা ফাটছে।

সংকেতের জবাবটা কী আসবে না? উত্তেজনায় অধীর রমজান ফা-ৎ করে শব্দ হল। হ্যাঁ হ্যাঁ হুরমতির ঘরেই, কাঠি জ্বালাবার শব্দ। হ্যারিকেন ধরাল হুরমতি। ওর ঘরের বাঁশের বেড়ার খোপ দিয়ে আলোর রেখা বেরিয়ে আসছে। এবার খট খট খড়মের শব্দ হল। হ্যাঁ দরজা কী জানালার দিকে এগিয়ে আসছে হুরমতি। টুন টুন টুন। এক দুই তিন, হ্যাঁ তিন বারই টুন টুন শব্দ হল টিনের জানালায়।

সম্মতির সংকেত পেয়ে পলক ফেলল না রমজান। হুরমতির বাড়ির সীমানায় নালা। এক লাফে নালাটা ডিঙ্গিয়ে হুরমতির দাওয়ায় উঠে এল ও। দরজার উপর হাতটি রাখতেই পিছন দিকে সরে গেল কপাট। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে হুরমতি। কোনো রকমে কপাটটা ভেজিয়ে দিল রমজান। মুহূর্তের অবকাশ না দিয়েই লুফে নিল হুরমতির হুরের মতো শরীরখানি। লোমশ গরিলা বাহুর যাঁতায় একদলা মাংসের মতো ওকে পিষে চলে রমজান। হিংস্র পশুর আঁচড় কেটে যায় ওর মুখে গলায় বুকে। হিস হিস গরম নিশ্বাসের সাথে টেনে নেয় ওর ফুলেল তেলের গন্ধ, ওর দেহের সুবাস। কোথাও পায়নি রমজান এমন দিল মাতোয়ারা সুবাস, শহরের রণ্ডি পাড়ায় না, রঙ্গমেও না। শুনেছে মিঞা-সৈয়দদের নীলরক্তের মেয়েদেরই গায়ের গন্ধ এটা। তাই তো এত লোভ, এত আকর্ষণ রমজানের।

ওর ব্লাউজের বোতামগুলো খুলে দেয় রমজান। শাড়ির বাঁধনটা দেয় শিথিল করে। পাট আর কৃত্রিম রেশমের মিশেলী মসৃণ শাড়ি। ঈষৎ ভারি। টুক করে খসে পড়ে ওর কোমর থেকে। নগ্ন দেহটা কোলে তুলে নেয় রমজান, আস্তে করে শুইয়ে দেয় চকির বিছানায়। পা গুটিয়ে উঠে বসে হুরমতি। রমজানের হাতটা ছাড়িয়ে

নেয়। হ্যারিকেনের মৃদু আলোয় আভায় হুরমতির সোনা বাটা শরীরের নিরাবরণ রেখাগুলো কী এক আগুনের শিখার মতো নেচে নেচে উঠে। আগুনের তীরের মতো এসে বিঁধে যায় রমজানের সর্বাঙ্গ।

হুরমতি হাসে। ছিনালী হাসি। ছিনালী কটাক্ষ। একী রহস্য হুরমতির! তবে কী এমনি করেই আজ ওকে বিদায় দিয়ে দেবে হুরমতি? চৌকি ছেড়ে একপা দুপা এগিয়ে আসে রমজান। ট্যাক খুলে থলেটা তুলে দেয় হুরমতির হাতে। নোটের চাপে ফোলা থলে, হুরমতির তালু গড়িয়ে পড়ে যায় মেঝেতে।

আবারও হাসে হুমতি।

অসহ্য। অসহ্য এ বিলম্ব। এতক্ষণের যে উত্তেজনা, ভেতরে ভেতরে যে অস্থির দাপাদাপি এ যেন তার চেয়েও ভয়ংকর। আপনার হিংস্র পশুত্বটাকে আর তো সামলাতে পারছে না রমজান। আবারও হাত বাড়ায় ও।

হেসে এক পাশে সরে যায় হুরমতি। হ্যারিকেনটা প্রায় নেভানোর মতো করে বুঁজিয়ে দেয়।

আধো অন্ধকারে ঠাহর করে ওকে স্পর্শ করে রমজান। আর এতক্ষণ সামলে রাখা পশুত্বটা যেন চেরাগের উপর ধরে রাখা গালার মতো গলে গলে ঝরে পড়ে।

হঠাৎ কী যেন হয়ে গেল। তীব্র তীক্ষ্ণ এক চিৎকারে বাজ খাওয়া কাকের মতো ছিটকে পড়ল রমজান। বদ্ধ দরজায় ঢুঁ খেয়ে মাথা ফাটাল। যন্ত্রণার চিৎকারে রাত্রির নীরবতা চিরে বেরিয়ে গেল রমজান আর হুরমতির খিল খিল হাসিটা যেন বিষ মাখা তীরের মতো ওর পিছু ধাওয়া করল। প্রতিশোধ নিয়েছে হুরমতি।

হাসতে হাসতে রমজানের কানটা কেটে রেখেছে ও।

শাড়ি পরে লণ্ঠনের আধবোজা আলোটা তুলে দিল হুরমতি। শিথানময় ছোপ ছোপ রক্ত। বালিশের এক কোণে বড় এক চাক রক্ত। সে রক্তের চাক থেকে মাংসের দলাটা আলাদা করে তুলে নিল হুরমতি। বালিশের তলা থেকে ন্যাকড়া বের করল। সে ন্যাকড়ায় প্যাঁচিয়ে নিল রমজানের কানটা। তার পর মেঝে থেকে কুড়িয়ে নিল রমজানের টাকার থলেটা। থলে আর ন্যাকড়ার পুঁটলিটা এক সাথে বেঁধে বেরিয়ে এল হুরমতি। লেকুর ঘরের দরজায় একটু চাপ দিতেই চৌকাঠের দিকটা ফাঁক হয়ে গেল। সে ফাঁক দিয়ে পুটলী আর থলেটা ভেতরে ছুঁড়ে দিল হুরমতি। বুঝি ভোরের উপহার রেখে গেল লেকুর জন্য।

ঘরে ফিরে হুড়কো দিল হুরমতি। হুড়কোর গায়ে লোহার শিকলিটা প্যাঁচিয়ে তালা মারল। তালাটা একবার ভালো করে টেনে দেখল। তার পর চাবিটা আঁচলে বেঁধে শুয়ে পড়ল।

২৫.

তারুণ্যের রংমোড়া সুন্দর একটি আবেগ। সেই আবেগের টানেই যেন ওর চলা। যুক্তিটা যে একেবারে অনুপস্থিত এমন নয়। কিন্তু বুদ্ধিটা আবেগে আচ্ছন্ন বলেই যুক্তির নির্দেশে পথ চলার প্রয়োজন এখনো দেখা দেয়নি ওর জীবনে।

কিন্তু আবেগ দিয়ে বোঝা যায় না জীবনের জটিলতাকে, চেনা যায় না বিচিত্র জটবাঁধা এই পৃথিবীকে। জাহেদের কাছে এ যেন এক হঠাৎ আবিষ্কার যা ওর তারুণ্যের আবেগ দিয়ে গড়া সহজ পৃথিবীটাকে খান খান করে ভেঙে দিয়ে যায়। সে ভাঙার ফুটো দিয়ে যে পৃথিবীটা উঁকি মেরে চায় সেখানে শুধু কুসংস্কার, নীচতা, অন্ধবিশ্বাস। কদর্য তার চেহারা। সেখানে সব কিছুই যেন জটিল। মনের সহজ আবেগ দিয়ে সেখানে পথ পায় না জাহেদ। কপালে ক্ষতটা ওর সেরে উঠেছে। তবু জ্বরের ভাব আর গায়ের ব্যথাটা আবার দেখা দিয়েছে আজ। ওর হাত টিপে দিচ্ছে মালু। এভাবে আমার সর্বনাশ করলে মেজো ভাই? মাটির দিকে চোখ করে শুধায় রাবু।

চমকে তাকায় জাহেদ। রাবুর মাথায় ঘোমটা। এমন ধারা প্রশ্ন করবে রাবু কল্পনাও করতে পারেনি জাহেদ। তাছাড়া ব্যাপারটা নিয়ে রাবুরও যে একটা বক্তব্য থাকতে পারে। সেটা চিন্তার বাইরে।

বুদ্ধি হয়ে মাকে দেখলাম না, মায়ের স্নেহ কী জানব না কোনো দিন।

আব্বাকেও তুমি তাড়িয়ে দিলে। ক্ষোভের অনুযোগের স্বর রাবুর।

এমনভাবে বলছিস যেন চাচা সব সময় বাড়িতেই রয়েছে, আমি বের করে দিলাম।

এবার আব্বা থাকতেন বাড়িতে। ঠিকই থাকতেন।

খুব অসন্তুষ্ট হয়েছিস মনে হচ্ছে? খাটের মাথায় হেলান দিয়ে বসল জাহেদ।

আহা মরি। বাপ স্বামীকে মেরে মুরে বাড়ি ছাড়া করলে। আমি এখন খুশিতে নাচব, তাই না? কে বলছিল তোমায় অমন বীরত্ব ফলাতে?

কী বলছে রাবু! এত ঝাঁঝ কখন এল ওর কণ্ঠে? চোখ জোড়া কচলে নিয়ে ভালো করে ওর মুখখানা দেখবার চেষ্টা করল জাহেদ। বলল শান্ত কণ্ঠে, তোর ভবিষ্যটা কী হত ভেবে দেখেছিস?

মা নেই, বাপ থেকেও নেই। তার আবার ভবিষ্যৎ। বরাতে যা লেখা তাই হোত? তুমি কেন মাথা গলাতে এলে?

খুব কথা শিখেছিস দেখছি, ওই বুড়োটা হবে তোর বর, বরাতে সেটাই লিখে দিয়েছে, না? এ সব কথা আমার সামনে বলবি তো চড় খাবি। বুঝেছিস?

রেগে ওঠে জাহেদ। চোদ্দ বছরের মেয়ের মুখে বরাতের কথা শুনলে কার না রাগ হয়!

কাজল রেখার মতো চিকন ভ্রূ। সে ভ্রূর নিচে একজোড়া ডাগর কালো চোখ। নক্সার মতো নিখুঁত ফর্সা মুখ। পাতলা ত্বকে কিশোরী লাবণ্য আর স্বাস্থ্যের শী। যেন এই প্রথম লক্ষ করল জাহেদ।

জানিস, শহরে তোর বয়সী মেয়েরা ফ্রক পরে খেলে বেড়ায়? লেখাপড়া শিখবি নিজের বুদ্ধিতে চলবার শক্তিটা অর্জন করে নিবি। তারপর তো বিবেক যা বলে তাই করবি। তার আগে আমায় আর চটাসনে।

উত্তর দেয় না রাবু। আঁচলের খুঁটে একটি একটি করে আঙ্গুল জড়ায়। একটি একটি করে আবার খুলে ফেলে।

তুই এখন চাস কী বল্ তো? তোর মন কী কয়, ঠিক সে কথাটাই বলবি। ওকে চুপ দেখে শুধাল জাহেদ।

আব্বাকে এনে দাও। আমার স্বামীকে ফিরিয়ে আন।

অবাক মানে জাহেদ। অসুস্থতার জের টেনে এখনো দুর্বল ওর স্নায়ুগুলো। সেই স্নায়ুতে যেন আগুন ধরিয়ে যায় রাবুর কথাগুলো। চেঁচিয়ে ওঠে, যা, যা, আমার সুমুখ থেকে যা তো। শীগগির যা।

দিন দুই পর।

সকালে ঘুম ভেঙেই খিঁচিয়ে যায় জাহেদের মেজাজটা। চেঁচামেচি শুরু করে দেয় : কতবার বলেছি, সকাল সকাল দু তিন কাপ চা দিয়ে যাবে আমায়। কেউ যেন গায়েই মাখে না আমার কথা। কী মেয়েরে বাপু। কখন থেকে বলছি, যা ওর ঘুমটা

ভাঙিয়ে দে। চায়ের পেয়ালার শব্দ পেলেই জেগে উঠবে ও। কী যে সারাক্ষণ ভাবে গালে হাত দিয়ে। জাহেদ শুনতে পায় রসুই ঘর থেকে ভেসে আসছে ওর আম্মার গলা।

রাবু আসে। কী এক পরমে ধীর ওর পদক্ষেপ। তেপায়ার উপর তৈরি করা চায়ের কেতলি আর পেয়ালাটা রেখে ফিরে যাবার জন্য পা বাড়ায়।

যাসনে। বস। কথা আছে। অতিরিক্ত গম্ভীর জাহেদের কণ্ঠ। মুখটা নীচু করে দাঁড়িয়ে যায় রাবু।

বসছিস না কেন? বসতে বললাম যে। ধমকে ওঠে জাহেদ।

বিড়াল ছানার মতো হাতপাগুলোকে সংকুচিত করে এতটুকু হয়ে বসে রাবু। খাটের কোণায়।

দেখ তোর লজ্জা দেখে আমারও লজ্জা পায়।

এজন্যই বসতে বলেছিলে নাকি? ছোট্ট করে শুধায় রাবু।

থামবি? তোর এ সব বাঁকা আর সেয়ানা কথা সহ্য হয় না আমার। বরাত বুঝিস, স্বামী চিনিস। মগজটাকে তো দিব্যি পচিয়ে তুলছিস। এদিকে লেখাপড়ার বেলায় তো ঢুঁ-ঢুঁ।

বেশ, ঢুঁ ঢুঁ, তাতে কার কী?

ও বাবা, আবার গাল ফোলানো হচ্ছে! তা, এদিকে যে একেবারেই মাড়াচ্ছিস না, ব্যাপার কী?

যা যা, আমার সুমুখ থেকে যা, এ সব কথা শুনলে কার আসতে ইচ্ছে হয়?

হো হো করে হেসে দেয় জাহেদ, বলে, তোর যে দেখি রাগও আছে। ঘন ঘন চুমুক দিয়ে পেয়ালার চাটা শেষ করে জাহেদ। বলে আবার, তুই নাকি কোলকাতায় যাবি না বলেছিস?

হ্যাঁ, বলেছি তো। কেমন জেদী কণ্ঠস্বর রাবুর।

কেন যাবি না?

সব বলেছি জ্যাঠি আম্মাকে।

আমাকেও বলতে হবে।

কী আমার মোড়লরে! সবই বলতে হবে তাঁকে! বলব না।

বলবি না? কেমন আহত আর ক্ষুণ্ণ স্বর জাহেদের। কী এক ব্যথায় যেন কালো হয়ে যায় ওর সদ্য হাসি ছড়ান মুখখানা।

চকিতে একবার চেয়েই চোখ নাবিয়ে নেয় রাবু। ফস করে কথাটা বলে ফেলেছে বটে, কিন্তু জাহেদকে একটুও আঘাত দিতে চায়নি ও। তাই ব্যথাতুর মুখটার দিকে তাকিয়ে ছলছলিয়ে ওঠে রাবুর চোখ। ঘোমটাটা আর একটু টেনে দেয় রাবু আর খাটের কার্নিসে আঙ্গুলের নখ ঘষে চলে। স্থির অপলক চোখে ওর দিকে চেয়ে থাকে জাহেদ। চোদ্দ বছরের মেয়েটি–ওই একটি রাত, এই কয়টা দিন যেন কোনো যৌবন অতিক্রান্তা নারীর পরিণতি দিয়েছে, গাম্ভীর্য দিয়েছে আর দিয়েছে কী এক বিতৃষ্ণা। ঘরে বসে আনমনে বুঝি পুতুল খেলছিল মেয়েটি, বেরিয়ে এসে দেখল ওর আনন্দময় কৈশোর ওর অনাগত রোমাঞ্চ ভরা যৌবন, এতগুলো বছর কে যেন মাঝখান থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। আনন্দে নাচবার, খুশিতে হাসবার আর কোনো অধিকার নেই ওর। বৃদ্ধ স্বামীর সেবা, দেওয়ানা পিতার হাজারো অত্যাচার সয়ে সয়ে সেই পিতাকেই আবার আঁকড়ে ধরা, ওই ওর জীবন। এই ওর বরাত।

বুঝি ওর মুখটা ভালো করে দেখবার জন্যই উঠে আসে জাহেদ।

আমার সামনে ঘোমটা দিচ্ছিস, এটা সত্যি তোর বাড়াবাড়ি।

জাহেদ আর চেয়ে থাকতে পারে না নিরানন্দের বিষাদ ঘেরা ওই মুখটার দিকে। বুকের ভেতরটা ওর মোচড় দিয়ে যায় কী এক বেদনায়।

রাবু কোনো কিছু বুঝবার আগেই ওর ঘোমটার আঁচলটা সরিয়ে দিয়েছে জাহেদ আর ওকে টেনে নিয়েছে আপন বাহুর পাশে। বলে চলেছে : তুই যদি ভাবিস সবাই মিলে হাত-পা বেঁধে কুয়োর ভেতরে ফেলে দিয়েছে তোকে, বাঁচার কোনো পথ নেই তোর, তবে কিন্তু খুব ভুল করছিস। দেখ আমার দিকে দেখ।

রাবুর চোখে পানি। পানির ধারা নেবে আসছে চিবুক বেয়ে।

ওর ভিজে চিবুকটা হাতের স্পর্শে তুলে নেয় জাহেদ, দেখ, ভালো করে চেয়ে দেখ তো? বর হিসেবে কী খুব মন্দ দেখাবে আমায়? মানাবে না তোর সাথে? ওকি চোখ বুজছিস কেন?

চোখের অশ্রু আর শরমের আবিরে বুঝি অপরূপ রাবু। মুখ লুকোতে গিয়ে আরও কাছে সরে আসে রাবু।

ঝুঁকে আসে জাহেদ। নিজের মুখ দিয়ে ডলে দেয়, ঘষে দেয় রাবুর কপালটা। বলে, ওই বুড়োর ঘর করাই যদি তোর কপালের লিখন হয়ে থাকে তবে এই আমি সৈয়দ আলী জাহেদ, এই মুহূর্তে সেই লিখনটা মুছে দিলাম তোর কপাল থেকে।

ছাড়া পেয়ে ছুটে পালিয়ে যায় রাবু।

দুর্ভাবনাকে ঠাঁই দেয়ার মতো মন নয় জাহেদের। অথচ সেই রাতের অবিশ্বাস্য ঘটনাটা, সেই সকাল আর এই তিনটি চরিত্র রাবু, দরবেশ চাচা আর তাঁর কামেল ওস্তাদ, সব মিলিয়ে চিন্তা আর দুশ্চিন্তা যেন গিঁঠ বেঁধে থাকে ওর মনের ভেতর। রাবুর দুর্বোধ্য একগুঁয়েমিটা যে কোথায় নিয়ে যাবে ওতে শিউরে ওঠে ও।

এরি মাঝে সুলতানপুরে মিটিং করতে গিয়ে ঢিল খেয়ে মাথা ফাটিয়ে এসেছে সেকান্দর। শরীরটা সারেনি বলে জাহেদ যেতে পারেনি সুলতানপুর। অথচ তার অনুপস্থিতিতে মার খেয়ে এল সেকান্দর। মনটা বুঝি আরো খারাপ হয়ে যায় জাহেদের।

নিশ্চয় এই মৌলভীদের কাণ্ড। কেন যে মৌলভীগুলো অমন আদাজল খেয়ে লেগেছে লীগের বিরুদ্ধে বুঝি না আমি। সব শুনে বলল জাহেদ, আরে না, মুলভী ফুলভীর ছায়াও ছিল না ধারে কাছে। সব গিয়ে হল আমাদের স্বনামধন্য প্রেসিডেন্ট ফেলু মিঞার দক্ষিণ হস্ত, যার নাম কান কাটা রমজান, তারই কীর্তি।

তার কীর্তি? যেন আর্তনাদ করে উঠল জাহেদ।

এই তো সমাজের অবস্থা। তা বাইরের চেহারার দরকার কী, তুমি তো আজাদী আজাদী বলে চেঁচিয়ে বেড়াচ্ছ দেশময়। অথচ তোমার বাড়িতেই ঘটে কী বর্বর কাণ্ড।

থাম থাম। কানে আঙ্গুল দেয় জাহেদ। এর পরই তো সাদা চামড়াওলাদের সেই থিওরিটা আওড়াবে, এখনো স্বাধীনতার উপযুক্ত হইনি আমরা।

সাদা চামড়ার উপর যতই না গায়ের ঝাল মিটাও, কথাটা তো ঠিক। আজাদী নিয়ে আমরা করব কী বল তো? না আছে আমাদের শিক্ষা, না আছে পোক্ত নৈতিকতার ভিত্তি। নইলে ভাবতে পার অতবড় এলেমদার বাবা নিজের চোদ্দ বছরের মেয়েটিকে তুলে দিতে পারে ষাট বছরের বুড়োর হাতে?

অতএব চিরটাকাল নিজের দেশে পরবাসী হয়ে থাকি আমরা। এই তো? ব্যঙ্গ বাঁকা স্বর জাহেদের।

কদর্থ করছ কেন আমার বক্তব্যের? আমার কথা হল : সমাজটাকে মেরামত কর। শিক্ষা দাও, আলো দাও, গোঁড়ামির অচলায়তন ভেঙে উন্মুক্ত কর বুদ্ধির দ্বার, কুসংস্কারের বাঁধ ভেঙে এনে দাও মুক্তির প্লাবন। মনটা রইল তোমার শৃঙ্খলে, চাও তুমি মুক্তি। সে কী সম্ভব, না কাম্য? বেশ গুছিয়ে জোর দিয়ে দিয়ে কথাগুলো বলে গেল সেকান্দর। নিজেও অবাক হয় ও এ গাঁ ও গা ঘুরে ঘুরে বক্তৃতা আর তর্কে মেতে মুখ গেছে ওর খুলে, জিবে এসেছে ধার।

আবার ঘোড়ার আগে গাড়ি জুড়ছ তুমি। দুশো বছর পিছিয়ে পড়া মুসলিম সমাজটার চোখ খুলে দিতে হলে যে বিরাট সংস্কার আর বিপুল কর্মোদ্যমের প্রয়োজন সে কী অস্বীকার করছি আমি? কিন্তু আমি মনে করি, অভ্রান্ত সত্য হিসেবেই মনে করি, একমাত্র রাজনৈতিক স্বাধীনতাই উন্মুক্ত করতে পারে সেই আকাঙ্ক্ষিত দ্রুত সংস্কারের পথ, রাজনৈতিক স্বাধীনতাই তৈরি করে দেবে বাঞ্ছিত পরিবর্তনের অর্থনৈতিক আর সামাজিক ভিত্তি।

সবই বুঝলাম। কিন্তু আজাদীর জন্য একটা ন্যূনতম মানসিক চারিত্রিক প্রস্তুতি থাকবে না? সে প্রস্তুতি কোথায় আমাদের? অধিকার বোধটা হল একান্ত প্রাথমিক উপলব্ধি। সে অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যে চারিত্রিক দৃঢ়তা, নিষ্ঠা, সততা আর আত্মার সম্পদ প্রয়োজন তার কী করছ? ওগুলো বাদ দিয়ে আজাদী আসতে পারে না, এলেও আজাদী ধরে রাখতে পারবে না, আত্মিক শক্তির অভাবে আজাদীটাই হবে উৎপীড়ন বিশৃঙ্খলার নামান্তর। উত্তেজিত স্বর সেকান্দরের। আজকাল তর্কের জোরে প্রায়ই উত্তেজিত হতে শুরু করেছে ও।

উদ্ভট যুক্তি তোমার। থাক গিয়ে এ তর্ক। আমি ভাবছি রমজান বলত মিনিমুখো শয়তান, কিন্তু মিনিমুখোটা যে মারমুখো হয়েছে, এখন কী বলে রমজান? হো হো করে এক সাথেই হেসে দেয় ওরা।

স্বাধীনতা একটি ব্যাপক, একটি সম্পূর্ণ চিন্তাধারা, একটি সামগ্রিক জীবনবোধ। জীবনের সব ক্ষেত্রেই এর রয়েছে একটা অর্থ, তাৎপর্য। সেটা হল জাগরণ এবং পুনর্গঠন-নৈতিক-আধ্যাত্মিক, সামাজিক-অর্থনৈতিক–সর্বক্ষেত্রে। তার মানে সংগ্রামটা হবে কঠিন, দীর্ঘস্থায়ী, প্রস্তুতি চলবে ঘরে ঘরে। এটাই তোমাকে বোঝাতে চাই। তাই এত তর্ক করি। হাসি থামিয়ে বলল সেকান্দর।

আমি বুঝি এবং আরও বুঝতে চেষ্টা করব, প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। তর্কের ইতি টানতে চাইল জাহেদ।

কিন্তু সেকান্দর যেন জিদ ধরেছে। সে বলে চলল–আমাদের মানসিকতাটা এখনো মধ্যযুগীয় ফিউডাল, এটা উপলব্ধি করতে হবে এবং একে দূর করতেই হবে।

তা স্বীকার করি মাস্টার। কিন্তু এখন তো অন্য চিন্তায় আসতে হয়। ব্যাটারা যে মিটিংয়ে গোলমাল শুরু করল, তার কী করবে? তোমার মামুজান ফেলু মিঞা তো নোসাখা দিয়েই দিয়েছেন, লাঠ্যৌষধি অর্থাৎ ওদের লাঠির জবাবে আমাদেরও লাঠি। আর গাদ্দারগুলোকে উত্তম ঠ্যাঙ্গানি।

ঠিক দাওয়াই। সায় দিল জাহেদ।

তবু চিন্তা মুক্ত হতে পারে না জাহেদ। হৃদয়ের স্বচ্ছ আবেগ দিয়ে যা অতি সহজ এবং স্বাভাবিক ভাবতে অভ্যস্ত ও, সে সমস্তই আজ কেমন গিঁঠ পাকিয়ে উঠেছে। ঘরে এবং বাইরে। জীবনে সহজের কোনো অস্তিত্ব নেই। রূঢ় নিদারুণ এক সত্য হিসেবেই যেন কথাটা উপলব্ধি করল তরুণ জাহেদ।

ওই এক রত্তি মেয়ে রাবু, সে-ই তো কত কঠিন। জাহেদের চোখে যা অস্বাভাবিক ও মেয়েটার কাছে তা-ই যেন স্বাভাবিক। একা রাবু কেন, বাড়িতে, বাড়ির বাইরে সকলের কাছেই জাহেদের সহজ স্বাভাবিক চিন্তা আর কাজগুলো যেন অস্বাভাবিক, অসরল অর্থ ভরা।

হোক না ভ্রান্ত তরীকার অনুসারী, তবু তো তারা আল্লার ওলি, ছিঃ ছিঃ মাইজা মিয়া কামটা বড় খারাপ করেছেন। জাহেদের সুমুখেই বলেন মুনশীজী।

তোব তোবা, এটা কী সৈয়দ বাড়ির ছেলের মতো কাম হয়েছে? কপাল থাপড়ায় মালুর মা। সৈয়দ বাড়ির নামে অমন একটা কলঙ্কের কালিমা পড়েছে। বলে বড় বিচলিত মালুর মা।

খোদার হুকুম ছাড়া গাছের পাতা নড়ে না। খোদার হুকুম হয়েছে, ওর বিয়ের ফুল ফুটেছে। নইলে অমন হুট করে সৈয়দ বাড়ির মেয়ের বিয়ে হয়েছে কখনো? কাজটা ভালো করিসনি বাবা। ভর্ৎসনার স্বর সৈয়দ গিন্নীর।

আশ্চর্য হয় জাহেদ। সত্যের পথটা কত সংস্কারে আচ্ছন্ন।

বলে না কিছু মালু আর আরিফা। ওরা সেই যে হকচকিয়ে চুপ মেরে গেছে আর মুখ খুলছে না। কেমন যেন ভোজবাজির মতো ঘটে গেলো একটার পর একটা

ঘটনা, ওরা যেন নীরব দর্শকই হয়ে রইল। মনে মনে ওদের যতটুকু অভিমান, যতটুকু রাগ, সে হল রাবুর বিরুদ্ধে। যদি বেঁকে বসত রাবু। সাধ্য ছিল কার কলমা পড়ায়? তা ছাড়া এখনই বা কী কাণ্ডটা করে চলেছে রাবু। লম্বা সেজদা, ঘন্টা ধরে মোনাজাত। বুঝি কাঁদেও চুপি চুপি। মানে হয় এ সবের?

বাইরের কানাঘুষো যথাসময় এবং যথানিয়মে পল্লবিত হয়ে পৌঁছে যায় সৈয়দ বাড়ির অন্তঃপুরে। গম্ভীর হয়ে যায় সৈয়দ গিন্নী। কান জোড়া গরম গরম হয়ে উঠে রাবুর।

দেখলে তো তোমার বাহাদুরির ফলটা? তামাম দুনিয়ায় ঢি ঢি পড়ে গেছে। তোমার না হয় হায়াশরম নেই। কিন্তু আমি? গ্রামে যদি এসব রটে আমি যাব কোথায়? যেন কৈফিয়ৎ চাইছে রাবু।

কলকাতায়। সংক্ষেপে বলে মুচকি হাসে জাহেদ। ওর পরিহাস চঞ্চল চোখ দুটো ঘুরে বেড়ায় রাবুর ঘোমটা মুক্ত মুখের উপর। রাগের চোটে আজ ঘোমটা টানতে ভুলে গেছে রাবু।

ফাজলেমি রাখ তো মেজো ভাই। বংশের বদনাম হচ্ছে না? লোকের কানাঘুষো বুঝি তোমার গায়ে বিঁধে না?

আহা, ফুলচন্দন পড়ুক লোকের মুখে। আবারও হাসে জাহেদ। রাবুর মুখে রাগ দেখে হাসি সামলান সত্যি বুঝি দুঃসাধ্য।

হঠাৎ কেন যেন হাসিটা ওর উবে যায়। গম্ভীর হয়, বুঝি কঠিন হয় জাহেদ, কী এক ঝাঁঝ ফুটিয়ে বলে ও : বংশের দশ পুরুষে তোর মতো স্বার্থপর কেউ জন্মেছে?

কী কথায় কী কথা? কেমন ভয় পেয়ে যায় রাবু। এ এক মুশকিল ওর, জাহেদ যখন রেগে যায় তখন কেন যেন ওর নিজের রাগটা গলে যায়, পানি হয়ে চোখের ধারায় ছুটে আসতে চায়।

আমি তোর সর্বনাশ করেছি, কী হবে তোর, কোথায় যাবি, কী করবি? এত সব দুশ্চিন্তায় ঘুম নেই তোর। আর ওই জোব্বাধারী শয়তানটা যে ফাটিয়ে দিল আমার মাথাটা, দেখেছিস একটিবার কপালে হাত বুলিয়ে? জিজ্ঞেস করলি একটিবার, কেমন আছি? আচমকা অভিমানে ভেঙে পড়ে জাহেদ।

ও মেজোভাই। তুমি কী গো... কথাটা শেষ করতে পারে না রাবু। ওর গলাটা যেন বুজে এসেছে আর উদগত এক কান্নার দমকে দুমড়ে গেছে ওর চিকন দেহ।

খাটের আলসেয় মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কেন যেন ভালো লাগছে রাবুকে। আস্তে আস্তে ওর পিঠে হাত বুলিয়ে দেয় জাহেদ।

২৬-৩০

দেখছ কাণ্ডটা? ঘরে বাইরে আমার নিন্দা। আমি যেন মহাপাতক। ওর নিষ্ফল ক্ষোভ দেখে মনে মনে হাসে সেকান্দর। মুখে মাস্টারী গাম্ভীর্য ফুটিয়ে বলে, শুভ কর্মে ধৈর্য ধর বন্ধু।

নাঃ অসহ্য এই আবহাওয়া। চল বেরিয়ে পড়া যাক আবার, কিছু কাজ তো হবে?

ওরা বেরিয়ে পড়ে। এ গ্রাম থেকে সে গ্রাম। এ বাজার থেকে সে বাজার। কিন্তু, জাহেদ সরে পড়েছে বলেই বাকুলিয়ার আবহাওয়াটা বদলে যাবে কে বলল ওকে?

যেখানে যেখানে গেল সেখানেও সব কিছু ওর মনোমতো চলছে না। চলল না। ওর সৎ আবেগ ওর সদিচ্ছাটাই সব কিছু নয়। অনেক স্বার্থ অনেক কোন্দল অনেক মনের সংঘর্ষে বিচিত্র জটিল গিঁঠ, সে সব গিঁঠ খোলা শক্ত কাজ, ধৈর্যের কাজ। সে সব স্বার্থ সংঘাতের মীমাংসা হয়ত দুরূহ নয়, কিন্তু কঠিন।

মনটাকে যে একটু হাল্কা আর ঝরঝরে করে আনবে বলে বেরিয়েছিল জাহেদ, সে আর হল না। অনেক জটিল জিজ্ঞাসা যেন এক সাথে মিলে ছেঁকে ধরেছে ওকে। যে বিরাট সমস্যা নিয়ে সদা ব্যাকুল ওর মন, অনেক মানুষের নিত্য দিনের ছোট ছোট অজস্র সব সমস্যা এসে যেন পরাভূত করতে চায় সেই বৃহৎকেই। জীর্ণ ক্লিন্ন ক্ষুদ্র বর্তমানটা যেন আচ্ছন্ন করে দিতে চায় মনের চোখে দেখা উজ্জ্বল বিশাল ভবিষ্যৎকে।

তবু মাইলের পর মাইল হেঁটে, মিটিংয়ে বৈঠকে তর্কের উত্তেজনায় ক্লান্ত হয়ে ভালো লাগল ওর।

বাড়ির মানুষগুলোকে যেমন রেখে গেছিল তেমনি রয়েছে ওরা। ওর বিরুদ্ধে নীরব অসহযোগে থমথম ওদের মুখ। সারা দিনেও রাবুর খোঁজ পেল না জাহেদ। কেবলি এড়িয়ে এড়িয়ে চলছে ওকে। পরিবর্তনের মাঝে শুধু বাঁধাছাদা চলছে। এতটুকু শব্দ নেই, কোলাহল নেই। মনে হয় সবাই মিলে বুঝি কোনো অন্তিম যাত্রায় চলেছে, এ তারই আয়োজন।

দেখছিস মালু? বাড়িটাকে একেবারে কবরখানা বানিয়ে ফেলেছে। সবাই যেন মোর্দা, শুধু গোর দেয়ার বাকী। লা-গা তো একটা গানের জলসা।

আহ্লাদে আটখানা মালু। গানের কথায় ওকে আর পায় কে! এদিক সেদিক ছুটল ও। গনি বয়াতিকে পাওয়া গেল না। মধু গায়েনকে বায়না দিয়ে এল। তালতলির নলিনী সাহা, যন্ত্রের বাজনা বাজায় ভালো তাকেও বলে রাখল মালু। আশেপাশের কোনো কবিয়ালকেই বাদ দিল না ও।

বার মাসে তের পার্বণ, কোন্ যুগে যে সত্যি ছিল কথাটা, বাকুলিয়ার মানুষ জানে না। উৎসবের উপলক্ষে যে কমতি তা নয়, সামর্থ্যের অভাবে উপলক্ষগুলোকে শুধু ছেঁটেই চলেছে ওরা। তাই সৈয়দ বাড়িতে জলসার খবর পেয়ে ওরাও মেতে উঠল।

একটা বড় গোছের চৌকির উপর মঞ্চ বানিয়েছে মালু।

কঞ্চি কেটে কেটে নক্সা বানায় জাহেদ। সেই নক্সার গায়ে গায়ে বুনো লতা বুনো ফুলের অলংকার ঝুলিয়ে সুন্দর করে তুলছে মালুর মঞ্চটা।

জিন্দাবাদ বুঝি আর ভালো লাগছে না?

রাবুর গলা শুনে মাথা তোলে জাহেদ, বলে, এ্যদ্দিনে তা হলে সেধে কথা বললি?

কথাটা বলে সত্যি যেন বেকায়দায় পড়েছে রাবু, মাথাটা নাবিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে জাহেদের লতাপাতার অলংকার।

নে হাত লাগা, ওর দিকে কতগুলো নাগকেশর আর কাঁকরল লতা এগিয়ে দেয় জাহেদ।

বাহ্ আমি আর বেকার থাকি কেন? সেকান্দর এসে বসে পড়ে ওদের পাশে।

ওই যে, ওকে একটা কাজ দেখিয়ে দেয় জাহেদ।

বাঁশের ফালিগুলো চাঁছতে চাঁছতে কথাটা পাড়ল সেকান্দর, চলে তো যাচ্ছ, এদিকের ব্যবস্থা কী হবে!

ব্যবস্থা আবার কী। তুমি তো রয়েছই।

উত্তরটা মোটেই মনোমতো হল না সেকান্দরের। ও বলে, এত ঝামেলা একা সামলাব কেমন করে?

কেমন করে বললে তো আর চলবে না এখন। দায়িত্ব নিয়েছ, কাজ চালিয়ে যেতেই হবে।

গজ গজ করে সেকান্দর বলে, আচ্ছা দায় পড়েছে আমার।

এইটুকুতেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছ? ওর চোখে চোখ রেখে হঠাৎ শুধাল জাহেদ।

আমার ঘাড়ে সব চাপিয়ে দিয়ে তুমিই বা সটকে পড়ছ কেন?

সটকে পড়ছি? আহত চোখে তাকায় জাহেদ।

অকস্মাৎ চুপ করে যায় ওরা।

কথায় কথায় কেমন যেন রুক্ষতা এসে গেছে। দুদিকেই মেজাজটা চড়ে গেছে। দিনে দিনে রূঢ়তার সম্মুখীন হয়ে আপন আবেগের সতেজ স্ফূর্তিটা কী হারিয়ে ফেলছে জাহেদ? চমকে উঠে নিজেকেই বুঝি শুধাল ও। সেকান্দরের মুষড়ে যাওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল, বলল, খামোখাই ঘাবড়াচ্ছ মাস্টার। দুমাস বাদেই তো আমি আসছি আবার। এমনি আসা যাওয়ার মাঝেই থাকব! তবু পুরোপুরি আশ্বস্ত হতে পারে না সেকান্দর। ও বোঝে না, ঘরে যার ভর্তি আছে, পুকুরে রয়েছে মাছ সে কেন বিদেশে পড়ে থাকবে। এ নিয়ে বকাঝকিও তো কম হল না জাহেদের সাথে। সেকান্দরের কথাটাকে সেকেল সংকীর্ণতা বলে উড়িয়ে দিয়েছে জাহেদ।

তবু ভালো। সংক্ষেপে বলে কঞ্চি চাঁছায় মন দেয় সেকান্দর।

গলা খাঁকরিয়ে কে যেন আসছে।

ত্রস্তে ঘোমটা টেনে পড়িমরি ছুটে পালায় রাবু। ওর পালানোর পথটির দিকে চেয়ে হেসে দেয় দু বন্ধু।

জমজমাট জলসা বসল।

সারা গ্রামটাই যেন ভেঙে পড়ল।

মালুর ব্যবস্থায়, সাজানোর কায়দায় বাহাদুরি আছে।

শোন, ওকে কাছে ডাকে জাহেদ, তুই খুব বড় রকমের শিল্পী হবি, বলে রাখলাম।

পাশে সেকান্দর মাস্টার। ছাত্রের প্রশংসায় সেও বুঝি খুশি। দুজোড়া খুশি খুশি চোখের নিচে যেন আহ্লাদে গলে যায় মালু। সবাই এসেছে কানকাটা রমজান আর মিঞা বাদে...আরো কেউ বসে আছে কিনা দেখবার জন্য ঘাড়টা উঁচিয়ে তোলে

লেকু, কথাটাকে ততক্ষণ ধরে রাখে জিবের ডগায়। হ্যাঁ খতিব সাহেব, কারি সাহেব বাদে, হাফেজ তো দেখি বসে আছে কোণে। কথাটাকে শেষ করে লেকু।

রমজানের নামের সাথে নতুন বিশেষণটা চালু হয়ে গেছে। আর তা নিয়ে বুঝি গবেষণারও অন্ত নেই।

যেই করুক না কেন, নৃশংস বর্বরতা ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না এটাকে। কতদিন যে এ সব বর্বর কাজ চলতে থাকবে গ্রামে, আল্লা জানে। হঠাৎ বলল সেকান্দর, লেকুর উপর চোখ রেখে, জাহেদকে উদ্দেশ্য করে লেকুর উপরই বুঝি ওর সন্দেহ।

মুখটা কুঁচকিয়ে অদ্ভুত এক হিংস্রতা ফুটিয়ে তোলে লেকু। তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নেয় সেকান্দর।

হুরমতির ছেঁকাটাও কম নৃশংসতা নয়। আস্তে করে বলে জাহেদ। তা হলে হুরমতির কাণ্ড? বিজলীর মতো ওর মনের উপর দিয়ে দৌড়ে গেল সন্দেহটা। আর আশ্চর্য হল সেকান্দর, হুরমতির দিকেই ওর মনের সমর্থন।

তালতলির নলিনীর বাজনা দিয়ে শুরু হয় আসর। বাজনা শেষে একের পর এক প্রাচীন কিসসার বয়ান অথবা যাত্রার ঢংয়ে অভিনয়। লায়লী মজনু। ইয়ুসুফ জোলেখা। লখিন্দর বেহুলা সবারই জানা কিস্সা। তবু তন্ময় হয়ে শোনে ওরা। চোখ ছলছলিয়ে ওঠে। কাঁদে। একটু বাদেই হাসে।

এই কান্না আর হাসির মাঝে নিজেদের জরাজীর্ণ জীবনটার কথা ক্ষণিকের জন্য একেবারেই ভুলে যায় ওরা। মঞ্চের নায়কনায়িকাদের জন্য উদ্বিগ্ন হয় ওদের মন, অধীর উৎকণ্ঠায় প্রতীক্ষা করে অপ্রত্যাশিত কোনো শুভ আর সুন্দর সমাপ্তির। এ মন বুঝি শুধু ওদের নয়, এ মন সর্বকালের দর্শকের মন।

লম্বা কাহিনী ধরেছে মধু গায়েন। তুর পাহাড়ে মুসা নবীর জ্যোতি দর্শনের সেই অতি প্রাচীন কাহিনী। বয়ানের বাহাদুরিতে লোকগুলোকে বুঝি সেই আদ্যিকালের তুর পাহাড়ে টেনে নিয়ে যায় মধু গায়েন।

আর এই লোকগুলোকেই বুঝি হ্যাঁচকা টানে একবারে আজকের দিনটায় নিয়ে এল মালু-বাকুলিয়ার মালু বয়াতি। এখন ওটাই তার বহুল পরিচিতি।

ভীরু ভীরু লজ্জা মাখানো হাসি নিয়ে উঠে দাঁড়ায় মালু। মাথায় ওর রঙিন গামছা। পিরানের উপর প্যাঁচিয়ে আর একটি গামছায় কোমরটাকে বেশ শক্ত আর চিকন

করে বেঁধে নিয়েছে মালু। এক পাশে গোল হয়ে বসেছে দোহারের দল। নাচের ঢংয়ে একটু কুঁজো হয়ে কোমর বেঁকিয়ে চটপটি ফাটার মতো দু আঙ্গুলের আওয়াজ তোলে মালু। প্রত্যুত্তরে তালি বাজিয়ে কাঁসার থালায় তাল ঠুকে, দোতারাটা কাঁপিয়ে সাড়া দেয় দোহারের দল। ধুয়ো ধরে ওরা! মাগো দাও চরণ, মাগো দাও চরণ।

মাটিই বুঝি মা। মায়ের বন্দনা গেয়ে শুরু হয় বয়াতির গান। বাকুলিয়ার গান। বাকুলিয়ার ইতিহাস নিয়ে গান বানিয়েছে মালু। বড়দের মুখেই ও শুনেছে কাহিনীটা। সেই শোনা কাহিনী শব্দে গেঁথেছে নিজের মতো করে।

বাকুলিয়ার বড় মিঞা
ও সে মস্ত মরদ
মাগো তোমার লাইগা হইছে কয়েদ
ও সে মস্ত মরদ

আরে মিটিং হইল, ওয়াজ হইল কত নসিয়ত
কাইন্দা কাইন্দা মিঞা কহে
দীন গেল দেশ গেল, গেল খেলাফত
গোলামীর জিঞ্জিরে কানছে যে মোর ভারত
হায় গেল সে খেলাফত
কানদে যে মোর ভারত
দাও চরণ, মাগো দাও চরণ।

এংরাজের পেয়াদা আইল, দারোগা আইল
আইল কত লাঠি বরকন্দাজ
তফাত রহো নাসারা ফেরেব্বাজ
বাঘের সনে মিঞা হাঁকিল
আরে সে হুংকারে দুনিয়া কাঁপিল
মাগো দুনিয়া কাঁপিল।

হাওদা উঠিল, পাগড়ি বান্ধিল
মস্ত মরদ সোয়ার হইল।
সোনার চাঁন ঘরে থুইয়া
আহা দালান কোঠা সোনা দানা
হাতের ময়লা ফেলিয়া

মিঞা চলিল।
কী হইল, কী হইল?
মিঞা গেল জেয়লে।
মাগো দাও চরণ।
হায়রে গেল সব
তালুকমুলুক রবরোয়াব
লাঠে চড়ে জমিদারী
হাতি ঘোড়ার সানদারী
কাইন্দা কাইন্দা ঘরের বিবি অন্দ যে হয়,
তবু মিঞার মন গলে না, আহা মন গলে না।
মিঞা কহে, কওমের তরে দিল যে বাইন্ধেছি
জান দিব তো মান দিব না,
আহা জান দিবে তো মান দিবে না।

আরে জেয়াল খানায় সোনার দেহ কালা হইল
দুষ্ট ব্যারামে কলিজার খুন খাইল
জেয়ল থেইকা গাজী আইসা
শহীদ যে হয়
আর সতীনারী স্বামীর সনে আখেরাতে
চইলে যে যায়।
আহা চইলে যে যায়।

অধম মালেকে কয়
দেশের লাইগা
কোরবান যে হয়
সে তো মরে না
গোর আজাবে তারে ধরে না
আহা সে যে বাঁইচা রয়
সাত সুরুজে তাহারই বন্দনা গায়।
আহা সে তো মরে না।
দাও চরণ মাগো দাও চরণ।

গানটা শেষ করেই মালু টিপ করে পায়ের ধুলো নিল ওর মাস্টার আর জাহেদের। হাত ধরে যে ওকে ঠেকাবে সেই অবসরটুকুও পেল না ওরা। কদমবুচি সেরে

ততক্ষণে মঞ্চে ফিরে গেছে মালু। দোসরা পালাটা ধরেছে।

হায় হায় এই কী কপাল
মিঞা সৈয়দ দেশ ছাড়িল এই কী কপাল।
কলিকালের খেলা আর কত দেখবি বল
সেই যে মিঞা ছিল গাজী হইল শহীদ
তার পোলারা দেশ যে ছাইড়া
নাসারা কমিনার নফর সাজিছে
হায় মিঞা-সৈয়দ দেশ ছাড়িছে।

আরে দিনে-দিনে কী হইল
রমজান আলী সুদ খাইল
খুলিল হারামের কারবার,
সাজে আল্লা পরস্ত ইমানদার
হায় এই কী কপাল।

হুরমতিরে ছেঁকা দিল
করে না কেহ ন্যায্য বিচার,
কারি পড়ে তোবা সোবানাল্লা
খতিব বলে দোররা লাগাও বিছমিল্লা।
আহা করে না কেহ ন্যায্য বিচার
হায় এই কী কপাল।

আরে মিঞার ব্যাটা মিঞা,
সে কিনা গেরামের মা বাপ,
হার্মাদ সেজে খাজনা দেয় না মাপ
নোটিশ পাইয়া গাঁয়ের চাষা গোনে পরমাদ
কসির হইল দেশান্তরী লেকু হয় যে বরবাদ
আরে মিঞা বড় হার্মাদ
তবে আরও শোন কালের কথা
ষাইটি বছরের ভণ্ড পীর
খায়েস চাপে কুমারী নারীর
কিন্তুক মিয়ার নাতি যারে বলো পেয়ারা জাহেদ।
ও সে কিলকনি আর গুঁতা দিয়া মিটায় পীরের সাধ
হায় এই কী কপাল।

গানটা শেষ করতে পারে না মালু। চিকের ওপারে মেয়েদের মহলে কী যেন চেঁচামেচি। তারপর চাপা উত্তেজনার উদ্বিগ্ন স্বর।

আম্বরি মূর্ছা গেছে। কেন, কী ব্যাপার, সে প্রশ্ন সবার মুখে, কিন্তু জবাব দেবে কে? সবাই হুড়মুড়ি খেয়ে ছুটছে আম্বরির দিকে।

জলসা ভেঙে যায়।

হুরমতি আর লেকু আম্বরিকে ধরাধরি করে বাড়ি নিয়ে যায়।

তৃতীয় দিন তালা পড়ল সৈয়দ বাড়ির বড় দালানে।

চতুর্থ দিন মারা গেল আম্বরি। ওর কাঠির মতো শীর্ণ মৃত দেহটাকে গ্রামের কবরখানায় গোর দিয়ে দিন দুই গুম হয়ে কাটায় লেকু। তার পর মেয়ে ভুনিকে কোনো জ্ঞাতি বাড়িতে রেখে নিরুদ্দেশ হল।

২৭.

দেখতে দেখতে কী যে হয়ে গেল।

কোথা থেকে কোথায় ছিটকে পড়ল মালু।

এক একটি বছর যায় আর ওকে যেন একূল থেকে ওকূলে আছড়ে ফেলে যায়। ও যেন ওই বড় খালে ভেসে যাওয়া ছিন্নমূল কোনো গাছের শাখা। এ পার থেকে সে পার, এ নদী ছেড়ে অন্য নদী, শুধু ভেসেই চলেছে। আজব এই দুনিয়াটা। এ দুনিয়ার কেরামতির বুঝি শেষ নেই।

প্রথম তিনটে বছর ভালোই কাটল মালুর। স্কুল আর লেখাপড়া। আপন মনে যখন খুশি গান গাওয়া।

তিনটে ক্লাসেই ভালো নম্বর পেয়ে পাস করল মালু। আর তাতে ওর চেয়ে মাস্টার সাহেবেরই যেন বেশি খুশি। ওর কাঁধে উৎসাহের হাত রেখে বলল, গত বছরটা বড় গোলমালে গেল। সুলতানের দিকে, তোর দিকে মোটেই নজর দেওয়া যায়নি। এবার থেকে রোজ রাত্রে আমার বাড়ি এসে পড়ে যাবি, কেমন?

কিন্তু নতুন বছরেই সাঙ্গ হল মালুর লেখাপড়ার পর্ব।

আসল কথায় আসবার আগে একটা ভনিতা পাড়ল রমজান : খোশ হও আর বেজার হও, হক কথাটাই বলব। আমি বলি খাও, কিছু করে খাও। মুন্‌শীজীর

কথা বাদ দিলাম, তিনি আল্লাবিল্লা করছেন, সে হল নেক কাম, খোদার কাম, আমাদের সকলের কাম। কিন্তু তোমরা?

রমজানের কুঁতকুঁতে চোখে কোন্ অভিসন্ধি? বই বন্ধ করে ওর দিকে তাকায় মালু।

জনপ্রতি যদি আধসেরও ধরি তা হলে দৈনিক একসের করে চাল লাগছে তোমাদের মায়ে-পুতে। তার মানে মাসে তিরিশ বত্রিশ সের, বছরে পাক্কা নয় মণ পাঁচ সের। তেলটা নুনটা না হয় মুনশীজীর মাসোহারা থেকেই গেল। কিন্তু....

এর পর কী বলবে রমজান? রুদ্ধশ্বাসে ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকে মালু। অবশ্য হুকুমটা মুনিবের। আমি শুধু জানিয়ে দিচ্ছি। তোমরা মায়ে-পুতে এসে খাও মিঞা বাড়ি। তুমি বিবি সাহেবার একটু যাকে বলে খেদমত করবে। আর মালু গরু বাতানটা দেখবে, ফাই-ফরমাশটা খাটবে।

রমজানের কথাটা শেষ না হতেই কেমন ভাঙা গলায় বলে উঠল মালুর মা, মালুর ইস্কুল?

ইস্কুল? যেন আকাশ থেকে পড়ল রমজান। তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলল : ধাড়ী হয়ে গেছে ছেলে, এখন আবার স্কুল কী গো? কামে লাগিয়ে দাও। কামে লাগিয়ে দাও। তা ছাড়া মায়ে-পুতে কী বসে খাবে তোমরা?

চুপ করে যায় মালুর মা। যেন গভীর মনোযোগে হাতের আঙ্গুলের মরে যাওয়া চামড়াগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তুলে চলেছেন তিনি। বুঝি দ্রুততর হয় মুন্‌শীজীর তসবি পড়া। শেষবার হজ্জের সময় মক্কা শরীফ থেকে কিনে আনা তসবির পাথরের গোটাগুলো দ্রুত শব্দ তুলে চলেছে ঠক ঠক ঠক।

হাল ছাড়ল না মালুর মা। বলল, সেকান্দর মাস্টার বলে মালু নাকি পড়াশোনায় ভালো।

হো হো হো। হেসে কূল পায় না রমজান। বলে, হাসালে মালুর মা, হাসালে। বলি গরিবের আবার লেখাপড়া কী? লায়েক হয়েছে ছেলে, এখন খাটবে, কাম করবে, রোজগার করবে।... লেখাপড়া কী? হা হা হা।

আরও দ্রুততর হয় মুনশীজীর তসবির শব্দ, ঠক ঠক ঠক।

পরের সম্পত্তি। একটা কুটোও যদি না-হক খরচ হয়, তবে বান্দার কাছে না হলেও আল্লার কাছে তো আমাদের জবাব দিতে হবে? আসলে কর্তব্য আর ঈমানের খাতিরেই যে কাজটা করতে হচ্ছে, এবার সেটাই বুঝিয়ে দেয় রমজান।

হঠাৎ ওর নজর পড়ে মালুর দিকে। চিৎকার করে ওঠে : দেখেছ? দেখেছ? কেমন ঘাড় তেড়া করে তাকাচ্ছে? দাঁড়া, ঘাড় তোর আমি সিদা করে ছাড়ব।

বেরিয়ে যায় মালু।

সেই যে বেরিয়ে এল, বাকুলিয়ায় আর ফেরা হল না ওর। যেমন ছিল গেঞ্জি আর লুঙ্গি পরনে, তেমনিই বেরিয়ে এসেছে। জামা নেই গায়ে, সঙ্গে নেই বই খাতা। তবু কেন যেন স্কুলের পথটাই ধরল মালু।

সৈয়দ বাড়িতে হক নেই ওদের। ওরা পরাশ্রিত। বসে বসে অন্যের অন্ন ধ্বংস করে চলেছে। এখন কাজ করে খেতে হবে। আর কাজটা কিনা ফেলু মিঞার গাবুর হওয়া? মনের ভেতরটা বুঝি তোলপাড় খেয়ে যায় ওর। সহসা কী এক দুরন্ত ইচ্ছে জাগে ওর মনে এমন কিছু করতে, এমন কোথাও যেতে যা ওকে চিরদিনের জন্য ভুলিয়ে দিবে কানকাটা রমজানের মুখ, ফেলু মিঞার মুখ, ওই সৈয়দ বাড়ি, ওই বাকুলিয়া। সেই দুরন্ত ইচ্ছেটা যেন টগবগিয়ে উঠল ওর শরীরের ভেতর, ওর ধমনীর রক্তে। জোরে জোরে পা ফেলল মালু, দ্রুত পথ কাটল। গা-টা গরম হয়ে ঘাম ঝরাল।

কলকাতা গেলে কী হয়? ধাঁ করে মনে এল কথাটা। কত লোকই তো যায় সেখানে! কামাই রোজগার করে জেব ভর্তি টাকা আর বোঁচকা ভর্তি রকমারি জিনিস নিয়ে ফিরে আসে গ্রামে। তা ছাড়া কোলকাতা যাওয়াটা তো অনেক দিনের সাধ মালুর। সেই যখন থেকে যাব যাব করছে সৈয়দরা তখন থেকে।

সেদিন কী যে খারাপ লেগেছিল মালুর! না মেজো ভাই, না রাবু আপা, একবার সাধল না ওকে, বলল না একবার চল, তুইও চল আমাদের সাথে। শহরে গিয়ে কাজের লোক কী লাগবে না ওদের, রাবুর বা আরিফার? রাবুর কাজগুলো মালুর মতো সুন্দর আর নিখুঁতভাবে অন্য কেউ করতে পারবে না, এটা হলফ করেই বলতে পারে মালু।

সেদিন কী এক চোট খেয়ে মালুর বুকটা যেন চৌচির হয়েছিল। মেজো ভাইদের ট্রেনে তুলে দিয়ে সোজা বাড়িতে ফিরে আসতে পারেনি ও। সেই বুড়ো তেঁতুল গাছটার তলায় বসে চুপি চুপি অনেকক্ষণ ধরে কেঁদেছিল মালু।

কিগো নতুন বয়াতি? এমন হনহনিয়ে যাও কই?

মুখ তুলে চেয়ে দেখে মালু সমুখেই গনি বয়াতি। সেই জাহেদের মিটিং গুলোতে মালুর গান শোনার পর থেকে ওকে নতুন বয়াতি বলেই ডাকে গনি বয়াতি।

তোমার বাড়িই যাচ্ছিলাম, বলল গনি বয়াতি।

কেন? শুধাল মালু আর মনে মনে বলল, ভাগ্যিস পথেই দেখা হয়ে গেল, নিজের বাড়ি বলে কিছু নেই ওর, এ কথাটা না-জানুক গনি বয়াতি।

লাঙ্গল-কোট থেকে একটা বায়না এসেছে। বড় বায়না। ভাবলাম তুমি যদি যাও তবে আমার দলটা বড়...। ইতস্তত করে গনি বয়াতি। ওর হয়ত সন্দেহ, রাজি হবে না মালু।

বেশ, আমি রাজি।

খুশি হয়ে উঠে গনি বয়াতি, বলে কালই যেতে হবে ভাই।

চলুন, আমি এখুনি যাব আপনার সাথে।

চোখ বড় বড় করে গনি বয়াতি, মালুর স্বরটা স্বাভাবিক নয়। অভিজ্ঞতা দিয়েই জানে গনি বয়াতি, বয়াতিদের ঘোর আসে, সাধন ভজনে মগ্ন পীর আওলিয়াদের যেমন যযবা, বয়াতিদের তেমনি ঘোর। এই ঘোরের সময় ওরা মাতোয়ারা, দুনিয়াদারীটা তখন ভুলে যায় ওরা। চলে যায় অন্য কোনো দুনিয়ায়। মালুর কী সে রকম ঘোরের সময় চলছে?

কোনো কথা না বলে হনহনিয়ে পথ ভাঙে ওরা।

এক বছর।

দু বছর।

আরও এক বছর প্রায় ধরে ধরে।

গনি বয়াতির দলে নেচে নেচে গান গেয়ে বছরগুলো কেটে যায়। আমির হামজা, সোনাবানের পুরনো কিসসা আজকের মতো করে সাজায় মালু। অভিনয় করে নিজে। নতুন নতুন গান বাঁধে। নতুন নতুন ছড়া বানায়। গনি বয়াতির নামের সীমা নেই। সুবাদ তার এক গাঁ, দু গাঁ এক মৌজা দু মৌজা নয়, শহর ছাড়িয়ে, জিলা ছাড়িয়ে তার নাম-ডাক। সেই গনি বয়াতির সাথে শহর বন্দর গ্রাম, কত জায়গায়ই না ঘুরে বেড়াল মালু।

আর কত হাততালি পেল, কত পেলা কুড়াল।

লোকের মুখে বাহবার অন্ত নেই। সাবাস গনি বয়াতি। যোগ্য সাগরেদ বানিয়েছে বটে। ওস্তাদকেও ছাড়িয়ে যাবে এই ছেলে।

এ এক আজব দুনিয়া। ছোটবেলা থেকে যে বাড়িটায় মানুষ মালু তার সাথে এর অনেক তফাত। এ দুনিয়াটার ঢং, এর বোল আচার নীতি সবই যেন অন্য রকমের। ভালো লেগে যায় মালুর। বাকুলিয়ার কথা মনে পড়ে। কিন্তু যাবার জন্য মনে কোনো সাড়া জাগে না। আর কোলকাতা? দরকার কী তার কোলকাতায় গিয়ে? অমন যে মেজো ভাই, সে-ই যখন সঙ্গে নিল না তখন কলকাতার ধূলোই মাড়াবে না মালু। এক রকম স্থির করে ফেলল ও।

মালু আসার পর থেকে গনি বয়াতির দলটা আরো ফেঁপে উঠল। কত বায়না ফেরত দিতে হয়। কত ডাক শুনেও না শোনার ভান করতে হয়। আর দেখতে না দেখতেই মালু হয়ে দাঁড়াল দলের প্রধান গায়েন।

ঠিক এমনি সময় কেমন যেন বদলে গেল গনি বয়াতির ব্যবহারটা। তামাক সাজাতে বলে গনি বয়াতি। আপত্তি করে না মালু। ওস্তাদের তামাক সাজানোতে অগৌরবের কিছু নেই। হুঁকো বদলাতেও বলে গনি বয়াতি। ভালো না লাগলেও পুরনো পানি ফেলে দিয়ে হুঁকোয় নতুন পানি ভরে দেয়। নলটাও সাফ করে দেয়। ওস্তাদের হুকুম না করতে নেই। ওস্তাদের খেদমতে বিদ্যা আসে, ছোটবেলা থেকেই তো এ কথাটা শুনে আসছে মালু। কিন্তু দিনে দিনে গনি বয়াতির হুকুমের মাত্রাটা বেড়েই চলল। বাড়িতে অথবা বাইরে দল নিয়ে ওরা ঘুরে বেড়ায়, গনি বয়াতি যেন ওর জন্য নিত্য নতুন ফরমাশ তৈরি করে চলে। যে কাজের জন্য লোকের অভাব নেই সে কাজটাও মালুকে দিয়েই করাবে, এ বুঝি একটা জিদ হয়ে দাঁড়াল গনি বয়াতির।

তাজ্জব বনে যায় মালু। কেন ওকে সবার সুমুখে ছোট করতে চায়, হেয় করতে চায় গনি বয়াতি? তবে কী ওর নামে কামে ঈর্ষাতুর হয়েছে গনি বয়াতি? দলের ভিতর ওর জনপ্রিয়তা, ওর প্রভাবটা সইতে পারছে না গনি বয়াতি? তাই যদি হবে, তবে ওকে সোজা বিদেয় না দিয়ে অমন বাঁকা পথ নিচ্ছে কেন গনি বয়াতি? মনে মনে কোনো সদুত্তর খুঁজে না পেয়ে অস্থির হয় মালু।

ঝমঝমিয়ে বর্ষা নাবল। নাবল তো নাবলই, থামবার নাম গন্ধ নেই। সে কী বৃষ্টি! গোটা আসমান যেন পানির ঝর্না হয়ে ঝরে পড়ছে, যেন এ ঝরার কখনো শেষ হবে না।

বেরোবার উপায় নেই। বায়েনাদারেরও দেখা নেই। এই বাদলায় কোন্ পাগল জলসা বসাবে। দলের কাজ-কর্ম এক রকম বন্ধ।

গনি বয়াতির বাড়ির বাইরে ছোট একটা ছনের ঘর। সেখানেই বরাবর থেকে আসছে মালু। কবে যে ছন বদলিয়েছিল ঘরটার তার কোনো হিসেব নেই। অন্তত গত তিন বছর যে চালে হাত পড়েনি সেটা তো চোখেই দেখল মালু। ফলে এবারকার বর্ষায় হুড় হুড় করে পানি পড়ছে চালের বড় বড় ফুটো দিয়ে।

এরি মাঝে দু একদিন ফর্সা গেল। মালু বলল, বয়াতি ভাই, চালে নতুন ছানি দাও, নইলে যে মরলাম।

আচ্ছা, বলে চুপ মেরে যায় গনি বয়াতি।

দ্বিতীয় দিনও বলল মালু। সেদিনও ওই আচ্ছা।

বাড়িতে ছন আছে মজুদ। আয়ও তো কম করেনি ওরা গত তিন বছরে। তবু কেন যে এত বখিলিপনা গনি বয়াতির, বুঝতে পারে না মালু। এই ঘোর বর্ষাতেও মেজাজটা তেতে আগুন হয়।

আর একদিন।

সারা সকাল লক্ষ কোটি ঘড়ার মুখ দিয়ে গলগলিয়ে পানি পড়ল, এমনি বৃষ্টির তোড়। হঠাৎ দুপুরের দিকে আকাশটা ফর্সা হয়ে থেমে গেল বৃষ্টিটা। মালু আর গনি বয়াতি দুটো টুল বের করে বসল ওদের বড় ঘরের দাওয়ায়। দে-তো মালু একটু তামাক সাজিয়ে দে, বলল গনি বয়াতি।

আমি তো চাকর নই কারো। এ সব কাম হবে না আমাকে দিয়ে। বেজাহানের মতো কথাটা বলে ফেলল মালু।

বুঝি ভিরমি খেতে খেতে রক্ষা পায় গনি বয়াতি, বলে, আচ্ছা বদদেমাকী ছোকরা তো তুই! এই যে এতটা দিন কাজকর্ম বন্ধ তবু পায়ের উপর পা তুলে দিব্যি খাচ্ছিস আর ঘুমুচ্ছিস। আর একটু তামাক সাজাতে বললাম বলে জাত গেল তোর?

খাওয়ার কথা তোলায় আরো চটে গেল মালু : তা তোমারটা তো খাচ্ছি না। কাজ করেছি, আয় করেছি। সে আয় তো সবই তোমার হাতে, হাত খরচের জন্যও কোনোদিন চেয়েছি একটি পয়সা?

কথাটা এত সত্য যে চট করে মুখ খুলতে বুঝি শরম লাগে গনি বয়াতির। মালুকে এতটা চটানোর হয়ত ইচ্ছেও ছিল না ওর। তবু সত্য কথাটা কার ভালো লাগে? গনি বয়াতিরও ভালো লাগল না।

কিন্তু এই মুহূর্তেই তো উঠে গেছে মালুর মনটা। গনি বয়াতিও ধান চালের হিসেব করল! আর একটা দিনও যদি মালুকে থাকতে হয় গনি বয়াতির বাড়ি তবে সে বুঝি দম বন্ধ হয়েই মারা যাবে।

আস্সালামুআলাইকুম। উঠে দাঁড়াল মালু। বেরিয়ে এল।

বিমূঢ়ের মতো শুধু চেয়ে থাকল গনি বয়াতি।

কী আশ্চর্য। ওর বেরোবার জন্যই যেন অপেক্ষা করছিল আবহাওয়াটা। ও বের হল, বৃষ্টি আর নাবল না।

দ্বিতীয়বার পথে ভাসল মালু।

কিন্তু, কোথায় যাবে মালু।

সেদিন অপ্রত্যাশিত ভাবেই গনি বয়াতির আশ্রয়টা পেয়ে গেছিল। আজ কোথায় আশ্রয় পাবে?

আকাশ পাতাল ভাবে মালু। যতই রাগ জমুক গনি বয়াতির উপর, তার কাছে কৃতজ্ঞ মালু। তার ওস্তাদি, তার বাহাদুরি সবই সে উজাড় করে ঢেলে দিয়েছে মালুকে। কিন্তু অমন দরাজ যার গলা সে লোকের মনটা কেমন করে অত ছোট হয়?

ভাবতে ভাবতে পথ চলে মালু। উদরাজপুরের হাটে রাত কাটায়। আবার চলে।

কিন্তু, এ কী? হাঁটতে হাঁটতে ও যে তালতলির কাছাকাছি এসে পড়েছে। আর এ কী হয়েছে অঞ্চলটার চেহারা? এ কোন্ দেশ? সুলতানপুর, চাটখিল, এ তো ওর সেই চেনা জানা গ্রাম নয়?

যুদ্ধ লেগেছে, সে খবরটা রাখে মালু। দল নিয়ে এ গাঁ সে গাঁও ঘুরতে ফিরতে যুদ্ধের দু চারটা আলামত যে চোখে পড়েনি ওর তেমন নয়। আসলে যেখানে ডেরা ফেলেছে গোরারা যেখানে ঘাঁটি বসেছে যুদ্ধের সে সব অঞ্চলগুলো ওরা এড়িয়ে চলেছে। কেননা যুদ্ধ শব্দটাই ওদের কাছে বিভীষিকা আর গোরা সৈনিক মূর্তিমান আতঙ্ক।

সুলতানপুর চাটখিলকে বেড় দিয়ে যে রাস্তাটা তালতলিতে গিয়ে পড়েছে সে রাস্তায় পা রেখেই মালু যেন অকস্মাৎ যুদ্ধটার মুখোমুখি দাঁড়াল।

গ্রামের পর গ্রাম নিঃশব্দ নিঝঝুম। বাড়ি ঘরগুলো যেমন ছিল তেমনি দাঁড়িয়ে আছে, জনপ্রাণীর সাড়া নেই কোথাও। একদা তকতকে উঠানগুলোতে শ্যাওলা জমেছে, আগাছার জঙ্গল গজিয়েছে। নৈঃশব্দের পীড়নটা সইতে না পেরে গাছের পাখিরাও বুঝি পালিয়ে গেছে কোনো দূরদেশে।

গোটা অঞ্চলটা সমর দফতরের দখলে। বেসামরিক অধিবাসীদের তুলে দেয়া হয়েছে। যে যেখানে পেরেছে উঠে গেছে ওরা।

রাস্তাটার পূর্ব দিকের চেহারা অন্য রকম। লম্বা লম্বা ক্ষেত। ক্ষেতের মাঝে ছাড়া ছাড়া বাড়ি। বাসিন্দাদের সরিয়ে সে সব বাড়িতে সৈনিকের ছাউনী পড়েছে। ক্ষেতময় তাঁবুর সারি। দূরে উঁচু ট্রাঙ্ক রোড। এখান থেকে স্পষ্ট দেখা যায় লরী আর সাঁজোয়া গাড়ির অবিরাম মিছিল চলেছে ট্রাঙ্ক রোড ধরে।

তালতলি এখনো হুকুম দখলের নোটিশ থেকে বেঁচে রয়েছে। যে কোনো দিন যমদূতের মতো এসে যেতে পারে পরোয়ানাটা। তাই প্রায় অর্ধেক গ্রামই ফাঁকা। কিন্তু মানুষের ভিড়ে, বেচাকেনার হৈ হট্টগোলে গম গম তালতলির বাজার। তিন বছর আগে ফেলে যাওয়া সেই বাজারটাকে চট করে চিনে উঠতে পারে না মালু। আড়ে লম্বায় বেড়ে গেছে তার সীমানা আর কত যে ঘর, ছোট ছোট চায়ের দোকান, মনিহারি, বড় বড় গুদাম। তালতলি আর বাজার নয়, যুদ্ধের বাজারে ফেঁপে ওঠা এক বন্দর।

সে বন্দরে মালু যেন এক আগন্তুক। কেউ ওকে চেনে না। সেও চেনে না কাউকে। রজনী ময়রার মিষ্টান্ন ভাণ্ডারটি উঠে গেছে। সেখানে এখন চায়ের স্টল। চা বিস্কুটের প্রতিযোগিতায় মিষ্টান্ন ভাণ্ডার বুঝি হার মেনে পাততাড়ি গুটিয়েছে।

পা-টা টনটন করছে মালুর। হাঁটা যায় না আর। রামদয়ালের বৈঠকখানার মাঠটা পেরিয়ে দীঘির পাড়ে উঠে এল মালু। সেই তালগাছগুলো কোন্ আদ্যিকাল থেকে যেমন দাঁড়িয়ে আছে সজাগ প্রহরীর মতো, তেমনি রয়েছে। তালগাছের পিঠে হেলান দিয়ে বসল মালু। দৃষ্টিটাকে পাঠিয়ে দিল বাকুলিয়ার মানুষের প্রিয় সেই দখিন ক্ষেতের দিকে।

কী এক হল্কা এসে বুঝি ঝলসে দিয়ে যায় মালুর চোখ জোড়া। ধূ ধূ রিক্ততায় যেন হাহাকার তুলছে দখিনের ক্ষেত। এক কণা শস্য নেই। এতটুকু সবুজের চিহ্ন নেই।

ওপারে বাকুলিয়া, হলুদ শাড়ির সবুজ পাড়ের মতো তার সবুজ রেখা। বড় খাল বরাবর সময়ের প্রয়োজনে নতুন এক রাস্তা তৈরি হয়েছে। ট্রাঙ্ক রোডে গিয়ে মিশেছে রাস্তাটা।

মালু যাচ্ছে কোথায়? রিক্ততার হাহাকার ভরা দখিন ক্ষেতের দিকে তাকিয়ে সে কথাটাই যেন আবার মনে পড়ল মালুর।

তালগাছের একটা ডাল কিসের যেন ঝাঁকনি খেয়ে মড় মড় শব্দে কেঁপে উঠল। চোখ উঁচিয়ে দেখল মালু একটা শকুন উড়ে চলে যাচ্ছে। তার পাখার ঝাপটায় বাবুই পাখির বাসাগুলো ঝড়ের দোলা খেল, একটি বাসা খসে পড়ল মালুর সুমুখে।

হাতে নিয়ে দেখল মালু, বাবুই দম্পতির যুগল চেষ্টায় কী চমৎকার সৃষ্টি। কুটো ছোবলা আর খড়ের নিখুঁত ঘন বিন্যাসে সুন্দর এক কারুকর্ম। খড়কুটো দিয়ে অমন সুন্দর জিনিস মানুষও বুঝি বানাতে পারবে না। কেন যেন বাসাটা নিজের গাঁটরিতে ভরে রাখল মালু।

রানুদি ডাকে।

নামটা শুনেই ধড়ফড়িয়ে উঠল মালু। সুমুখে দাঁড়িয়ে রানুদের বাড়ির চাকরটা।

রানুদি মনে রেখেছে ওকে? না দেখার দূরত্বে অচেনা হয়ে যায়নি মালু? কিন্তু রানুদি ওকে দেখল কখন? বিস্ময়ের চোখে আরও কত কী যেন জিজ্ঞেস করল মালু।

মালুর প্রশ্নগুলো বুঝি আন্দাজ করেই বলল ছেলেটি : দীঘির পাড়ে যখন উঠে আসছ তুমি, আমরা দেখে ফেললাম।

গাঁটরিটা বগলে নিয়ে ওর পিছু পিছু পরিচিত দালানটায় উঠে আসে মালু। রানুদি! অস্ফুটে যেন উচ্চারণ করল মালু। ঢিপ করে একটা প্রণাম রেখে দিল রানুর পায়ের পাতায়।

ষাট ষাট, হয়েছে। আস্তে করে ওর হাত ধরে পাশের চেয়ারটায় ওকে বসিয়ে দিল রানু।

অবাক মানে মালু। রানুর চেয়েও বিঘত খানিক উঁচিয়ে গেছে ও। আর আগের চেয়েও সুন্দর হয়েছে রানুদি। শরৎ রোদের মতো মিষ্টি উজ্জ্বল রানুর মুখ। সে মুখের দিকে এক পলক চেয়েই বুঝল মালু ওকে দেখে সত্যি খুশি হয়েছে রানু।

কিন্তু হঠাৎ কেন যেন গম্ভীর হয়ে গেল রানু, বলল, পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিস কেন?

এ প্রশ্নের আবার কোনো জবাব হয়? কী বলবে মালু!

রানুর গাম্ভীর্যটা কিসের যেন পূর্বাভাস। গম্ভীর মুখখানি তার কী এক করুণায়, কী এক মমতায় কাতর হয়ে আসে, চোখ জোড়া ভরে যায় পানিতে। ধীরে ধীরে বলল রানু, মালু, তুই বড় অভাগা। এত অল্প বয়সে বাবা মাকে হারালি?

রানুর চোখের কোণে দু ফোঁটা জল কেঁপে কেঁপে ঝরে গেল।

আর কিছু বলল না রানু।

মালুও জিজ্ঞেস করল না কিছু।

কী-ই বা জিজ্ঞেস করার আছে মালুর। বাবা মার যেটুকু অস্তিত্ব ওর জীবনে সত্য সে হল বাল্যের আর কৈশোরের কতগুলো তিক্ততা যা কোনোদিন ভুলবে না ও। এ ছাড়া তাঁদের উপস্থিতি বা অভাবটা কখনো অনুভূত হয়নি ওর জীবনে। বাবা মাকে বাদ দিয়েই যেন শুরু হয়েছিল ওর জীবন। ওদের ছাড়াই সে বেঁচেছে, বেড়েছে, বাঁচবেও। বুঝি তাই রানুর মুখে অকস্মাৎ সংবাদটা শুনে দুঃসংবাদ বলে মনে হয় না ওর, দুঃখের বা শোকের কাতরতা জাগে না মনে। ওরা যদি বেঁচেও থাকত মালু কী তাদের কাছে ফিরে যেতে পারতো?

ওর মুখে কোনো ভাবান্তর লক্ষ না করে রানুও বুঝি কম অবাক হয় না। এখনি কী করবি? অনেকক্ষণ পর শুধাল রানু।

এ প্রশ্ন নিয়েই তো ভাবছে মালু। কিন্তু জবাব যে এখনো খুঁজে পাচ্ছে না ও।

নিজেই যেন একটা উত্তর খুঁজে পেল রানু : পড়বি? নিজের চেষ্টায় আজকাল কত ছেলে পড়াশোনা করছে, মানুষ হচ্ছে!

বলা তো খুব সোজা। থাকব কোথায়? খাব কী?

কী যেন ভাবল রানু। শুধাল–কাজ করবি?

হ্যাঁ।

বেশ, খুড়োর দোকানে দিনের বেলায় কাজ করবি! রাতে মাস্টার সাহেবের কাছে পড়বি। কথাটা বলে রানু আর একটুও সময় দিল না ওকে। স্নানের তাড়া দিল।

খাবার তাড়া দিল। নিজেই খুলে ফেলল ওর গাঁটরিটা। অবাক হল : এটা আবার কী?

দেখতেই তো পাচ্ছ বাবুই পাখির বাসা। ওর একটা গোপন জিনিস অন্যায়ভাবে রানু দেখে ফেলেছে বলে রুষ্ট হল মালু।

তুই কী ভাবিস, এখনো সেই বাচ্চা ছেলেটি রয়েছিস? বাবুই পাখির বাসাটা ছুঁড়ে উঠোনে ফেলে দেয় রানু।

২৮.

মাসিক সাত টাকা বেতন।

রামদয়ালের মনিহারি দোকানটায় বহাল হয়ে গেল মালু। খাওয়া দাওয়া আর জামা কাপড়ের খরচ দোকানের। নিরাশ্রয়ের পক্ষে খুশি হবার মতোই ব্যবস্থা। কিন্তু, মালুর খুশিটা বুঝি অন্য কারণে।

রানুর খুড়তুতো ভাই অশোক। থাকে কোলকাতায়। জাপানী বোমার আতঙ্কে আর মাথার উপর হরদম উঁচিয়ে থাকা খড়গের মতো হুকুম দখলের ভয়ে গ্রামকে গ্রাম যখন বিরানা হতে চলেছে, সেই সময়টিতে কেন যেন গ্রামে বেড়াবার শখ জেগেছে অশোকের। সারাদিন টো টো করে, কিন্তু সকাল আর বিকেল বেলাটায় তার বাঁধা কাজ। সকালে ও গান শেখায় মেয়েদের আর বিকালে ছেলেদের। অশোককে কেন্দ্র করে তালতলির প্রায় মরে যাওয়া ক্লাবটা আবার চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। সকাল বিকেল ছোট ছোট ছেলে মেয়ের বিচিত্র কণ্ঠ আর যন্ত্রের নানা রকম স্বর-নিক্কণে মুখর থাকে ক্লাব-ঘর।

মালুর চোখে অশোক এক পরম বিস্ময়। নিষ্প্রাণ তার, জড় যন্ত্র, কেমন বোকার মতো সব পড়ে থাকে ক্লাবের শতরঞ্জির উপর, অথচ অশোকের সামান্য একটা আঙ্গুলের ছোঁয়ায় কী বিচিত্র সুরে কথা কয়ে ওঠে। যে মানুষের স্পর্শ পেয়ে অমন নিষ্প্রাণ বস্তুগুলোও জেগে ওঠে, রিনরিনিয়ে বেজে ওঠে, না জানি কী মহামন্ত্র সে মানুষের আয়ত্তে।

সে যন্ত্রের ঝংকারে, বাদ্যের তালে গান ধরে অশোক, উঠতি পড়তি গলার বিচিত্র স্বরে, সুরের গমকে এ এক নতুন ধরনের গান। এ গান কখনো শোনেনি মালু। বাদ্য ঝংকারে অনুপম মিতালির সে গান যখন ভেসে আসে মনটা মালুর আনচান করে। অস্থির হয়, দোকানের কাজ ফেলে ও ছুটে আসে ক্লাব ঘরটার দিকে।

বলি বলি করেও বলা হয় না মালুর কথাটা। ঘুর ঘুর করে, প্রতিদিন সন্ধ্যায়। কিন্তু ক্লাবের ভেতরে যাবার সাহসটা কিছুতেই সঞ্চয় করতে পারে না মালু। শেষে মরিয়া হয়ে কথাটা বলেই ফেলল মালু, আশোকদা, আমায় বাজনা শেখাবেন?

কেমন মানুষ অশোক! মালুর দিকে একবার তাকাল না, ওর কথাটা কানে তুলল কিনা তাও বোঝা গেল না। শুধু বলল, বেশ আয়। পিছে পিছই এল মালু।

হারমোনিয়মে সা-রে-গা-মা-র প্রথম পাঠ ওকে লাগিয়ে দিল অশোক।

বারে আমি তো বাজনা শিখতে চাই, বলল মালু।

আরে পাগল! সারেগামাটা আগে ধরতে শেখ তো, তারপর বাজনার তালবোল নিজেই ধরতে শিখবি।

অশোকের বিরাটত্বে এতদিন মুগ্ধ ছিল মালু। আজ বুঝি ধন্য আর কৃতার্থ হল ওর স্নেহের ছোঁয়ায়।

সারেগামার গন্ টানতে টানতে দুর্বোধ্য যন্ত্রগুলোর দিকে বুভুক্ষুর মতো চেয়ে থাকে মালু। কবে, কবে ও ছুঁতে পারবে ওই যন্ত্রের বিস্ময়কে! কবে ওর আঙ্গুলের স্পর্শ পেয়ে কথা কয়ে উঠবে ওরা যেমন ঝংকার দিয়ে ওঠে অশোকের অঙ্গুলি স্পর্শ? কবে ওর মনের সুরটা যন্ত্রের ধ্বনিতে ছড়িয়ে পড়বে মানুষের কানে, বাতাসে বাতাসে?

এতদিন আপন মনে যেমন খুশি গেয়ে এসেছে মালু। গনি বয়াতির কাছে শুধু কয়েকটি পালা আর গানই শিখেছে মালু। কিন্তু গানের যে কত বিধিবদ্ধ নিয়ম, রাগ রাগিণীর শৃঙ্খলা, তালবেলের কত কলাকৌশল, অশোকের কাছে এই প্রথম সে কথাটা শুনল মালু।

অদ্ভুত তোর গলার খাঁজ, বাজনার সাথে চমৎকার খুলবে রে! অশোকের প্রশংসায় দশহাত ফুলে ওঠে মালুর বুকটা।

কিন্তু জানিস, সুরের সাধনা বড় কঠিন, দীর্ঘ সাধনার ধন এই সঙ্গীত।

সাধনা? বুঝতে না পেরে শুধায় মালু।

মানে লেগে থাকতে হবে আর কী! জোঁকের মতো আঁকড়ে থাকবি, ছাড়বি না।

অশোকের কথায় কেমন যেন ধাঁধা লেগে যায় মালুর।

তালিম দেয়া গলা নয় ওর। কসরত করতে হয়নি ওকে সুরের জন্য। বেগ পেতে হয়নি কথার জন্য। ওই পাখির ডাক, দোল-খাওয়া পাতার শন শন ঝরে পড়া পাতার মর্মর থেকেই বুঝি ধ্বনির অলক্ষ চেতনা পেয়েছে ও। বড় খালের কুল কুল তরঙ্গ, বাতাসের মন্দ্র-গুঞ্জন, এ সবই তো ওর সুরের উপাদান, সেখান থেকেই এসেছে ওর সুর। তাই সুরটা ওর স্বভাব, সুরের প্রকাশটা সহজ এক অভিব্যক্তি ওর কাছে। সে সুর নিয়ে মাথা ঘামিয়ে হয়রান হতে হবে, এ সব কথা ওর কাছে একেবারেই নতুন।

অবিচল নিষ্ঠায় বছরের পর বছর অক্লান্ত সাধনা। ধৈর্য আর তিতিক্ষা। তবেই পাওয়া যায় সার্থক শিল্পীর গৌরব, বুঝলি?

অশোক যেন একটা প্রত্যাশা নিয়ে তাকায় মালুর দিকে।

ঘাড় নাড়ে মালু। যেন খুব বুঝেছে ও।

.

বুঝুক না বুঝুক অশোকের সব কথাই মন দিয়ে শোনে ও। ভালো লাগে শুনতে। প্রথমটায় যেমন ধাঁধা লাগিয়ে দিয়েছিল অশোক, ধীরে ধীরে সে অবস্থাটার পরিবর্তন হয়। অনেক কিছুই যেন স্পষ্ট হচ্ছে, বুদ্ধির নাগালে ধরতে পারছে মালু।

সারেগামার পাঠ সারতে দেরি লাগল না মালুর। তবলা সারেঙ্গী সেতার এসরাজ, একে একে যন্ত্রগুলো ওকে চিনিয়ে দেয় অশোক। মালু হাত দিয়ে স্পর্শ করে সেই বিস্ময়কর জড়পদার্থগুলো যার ভেতর লুকিয়ে রয়েছে মানুষের মনের সুর হৃদয়ের কথা।

টংকার খাওয়া সেতারের তারটির মতোই যেন কেঁপে কেঁপে যায় মালুর দেহের তন্ত্রীগুলো। এ যেন অজানা পৃথিবীর দুয়ারে দাঁড়িয়ে আশা দুরাশার ঘন আন্দোলনে বেহুঁশ হওয়া। জ্ঞানীর গুণির ধ্যানীর জগৎ শুধু গান নয়, শুধু সুর নয়–সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শব্দ ধ্বনি তরঙ্গের লয় প্রলয়, কোমল বিন্যাস–সে যে সঙ্গীতের জগৎ, সাধনার জগৎ, সেখানে মালু বয়াতির স্থান হবে কী?

যত্ন করেই ওকে শেখায় অশোক।

অশোকদা খুব ভালো। অশোকদা খুব চমৎকার। মনে মনে উচ্চারণ করে মালু।

কিন্তু সব ভালো কাজেই যেন শুধু বাধা আর বিপত্তি।

আবার গান নিয়ে মেতেছিস? পড়বি বলে না কথা দিয়েছিলি আমায়? চোখ মুখ লাল করে ধমকায় রানু।

আহা পড়ার সময়টা কী চলে যাচ্ছে নাকি? কিন্তু অশোকদা চলে গেলে এ সব নতুন ধরনের গান বাজনা শিখবে কোথায় মালু।

মালুর, যুক্তিতে মন গলে না রানুর। বলে, বেশ গান নিয়েই থাক, আমি খুড়োকে বলে দিচ্ছি চাকরির আর দরকার নেই তোমার।

রেগে মেগে ওকে তুমি বলতে শুরু করে দিয়েছে রানু।

কেঁদে দেয় মালু।

গলে যায় রানুর মনটা। হেসে দেয়, বলে, কত বড় হয়েছিস, খেয়াল আছে?

আয়নায় চেহারাটা একবার দেখিস। এ্যাদ্দিনে অন্তত ম্যাট্রিকটা তোর পাস করে ফেলা উচিত।

রানুর হাত থেকে রেহাই পেল মালু। কিন্তু রামদয়ালের মতো বাধাটা ডিঙ্গিয়ে যাবার শক্তি কোথায় মালুর।

যুদ্ধ লাগার পর থেকেই মনোহারি দোকানটার দায়িত্ব ভাইপো রমেশের হাতেই ছেড়ে দিয়েছে রামদয়াল। সাবেক দোকানটার সীমানা থেকে পুরো তালতলি বাজারের আধেকটা জুড়ে লম্বা তিনটি গুদাম ঘর, মাঝারি গোছের চারখানি দোকান ঘর। সেই প্রাচীন মনোহারি দোকানটার সাথে যুক্ত হয়েছে এগুলো। চালডাল সুপুরির আড়তদারি, কন্ট্রোলের তেল চিনি কাপড়ের ডিলারি, কত রকমের কারবার রামদয়ালের। যুদ্ধের বাজারে ফেঁপে উঠেছে রামদয়ালের ব্যবসা। এক এক গুদাম, এক এক দোকান পৃথক পৃথক আত্মীয়-কর্মচারীর জিম্মায়, কিন্তু সবটার উপর রামদয়ালের তীক্ষ্ণ নজর। দোকান আর গুদামগুলোর ঠিক মাঝখানে ছোট্ট একখানি ঘর। সেখানে বসে চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখে রামদয়াল। এ দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে রোজ রোজ দোকান পালানো কঠিন।

অবশ্য মালু যে ভাবে যায় তাকে আর যাই বলা হোক, পালানো বলা চলে না। প্রথমত রমেশের অনুমতি নেয় ও। দ্বিতীয়ত যে সময়টিতে যায় মালু ওটা দোকান বন্ধ হবার সময়। বড়জোর পনেরো বিশ মিনিট আগে চলে যায় ও। একমাত্র ব্যতিক্রম সপ্তাহের দুটো হাটবার। সে সময়ে তো রাত বারটা কখনো একটা

পর্যন্তও খোলা থাকে দোকান। হাটবারে সকাল বেলায় গিয়ে কিছুক্ষণ গলা সেধে আসে মালু। এ ব্যবস্থাই হয়েছে অশোকের সাথে।

কিন্তু, বিশ মিনিটই হোক আর দশ মিনিটই হোক, দোকান খুলতে দেরি করা অথবা আগে ভাগে বন্ধ করা, রামদয়াল তা সইবে কেন? ওকে কী এই জন্য মাইনে দিচ্ছে রামদয়াল?

দু একদিন কানআড়ি শুনেছেও মালু। রমেশকে জিজ্ঞেস করছে রাম-দয়াল : এই রমেশ ওই নেড়ের বাচ্চাটা আগে আগে কোথায় বেরিয়ে যায় রে? অমন চটপটে, বি. এ .পাস গুণীলোক অশোক, তারই বড় ভাই রমেশ। কিন্তু হলে কী হবে, বুদ্ধিতে একেবারে নিরেট বলে কলকাতার ব্যবসায় কোথাও স্থান হয়নি তার। তাই এই গ্রামের দোকানটায় বসিয়ে রাখা হয়েছে তাকে। কোথায় একটু ছিপিয়ে ছুপিয়ে বলবে, তা নয়, একেবারে সোজাই বলে ফেলল, কেন ওই ক্লাবে?

ওতো গান শেখে অশোকের কাছে।

কাকে বলে যায় ও? গম্ভীর কৈফিয়ত তলবের স্বর রামদয়ালের।

আমাকে বলে। আমি তো ছুটি দিয়ে দিই ওকে। সরল মনে সত্য কথাটাই বলে রমেশ।

গর্জে উঠেছিল রামদয়াল। তারপর ভাইপোর উদ্দেশে কী কী সব শ্রাব্য অশ্রাব্য উক্তি করেছিল রামদয়াল, সে সব শোনার জন্য অপেক্ষা করেনি মালু।

কিন্তু তক্ষুনি তক্ষুনি মালুর তলব পড়েনি। তার পরদিন অথবা পরের সপ্তাহেও না। হয়তো ভুলেই গেছে রামদয়াল। আর মাটির মানুষ রমেশদা, সে তো কিছুই বলে না মালুকে।

মালুর সাহসটা যায় বেড়ে।

রমেশদা যাই? বলে একটু আগে ভাগেই বেরিয়ে পড়ে মালু।

কথায় বলে সাতদিন চোরের, একদিন গেরস্তের।

দোকান থেকে বেরিয়ে সবে মোড়টা নিয়েছে মালু সুমুখে রামদয়াল। এদিকে আয়, দোকান ঘরে ঢুকে ওকে ডাক দেয় রামদয়াল।

অপরাধীর মতো এসে দাঁড়াল মালু।

এটা চাকরি, দোকানের কাম, মামা বাড়ি নয়। বলতে বলতে মালুর গালে ঠাস ঠাস কয়েকটা চড় বসিয়ে দেয় রামদয়াল। অতর্কিত আক্রমণে বুঝি হকচকিয়ে যায় মালু, পেছন সরে পরিস্থিতিটা বুঝবার আগেই একটা কেরোসিন টিনের গায়ে পা লেগে পড়ে যায় ও।

ব্যাটা, ভাব তুমি, কিসসু নজরে পড়ে না আমার? বেরিয়ে যায় রামদয়াল। উঠে দাঁড়াল মালু। কী এক দুরন্ত উত্তাপে টগবগিয়ে উঠতে চায় মালুর তরুণ রক্ত। হাতটা মুঠো করে ও। অনুভব করে, আর যেন এই প্রথম অনুভব করে, শক্তি আছে, বিপুল শক্তি ওর দেহে।

না। রানুদির জ্যাঠা মশাইকে মেরে, রানুদিকে মুখ দেখাবে কেমন করে মালু? মুঠো ওর শিথিল হয়ে আসে। ধীরে ধীরে ক্লাবের দিকেই চলে যায় ও।

প্যাঁ পুঁ করাই সার হল। সুর সাধনা আজ জমল না। ভয় লেগেছে মালুর আজকের ঘটনার পর চাকরি নিশ্চয় থাকবে না ওর। তা হলে? তা হলে অশোকদার সযত্ন শিক্ষকতায় গান শেখার ইতি হবে এখানেই?

আগাগোড়া শুনে হেসেই খুন রানুদি। বলে, তুই একটা বোকা। আরে যুদ্ধের বাজারে লোক ওরা পাবে কোথায় যে তোকে জবাব দেবে?

সত্যি তাই। সকালে যথারীতি দোকান খুলল মালু। রমেশ বা রামদয়াল কেউ মুখটা পর্যন্ত খুলল না, যেন কিছুই হয়নি।

শুধু একটা নতুন নিয়ম চালু করল রামদয়াল। ওই দোকান ঘরেই ঘুমুতে হবে মালুকে। এতদিন ওর ঘুমুবার জায়গাটা ছিল অন্যত্র।

সঙ্গে সঙ্গেই রাজি মালু; কিন্তু যখন আপনি ক্যাশ বন্ধ করে ফিরবেন তখন আমাকেও বন্ধ করে যাবেন।

অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত কথা। দোকান বন্ধ হয় সন্ধ্যার পর পর। মালু কী তখন থেকেই তালাবদ্ধ হয়ে থাকবে নাকি? না তা করতে পারে না রামদয়াল।

রামদয়ালের দুষ্ট চালটা ব্যর্থ গেল। দিব্যি গানটা সেরে শুতে আসে মালু। রাত তখন কখনো বারটা, কখনো আরো বেশি। রামদয়াল তখনো সরকার মশায়কে নিয়ে হিসেবে মিলাচ্ছে।

২৯.

কী কাল যুদ্ধ!

আর কী সর্বনেশে!

সব কিছু লণ্ডভণ্ড, তছনছ করে দিয়ে গেল। যেন লক্ষ কোটি শকুনি পাখা বিস্তার করেছে আকাশে। যে আলোয় আলোকিত থাকত পৃথিবী সে আলোটা আড়ালে পড়েছে। পৃথিবীময় শকুনি পাখার অন্ধকার ছায়া। শকুনির হিংস্র কুটিল দৃষ্টি আগুন ঝরিয়ে চলেছে, সে আগুনে মাটি পুড়ছে। মানুষ, জানোয়ার, পৃথিবীর সভ্যতা, পৃথিবীর সবুজ, পুড়ে খাক হচ্ছে। শকুনির জিহ্বা বেয়ে টপটপ বিষ ঝরছে। সে বিষ মাটিতে মিশে মানুষের গায়ে লেগে ছড়িয়ে চলেছে রোগ মহামারী দুর্ভিক্ষ।

সেকান্দর মাস্টারের স্বপ্নটাও ছিনিয়ে নিয়েছে এই সর্বনেশে যুদ্ধ। সব ছারখার হয়ে গেল রে মালু। সব ছারখার হয়ে গেল। কেমন শুকনো ম্লান মুখে বলে সেকান্দর মাস্টার।

শত দুর্যোগ, শত অনটনের মাঝেও যে স্বপ্নটিকে ও শুকতারার মতো জ্বালিয়ে রেখেছিল চোখের সুমুখে যুদ্ধের শুরুতেই সেই স্বপ্নের কবর খুঁড়ে চলে গেছে সুলতান। পড়াশোনার দরকার নেই তার। টাকা কামাবে সে, তাই কামাইয়ের জন্য যুদ্ধের হাটে নেবে পড়েছে ও।

জীবনের অপূর্ণ যত ছোট ভাইটির সার্থকতার মাঝে পূর্ণ করবে বলে এত যে তার আয়োজন সবই ব্যর্থ করে দিয়ে গেল সুলতান। বুকটা বুঝি ভেঙে পড়েছিল সেকান্দর মাস্টারের। নিমিষের জন্য সমস্ত শ্রম সমস্ত উদ্যোগ আর তিল তিল ত্যাগ সবই যেন অর্থহীন মনে হয়েছিল। কিন্তু লক্ষ মানুষের লক্ষ দুঃখ ওর একার দুঃখটাকে যে কখন ভাসিয়ে নিয়ে গেল টেরই পেল না সেকান্দর।

এমনিতেই কাজ কী তার কম? জাহেদের চাপিয়ে দেওয়া সেই দায়িত্ব, স্কুলের কাজ, ডানে বাঁয়ে তাকাবারও সময় দেয়নি ওকে। তার উপর যুদ্ধ বিশৃঙ্খল জীবনের হাজার ফরিয়াদ, লক্ষ অনাচার, একটি প্রতিকার; ছুটাছুটি দৌড়াদৌড়ি, নিজের বলতে সব কিছুই যেন চাপা পড়ে গেছে এত কিছুর মাঝে।

মাস্টারের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন কান্না পায় মালুর। তিনটি বছরের প্রতিটি দিন, এক হাজার পঁচানব্বইটি দিনের প্রতিটি ঘণ্টা আর মিনিট অসংখ্য চিন্তা দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনার রেখার দাগে যেন এক একটি করে ছাপ ফেলে গেছে তার মুখে। অকাল বার্ধক্যের চিহ্ন সেকান্দর মাস্টারের মুখে, মাঝ কপাল বরাবর এক

পোঁচ সাদা চুল। তিনটি বছর এমন নির্দয় স্বাক্ষর রেখে যেতে পারে কোনো মুখে– মাস্টার সাহেবকে না দেখলে কোনো দিনই বিশ্বাস করত না মালু।

কিন্তু মাস্টার সাহেব, যে ভাবে ছুটোছুটি করছেন আপনি তো মরে যাবেন। বলিস কিরে? মরে যাব? মালুর কথাটা কেড়ে নেয় সেকান্দর মাস্টার। বলে, চোখে যদি দেখতিস কাণ্ডকারখানা তবে বলিতিস না এ কথা। সুলতানপুর চাটখিল গোটা মৌজাটার উপর নোটিশ পড়ল, তিনদিনে খালি করতে হবে। কমসে কম হাজার কুড়ি মানুষ তো হবেই, তিন দিনে বাড়ি ঘর খালি করবে কেমন করে? আমি তো ভাবলাম এই হুড়োহুড়ি টানা-টানির চোটে আধেক লোকই বুঝি সোজা বেহেশতের দিকে রওনা দিবে। বলে কয়ে গোরা সাহেবটার কাছে থেকে আর একটা দিন বাড়িয়ে নিলাম। গরু, বাছুর, কাঁতা, বালিশ, খোরা, শানকি, সব নিয়ে যে যেদিকে পারল চলে গেল। গুনে দেখি, ও মা, মরল মোটে গণ্ডা দেড়েক মানুষ আর এক জোড়া বুড়ো বলদ।

বলে কেমন ম্লান করে হাসে সেকান্দর। মালুর মনে হয় সে হাসিটা কান্নারই আর এক রূপ। তারপর সেকান্দর মাস্টার জুড়ে দেয় শেষ বাক্যটা : এখন বুঝলি তো, মরা কত কঠিন? মরাটা যেমন সহজ তেমনি কঠিনও।

অপলক চেয়ে থাকে মালু। ওর আবাল্য শ্রদ্ধার মানুষ মাস্টার সাহেব। আজ আবার তার পায়ের ধূলো নিল মালু।

থাক থাক। বুঝি বিব্রত হয় সেকান্দর মাস্টার।

হঠাৎ অমন নাটকীয় ভাবে কদমবুচি করার কী ঘটল বুঝতে পারে না সেকান্দর! হাত দুটো ধরে মালুর ঝুঁকে থাকা কাঁধটা উঠিয়ে আনে ও। যেন গভীর মনোযোগে চেয়ে থাকে মালুর মুখের দিকে। ছলছলিয়ে ওঠে ওর চোখজোড়া, বলে : বড় দুর্ভাগ্য নিয়ে জন্মেছিস রে! বড় দুর্ভাগ্য নিয়ে জন্মেছিস তুই। শেষ দেখাটা তুইও দেখলি না, ওঁরাও দেখলেন না। সে দুঃখটাই সব সময় আমার মনে বাজে।

বুঝি অতীতের সেই দুঃখ দিনটিই ভেসে উঠেছে মাস্টারের মনের পর্দায়। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সজাগ ছিলেন মুন্‌শীজী। পরিষ্কার নিখুঁত কেরাত ধরে দোওয়া পড়েছেন আর শুধু তোর কথা জিজ্ঞেস করেছেন। গরু খোঁজার মতো খুঁজলাম তোকে। হয়তো খবর পেলাম অমুক বাজারে আছিস, গিয়ে দেখি, কোথায় কী? থামল সেকান্দর। ছাতাটাকে কোলের উপর তুলে শুইয়ে রাখল। বলল আবার : তিনটি মাস যেতে না যেতেই তোর আম্মাও অসুখে পড়লেন। সে অসুখই তাঁর শেষ অসুখ। আমার কী মনে হয় জানিস? ওদের কাছে শেষ জীবনের ওই

পরিহাসটার চেয়েও বড় ছিল তোকে হারানোর শোক। শোকেই ... হঠাৎ সেকান্দরের নজরে পড়ে, মালু শুনছে না ওর কথাগুলো। হাতে একটা ন্যাকড়া প্যাঁচিয়ে চাটাই ঘষছে মালু। ঘষে ঘষে ময়লা তুলছে। যখনি দেখা হয়েছে মাস্টারের সাথে প্রসঙ্গটা অনিবার্যভাবেই এসে পড়েছে। আর নির্বাক অন্যমনস্কতায় আপনাকে সরিয়ে নিয়েছে মালু। মাস্টার সাহেবের সমবেদনা এতটুকু দাগ কাটে না ওর মনে। ভারি হয় না মনটা।

অমন যে মালু, একটুতেই জলে ভরে আসত যার চোখ, সেই মালু অনেক সাধ্য সাধনা করেও ঝরাতে পারে না এক ফোঁটা অশ্রু। রানুদির, মাস্টার সাহেব, ওদের সমবেদনার জবাবে সামান্য একটু কৃতজ্ঞতা প্রকাশের খাতিরেও না। ভেতরে ভেতরে কেমন যেন কঠিন হয়ে আসে ও। চোখজোড়া যায় শুকিয়ে। আর সেই শুকনো চোখের গর্ত থেকে কী এক জ্বালা উঠে আসে। সে জ্বালায় কপালের শিরা আর মাথার ঝিল্লিগুলো দপদপিয়ে ওঠে, সারা দেহে আগুন ছড়ায়।

যেন কলঙ্কের ভারে নুয়ে ছিল ওর পিঠটা, ছোট ছিল ওর মুখটা। আব্বা আম্মা মরে গিয়ে সে ভার থেকে মুক্ত করেছে ওকে। সিদা হয়ে আজ দাঁড়াতে পারবে ও, মুখ বড় করে কথা বলতে পারবে। কেন এমন মনে হয় মালুর?

দুঃখ সওয়া, দুঃখ নেওয়া খুব বড় জিনিস রে মালু, খুব বড় জিনিস, দুঃখের আগুনে যে না পুড়েছে সে চিনতে পারে না, জানতে পারে না এই দুনিয়াটাকে। ভুল করে ওকে সান্ত্বনা দেয় সেকান্দর মাস্টার।

চোখ তুলে তাকায় মালু। ঘরে ঘরে যুদ্ধের সর্বনাশ ডাকা এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলটার সান্ত্বনা, সহিষ্ণুতা আর আশার প্রতীক সেকান্দর মাস্টার। কিন্তু তাকে কি সান্ত্বনা দেবার আছে কেউ? অথবা, আত্মবোধটাকে একেবারেই বিসর্জন দিয়েছে সেকান্দর মাস্টার, তাই নিজের জন্য সান্ত্বনার প্রয়োজন হয় না তার।

উঠি এখন। শিমুল পাড়াটা একেবারেই পুড়িয়ে দিয়েছে গোরাগুলো। যাচ্ছি সেখানে রিলিফ নিয়ে। কাল নাও ফিরতে পারি।

ছাতাটা বগলে নিয়ে উঠে দাঁড়ায় সেকান্দর মাস্টার। কী যেন মনে পড়ে যাওয়ায় আবার বসে পড়ে।

ওহ্ হো ভুলেই গেছিলাম, জাহেদ লিখেছে যেমন করে হোক তোকে খুঁজে বের করতে আর তোর লেখাপড়ার ব্যবস্থা করতে। বুক পকেট থেকে খামটা বের করে

মালুর হাতে দেয় সেকান্দর। আর রাশু খবর পাঠিয়েছে ওর শ্বশুর বাড়ি থেকে, তুই যেন একবার বেড়িয়ে আসিস।

তা হলে মেজো ভাই ভোলেনি ওকে? চিঠিটার উপর চোখ বুলিয়ে কী এক আনন্দে নেচে ওঠে ওর মনটা। কিন্তু রাশু! অবাক মানে মালু। রাশুর মুখটা সত্যিই ভুলে গেছে ও।

চল, আমার বাড়িতেই থাকবি তুই। দোকানের কাজ ছেড়ে দে। চিঠিটা ভাঁজ করে পকেটে পুরে বলল সেকান্দর।

ধপ করে যেন পড়ে গেল আনন্দে নেচে ওঠা সেই মনটা। কী আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠল মালু : না না মাস্টার সাহেব, বাকুলিয়ায় যাবার কথা বলবেন না আমায়, সে আমি পারব না, কোনোদিন না।

তুই, তুইও একথা বললি? এখনো হুকুম দখলের নোটিশ পড়েনি। কিন্তু, জানিস এরি মাঝে আদ্ধেক গ্রাম খালি? শূন্য ভিটিগুলো দেখে মনে হয় খোলা বুকে মাতম করছে না ওরা, ওরা অভিশাপ দিচ্ছে, অভিশাপ। ধিক্কার দিচ্ছে তোকে, আমাকে, সবাইকে, সমগ্র মানবজাতিকে। মাটির অভিশাপ। আমি তাকাতে পারি না। চোখ বুজে হাঁটি।

রেগে গেছে সেকান্দর। রাগটাকে সামাল দিতে দিতে বেরিয়ে যায় ও। নিথর নির্বাক মালু। চেয়ে থাকে মাস্টারের ছেড়ে যাওয়া টিনের চেয়ারখানার দিকে।

অসাবধানে বলে ফেলেছে মালু, কিন্তু সে তো ওর মনেরই কথা। কেমন করে ও ফিরে যাবে বাকুলিয়ায়? রাবু, আরিফা, জাহেদ, যাদের কেন্দ্র করে ওর বাকুলিয়ার শৈশব, বাকুলিয়ার আনন্দ, ওরা তো কেউ আপন নয় ওর। সে সব দিন, সে সব আনন্দ পরাভূতের গ্লানি, উচ্ছিষ্টভোজীর অনধিকার। সে আনন্দের স্মৃতি আজ শুধুই দুর্বার। সে স্মৃতি আজ বেদনা দেয়, কী এক অপমানের জ্বালা ছিটিয়ে দেয় সর্বাঙ্গে। ওর এই মনের কথাটা কী বুঝবে না মাস্টার সাহেব?

মাস্টার সাহেবের সেই বেদনা-পীড়িত ক্ষুব্ধ মুখের ছবিটাই বার বার ভেসে ওঠে মালুর চোখের সুমুখে। আর ছোট বেলার সে সব স্মৃতি যা যন্ত্রণা হয়েই জাগে, সেই স্মৃতিরা কী এক টানে পেছনে নিয়ে যায় ওকে।

মাটিরও কী অভিশাপ আছে? হয়তো আছে। সেই মাটির অভিশাপটা বুঝি মিশে আছে মালুর রক্তে। আর ওর আম্মার অভিশাপ? সে তো এখনো পিছু তাড়া করে চলেছে ওকে।

ছিঃ মালুর মা। অমন করে কহর দেয় না ছেলেকে। মায়ের কহর বড় কঠিন, লেগে যায়। সৈয়দগিন্নীর সেই তিরস্কারটাও মনে পড়ে মালুর।

তার চেয়েও আশ্চর্য, মিঞা সৈয়দ গ্রাম ছেড়েছে বলে ধিক্কার দিয়ে গান বেঁধেছিল মালু। গোটা গ্রামের মানুষকে শুনিয়েছে সে গান। সেই মালুর কাছে বাকুলিয়া আজ কলঙ্কের সাক্ষী মর্মন্তুদ কোনো যন্ত্রণার পীড়ন! মনটা দমে যায় মালুর। গান আজ একটুও জমল না। বারে বারে সুর কেটে যায়, তালে ভুল হয়। তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়বে বলে উঠে আসে ও।

বস্ মালু। আজ একটু দেরি হবে শুতে। ওকে দেখে বলল রামদয়াল। বসে বসে আরও খারাপ লাগে মালুর। অতীতটাই ছুটে আসে, ওকে ঘিরে ধরে। বাকুলিয়ার আনন্দ, রাবু আপা, মেজো ভাই, ওদের স্নেহ, সবই কী মিথ্যা? তা কেন হবে? আজও তো সেই স্নেহের টান অনুভব কর চলেছে মালু! মেজো ভাইয়ের চিঠির ছত্রে নিজের উল্লেখ দেখে নেচে উঠেছে ওর মন।

রাত বেড়ে যায়। ঠেস তোলা টুলে বসে বুঝি ঘুমে ঢুলে পড়ে মালু। হঠাৎ লরীর শব্দ পেয়ে ঢুলুনিটা ভেঙে যায় মালুর। তেরপল দিয়ে ঢাকা দুটো লরী এসে থামল রামদয়ালের গুদাম ঘরের সামনে।

ফিস ফিস কথা চলে ওদের। উসখুস করে মালু। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল, বারটা বেজে মিনিটের কাঁটা ডান দিকে হেলে পড়েছে।

না না, সে সম্ভব হবে না। হঠাৎ উচ্চৈঃস্বর ভেসে আসে রমজানের। আরে হবে হবে। তুমি ইচ্ছা করলেই হবে। অনুনয়ের স্বর রামদয়ালের। আহা বুঝছেন না আপনি, গাড়ি যে মালে বোঝাই। ঘন ঘন ঘাড় নাড়ে রমজান।

কয়টিই বা বস্তা আমার। যতই মালে ঠাসা থাকুক, অত বড় গাড়িতে চার পাঁচটি বস্তা কী আর ধরবে না? চল দেখি না?

রামদয়াল লরীর ভেতরটা দেখবার জন্য উঠতে যাচ্ছে দেখে লাফিয়ে উঠে ওর পথটা আগলে দাঁড়ায় রমজান।

বলে, আচ্ছা দেন দেন। কিন্তু পাঁচ বস্তার বেশি নয়।

হাসির একটি চতুর রেখা খেলে যায় রামদয়ালের মোচের ফাঁকে।

ডাক পড়ে মালুর।

ওই চিনির গুদাম খোল। পাঁচটি চিনির বস্তা বের করে নিজেও মালুর পিছে পিছে আসে রামদয়াল।

বস্তাগুলো বের করার পর হুকুম দেয় রামদয়াল : এই গাড়িতে দুটো আর ওই গাড়িতে তিনটে তুলে দে।

দুমণি বস্তা। কিন্তু, পিঠে আর হাতে ভার টানতে টানতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে মালু। পিঠ বেঁকিয়ে একটু নিচেতে বসে ও। বস্তার কান দুটো ধরে একটু সুমুখে টেনে নেয়। পিঠ আর বস্তাটাকে সমান্তরাল করে। তার পর পা দিয়ে ঠেলে দেয় মালু। বস্তা শুদ্ধ উঠে আসে উর্ধ্বাঙ্গ।

কিন্তু, এ কী মাল রমজানের গাড়িতে! কিষাণী মেয়েতে গাদাগাদি ভর্তি গাড়ি। ছোট বড় ন্যাকড়ার পুঁটলী হয়ে এ ওর গায়ে সেঁটে রয়েছে। এক তিল ঠাঁই নেই গাড়িতে। এরি মাঝে আচমকা একটা বস্তা এসে পড়ায় অতগুলো পুঁটলী যেন এক সাথে নড়ে উঠল, কী এক আতঙ্কের চাপা আর্তনাদ তুলল। দরজার মুখের দুটো মেয়ে উহ্ করে ছিটকে পড়ল পেছনের কয়েকজনের গায়ের উপর দিয়ে। হঠাৎ বস্তা পড়ে বুঝি চোট লেগেছে ওদের পায়ে। ধপাধপ বস্তাগুলো ফেলল মালু।

ওরা ভয়ে মৃত। ওরা আতঙ্কিত। উহ্ করে শুধু সরে গেল। এ ওর গায়ের উপর ভয়ের কম্বল জড়িয়ে পড়ে রইল।।

বস্তাগুলো উঠানো হলে ড্রাইভারের পাশে গিয়ে বসল রমজান। গাড়ি ছেড়ে দিল।

ঘুম পালিয়ে গেছে মালুর। ঘুম আর হবে না। বিড়ি তামাক, চিড়া গুড় তেল সাবান, সব মিলিয়ে মনোহারী দোকানের যে বিচিত্র গন্ধ, শুয়ে শুয়ে সেই গন্ধটা শোকে মালু। এ পাশ ওপাশ করে।

এই তবে রমজানের ব্যবসা? সুলতান তার সহকারী? শুনেছে মালু কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা বানিয়েছে রমজান। যুদ্ধের হাটে বিচিত্র পণ্যের কারবার তার। রামদয়াল তার দোসর। ঘরে ঘরে বুভুক্ষু কৃষক বধূরা, নিরাশ্রয়া কিষাণী কুমারী রমজানের পুঁজির কড়ি। অন্ধকারেই উঠে বসে মালু। দিয়াশলাই হাতড়িয়ে মোম জ্বালায়। মোমটা কাত করে ধরে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসে বস্তাগুলোর দিকে। কোণের দিকে একটার পর একটা একবারে ছাদ অবধি সাজানো বস্তার সার, চাল ডাল লবণের। দোকানের মজুদ মাল। এ বস্তাগুলোর মাঝেই কতগুলো নতুন ধরনের বস্তা রেখে গেছে রমজান। ময়লা আলকাতরার দাগ পড়া বস্তা, হাত দিয়ে ছুঁতেই ঘেন্না ধরে। অযত্নে রাখা, অথচ রামদয়ালের কেমন একটা গোপন সতর্কতা। স্টক

দেখবার অছিলায় যখন দোকানে ঢেকে রামদয়াল ওই বস্তাগুলোর কাছেও যায় না সে, কিন্তু কেমন আড় চোখে সংখ্যাগুলো মিলিয়ে দেখে। মালুর দৃষ্টি এড়ায় না।

সেদিনও এমনি গভীর রাতেই গাড়ি থেকে বস্তাগুলো নাবিয়ে রেখে গেছিল রমজান। মালুকে ছুঁতে দেয়নি, নিজেই গাড়ি থেকে বয়ে এনেছিল রমজান।

মোমটা কাছের খালি টিনের উপর বসিয়ে একটা বস্তার উপর হাত রাখল মালু। চাল ডালের বস্তার মতো নয়, হাতটা কেমন শক্ত ঠেকে। মনে হয় বস্তার নিচেই পীচবোর্ড। হাতটা একটু চাপতেই ডেবে যায়। অবাক হয় মালু, ভুসিটুসি নয় তো? দু হাতের বেড়ে একটা বস্তা তুলতে গিয়ে বেকুব বনে গেল মালু। হাতে যতটা জোর খিঁচেছিল সেই জোর যেন উল্টে এসে ওর বুকে আছড়ে পড়েছে। একেবারে হাল্কা বস্তাটা, শুকনো মরিচের বস্তাগুলোও এত হাল্কা নয়।

ডবল সুতোর প্যাঁচে মজবুত করে বাঁধা বস্তার মুখটা। অভিজ্ঞ হাতের ক্ষিপ্র চালনায় সেই মজবুত সেলাইটা খুলে ফেলল মালু। যা ভেবেছিল তাই, মুখের দিকে পীচবোর্ডের ঢাকনির মতো পীচবোর্ডগুলো সরিয়ে হাতটা ভেতরে সেঁদিয়ে দিল মালু। যেন শুকনো পাতার গাদির ভেতর দিয়ে খরখরিয়ে গেল মালুর হাতখানা। খস খস আওয়াজ উঠল বস্তার ভেতর থেকে, শুকনো পাতা গায়ে গায়ে লেগে যেমন খসখসিয়ে ওঠে। এক মুঠো পাতা তুলে আনল মালু। মোমের সামনে ধরে হাতটা তার কেঁপে গেল। পাতাগুলো ঝরে গেল। ছড়িয়ে পড়ল মেঝেতে।

দু টাকার পাঁচ টাকার এক শো টাকার, সব ধরনের নোটই উঠে এসেছে ওই একটি মুঠোতে।

আবার ছুটে গেল মালু। আবার মুঠো ভরে তুলল, মেঝেতে ছড়িয়ে দিল, দশ টাকা এক শো টাকার কাগজ। রাজার ছবি আঁকা, বিচিত্র রং-করা, পাতা আঁকা সব কাগজ।

আবার ছুটে গেল মালু। খুলে ফেলল আর একটা বস্তা। বেরিয়ে এল গাদি গাদি নোট।

আর একটা বস্তা। সেখানেও শুধু গাদি গাদি কাগজের নোট।

আর একটা বস্তা। সেখানেও শুধু তাড়া তাড়া কাগজের টাকা।

এ কী করছে মালু? হঠাৎ বুঝি ভয় পেয়ে যায় ও। ফুক করে নিভিয়ে দেয় মোমটা।

টাকার গাদির উপর অন্ধকারে বসে থাকে মালু। বসে বসে ঘামে। অন্ধকার যেন ওকে দেখছে। দেখছে তন্ন তন্ন করে। দু চোখে সুঁচের তীক্ষ্ণতা ফুটিয়ে সেও ভাসমান আঁধারের মিসকালে দেহটাকে বিঁধে চলেছে। বুকের ভেতর শুনতে পাচ্ছে অন্ধকারের কুমন্ত্রণা। ওর পায়ের নিচে লক্ষ টাকার মর্মর শুকনো পাতার মতো যেন ভেঙে ভেঙে পড়ছে ওর পায়ের চাপে। অন্ধকারের কুমন্ত্রণার কাছে হার মানবে মালু?

মালু হাঁপিয়ে চলে। মালু ঘেমে একসা হয়।

ধ্যাৎ শালা। হারামের টাকা। পাপের টাকা। চোরা বাজারের টাকা। বুঝি অন্ধকারকেই শুনিয়ে শুনিয়ে বলে মালু। উঠে দাঁড়ায়। মোমটা জ্বালায়। বস্তায় বস্তায় কাগজের টাকাগুলো ভরে রাখে। ঠিক যেমনটি ছিল তেমনি সেলাই করে রাখে মুখগুলো।

তারপর মোমটা নিভিয়ে কী এক স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ে মালু। শুয়ে পড়ে সেই ময়লা চাটাইটার উপর। ঘুমিয়ে পড়ে।

ভোরে ঘুম ভেঙে মালু দেখল আর এক তাজ্জব কাণ্ড।

এক শো গ্রাম যেন ভেঙে পড়েছে তালতলির বাজারে। ছেলে বুড়ো মেয়ে পুরুষ। সংসারকে সংসার যেন উপড়ে তুলে এনেছে ওরা। কোথায় চলেছে এত লোক?

ওরা চলেছে পঙ্গপালের মতো। মায়ের কোলে শিশু। মেয়েদের কোলে এবং মাথায় বাসন খোরা হাঁড়ি পাতিল। পুরুষদের কাঁধে কাঁথা বালিশ, মাথায় কোরা ভর্তি দা, কুড়োল, ছেনি, ছোটখাট করাত, যার যা সম্পত্তি। ওদের পরনে জোলার তৈরি শাড়ি, জোলার তৈরি লুঙ্গি অথবা ধূতি। ওদের চেহারা, ওদের পোশাক দেখেই চেনা যায়, ওরা আশেপাশের গ্রামেরই কিষাণ কিষাণী।

কিছুদিন ধরেই দেখছে মালু, ওদের ছোট ছোট দল তালতলির উপর দিয়ে বড় রাস্তায় গিয়ে ওঠে। সে রাস্তা ধরে কোথায় যে যায়, জানে না মালু। যেতে যেতে ওরা খোরা বাড়িয়ে দেয় এক মুঠো খুদ অথবা চালের জন্য। হাত বাড়িয়ে দেয় একটি পয়সার জন্য।

কখনো বা রাতের বেলায় ভাত মেগে বেড়ায় ওরা। ভাতের অভাবে ফেন চায়। মাঝে মাঝে মালুর বয়সী ছেলেরাও দল বেঁধে চলে যায় বড় রাস্তার দিকে। ওদের পিঠে ঝোলান থাকে ওঁড়া-কোদাল। ওরা যায় মেলেট্রির মাটি কাটতে।

কিন্তু আজ একটা দুটো দল নয়। পিঁপড়ের মিছিলের মতো, যেন শেষ নেই ওদের। যেতে যেতে ভিখ মাংছে। : এক খোরা ভাত দেবে? এক মুঠো খুদ দেবে? একটা পয়সা দেবে?

মুখগুলো দেখেই বুঝতে পারে মালু সর্বগ্রাসী ক্ষুধায় পেট ওদের পুড়ছে। তবু চাওয়াটাকে যেন সামান্যের মাত্রায় সীমাবদ্ধ রাখতে বিশেষ চেষ্টা ওদের; এক খোরা ভাত অথবা একটি পয়সা। বেশি কিছু নয়।

মাত্র কয়েকদিন আগে চালের বড় গুদামটাকে ঝেড়েঝুড়ে পরিষ্কার করিয়ে ছিল রামদয়াল। ধূলো বালি শুদ্ধ মালুই সে চালগুলো একটা বস্তায় পুরে ফেলে রেখেছে দোকান ঘরের এক কোণে। বস্তাটা টেনে বের করল মালু। ধূলো বালি ঝেড়েঝুড়ে মণ দেড়েক চাল তো হবেই।

বস্তাটা খুলে এক কোষ করে চাল ওদের বিলোতে লাগে মালু। দেখতে দেখতে ভিড় জমে যায়। ভিড় বেড়ে যায়। হল্লা লেগে যায়। ছুটে আসে রামদয়াল। আমি কী দানছত্র খুলেছি? ব্যাটা আমার দোকানটা কী লুট করাবে আজ? ব্যাটা নেড়ের বাচ্চা, দাঁড়াও আজই তোমায় আমি ঠেঙিয়ে বিদেয় করছি? একে গুঁতো দিয়ে, ওকে ঠেলা মেরে এগিয়ে আসতে আসতে বেহদ চেঁচিয়ে চলে রামদয়াল। কাছে এসে দু হাতে টেনে নেয় বস্তাটা। শূন্য বস্তা। চাল তখন বণ্টন হয়ে গেছে।

খালি বস্তাটা ওদের দেখায় মালু, বলে, আর চাল নেই, যাও তোমরা।

ভিড়টা আস্তে আস্তে গলে যায়।

কটমট চোখে একবার রামদয়ালের দিকে তাকিয়ে বেচাকেনার জায়গাটিতে এসে বসে মালু।

ব্যাপার স্যাপার ভালো দেখাচ্ছে না। দোকান বন্ধ করে দাও। রমেশকে উদ্দেশ্য করে বলল রামদয়াল। তরপর মালুর দিকে একটি অপাঙ্গ দৃষ্টির শাসানি ছুঁড়ে চলে গেল গুদামের দিকে।

ভালই হল। দোকান ছেড়ে ওই পিঁপড়ের সারিতে মিশে গেল মালু। দত্ত দীঘির গা ঘেঁষে ওরা যায় ডানমুখী। মালু উঠে আসে দীঘির পাড়ে। পাড়ের কিনার ঘেঁষে এগিয়ে যায় ভিক্ষুকের মিছিল। বড় দলটা বোধ হয় এতক্ষণে পৌঁছে গেছে ট্রাঙ্ক রোডে। এবার আসছে সব ছোট ছোট দল।

মেয়েগুলোর মাথায় ঘোমটা। জড়সড় ক্লান্ত পা ওদের। কোনোদিন বুঝি এমন করে পথে নাবেনি ওরা। আজ এই প্রথম পথ ভাংতে গিয়ে কেবলই হোঁচট খাচ্ছে। কোথায় চলেছে ওরা? শহরে? কিন্তু সেখানেও তো নাকি শুধু ক্ষুধার হাহাকার!

এ কী? এ কী হয়ে গেল হঠাৎ?

রাস্তার পাশে পাকুড় গাছটার নিচে অনেকক্ষণ থেকেই দাঁড়িয়েছিল একটা লরী। সেই গভীর রাতে দেখা রমজানের মাল বোঝাই লরীগুলোর মতোই তেরপল দিয়ে ঢাকা। আচমকা তেরপলের পর্দা সরিয়ে তিনটি কী চারটে লোক ঝাঁপিয়ে পড়ে নিরন্নের কাফেলার উপর। ছোঁ মেরে তুলে নেয় দুই কিষাণী কন্যা। সঙ্গে সঙ্গেই গর্জন করে ছুট দেয় গাড়িটা।

ভয়ে আতঙ্কে ভেঙে যায় কাফেলার লাইন। কেউ পাশের ঝোপে, কেউ ক্ষেতে ছিটকে পড়ে। কেউবা প্রাণ ভয়ে দৌড় দেয় ক্ষেতের আল ধরে। কে যেন ডুকরে কেঁদে ওঠে। হয়তো ওই কিশোরীদের মা।

হাহাকার উঠে নিরন্নের কাফেলায়।

চকিতে পাড় ছেড়ে দৌড়ে আসে মালু। কিন্তু নিরর্থক। মাল বোঝাই গাড়িটা তখন চলে গেছে অনেক দূর।

৩০.

গুজবের পর গুজব আসছে।

জাপানীরা নাকি বোমা মেরে উড়িয়ে দিয়েছে চট্টগ্রাম। ফেনী শহরেও বোমা পড়েছে।

ট্রাঙ্ক রোডের উপর কে নাকি জাপানীদের দেখে এসেছে স্বচক্ষে। স্বচক্ষের বর্ণনাটাও ছড়িয়ে পড়েছে মুখে মুখে : থ্যাবড়া নাক, ইয়া ইয়া জোয়ান, চোখ এক রকম নেই বললেই চলে। বাচ্চা ছেলেদের ধরে ধরে কাঁচাই চিবিয়ে খায় ওরা।

গিয়ে টিয়েও যে কয়েক ঘর বাসিন্দা পড়েছিল তালতলিতে তারাও পালাচ্ছে। আসলে দু এক ঘর করে রোজই সরে পড়ছিল। নজরে পড়েনি মালুর। আজ ক্লাবে এসেই বুঝল, কেউ আর থাকছে না তালতলিতে।

ভবেশ পণ্ডিতের পাঠশালার পেছনে সেই ঘরটি। সেই ঘর থেকে ছড়িয়ে পড়ত অশোকের গলা, সুরের ঝংকার। সেই ঝংকার গিয়ে পৌঁছাত ওই তেল নুনের

দোকানে। কী আনন্দে নাচতে নাচতে বেরিয়ে আসত মালু!

আজ গান নেই। আনন্দের ডাক নেই। ভবেশ পণ্ডিতের পাঠশালার কাছে এসেও সামান্য একটু টুং টাং আওয়াজ পেল না মালু। তালতলির বাতাস কী আর সুরের ঝংকারে উতলা হবে না কোনোদিন?

ক্লাবের ভেতর পর্যন্ত যেতে হল না মালুকে। দরোজার কাছাকাছি এসেই দেখল মালু, যন্ত্রপাতিগুলো হাতে নিয়ে বেরিয়ে আসছে অশোক। অশোকের পেছনে ওরই দু জন ছাত্র।

ওরা দু জন আর মালু, গত কয়েক দিন এই তিন ছাত্রকে নিয়েই অশোকের গানের স্কুল বসেছিল। আজ ওরাও চলে যাচ্ছে।

মালু, তুইও চল আমাদের সাথে, বলল অশোক।

না। কেমন কর্কশ শোনায় মালুর এক শব্দের উত্তরটা। অশোক যেন চমকে তাকাল ওর দিকে। বলল : ও, তুই বুঝি জাপানীদের ঠেঙ্গাবার জন্য থেকে যাবি? তোর ওই মাস্টার সাহেব যেমন বলে?

উত্তর দেয় না মালু। মাস্টার সাহেবকে নিয়ে কোনো বাঁকা কথা, সে যার কাছে থেকেই আসুক, অসহ্য মালুর পক্ষে।

অশোক আগে আগে। ওরা পিছে পিছে।

রানুও তো চলে যাচ্ছে, বলল অশোক।

রানুদিও যাচ্ছে? বুকের তলা থেকে বেরিয়ে আসা একটা আর্তনাদ বুঝি অতি কষ্টে চেপে রাখল মালু। সবাই চলে গেলেও রানুদি যাবে না, এমন একটা কথা কেন যেন ভেবে রেখেছিল ও।

এমন সুন্দর গলাটা। চর্চা করলে সত্যি সত্যি ওস্তাদ হতে পারতিস তুই। হঠাৎ প্রসঙ্গটা পাল্টিয়ে নিল অশোক।

গানের কথা আসতেই কেমন নরম হয়ে যায় মালু। জড়িয়ে আসে পা জোড়া। গান শিখবি তো কোলকাতায় তোকে আসতেই হবে। এই চোরা বাজারের ডিপোতে চোর চোট্টাদের সাথে থেকে গান শিখবি তুই? পেছন ফিরে মালুর মুখের উপর চোখ রেখে বলল অশোক।

তক্ষুণি যেন মন স্থির করে ফেলে মালু। গানের জন্য কোলকাতা কেন, যে কোনো দোজখে যেতে প্রস্তুত মালু। আর কোলকাতা যাওয়াটা তো অনেক দিনের স্বপ্ন ওর। সেই স্বপ্নটা আবার চাড়া দিয়ে উঠল বুঝি। মুখে কিছু না বলে নীরবেই যেন সম্মতিটা জানিয়ে দেয় মালু।

বুঝি কোনো আসন্ন প্রলয়ের মুখে নিঃশব্দ প্রস্তুতি চলছে রানুদের বাসায়। কাকপক্ষীও টের পায় না এমনিভাবে সেরে ফেলেছে সব বাঁধা সাঁধার কাজ। এখন শুধু যাত্রাটাই বাকী। কেন যে এই গোপনীয়তা বুঝতে পারে না মালু।

অস্বাভাবিক গম্ভীর রানু। মালুকে দেখে চোখের ইশারায় কাছে ডাকল, বলল : এবার পড়ার দিকে মন দিবি। বুঝলি? মাস্টার সাহেব এসেছিলেন, তোর কথাই আলাপ হল।

রানুর কথাটা শেষ হবার জন্য অপেক্ষা করার মতো ধৈর্য নেই মালুর। ও শুধাল : তুমি চলে যাচ্ছ রানুদি?

গম্ভীর মুখটাকে যেন আরো গম্ভীর করে হাসল রানু। বলল : মেয়েরা কী চিরকাল বাপের বাড়ি থাকে রে?

বুঝতে না পেরে রানুর মুখের দিকে প্রশ্নভরা চোখে চেয়ে থাকে মালু। আমরা যাচ্ছি ভাগলপুর, মামার বাসায়। সেখানে আমার বিয়ে হবে। হাঁদারাম কোথাকার! এবার বুঝলি?

বুঝতে পেরেও খুশিতে হাসবে, না দুঃখে কাঁদবে, সেটা বুঝতে না পেরে চুপ মেরে যায় মালু।

লক্ষ্মী ছেলের মতো থাকবি। জ্যাঠ্যা মশায়ের সাথে ঝগড়া করবি না। দুর্ব্যবহার করলে আমাকে লিখবি। কেমন? এক টুকরো কাগজে ঠিকানাটা লিখে মালুর হাতে গুঁজে দেয় রানু, বলে, এক পিঠে অশোকদার, উল্টো পিঠে আমার।

ঠিকানা লেখা কাগজটা পকেটে না পুরে হাতের চেটোয় কচলে চলল মালু।

কিন্তু পড়াশুনা করবি লক্ষ্মী ভাইটি। মালুর মাথাটা কাছে টেনে হাত বুলিয়ে দেয় রানু।

বুঝি এই আদরটুকুর অপেক্ষায়ই ছিল মালুর চোখের জল। বহু দিন পর সেই ছোট বেলার মতোই মালুর চোখ পানিতে ঝাপসা হল।

গভীর রাত।

বড় খাল।

মালুর মনে আছে, এমনি এক রাতে বিদায় দিয়েছিল কসিরকে। আজ বিদায় দিল রানুদের গোটা পরিবারটাকে। তালতলিতে রইল ওদের পরিবারের রামদয়াল আর রমেশ।

নৌকোটা ছাড়ার আগ মুহূর্ত পর্যন্তও বুঝি তৈরি ছিল মালু, আর একবার বলবে অশোক–চলে আয়। অমনি নৌকোর গলুইতে উঠে বসবে মালু। কিন্তু কেউ ওকে ডাকল না, না অশোক, না রানু। রাবু আপা চলে গেছে। রানুদিও চলে গেল। আবাল্য আপন বলে যাদের ভেবে এসেছে এমনি করে তারা সবাই ওকে বর্জন করে চলে গেল। বড় খালের ঝিরঝিরে বাতাস গায়ে মেখে ফেরার পথে কেন যেন এ কথাটাই ভাবল মালু, আর বুকটা ওর ভারি হয়ে এল।

কিন্তু বড় খাল থেকে ফিরে তালতলির বাজারে পা রেখে আবার অশোককেই দেখতে পাবে এমন একটা ভৌতিক কাণ্ড কেমন করে কল্পনা করতে পারে মালু।

সত্যি সত্যি অশোককে দেখল মালু। একটা জীপের ভিতর বসে আছে অশোক। দুপাশে গোরা সেপাই। হয়ত বাজার বলেই জীপের গতিটা শ্লথ। মুখ বাড়িয়ে অশোক বলেছে, এই মালু। এই মালু, আমাকে এরা এ্যারেস্ট করেছে।

কেন?

জানি না। এরা বলছে আমি নাকি রাজ-বিরোধী, জাপানী স্পাই।

কখন ধরল?

এই তো এখুনি। মাঝ গাঙ্গে নৌকোটা ঘেরাও করে তুলে নিয়ে এল আমাকে।

কখন ছাড়বে? জীপের পাশে দৌড়াতে দৌড়াতে শুধাল মালু। কিন্তু জবাব পেল না। জীপটা ততক্ষণে গতি বাড়িয়েছে, শাঁ করে বেরিয়ে গেছে বাজার ছেড়ে ট্রাঙ্ক রোডের দিকে।

৩১-৩৫

রাত কাবার হয়ে দিনটাও চলে গেল। আরও একটা দিন আরও একটা রাত পেরিয়ে গেল।

কিন্তু কোথায় সেই নাক থ্যাবড়া জাপানী। কোথায় জাপানী বোমা?

তাই বলে স্বচক্ষে জাপানী দেখবার জন্য তো আর কেউ অপেক্ষা করবে না! গোটা তালতলি গ্রাম জনশূন্য।

কিন্তু, তালতলির বাজার মানুষের ভিড়ে, বেচাকেনার ধুমে জমজমাট। কত কুলি মজুর কাজ করে চলেছে আশে পাশের রাস্তায়, সামরিক ঘাঁটিতে। কন্ট্রাকটার, ওভারসিয়ার, বিল বাবু, গুদাম বাবু–সাহেব আর বাবুর অন্ত নেই। একটু দূরেই রয়েছে মিলিটারী ছাউনি। চায়ের স্টলগুলো দিনরাত্রি সরগরম। চায়ের পেয়ালা চামুচের টুংটাং, বাংলা হিন্দি ইংরেজি মাদ্রাজি। বিচিত্র বোল-তালতলির হাওয়ায় নতুন সঙ্গীত।

আর দিনরাত শুধু গাড়ির চলাচল। ছোট বড় মাঝারি কত রকমের গাড়ি। ঘর্ঘর গর্জন। পেট্রোলের গন্ধ। ধোঁয়া ধুলো। মাথার উপরে বোমারু বিমানের কর্কশ চিৎকার। এই বুঝি তালতলির নতুন সঙ্গীতের আধুনিক আবহ।

ওই নতুন সড়ক, ওই গাড়ির মিছিল যেন বিশাল পৃথিবীরই একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ এনে পৌঁছে দিয়েছে এই তালতলির বাজারে।

রকমারী ভাষা এসে যেমন কানে বাজে তেমনি চোখে থেমে থাকে মানুষগুলোর বিচিত্র রং ঢং চেহারা নমুনায়। কারো রং সাদা, কদুর বুকের মতো। কারো বা পাকা কলার মতো স্বর্ণাভ। কেউ বা বট ফলের মতো লাল। আর এক দল মিসমিসে কালো, যেন হাড়ির তলা। কেউ বাঁদরমুখো। কেউ শিয়ালমুখো। কেউ বা ছবির মুখের মতোই সুন্দর। কিন্তু এক মুহূর্ত স্থিরতা নেই কারো। ফৌজি কাফেলা, দিন নেই, রাত নেই, চলছে তো চলছেই। ছাউনির পর ছাউনি পড়ছে। উঠে যাচ্ছে সব ছাউনি। আবার বসছে নতুন ছাউনি।

উন্মত্ত, তীব্র এক গতি। সে গতির মুখে বিভ্রান্ত তালতলির হাট। ক্ষুদ্র ডোবাটির মাঝে হঠাৎ যেন সমুদ্র এসে পড়েছে। বদ্ধ জল আজ তরঙ্গ উতরোল। মিঠা পানিতে লেগেছে লোনা স্বাদ। শুধু তালতলি নয়, পূর্ব বঙ্গের বিস্তীর্ণ সীমান্ত অঞ্চল জুড়ে বুঝি এই তরঙ্গের আঘাত, মিঠে পানিতে এই লোনা স্বাদ।

সব কিছু যে তছনছ হল, তার বিনিময়ে এটুকুই বুঝি লাভ। ধ্বংসে সৃষ্টিতে তিক্ততায় মধুরতায় আশ্চর্য যে মানবজাতি, সীমান্ত বাংলা হয়তো জানল না তার বেদনা, কিন্তু দেখল ওদের দুচোখ মেলে। আর তাদের নৃশংসতা তাদের ব্যাধির

ছাপ আপন অঙ্গে তুলে নিল, আপন মুখের অন্ন ওদের হাতে তুলে দিয়ে সারা পৃথিবীর সাথে তার এই প্রথম পরিচয়কে অক্ষয় করে রাখল।

তালতলির হাট তাই আজ বিশ্বের মেলা। সেই বিশ্ব মেলার কয়েকটি মাসেই বাকুলিয়ার মালু যেন ডিঙ্গিয়ে গেল কয়েকটি জীবন একটি শতাব্দী।

এদিকে দুনিয়ার কোলাহল, ওদিকে খাঁ খাঁ করছে স্কুল ঘর। পিটিয়ে পুটিয়ে যে দু চার গণ্ডা ছাত্রকে স্কুলে এনে হাজির করত সেকান্দর মাস্টার তারাও আজ অনুপস্থিত। পিয়নটাও পালিয়েছে। শূন্য স্কুল ঘরটিতে একলাই খুট খুট করছে সেকান্দর মাস্টার। এ ক্লাস সে ক্লাস ঘুর ঘুর করছে। বগলে তার হাজিরা বই।

হেডমাস্টারের ঘরে বসে বুড়ো মিত্তির। গত বিশ বছর ধরেই স্কুলের সেক্রেটারী তিনি। হেডমাস্টার ইস্তেফা দিয়ে চলে যাওয়ার পর ছাত্র শূন্য স্কুলের এই দায়িত্বটাও নিয়মিত নিষ্ঠায় পালন করে চলেছেন। সেকান্দরকে ঘরে ঢুকতে দেখে বললেন : আর কেন সেকান্দর, চল এবার আমরাও কেটে পড়ি।

যেন মিত্তির মশায়েরই জবাবে হাজিরা বইগুলো টেবিলের উপর ছুঁড়ে মারে সেকান্দর মাস্টার। গোঁৎ গোঁৎ করে বেরিয়ে যায়।

সামনেই পড়ে বাকুলিয়ার ট্যান্ডল বাড়ির ছোট ছেলেটি। বছর আটেক বয়স হবে হয়তো। বিনে ফিসে, বিনে মাইনায় ছেলেটাকে সেকান্দর ভর্তি করিয়ে নিয়েছিল স্কুলে। বইপত্রও নিজের পয়সায় কিনে দিয়েছিল মাস্টার। কিন্তু আজ স্কুলে বইগুলো রেখেই ছেলেটা কোথায় যেন পালিয়ে গেছিল।

কোথায় ছিলি সারাদিন? সেকান্দরের আচমকা রূঢ় স্বরে বুঝি কেঁদে দেয় ছেলেটি। মিনমিনিয়ে যা বলল তার অর্থ : রমজানের নতুন ম্যানেজার ওকে ডাকল। ও চলে গেল। ট্রাঙ্ক রোডে যে মেরামত হচ্ছে সেখানে এক চাক দু চাক করে মাটি ফেলল ছেলেটি, দিনের শেষে নগদ একটি টাকা পেল।

এখন বাড়ি যাবে। বইগুলো ফেলে গেছিল। বইয়ের জন্য এসেছে ও। ছেলেটির গালে পটাপট কয়েকটা চড় বসিয়ে দিল সেকান্দর। হেঁটে চলল বাজারের দিকে।

বুঝি এই প্রথম মাস্টার সাহেবের রাগ দেখে হাসি পায় মালুর। সালাম দিয়ে পাশে পাশে চলে মাস্টারের।

বিড় বিড় করে কী যেন বকে চলেছে মাস্টার। শুধু একটি কথাই কানে এল মালুর–শুয়রের বাচ্চা রমজান।

বুঝি চরম প্রতিশোধ নিয়েছে রমজান। দূরে অলক্ষে থেকে ও অবিরাম নির্যাতনের তীর ছুঁড়ে চলেছে। আর পলে পলে সে তীরের বিষে জর্জর সেকান্দর মাস্টার।

দোকানের কাছে এসে থেমে যায় সেকান্দর। দোকানের দিকে মুখ ফেরাতেই দেখে, মালু চলেছে পাশেই।

মিঞা বৌ তোকে আজই একবার যেতে বলেছে। কী নাকি জরুরি দরকার। কথাগুলো বলে আর দাঁড়াল না সেকান্দর। ফড়ফড় শব্দে ছাতাটা মেলে দ্রুত পা চালাল বাকুলিয়ার দিকে।

কম আশ্চর্য হবার কথা নয়। রাবুদের সূত্রে ফেলু মিঞার বৌকে মামী বলেই ডাকত মালু। কিন্তু ওই পর্যন্তই। দুটো কথা বা একটা ফরমাশ কোনোদিন তাঁর কাছ থেকে পেয়েছে মালু, এমন কোনো ঘটনা মনে করতে পারল না মালু। অথচ আজ তাকেই ডেকে পাঠিয়েছে। আকাশ পাতাল ভেবেও এ ডাকের কোনো হেতু খুঁজে পায় না মালু।

৩২.

আ-চষা দখিন ক্ষেত। অভিমানে মাটি যেন গুমরে মরছে। বড় বড় ফাটল পথে বুঝি সে অভিমানেরই বিস্ফোরণ। পায়ের তলায় শক্ত মাটি, ধপ ধপ আওয়াজটা কেন যেন শুকনো হাড়ের কান্নার মতো মনে হয় মালুর। দখিনের ক্ষেতে আবার কবে হেসে উঠবে সবুজ ধানের ঘোড়! যেতে যেতে সে কথাটাই বুঝি ভাবে মালু।

বড় খালের পুলটার কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়তে হয় মালুকে। রাস্তা দিয়ে লম্বা একটি কনভয় চলেছে। সবকিছু ওলট পালট করা এই যুদ্ধ স্বচ্ছতোয়া বড় খালটিকেও রেহাই দেয়নি। তলার মাটি যেন ঘুঁটিয়ে তুলে এনেছে স্রোতের উপর। বড় খালে এমন ঘোলা পাখি কখনো দেখেনি মালু।

.

মিঞা পুকুরের কোণে সেই গাব গাছের তলায় দাঁড়ান মানুষটাকে দূর থেকেও চিনতে কষ্ট হয় না মালুর। পোশাকে একটুও বদলায়নি ফেলু মিঞা, পরনে সেই রঙিন সিল্কের বর্মি লুঙ্গি, গায়ে মলমলের পাঞ্জাবী। বুক পকেটে তেমনি ভাঁজ করা রুমাল। ছড়ির বাঁটের উপর হাত দুটো যেন বিশ্রাম নিচ্ছে।

কিন্তু, অমন একনিষ্ঠ দৃষ্টির ব্যাকুলতায় দখিন ক্ষেতের ফাটল চেরা বুকে কী খুঁজছে ফেলু মিঞা?

সুমুখ দিয়েই পাড়ে উঠে এল মালু। মিঞা যেন নজরই করল না। ততক্ষণে রিক্ততার হাহাকার ভরা দখিন ক্ষেত ছেড়ে ফেলু মিঞার দৃষ্টি কী এক উদাসীনতায় ছড়িয়ে পড়েছে অনেক দূরে, তালতলির তালসারির মাথায় স্তব্ধ হয়ে থাকা দিগ্বলয়ের দিকে।

আলিবর্দির বাংলা বুঝি ফিরে এল না ফেলু মিঞার জীবনে। মোগল পাঠানের রক্ত সেই যে পানসে হয়ে গেছে, শরাবী তেজে গরম হয়ে উঠল না সে রক্ত। শেষ দানেও হেরে গেছে ফেলু মিঞা। বৌর গায়ের শেষ সোনাটিও ছিনিয়ে নিয়ে যে তালুকগুলো পুনরুদ্ধার করেছিল ফেলু মিঞা সে সব তালুক প্রজাহীন, জনহীন কবরখানা। জমিগুলো সমর দফতরের হুকুম-দখলে।

ব্যর্থ ফেলু মিঞা। শস্যহীন ওই দখিন ক্ষেতের মতোই বুঝি ফাটল-চেরা, দীর্ঘশ্বাস ভরা ফেলু মিঞার বুকের ভেতরটা। হয়ত তাই দখিন ক্ষেতের সাথে আজ তার নতুন মিতালী। বুঝি মিঞা-বৌর সেই গয়না বেচা টাকায় ফেঁপে উঠেছে রামদয়ালের কারবার, লাল হয়ে উঠেছে রামদয়াল। ধূর্ত রামদয়ালের কূট বুদ্ধিটা অনেক দেরিতে ধরা পড়ল ফেলু মিঞার চোখে। রমজানের বেইমানীটাও।

দখল করা জমির ক্ষতিপূরণ দিচ্ছে যুদ্ধ-দফতর। এই অঞ্চলের সে সব লেনদেনের মাধ্যম রমজান। এক কানি জমির ক্ষতিপূরণ পেয়ে হয়ত তিন কানি জমির ক্ষতিপূরণের রসিদে টিপসই দিচ্ছে অজ্ঞ কৃষক। এক ঘরের টাকা নিয়ে পাঁচ ঘরের টাকা বুঝে পেয়েছে বলে লিখে দিচ্ছে রমজানের হাতে। তবু কিছু নগদ টাকা তো পাচ্ছে তারা? ভাগ্যিস ছিল রমজান নইলে ওই ফৌজী দফতরের ধারে কাছেও কী ঘেষতে পারত ওরা?

সেই রমজান পুরাতন মুনিবকেও ভোলেনি। ও এসেছিল। কসম খেয়েছিল। অন্যের বেলায় যাই করুক না কেন, জন্মাবধি যার নিমক খেয়েছে তাঁর হক পয়সার এক পয়সাও এধার ওধার করবে না ও। আল্লার বরকতে রুজি তার কম নয়।

চোপরাও বেইমান! টাকার কী আমার কমতি আছে? রেগে গেছিল ফেলু মিঞা, খেদিয়ে দিয়েছিল রমজানকে।

সন্ধ্যা নাবছে আবছায়া। মগরেবের আজান দেবে বলে ওজু করছে হাফেজ সাহেব। মসজিদটার কাছে এসে পেছন ফিরে দেখল মালু। গাব গাছের তলায় নিশ্চল মূর্তির মতো এখনো দাঁড়িয়ে রয়েছে ফেলু মিঞা।

এসেছিস মালু? আয় জলদি দুটো খেয়ে নে। জোয়ারের সময় এল বলে। কোনো কিছু বলবার বুঝবার আগেই মিঞা-বৌ হাত ধরে ওকে নিয়ে এল রসুই ঘরে। পিঁড়িতে বসিয়ে এগিয়ে দিল ভাতের থাল।

দুটো সুটকেশ আর ছোট্ট একটা বিছানা বেঁধে তৈরি মিঞা-বৌ। কোথায় যাবে মিঞা-বৌ? আগামাথা হদিস পায় না মালু। জিজ্ঞেস করতেও কেমন যেন বাধে মালুর।

হাত ধুয়ে মালু বেরিয়ে আসতেই বলল মিঞা-বৌ, চল।

কোথায় চলবে তার নেই কোনো ঠিকানা। তবু সুটকেস দুটো হাতে তুলে নেয় মালু।

সুমুখে মিঞা-বৌ। বগলে তার ছোট বিছানাটা, মাঝখানে মালু। পেছনে মিঞা-বৌর বাঁদী সেই বিশ বছর আগে বিয়ের সময় বাপের বাড়ি থেকে যাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল মিঞা-বৌ। বাঁদীর হাতে পানদান আর খাবার ভর্তি একটি টিফিন ক্যারিয়ার। অন্ধকারের আড়াল নিয়ে বাড়ির পিছনের সুপারী বাগিচার ভেতর দিয়ে বেরিয়ে এল ওরা। আগাগোড়া যেন একটা রহস্য, ওই আবছা আঁধারটার মতোই দুর্ভেদ্য। ওরা কী পালিয়ে যাচ্ছে? ছোট্ট বিছানাটা কিছুতেই মিঞা-বৌর হাতে থাকতে চাইছে না। বার বার খসে পড়ছে, খুলে গেছে চিকন রসির বাঁধনটা। হোক না ওইটুকু বোঝা, পারবে কেন মিঞা-বৌ সামলাতে? জীবনে যে এক ঘটি পানি তুলে আনেনি পুকুর থেকে, টিব কলে দেয়নি একটুখানি চাপ তার পক্ষে একটি কম্বল, একটি বালিশ, একটি চাদরের বোঝা, সে তো বিরাট বোঝা।

আর বুঝি চুপ থাকতে পারে না মালু। লম্বা কদমে এগিয়ে এসে বলল, মামী, আমরা চলেছি কোথায়?

বড় খালে সাম্পান বাঁধা আছে। এর চেয়ে বেশি কিছু বলার দরকার মনে করল না মিঞা বৌ।

দখিনের ক্ষেতে নেবে ওরা পাশাপাশিই চলে। ডান হাতের সুটকেসটা মাটিতে রেখে মালু এক রকম ছোঁ মেরেই মিঞা-বৌর হাত থেকে বিছানাটা নিয়ে নেয় নিজের বগলে। সুটকেসটা হাতে নিয়ে আবার চলতে থাকে। তবু হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে মিঞা-বৌর। স্যান্ডেলের স্ট্রাপটা ছিঁড়ে গেছে। বাঁদীর হাতে উঠেছে স্যান্ডেল জোড়া। এ্যাবড়ো থ্যাবড়ো ফাটা মাটির কামড়ে বুঝি ক্ষত বিক্ষত শরীফজাদির নরম পা। বার বার হোঁচট খেয়ে টলে পড়ছে। কী এক দোজখের আগুন যেন পিছু তাড়া

করেছে, তাই মরিয়া হয়ে ছুটছে অন্তঃপুরবাসিনী হালিমা বিবি। মরিয়া হয়ে ছুটছে ওরা অন্ধকারে।

মালুর চোখে এ যেন একটা অবিশ্বাস্য, অভাবনীয় দৃশ্য। মিঞা খানদানের কোনো বৌ পাল্কী ছাড়া আন্দরমহলের বাইরে পা দিয়েছে? সেই মিঞা বাড়িরই মিঞা-বৌ পালাচ্ছে? কথাটা ভাবতে গিয়েও মালুর গাটা কাঁটা দিয়ে যায়।

চেনা মাঝি, মিঞাদেরই রাইয়ত। ওরা উঠতেই ছেড়ে দিল সাম্পান। ছইয়ের ভেতর বিছানা পেতে দিল বাঁদী। শুয়ে পড়ল মিঞা-বৌ।

গলুইয়ের উপর বসে জলো হাওয়ার পরশ নেয় মালু।

কালো ঢেউয়ের বুকে দোল খেয়ে খেয়ে সাম্পান চলে। ছলাৎ ছলাৎ সাম্পানের পিঠে আছড়ে পড়া পানি লাফিয়ে ওঠে। কণা কণা ভেঙে পড়ে মালুর গায়ে।

ছপ ছপ ঝপ ঝপ বৈঠা পড়ছে আর সাম্পানের সেই পরিচিত ধ্বনির তরঙ্গটা মিষ্টি এক ডাকের মতো ছড়িয়ে পড়ছে দূর দূরান্তে-ক্যাককুর ক্যাককুর।

নৌকার চেয়ে সাম্পানটা অনেক সুন্দর, অনেক আরামের, যেন আজই প্রথম মনে পড়ল মালুর। স্বচ্ছন্দ মরালগতি সাম্পানের। মনোরম তার ভঙ্গি। লগির উটকো ঠেলায় নৌকোর মতো কেঁপে দুলে টক্কর খেয়ে চলে না। তর তর করে চলে সাম্পান গর্বিত গ্রীবা রাজহংসের মতো। উঠে বসেছে মিঞা-বৌ। ছইয়ের ভেতর থেকে মুখটা বাড়িয়ে দিয়েছে।

মামী, ফেলু মামার কষ্ট হবে না? কে তার যত্ন আত্তি করবে? উনি তো বড় আয়েশী মানুষ। হঠাৎ শুধাল মালু।

তারা-জ্বলা রাতের ফিকে আঁধারে যেন চকমকির মতো দপ করে জ্বলে উঠল মিঞা বৌ। এক রাশ কথা যেন আঁচ পাওয়া বারুদের মতোই উঠে এল তার মুখ দিয়ে।

ফেলু মিঞার জন্য আবার ভাবনা? সে কী মানুষ? জানোয়ার। নইলে অমন করে কষ্ট দেয় বৌকে? যুদ্ধের ডামাডোল লাগতেই ছেলেমেয়েগুলোকে মিঞা-বৌ পাঠিয়ে দিয়েছিল ওদের মামার বাড়ি। নইলে ওগুলো হয় মানুষখেকোদের হাতে পড়ত, নয়ত উপপাসে মরত। মিঞা-বৌ অনেক সয়েছে, এখন মরতে রাজি নয়। শ্বশুর বাড়ি থেকে কত তাড়া এসেছে–যুদ্ধের হট্টগোল ছেড়ে নিরাপদে এসে থাক। কিন্তু শ্বশুর বাড়ি উঠে আসতে সায় দেয় না ফেলু মিঞার খানদানী রক্ত।

খেসারতের টাকাটা এনে নিরাপদ অঞ্চলে একটা বাড়ি, তাও করবে না ফেলু মিঞা। ভাইদের কাছেও যাবে না। সবই তার জিদ। বেশ পড়ে থাকুক ফেলু মিঞা তার জিদ নিয়ে। মিঞাবৌ চলল কুমিল্লা, তার বাপের বাড়ি। ছেলেগুলোকে তো মানুষ করতে হবে। দালানের খসে পড়া চুনবালি খেয়ে অনায়াসেই বাঁচতে পারবে ফেলু মিঞা। এসব লোক কী কখনো মরে? মরে না। বৌদের কষ্ট দেবার জন্যই বেঁচে থাকে এরা।

অন্তঃপুরের বধূ যেন খুঁজে পেয়েছে তার মুখ। সে মুখে লাগাম নেই আজ। কিন্তু নিজের দিকে তাকিয়ে সবচেয়ে বেশি অবাক মানে মালু। গাব গাছের তলায় দাঁড়িয়ে থাকা সেই নিশ্চল মূর্তিটাই কখন টেনে নিয়েছে ওর মনের সবটুকু সহানুভূতি। মনের পট থেকে মালু কিছুতেই মুছে ফেলতে পারে না ফেলু মিঞার সেই উদাস চোখের সবখোয়ানো দৃষ্টিটা।

সাম্পান চলে মরাল গতি। ক্যাঁককুর ক্যাঁককুর, তার গানের ডাকে ভেঙে যায় রাতের ঘুম। খালে পানির বুকে তারার চিকিমিকি।

৩৩.

কুমিল্লা স্টেশনের টিকেট ঘরটার সুমুখে দাঁড়িয়ে কেন যেন মনে হল মালুর কলকাতার বড় কাছাকাছি এসে পড়েছে ও। কলকাতাটা যেন কুমিল্লার পাশেই। এত কাছাকাছি এসেও কলকাতা যাবে না মালু?

তক্ষুণি মনটা বেঁধে ফেলল মালু। গান নেই, রানুদিরা নেই, তালতলিতে ফিরে যাবার অর্থ হয় না কোনো। তা ছাড়া কলকাতায় তো ওকে যেতেই হবে গানের জন্য। যেন এক ঝলক রোমাঞ্চিত বাতাস নেচে যায় মালুকে ঘিরে।

কিন্তু টিকেটের দাম শুনেই বুকটা ওর পানি হয়ে যায়। কুল্লে তিনটি টাকা মাত্র সম্বল। বাপের বাড়িতে পেট ভরিয়ে খাইয়ে ওকে বিদায় দেবার সময় টাকা তিনটি ওর হাতে গুঁজে দিয়েছিল মিঞা-বৌ। মালুর ফিরে যাবার ভাড়া আর কিছু নাশতা পানির পয়সা, এ টাকায় তো আর কলকাতায় যাওয়া যাবে না?

একটার পর একটা ট্রেন আসছে, যাচ্ছে। সৈন্য বোঝাই ট্রেন। ক্বচিৎ যাত্রীবাহী গাড়ি। স্টেশনের ভিড় থেকে একটু আলাদা হয়ে নানা কথা ভাবে মালু আর পস্তায়।

দুটি বছর কাজ করল রামদয়ালের দোকানে। মাসে বড়জোর তিনটে টাকা মালু খরচ করেছে। বাকী সব টাকাই তো ও জমা রেখেছে রামদয়ালের তহবিলে।

আফসোস হয় মালুর, অন্তত পাঁচটি টাকাও যদি আপদ-বিপদের জন্য-রাখত সঙ্গে, তা হলে আজ এমন ভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পস্তাতে হত না।

আবার একটা ট্রেন এল। ভক ভক করে ধোঁয়া ছাড়ল। একটা ঝাঁকুনি খেয়ে থেমে গেল। গাড়িটার শেষের দিকে গদী আটা রং করা সুন্দর সুন্দর কামরা।

সেই কামরার একটি দরজা খুলে গেল। মালু দেখল জমকালো পোশাক পরা একটি মেয়ে প্রসাধনীর বিচিত্র চটকোলা মুখ বাড়িয়ে হাসছে। হাত ইশারায় কাকে যেন ডাকছে ও। মেয়েটির পাশে একটি লাল মুখ সাহেব। মালুর মনে হল ওকেই যেন ডাকছে মেয়েটি। বুঝি ভুলই করছে মালু নিশ্চয়ই আশ-পাশের অন্য কেউ মেয়েটির ইশারার লক্ষ্য। সামনে পেছনে ডানে বামে চেয়ে দেখল মালু। পেছনে খাকি পোশাক একটি লাল মুখ কোমরে হাত রেখে পাইপ টানছে। মালু নিশ্চিন্ত হল ওই সাহেবটাকেই ডাকছে মেয়েটি।

মেয়েটি নেবে এল। মালুর সামনাসামনি এসে দাঁড়িয়ে পড়ল।

হুরমতি?

এই জনারণ্যে বাঘ পড়লেও বুঝি এতটা চমকে উঠত না মালু।

ঠোঁটে রং লেপেছে হুরমতি। কাউফলের কোয়ার মতো রসমেদুর টুক-টুকে লাল ঠোঁট। চোখের নিচে গালের টোলে হাল্কা পোঁচের গোলাপী আভা। নিটোল দেহের উদ্ধত ভাঁজে সিল্কের পাতলা শাড়ির বাঁধনটা যেন নিলাজ আমন্ত্রণ। কাঁধের কিনার ঘেঁষে পিঠ ছুঁয়ে আঁচলটা ওর নেবে এসেছে মাটি অবধি। আঁচলের লতাপাতা আঁকা প্রান্তটা লুটোচ্ছে ধুলোয়। জুতো পরেছে হুরমতি। গোড়ালি তার এক বিঘতেরও উঁচু। অমন জুতো মালু দেখেনি আগে। সব মিলিয়ে বাকুলিয়ার হুরমতি সুন্দরী আজ বিশ্বের অপরূপা।

কিরে ভূত দেখলি নাকি? শুধাল হুরমতি।

ভূত দেখলেও কী আর অমন তাজ্জব বনত মালু?

বাহ। কোঁচা ঝুলিয়ে দিব্যি বাবু সেজে চলেছিস কই? মালুকে নিরুত্তর দেখে আবারও শুধায় হুরমতি। মালুকে কথা বলানোর জন্যই সুন্দর হাতের দুটো আঙ্গুল দিয়ে মালুর চিবুকটা ছুঁয়ে দেয় হুরমতি। স্টেশন ভর্তি লোকের সুমুখে এ কী কাণ্ড হুরমতির। কলকাতা যাচ্ছি, কোনো রকমে উচ্চারণ করে মালু।

ও, সে জন্যই এমন বাবুর মতো সেজেছিস? কই মালপত্র কোথায় তোর? হঠাৎ হুইসেল বাজে। অস্থির হয়ে উঠে গোরাটা। গাড়ি থেকে দু কদম এগিয়ে এসে কফ জমা গলায় চেঁচিয়ে চলে ও–হুরমাট হুরমাট।

চট করে হাতের ব্যাগটা খুলে ফেলল হুরমতি। একখানি দশ টাকার নোট মালুর হাতে গুঁজে দিয়ে বলল : যাচ্ছিস বিদেশে, সঙ্গে রাখ, কাজে লাগবে। সাহেবটার হাত ধরে গাড়িতে উঠে যায় হুরমতি। উঠতে উঠতে বলে : রাবু আপা আরিফা আপাকে সালাম দিবি। খালাম্মাকে কদমবুচি। তুই ভালো থাকবি। বাকী কথাগুলো চাপা পড়ে যায় রেল গাড়ির চাকার নিচে।

চলতি গাড়ির জানালা দিয়ে মুখখানি বাড়িয়ে রাখল হুরমতি। ছলছলিয়ে উঠল ওর চোখ জোড়া। দু ফোঁটা পানি ঝরে পড়ল। বাতাসের গায়ে মিলিয়ে গেল।

চমকে উঠে নিজেকেই যেন শুধাল মালু : জল কেন হুরমতির চোখে?

৩৪.

নে ধর, বন্ধুর নায়ে নীল বাদাম।

মালু ধরে এবং গেয়ে চলে। গাইতে গাইতে এক সময় শেষ লাইনেও এসে পড়ে।

অশোক ততক্ষণে তবলার গায়ে হাতুড়ি পিটতে লেগেছে। হঠাৎ তবলা ছেড়ে বেহালার ছড়টা গভীর মনোযোগে নিরীক্ষণ করছে। ধর বলে যে গানটা ধরিয়ে দিয়েছে মালুকে সেদিকে খেয়ালই নেই তার।

এমনই স্বভাব অশোকের। ফড়িংয়ের মতো লাফিয়ে চলা। নির্দিষ্ট পেশা নেই তার। নেশাও নেই। গান বাজনা নিয়ে মেতেছে তো মেতেই রইল। কিন্তু সে আর কদ্দিন। বড়জোর ছয় মাস। তারপর হয়ত লেগে গেল, দোকানের কাজে। দুপুরুষের পারিবারিক ব্যবসা। মাঝে মাঝে হাজিরা দিলেই চলে। কিন্তু না, অশোক যখন মেতেছে তখন দিন নেই রাত নেই শুধু দোকান আর দোকান। ভূতের মতো খাটবে। সবাইকে তটস্থ করে ছাড়বে। তারপর যেই অশোক সেই অশোক। দোকানের ত্রিসীমানায় কেউ দেখবে না ওকে, দেখবে হয়ত কোনো স্বদেশি মিছিলে বজ্রমুষ্টি উঁচিয়ে স্লোগান হাঁকছে।

হঠাৎ একদিন হয়ত হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল অশোক। বেঁধে নিল ছোট-খাট একটা বোঁচকা। চাবিটা মালুর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলল : ওই দেরাজে টাকা আছে। আমি চললাম।

অশোক চলে গেল নবদ্বীপ অথবা কৈম্বাটোরে। এমনি করেই চলছে। বছর ঘুরে বছর আসে। আবার বছর ঘুরে যায়।

কিন্তু এ রকম উড়নচণ্ডী লোকের সাথে কদিন থাকবে মালু? কেমন করে থাকবে? একটু থিতি নেই, না মনে, না কাজে। যেন আহলাদী খোকা নতুন নতুন খেলনা, নতুন জামা কাপড়, দেখলেই অমনি পুরানোটা ফেলে ছুটল নতুনটার পেছনে।

অভাব যার নেই আর নেই বড় কিছুর তাগাদা, এ বিলাস তাকেই পোষায়। কিন্তু মালু তো হাঁপিয়ে উঠেছে অশোকের মেসে।

শিয়ালদা থেকে নেবে বৌবাজার স্ট্রীটের মুখস্থ করা ঠিকানাটা খুঁজে বার করতে বেগ পায়নি মালু। সন্দেহ ছিল, ভয় ছিল, না জানি ওকে কী ভাবে নেবে অশোক।

কী রে এ্যাদ্দিন পরে তোর কলকাতা আসার কথাটা খেয়াল হল বুঝি। মালুর সমস্ত আশঙ্কা অমূলক করে ওর কাঁধে হাত রেখেছিল অশোক। সিঁড়ির গোড়ায় সেজেগুঁজে দাঁড়িয়েছিল অশোক। বেরুচ্ছিল কোথায়। কিছু খুচরো পয়সা আর ঘরের চাবিটা মালুর হাতে দিয়ে বলেছিল : বোমার ডরে চাকর বামুন ভেগেছে। নিচের হোটেলেই খেয়ে নিবি। পাশের ঘর দুটো আমার। বই আছে, ভালো লাগলে পড়বি, নতুবা ঘুমোবি।

মাঝ সিঁড়ি থেকেই আবার লম্বা লম্বা লাফে উঠে আসে অশোক। ঘরে ঢুকে দরজায় খিল দেয়। দেয়ালেরও কান আছে, বুঝি সে কথাটা মনে করেই মালুর মুখের কাছে মুখ এনে বলল : মেসটা কিন্তু হিন্দু মেস। তোকে হিন্দু পরিচয়ে থাকতে হবে। বুঝলি? ড্যাব ড্যাবা চোখ করে মালু। বাকুলিয়া গ্রামের সৈয়দ বাড়ির মুনশীজীর ছেলে আবদুল মালেক ওরফে মালু, কে না চেনে ওকে। এ কী বাহাত্তুরে কথা, কলকাতা শহরে এসে ওকে হিন্দু সাজতে হবে?

কয়েকটা বাজে লোক আছে এখানে। গোঁড়া আর মুসলিম বিদ্বেষী তাই। ব্যাপারটা মালুকে আর একটু স্পষ্ট করে সমঝিয়ে দিল অশোক।

আশ্চর্য হয়েও ব্যাপারটায় একটা কৌতুকের গন্ধ পায় মালু। অভিনয় করতে কখনো খারাপ লাগে না ওর। ও বলল, বেশ তো।

জাত? শুধাল অশোক।

জাত বৈদ্য। নাম মলিন কুমার দাশগুপ্ত ওরফে মালু। পিতা মৃত শ্রীবিজন কুমার দাশগুপ্ত। গড় গড় করে বলে যায় মালু। যেন আগে থেকেই ঠিক করা ছিল।

বেশ বেশ। মালুর উপস্থিত বুদ্ধিতে খুশি হয়ে সিঁড়ি ধরে নেবে গেছিল অশোক।

প্রথম ঘরটা অশোকের শোবার ঘর। মামুলি বিছানা। মামুলি কয়েকখানি কাউচ। কিন্তু দ্বিতীয় ঘরে ঢুকে তাজ্জব বনেছিল মালু। সেই তালতলির ক্লাবের মতো দুনিয়ার যত বাদ্যযন্ত্র, কোনোটার গায়ে গিলাপ, কোনোটা নাঙ্গা গায়ে মসৃণ সুন্দর। সতরঞ্চি পাতা মেঝের অর্ধেকটাই ওদের দখলে। আর দেয়ালের গায়ে গায়ে কাঁচ ঢাকা তাক। তাকে তাকে বই। অজস্র বই। এত বই এক সাথে কখনো দেখেনি মালু।

ওই ঘরটায় থাকবি তুই, বলেছিল অশোক।

ওই ঘরে? ওই বাদ্যযন্ত্রগুলোর সাথে একই সতরঞ্চিতে? মালু বুঝি বিশ্বাস করতে পারছিল না। কিন্তু ভেতরে ভেতরে খুশি ওর ধরছিল না। যখন খুশি তুলে নাও একটি যন্ত্র। বুলিয়ে দাও হৃদয় নিঙড়ান একটি স্পর্শ। ওরা কথা কয়ে উঠবে। তোমার অব্যক্ত যত কথা নানা সুরে নানা ঝংকারে জানিয়ে দেবে মানুষের পৃথিবীটাকে। তোমার মনের কান্নায় কেঁদে উঠবে ওরা। তোমার খুশির ছোঁয়ায় নেচে উঠবে ওরা। অথবা টেনে নাও হারমোনিয়ামটা। আপন মনে গান ধর।

নাঃ হারমোনিয়ামটা এবার ছুঁবেই না মালু। প্রথম এই যন্ত্রটার প্রতি কেমন একটা বিতৃষ্ণা ছিল মালুর। অথচ অশোক, রানু, তালতলির ছেলে-মেয়েরা ওই যন্ত্র না হলে নাকি গাইতেই পারে না ওরা। আর ওদের দেখা-দেখি তালতলির দু বছরে মালুরও কেমন একটা অভ্যাস হয়ে গেছে, গানের সুর ভাঁজতে হলেই হারমোনিয়ামটা টেনে নেয় ও। এবার সেই বদ অভ্যাসটা কাটিয়ে উঠবে, মনে মনে সেদিন ঠিক করেছিল মালু।

আর ওই বইগুলো? সেও এক বিস্ময়। তুমি শুয়ে থাকবে, অথবা বসে, চারিদিকে তোমাকে ঘিরে বই আর বই। অভিজ্ঞতাটা কেমন, প্রত্যক্ষভাবে জানবার জন্য অধীর হয়েছিল মালু। ওই বইয়ের জগৎটাও দুর্নিবার আকর্ষণে টেনে নিয়েছিল মালুকে।

সেই চেনা জীবন। বড় খালের ধারে ধারে আবাল্য-পরিচিত দুনিয়াটা অকস্মাৎ সেই চেনা জানার দুনিয়াটাকে পেছনে ফেলে মালু যেন নতুন জগতে ঠাঁই পেল। এখানে ক্রুরতা নেই। নিষ্ঠুরতা নেই। এখানে যুদ্ধ নেই। এখানে রমজান নেই, রামদয়াল নেই। এখানে ভালো লাগার জনদের স্মৃতির ছোঁয়ায় মন আর্দ্র হয় না, অকারণে কান্না পায় না। এখানে রাবু নেই, রানু নেই। এখানে শুধু গান, এখানে

শুধু সুর। এখানে অনেক বই। আর মালু স্বয়ং। এ জগৎটা সম্পূর্ণ ভাবেই ওর আপনার। এ জগতের সে-ই একমাত্র অধীশ্বর।

মধুর এক অস্থিরতা, মিষ্টি এক উত্তেজনা। প্রথম রাতটা তো ভালো করে ঘুমোতেই পারেনি মালু।

যুদ্ধের বাকী বছর গুলো এ ঘরটাতেই কেটে গেল মালুর।

গানের আনন্দে, বাদ্যের বোলে, জাপানী বোমার ভয়াক্রান্ত কোলকাতার অন্ধকারে। আর সাধ্যমতো বই পড়ে। স্কুলে পড়া বিদ্যার পরিধিটাকে নিজের চেষ্টায় যতদূর সম্ভব বাড়িয়ে নিয়ে।

কিন্তু আজ? ওই ঘরের রুদ্ধ হাওয়ায় মালুর যেন শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। মনের ভিতর কী যেন গুমরে মরছে সারাক্ষণ। কী এক যন্ত্রণা ওর বুকের ভেতর বাসা বেঁধে অস্থির করে তুলেছে ওকে! কোথাও ছুটে যেতে চায় মালু। কিন্তু কোথায়? সে তো জানা নেই ওর।

এই মেসে আসার কয়েক মাস পরই অশোকের রান্নার দায়িত্বটা নিজের হাতে তুলে নিয়েছিল মালু।

ভীষণ আপত্তি করেছিল অশোক।

মালু বলেছিল, হাতে পায়ে একটু মেহেন্নত না করলে শরীরটা আমার বিশ্রী লাগে অশোকদা। তা ছাড়া আপনিই বা হোটেলে খাবেন কেন?

আসলে শরীরের চেয়ে মনটাই বুঝি ওর বিশ্রী লাগছিল বিনা শ্রমে অন্যের ভাত গিলতে।

বুঝেছি। কিছু করে খেতে চাস তুই। বেশ তো। হেসেছিল অশোক। একটি একটি করে ঘরের সবগুলো কাজই মালুর হাতে এসে পড়েছিল। ঘর ঝাড়া, ঘর মোছা। বাজার করা, রান্না করা। লন্ড্রীর হিসেব রাখা, জিনিসপত্র জামা কাপড় গুছিয়ে রাখা।

তুই তো দেখি ছোটখাট একটা সংসার গড়ে তুললিরে। খুশির সুরেই বলতো অশোক।

এ সব কাজ করেও অঢেল সময় থাকতো মালুর হাতে। সে সময়টা গান বাজনায় আর বই পড়ে কেটে যেত।

মাঝে মাঝে বন্ধু বান্ধব নিয়ে আসর বসাতে অশোক। গানের চেয়ে হয়তো হৈ-চৈ টাই হত বেশি। কিন্তু কখনো কখনো রীতিমতো ওস্তাদ গাইয়ে জুটে যেত। সে সব দিন অদ্ভুত ভালো লাগতো মালুর।

এর মাঝে বার তিন উধাও হয়েছিল অশোক। একবার এর্নাকুলামে। একবার সিকিমে। আর একবার উদয়পুরে। চার ছয় মাস করে একেবারে লাপাত্তা হয়ে থাকতো অশোক। মালু তখন নিজেই রাজা।

সবচেয়ে বিপদে পড়তো মালু বইয়ের তাকগুলোর সুমুখে দাঁড়িয়ে। কাঁচ রুদ্ধ বইয়ের জগৎটা যেন সারাক্ষণ হাতছানি দিয়ে ডাকতো ওকে। ওর মনে পড়ে যেত স্কুল দিনের কথা। কেন যে পড়াটা হল না ওর ভাবতে গিয়ে বদ নসিবটাকেই দোষতে হত ওর। কিন্তু নসিবের উপর সব দোষ চাপিয়ে মনটা মালুর স্বস্তি পেত না।

মনে পড়তো মৃতা মায়ের অভিসম্পাত। আলেমের ঘরেই জালেমের পয়দাস সেই প্রবাদ বচনটির উদ্ধৃতি দিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন মা, পড়াশোনা হবে না মালুর। আশ্চর্য! মায়ের অভিসম্পাতটাই যেন খেটে গেল। মূর্খই রয়ে গেল মালু।

দুরু দুরু কাঁপত মালুর বুকটা। ভীরু ভীরু হাতে কাঁচটা সরিয়ে একটি কী দুটি বই বের করে নিত ও। কত রকমারি কিতাব। গল্প উপন্যাস ইতিহাস। ইংরেজি বাংলা। অনেক জায়গা বুঝত না মালু। বইয়ের মেলার মধ্যে বাস করে না-পড়াটা কেমন অপরাধ বলে মনে হত ওর।

গান বাজনা আর রান্না। তার সাথে বই পড়াটাও কেমন যেন ভালো লেগে গেল মালুর।

প্রায় জনশূন্য কলকাতা। ফাঁকা ফাঁকা রাস্তায় মিলিটারী কনভয়, সৈনিকের কুচকাওয়াজ, সামরিক গাড়িগুলোর কানফাটা গর্জন। রাতের আঁধার চিরে সাইরেনের কর্কশ চিৎকার।

পুস্তক আর গানের দেয়াল ফুঁড়ে এ সব চিৎকার পৌঁছত না মালুর ঘরে। ও যেন এক গৃহাবদ্ধ সাধনাচারী। পৃথিবীর কোলাহল বৃথাই দেয়ালে আছড়ে পড়ত। উল্টো আঘাত খেয়ে ফিরে যেত।

কিন্তু, এ কী স্বভাব অশোকের। বই কিনেছে, এখনো কেনে, কিন্তু, ভুলেও কোনোদিন ছোঁয় না সে বই।

শুধু সুর কেন, সঙ্গীত কেন–যা কিছু বড় আর মহৎ, সবই দীর্ঘ সাধনার ধন। তনুমন একসাথে করে তোকে গলা সাধতে হবে, দিনের পর দিন বছরের পর বছর। ভুলে যেতে হবে অন্য সব কিছু ডুবে যেতে হবে সঙ্গীতের রাজ্যে।

আজো মালুর কানে রিন রিন করে বাজে অশোকের উপদেশগুলো। অক্ষরে অক্ষরে সে উপদেশ পালন করে আসছে মালু। কিন্তু, এমন চমৎকার উপদেশটা নিজের জীবনে কেন কার্যকরী করে না অশোকদা? অথচ কী সুন্দর তার গলা, কত গভীর তার সুর জ্ঞান।

একান্ত বেয়াদবি মনে করেই প্রশ্নটা অশোককে কখনো শুধায়নি মালু। আজ আর শুধাবার কোনো প্রয়োজন নেই। কেননা এই খামখেয়ালী মানুষটির অদৃশ্য বন্ধন ছিঁড়ে ও নিজেই আজ ছুটে যাবার ব্যাকুলতায় অস্থির।

৩৫.

যুদ্ধ থেমে গেছে। বিশ্রী বাফেল ওয়ালগুলো ভাঙা শুরু হয়ে গেছে। ধীরে ধীরে উঠে যাচ্ছে আলোর ঢাকনি। আবার আলো ঝলমল লোকারণ্য এই মহানগরী।

সকালভর এতটুকু ফুরসুত পায়নি মালু। সূর্য উঠবার সাথে সাথেই বাবুদের চিড়ে-দই খাইয়ে ছুটেছে বাজারে। বাজার সেরে এসে দেখে, যে হাঁড়িটায় ডাল চড়িয়ে গেছিল সেটা ধুঁয়ো উগরোচ্ছে।

বেরুবার সময় জ্বলন্ত কয়লার উপর কিছু কয়লাগুঁড়া ছিটিয়ে দিতে ভুলে গেছিল মালু। গনগনে আগুনে ডালগুলো সব পুড়ে একটা কালো পাতের মতো হাঁড়ির তলায় চেপ্টে রয়েছে। ধোঁয়ার কুণ্ডলী সরিয়ে চোখ মুখ ডলতে ডলতে এক কাণ্ডই করে বসল মালু। সাত তাড়াতাড়ি খালি হাতেই পাতিলের কানিটা তুলে ধরে ও। ধপ করে পড়ে যায় পাতিলটা। ছাঁত করে ওঠে আঙ্গুলের চামড়া। চড় চড় করে দুহাতের দশটা আঙ্গুলের চামড়া যেন উঠে এল। সে অবস্থাতেই তরকারি কূটে বাটনা বাটতে লেগে যায় মালু। ওদিকে পোড়া গন্ধে নাক পুড়িয়ে ক্রুদ্ধ মেস বাসীরা বাক্যবাণ ছুঁড়তে লেগেছে। কবে থেকে বলছি বিদেয় করে দাও ছোঁড়াটাকে। অতিষ্ঠ হয়ে উঠলাম ওর জ্বালায়। তা অশোক কী আর কানে তোলে? যতীন বাবুর গলাটাই সবাইকে ছাড়িয়ে যায়।

গর গর করে কেঁপে যায় মালুর তেঁতে উঠা শরীর। ভারী বয়ে গেছে। সে কী রাঁধুনী, না কী বাটনা বাটতে এসেছে এত দূরের কলকাতায়!

যতীন বাবু, অবনী বাবু, ওরা পাঁচজন। সেই প্রথম এসেই এই মেসে ওদের দেখেছিল মালু। হোটেলেই খেত ওরা। কিন্তু কেমন করে যেন ওরা ভজিয়ে ভুজিয়ে ওরই সাথে খাবার ব্যবস্থা করেছিল। মালুর মতামতটা জিজ্ঞেস করেনি অশোক। তবু খুশি হয়েই তো ওদের পাকশাক দিন ধরে করে আসছে মালু।

মাইনের কথা অবশ্য ওরা তুলেছিল। মালুই বলেছিল দরকার নেই, যা দেবার অশোকদাই তো দেয় আমায়।

কিন্তু, ওই যে কথায় বলে বসতে দিলে শুতে চায়। তাই হয়েছে যতীন বাবুদের অবস্থাটা। যুদ্ধের সময় কোথায় ছিল ওই মেজাজ? দাদা ভাই পিঠ চাপড়ানি, মালুকে তখন কত খাতির, কত তোয়াজ। সেই দুর্দিনের উপকারটা আজ বেমালুম ভুলে গেছে ওরা।

শালা বেইমান আর বলে কাকে! আপন মনেই বিড় বিড় করে মালু। পোড়া আঙ্গুলগুলো জ্বলছে। কিছু ন্যাকড়া কুড়িয়ে আঙ্গুলগুলো প্যাঁচিয়ে নিল মালু।

খেতে বসে তেলে বেগুনে হল যতীন বাবু। এ্যাঁ ইলিশ মাছে পেঁয়াজ? বাবার জন্মে কেউ শুনেছে, না দেখেছে? ডাল কই? র‍্যাশনের এই কটকটে চালের ভাত ডাল ছাড়া গেলা যায়?

মনে মনে হেসে বুঝি কুটি পাটি খায় মালু। আঙ্গুল দিয়ে অবাধ্য ঠোঁট দুটোকে চেপে ধরে ও। বাছাধন, এতটি বছর যে ইলিশে পেঁয়াজ খেলে সে কী বোমার ভয়েই লক্ষ করনি এ্যাদ্দিন?

ইস্, দেখ শালার কাণ্ড। ঘ্যাট রেঁধেছে না ওর মুণ্ড। ডাঁটাগুলো একেবারেই কাঁচা, কচ কচ করছে। কুমড়োগুলোও যদি সেদ্ধ হত–ওহে গাঙ্গুলী দেখতে একটা ভালো চাকর। এতবড় যুদ্ধের ফাঁড়াটা কেটে গেল এবার দেখছি এ ব্যাটার জুলুমেই অক্কা পেতে হবে। না খেয়ে উঠে যায় যতীন বাবু। কেমন জব্দ। কী এক নির্দয় খুশিতে পোড়া আঙ্গুলের জ্বালাটাও তখনকার মতো ভুলে যায় মালু।

আজকের মধ্যেই ঠেঙ্গিয়ে বের করছি তোকে। কোঁচাটা গুছিয়ে অফিসের পথে রাস্তার দিকে ছুটতে ছুটতে জানিয়ে যায় যতীন বাবু।

হুঁ। খুব জানা আছে মালুর। ওই লম্ফঝম্ফই সার। আশি টাকার কেরানী বিনে মাইনের চাকরের হাতে কাঁচা কচুও গিলতে পারে। দিনে অশোকের ফেরার কথা ছিল না। কিন্তু রাতেও ফিরল না অশোক। অনেকক্ষণ খাবার পাহারা দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল মালু।

অশোক ফিরল পরদিন সকালে, যখন রোববারের কলতলায় কেরানী বাবুদের কাপড় কাঁচার ধুম লেগেছে। সঙ্গে ওর গণ্ডা দেড়েক বন্ধু। ওদের নিয়ে বুঝি আসর বসবে আজ।

ওদের চা দিয়েই বাজারে চলে গেল মালু।

বাজার থেকে ফিরে আবার চায়ের ফরমাশ পেল মালু।

আসর ওদের গুলজার। ওরা শিক্ষানবিস। তাই কোনো শৃঙ্খলার বাঁধাধরা নিয়ম নেই। তবলা সারেঙ্গী তানপুরা, যার যেটা পছন্দ কোলে নিয়ে বসে গেছে। মহড়া দিচ্ছে সদ্য শোনা কোনো যন্ত্র সঙ্গীতের। নিচে তখন ঝুপ ঝাপ মেস বাবুদের সমবেত গোসলের শব্দ, আর হৈ হাঁক। মালুর মনে হল সেই শব্দ কোলাহলের সাথে পাল্লা দিয়েই অশোকের বাদ্যযন্ত্রগুলো সুরের কলহ জুড়েছে।

পোড়া আঙ্গুলের জ্বালাটা এখন একটু কমেছে মালুর। কিন্তু, ফোসকা পড়ে গেছে কয়েকটা আঙ্গুলে। তবু যত্নের সাথেই রান্না করল মালু।

রোববার। হপ্তায় ওই একটি দিনই বাবুদের একটু ভালো খাওয়া, অর্থাৎ, অন্যদিনের চাইতে একটু বড় মাছের টুকরো, মুগ ডালে মাছের মুড়ো, একটি ভাজি, একটি তরকারি। তা ছাড়া অশোক, অশোকের বন্ধুরাও খাবে। ওদের জন্য আলাদা করে কিছু মাছও ভেজে নিল মালু।

রান্নার পাট তুলে স্নান করে নিল মালু। গাঙ্গুলী মশায়কে খাইয়ে দিল। উনি চলেছেন শহরতলীতে আত্মীয় দর্শনে। অন্যদের তাড়া নেই।

যতীন বাবু এখনও ফেরেনি। খাবার আসন সাজিয়ে একটি বই নিয়ে বসল মালু। দু চার পাতা পড়তে না পড়তেই বুঝি ঝিমুনি এসে গেল ওর। হঠাৎ একটা শোরগোল উঠল। ঝিমুনিটা ভেঙে গেল মালুর। বই বন্ধ করে মাছি তাড়ায় ও। আর উৎকীর্ণ হয়। দরজার দিক থেকে ভেসে আসছে যতীন বাবুর উত্তেজিত গলা।

তক্ষুণি আমার সন্দেহ হয়েছিল। যে হারে পেঁয়াজ খায়, ব্যাটা মুসলমান না হয়েই যায় না। কেউ তো গ্রাহ্য করলে না আমার কথা। এখন? এখন জাত ধর্ম সব খোয়ালে তো?

বড় মেসবাড়ি। বাসিন্দার সংখ্যা কম নয়। রান্না হয় পাঁচটা আলাদা পাকে। হট্টগোল শুনে পিল পিল করে বেরিয়ে আসে সবাই। এক তলার বারান্দা আর

খোলা উঠোনে রীতিমতো ভিড় জমে যায়।

নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ প্রৌঢ় তারিণী বাবু। মেসে থাকলেও স্বপাকে তার আহার। খবরটা শুনে বেজায় মুষড়ে পড়েছেন তিনি। যতই দূরে দূরে থাকুক না কেন, তবু এক মেস তো? ছোঁয়াছুঁয়ি যে হয়ে যায়নি কে বলবে? এ্যাঁ, এই কাণ্ড, যেন বিলাপের সুর তারিণী বাবুর।

কেমন ধারা হিঁদু গো তোমরা? বাড়িতে একটা জলজ্যান্ত মুছলমান রয়েছে, এ্যদ্দিন টের পাওনি? বারান্দার ভিড় থেকে কে যেন বলল। আপনি ছিলেন কোথায়? উঠোনের ভিড় থেকে উঠে আসে দুরন্ত জবাব। বাজে বকবেন না মশায়। অমন বাঁকা জবাব পেয়ে প্রথম জন বুঝি চটেই যায়। দ্বিতীয় জন নাছোড়বান্দা। ত্বরিতে পাল্টা জবাব পাঠিয়ে দিলেন তিনিঃ খুব এখন হিঁদুর দরদী সেজেছেন মশায়। ওদিকে মুসলমানের হোটেলে ঢুকে যে মুরগি খেয়ে আসেন সেটা কিছু না, না?

প্রথম বা দ্বিতীয় জন ভিড়ের জন্য কেউ কারো মুখ দেখছেন না। শুধু স্বর চিনে বাক্যবাণ নিক্ষেপ করে চলেছেন। হয়ত আড়াল ছেড়ে সুমুখেই এগিয়ে আসতেন তারা, কিন্তু উত্তেজনাটা ততক্ষণে অন্য দিকে গড়িয়ে গেছে।

যতীনের নেতৃত্বে আস্তিন গুটিয়েছে দু তিনজন। আস্তিন গুটিয়ে পাক ঘরের দিকে এগিয়ে আসছে ওরা।

ছ্যাঁত করে ওঠে মালুর বুকটা। ওরা কী মারতে চায় ওকে? ওর গায়ের রক্ত হিম হয়ে আসে। কিন্তু মুহূর্তেই যেন জেগে ওঠে ওর পৌরুষ সত্তাটা। ধর শালার নেড়েটাকে, একটু হাত সুখ করে নিই। কে যেন বলল। না হে জীবন। ও সব মারধোরে যেও না। বাংলায় এখন লীগ মিনিস্ট্রি খেয়াল আছে? ওপরের বারান্দা থেকে নেবে আসে প্রবীণ বাসিন্দার হুঁশিয়ার কণ্ঠ।

বহুরূপী বাছাধন। লুকিয়ে লুকিয়ে আর কতদিন আমাদের জাত মারবে। দয়া করে এবার বিদেয় হও তো। ক্রোধ আর বিদ্বেষের বিকৃতি যতীন বাবুর কথায়, মুখের চেহারায়।

কিন্তু, কোথায় মালু? পাক ঘরে যে ওর টিকির চিহ্নও নেই।

এ্যাঁ, পালিয়েছে? এতগুলো চোখকে ফাঁকি দিয়ে পালাল কখন?

আরে মশায়, চোখ কী আপনাদের সজাগ ছিল? আপনারা তো এ ওর মুণ্ডপাত করছিলেন। কে যেন বলল।

শালা ভারি বজ্জাত তো!

না-না, এ বাড়ি ছেড়ে কোথাও পালায়নি। ভালো করে দেখ। চল কলতলার দিকটা দেখি তো? পাঞ্জাবীর আস্তিন দুটো আরো কয়েক ইঞ্চি গুটিয়ে কলতলার দিকে ছুটে আসে যতীন বাবু।

না। এখানে নেই।

ভাড়ার ঘর?

না।

পায়খানা?

সেখানেও নেই।

আরে ওই ঘরটা দেখতো? দরজাটা যেন বন্ধ ঠেকছে?

যতীন বাবুর দল হুড়মুড়ি খেয়ে পড়ে দরজাটার সুমুখে।

এক কালে গোসলখানা ছিল ঘরটা। বর্তমানে হাবিজাবি মালে ভর্তি। ধপাধপ কয়েকটি লাথি পড়ে দরজাটার গায়। দুর্বল দরজা ক্যাঁক ক্যাঁক আর্তনাদ তুলে কেঁপে যায়। ঝুর ঝুর ঝরে পড়ে কিছু চুন বালি। ধস করে পড়ে এক চাঙ্গড় পলেস্তারা।

দরজা ভাঙার জন্য নিঃশব্দে অপেক্ষা করে মালু।

অদ্ভুতই বটে। নড়বড়ে দরজাটা ভাংতে ভাংতেও একেবারে ভেঙে পড়ে না। প্রচণ্ড আঘাতের মুখে টলতে টলতেও দাঁড়িয়ে থাকছে। বুঝি একটু ভাববার অবসর দিচ্ছে মালুকে।

কিন্তু, অমন কাপুরুষের মতো পালাচ্ছেই বা কেন মালু? কেন দরজায় খিল এঁটেছে? নষ্ট করছে ওদের ধর্ম আচার, ভুল পরিচয় দিয়েছে? বেশ তো, বিচার করুক না ওরা। নতুবা পথ করে দিক ও বেরিয়ে যাবে। যদি মারে? স্যাঁতস্যাঁতে ঘরের অন্ধকারে মুঠো দুটো শক্ত হয়ে আসে মালুর। সিনাটা সিধা করে দরজার কাছে এসে দাঁড়ায় ও।

আহা, অশোককে একবার ডাক না। ওর লোক, যা করবার সেই করুক। একটা চিকন গলা বুঝি সুবুদ্ধির সন্ধান দেয় ওদের।

লাথালাথিটা মুলতুবি রেখে ওরা উঠে যায় দোতলায়, অশোকের ঘরের দিকে।

নিছক একটা সন্দেহ নয়। নিজ কানে শুনে এসেছে যতীন বাবু। সাক্ষী রমেন চক্রবর্তী। অশোকের কামরার পরের পরেরটায় একেবারে দক্ষিণের সিটে থাকেন যে রমেন চক্রবর্তী, তিনিই। তিনিও ছিলেন যতীন বাবুর সাথে।

সেই যে রাকীবুদ্দিন ভদ্রলোক অশোকের আসরে হামেশাই যাঁকে দেখা যায়? তিনিই তো ফাঁস করে দিয়েছেন আসল কথা। শিয়ালদর মোড়ে দেখা তাঁর সাথে। যতীন বাবুকে দেখেই বললেন : ভালোই হল আপনার সাথে দেখা হয়ে গেল। যাচ্ছিলাম আপনাদের মেসের দিকেই।

কী ব্যাপার বলুন তো? শুধাল যতীন বাবু।

মালেককে মেহেরবানী করে বলবেন, আজই যেন দেখা করে আমার সাথে। আমার হোটেলে।

যতীন বাবু তো আকাশ থেকে পড়লেন। চেনা তো দূরের কথা, ও রকম একটা নাম এই প্রথম শুনলেন তিনি।

আরে মশায়, মালেক–আবদুল মালেক ডাক নাম মালু। আপনাদের মেসে অশোকের ঘরেই তো থাকে ছেলেটি। খাসা একখানি গলা, গায় চমৎকার। যতীন বাবু চিনছেন না দেখে ভালো করেই চিনিয়ে দিলেন রাকীব সাহেব। মালু এবং মালেকে যে কী দুস্তর ব্যবধান সেটা বোধ হয় জানেন না তিনি। সব শুনে অশোক থ মেরে রইল। আত্মপক্ষ সমর্থনে কিছুই যেন বলার নেই তার।

নিজে না হয় জাত ধর্মো মান না বাপু, তাই বলে মোছলমানের ছেলেকে এনে মেসে জায়গা দেবে? এতগুলো লোককে ওই ম্লেচ্ছটার পাক খাওয়ালে? ছি : রামো : তারিণী বাবু বুঝি এখুনি বমি করবেন।

নিরুত্তর অশোক। গোটা মেসটাই মারমুখো। গোটা মেসটাই কৈফিয়ত চাইছে ওর কাছে। এত দৃষ্টির ধিক্কার আর কৈফিয়ত তলবের মুখে ও অসহায়।

হাবিজাবি মালের ডিপো ওই স্যাঁতস্যাঁতে অন্ধকার ঘরটার ভেতর একটি সেকেন্ড যেন দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে চলে। মালু ভেবে পায় না, কেন নেবে আসছে না অশোক। কেন এই নরক যাতনা থেকে মুক্তি দিচ্ছে না ওকে।

সেই যে লুকিয়েছে মালু, আট কী দশটা মিনিট কেটে গেল। আর এই কয়টি মিনিটেই যেন একটা যুগ পেরিয়ে এল মালু। অশোকদা ভালো। অশোকদা

চমৎকার। কিন্তু সব ভালো লোকগুলোই কেন যেন ভীরু হয়। ভালো লোক অশোকদাও ভীরু। কী এক সংকল্পের দৃঢ়তায় কঠিন হয়ে আসে মালুর মুখের পেশী। ঢুস করে হুড়কো পড়ার শব্দ হল। খুলে গেল দরজটা। হতবাক হয়ে রইল লোকগুলো।

ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল মালু।

ওরা চেয়ে থাকল।

৩৬-৪০

বসো বসো। খবরটা তা হলে পেয়েছিলে। স্নেহের উষ্ণতা রাকীব সাহেবের কণ্ঠে।

জী। কাউচের কোণায় জড়সড় হয়ে বসে মালু।

মৃদু হেসে কী এক আশাকে যেন রাঙিয়ে তোলেন রাকীব সাহেব। চোখ জোড়া তাঁর বারেক নেচে যায় মালুর দিকে চেয়ে।

বয়স তাঁর পঞ্চাশের গা ঘেঁষে। কিন্তু মুখটাতে নেই বয়সের ছাপ। মুখে তার শিশুর সারল্য আর মিষ্টি এক কোমলতা। যখন হাসেন সে মুখ কচি সবুজের দীপ্তি ছড়ায়। কচি সবুজ দীপ্তি ছড়িয়ে হাসছেন রাকীব সাহেব। কেন আসতে বলেছিলেন? যেন জড়ান মালুর স্বরটা।

কাল সকাল সাড়ে আটটায় মাইক্রোফোনে তোমার কণ্ঠ-পরীক্ষা। শৈলেন বাবুর সাথে কথা হয়ে গেছে আমার। একটা এনগেজমেন্টও করে এসেছি আজ বিকেল চারটায়। আগে থেকে একটু পরিচয় করে রাখা ভালো। বুঝলে না?

ও, এই জন্যই এমন মুচকি মুচকি হাসছিলেন রাকীব সাহেব? আনন্দে নেচে ওঠে মালুর মন। তুচ্ছ মনে হয় একটুক্ষণ আগের লাঞ্ছনাটা। আর এই মুহূর্তেই মালু যেন স্পষ্ট করে চিনল ওর সেই যন্ত্রণাকে যা ওকে অস্থির করে তুলেছিল অশোকের মেসে। সে তো ওর সুর, ওর গান। ওরা টেনে নিতে চায় মালুকে সেই মহাজগতের দিকে যেখানে মানুষ, যেখানে অগুনতি শ্রোতা, যেখানে ওর সকল গানের সকল সুরের সার্থকতা। অশোকের মেসে সে পথের সন্ধান পাচ্ছিল না মালু। তাই অস্থির হয়ে ছিল, মাথা কুটে মরছিল ওর গান, ওর সুর। সুরের হৃদয় আজ পেয়ে গেছে তার প্রকাশের পথ।

ভাবতেই কেমন লাগে মালুর। মনে মনে সে তো এই খবরটিরই অপেক্ষা করছিল গত কয়েক মাস ধরে।

তুমি তো দেখছি রেডি হয়ে আসনি। যাও, তিনটে বাজতে চলল প্রায়। এতক্ষণ আনন্দের আসমানে উঠিয়ে এবার বুঝি ওকে ধপ করে মাটিতে ফেলে দিলেন রাকীব সাহেব। কেমন করে তাকে বলবে মালু, ভদ্র সমাজে চলার মতো সেই যে তার এক জোড়া ধূতি আর পাঞ্জাবী, সেটা এখন উদ্ধারের অতীত?

এর চেয়ে ভালো পোশাক নেই আমার, মিথ্যে কথাই বলল মালু।

বিব্রত হয়ে অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন রাকীব সাহেব। তার পর উঠে গেলেন। ওয়ারড্রোবটা খুলে কয়েকজোড়া ধূতি-পাঞ্জাবী এনে রাখলেন মালুর সুমুখে। বললেন তুমি তো আবার লম্বার ধাড়ি। আমি হলাম গিয়ে ঠিক উল্টো, বেঁটেখাটো মানুষ। হাঁটু সমান কয়েকটা পাঞ্জাবী আছে আমার। দেখতো কোনো রকমে ভদ্রতা রক্ষা হবে কী না তোমার?

পরে দেখল মালু। কোনো রকমে কোমর অবধি এসেছে পাঞ্জাবীর ঝুল। চোখে ঠেকে, তবু ভদ্রতায় উতরে যাবে হয়ত।

কী হল? মুখ বেজার কেন? ভ্রূ কুঁচকে ওর মুখের দিকেই তাকিয়ে রইলেন রাকীব সাহেব। অমন চমৎকার খবর পেয়েও উৎফুল্ল হয় না ছেলেটা, বুঝি চিন্তায় পড়ে গেলেন রাকীব সাহেব

খাওয়া হয়নি। বলেই মুখটা নীচু করল মালু। এবার হো হো করে হেসে ওঠেন রাকীব সাহেব, তা এতক্ষণে বলতে হয়?

বয় এল।

কিছুক্ষণ বাদে খাবার এল।

আজ থেকে থাকার জায়গাও গেল, খেতে খেতে বলল মালু।

কেন গেল, কী হয়েছিল, কিছুই শুধালেন না রাকীব সাহেব। এক মনে মালুর খাওয়াটাই যেন দেখে গেলেন। মালুর খাওয়াটা শেষ হলে পরে বললেন, এখানেই থাকবে। কী বল?

বেশ। মালুর মুখ দেখে মনে হল না হাতে স্বর্গ পেয়ে তেমন খুশি হয়েছে ও।

কিন্তু মালু বুঝি আজ মরিয়া। কতটুকুইবা পরিচয় রাকীব সাহেবের সাথে। অথচ খাবার মাংলো তাঁর কাছে। আশ্রয় চাইল।

মালুর কোনো কথাই যেন না বলার নয় এই লোকটার কাছে।

একটি কাজ চাই আমার, আবার বলল মালু।

কী কাজ?

যে কোনো কাজ। বৌ বাজারে তো বাবুর্চি ছিলাম।

বাবুর্চি? বিশ্বাস করতে বুঝি কষ্ট হয় রাকীব সাহেবের। মালুকে তিনি দেখেছেন সুন্দর স্বাস্থ্য, পরিষ্কার পোশাকে উজ্জ্বল এক তরুণ। কণ্ঠের সুর যার ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি।

গায়ে গতরে খাটতে আমার আলসেমি নেই। রাকীব সাহেবের আস্থা অর্জন করার জন্যই যেন বলল মালু।

সরল মুখখানিতে এবার ভেসে উঠল কী এক ব্যথার ছায়া। চোখের কোলে যেন অপার কোনো বেদনার ঠাঁই। ধরা গলায় বললেন রাকীব সাহেব : শিল্পী জাতটাই বড় অভাগা, মালেক। বড় অভাগা। এদের পেটে থাকে না ভাত, মাথা গুঁজবার মতো থাকে না একটুখানি আশ্রয়। তবু যে পথে অর্থ নেই, যে পথে নেই সচ্ছল জীবনের নিশ্চয়তা সে পথটাই আঁকড়ে থাকবে এরা!

থামলেন রাকীব সাহেব। ব্যথা ছল ছল তাঁর চোখ জোড়া। সে চোখ গভীর এক মমতায় স্থির হয়ে থাকে মালুর মুখের উপর। বললেন, মালেক, এত কষ্টেও গান যখন ছাড়নি তুমি পুরস্কার তার পাবেই।

জাহেদের মতো অশোকের মতো রাকীব সাহেবও বুঝি ভবিষ্যৎবাণী করলেন। কিন্তু, সে নিয়ে এখন ভাববার সময় নয় মালুর। অথবা রাকীব সাহেবের আকস্মিক ভাবালুতায় আছন্ন হয়ে চুপ করে থাকবারও অবস্থা নয় তার। ও বলল : আমার চাকরির কী হবে?

হবে হবে। চল এখন বের হই। ওর কথাটাকে চাপা দিয়ে উঠে পড়লেন রাকীব সাহেব।

ধার করা ধূতি আর ধার করা পাঞ্জাবীতে জীবনের প্রথম পরীক্ষার প্রথম অঙ্কটা শেষ করে এল মালু।

যথা সময় অকৃতকার্যতার খবরটাও পেল।

আহা, মন খারাপ করো না। আমি বলছি, সাধনার ফল তুমি এক দিন পাবেই। সান্ত্বনা দেন রাকীব সাহেব।

ফুঃ। ফাঁকা আশ্বাস। সংগ্রাম সাধনা ধৈর্য তিতিক্ষা, সেই কবে থেকে অশোকের মুখে মালু শুনে আসছে কথাগুলো। আর সেই ছোট্ট বেলা থেকে গানই তো ওর ধ্যান মন। তবু তো রেডিও কর্তারা বলে দিয়েছেন, গলা তার এখনো উপযুক্ত

হয়নি। মাইক ফিট করে না। অডিশন বড় খারাপ হয়েছে। আরো গলা সাধতে হবে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রথম চোট খেয়েই অতটা ভেঙে পড়লে? আরো কত যে চোট খেতে হবে? আবারও বললেন রাকীব সাহেব।

হুঁ, বলতে অমন সবাই পারে। সুর সরস্বতী আর লক্ষ্মী যার পায়ে লুটোপুটি খায়, গানের রেকর্ড যার ঘরে ঘরে তার তো মূল্যবান সব উপদেশ বিলানোরই কাজ। কিন্তু মালু তাতে আশ্বস্ত হবে কেমন করে? ওর এতদিনের সাধনা, এতবড় আশায় বুক বেঁধে অচেনা কলকাতার পথে নিঃসম্বল পাড়ি দিয়েছিল ও, সবই তো নস্যাৎ হয়ে গেল এক নিমিষে।

দেখ আগেই তো বলেছিলাম তোমায়, ভীষণ প্রতিযোগিতা এখানে। তার উপর মুসলমান তুমি। ভালো গায়ক-গায়িকা সবাই হিন্দু, যারা বাছাই করবেন তাঁরাও হিন্দু, সহজে কী আর ওরা চান্স দিতে চায় কোনো মুসলমানকে? মালুর অন্তর্নিহিত প্রতিভায় আস্থা সৃষ্টির উদ্দেশেই বুঝি কথাগুলো বললেন রাকীব সাহেব।

ধোপে যারা টেকে না তাদের জন্য এ ছাড়া আর সান্ত্বনাই বা কী! কেমন ম্লান হেসে বলল মালু। যেন আলপিনের খোঁচা খেয়ে চমকে তাকালেন রাকীব সাহেব। বাবুর্চিগিরি করে যে ছেলে গান শিখে এ তো তার কথা নয়?

তা ছাড়া ওরা তো একেবারে নাকচ করেননি তোমাকে। এক মাস পরে তো আবার যেতে বলেছেন। এবার একটা নিশ্চিত আশা মালুর সুমুখে তুলে ধরলেন রাকীব সাহেব।

হু, অসম্ভবের আশা নিয়েই তো বেঁচে থাকে মানুষ। কথাটা বলে আবার কেমন ম্লান করে হাসল মালু।

রাকীব সাহেবও হাসলেন।

হাসির মাঝে পরস্পরকে যেন বুঝে নিল ওরা।

মালু নেবে গেল নিচে, ওর কাজের জায়গায়।

সাজে গোজে মাঝারি গোছের দেশীয় হোটেল। তিন তলা। দোতলা আর তিন তলাটা আবাসিক। এক তলায় ভোজন ঘর এবং রেস্তোরাঁ। অপরিষ্কার নয়। পরিষ্কারও নয়। যেমনটি হয় মাঝারি পর্যায়ের হোটেলগুলো। তিন তলায় দুটো কামরা নিয়ে একক বাস রাকীব সাহেবের। নিউ গ্র্যান্ড হোটেলের আট আনা

মালিক ষোল আনা পরিচালক শচীন বাবু। রাকীব সাহেবের গুণমুগ্ধ এবং বন্ধু। সেই খাতিরেই নতুন কাজটা হয়ে গেল মালুর। বিল লেখা এবং হিসেব মেলানো। ওর থাকার ব্যবস্থা হয়েছে তিন তলার চিলেকামরার এক অংশে, বাকী অংশটা ভাঙা আসবাব এবং ইঁদুর পরিবারের দখলে।

মন্দ লাগে না মালুর নতুন কাজটা। সবাই বাঁধা খদ্দের, বাকীর খাতায় সই দেয়ার দলের। ঝামেলা কম। যথেষ্ট সময় পায় মালু গলা সাধবার। তার চেয়েও বড় কথা রাকীব সাহেবের সান্নিধ্য। তাঁর সুরভরা কণ্ঠটি শোনবার অবিমিশ্র সুযোগ।

যত দেখছে রাকীব সাহেবকে ততই অবাক হচ্ছে মালু। মুখে যেমন শিশুর সারল্য তেমনি ভেতরটা। অন্তর তাঁর সারাক্ষণ যেন কেঁদে চলেছে পৃথিবীর অনন্ত বেদনায়। যে বেদনা সমস্ত রাগিণীর উৎস। সেই অনন্ত বেদনারই একটি খণ্ডরূপ তার আপন সমাজ, আপন পরিবেশ, সে পরিবেশের বিরুদ্ধে যুঝে যুঝে আপনার সুরের জগৎটাকে দিনে দিনে বিস্তৃত করে চলেছেন তিনি।

মালুর মনে পড়ে সেই প্রথম দিনটির কথা। আসর বসেছে অশোকের সেই ঘরটিতে। একটি ভাটিয়ালী শোনালেন রাকীব সাহেব। তন্ময় হয়ে শুনল মালু। এ যেন সেই দখিন ক্ষেতের বুক চিরে তর তর করে বয়ে যাওয়া বড় খালের সুর, তালতলি বাকুলিয়ার সুর। মালুর আপনার সুর, ওর অস্থি পাঁজরে মিশে থাকা সুর। তবু রাকীব সাহেবের মতো অত দরদ, অত আবেগ দিয়ে তো কোনো দিন গাইতে পারেনি মালু?

গান থেমে গেলেও সুর চলছে মালুর সূক্ষ্ম তন্ত্রীলোকে। কী এক আচ্ছন্নতা ঘিরে নিয়েছে ওকে।

আমাদেরই দেশের ছেলে, শুনুন ওর গান। হঠাৎ হারমোনিয়ামটা ওর দিকে এগিয়ে দেয় অশোক।

সেই আচ্ছন্নতার ঘোরেই তালতলির একটি পরিচিত গান গেয়ে যায় মালু। শুনে কী এক উল্লাসে প্রায় চেঁচিয়ে ওঠেন রাকীব সাহেব। আহা এ-যে আমার গ্রাম বাংলার মিঠে সুর গো। গাও গাও। আর একটি গাও। কলকাতা শহরে বসে অমন খাঁটি আর মিঠে সুর কী মাথা কুটলেও পাওয়া যায়?

পল্লীগীতির সম্রাট রাকীব সাহেব। জনপ্রিয়তার শিখরে সার্থক শিল্পী, নাম তাঁর দেশের সীমানা ছাড়িয়ে। মুকুটহীন সেই সম্রাটের উচ্ছ্বসিত প্রশংসায়, অভিভূত আচ্ছন্নতায় মুক হয়েছিল মালু।

সেই যে প্রশংসা, সে তো শুধু মামুলি দুটো উৎসাহ-বচন ছিল না? সে ছিল এক স্বীকৃতি মালুর শিল্পী-জন্মের এক মহাসনদ।

অপার বিস্ময়ে সেদিন নিজের দিকে তাকিয়েছিল মালু। আপনার গভীরে কী এক আলোড়ন, কী এক সত্তার এক চকিত স্পন্দন। চমকে উঠেছিল মালু। সে ছিল বুঝি পরিপূর্ণ এক শিল্পী-সত্তার উন্মেষ লগ্ন। যে সত্তা জন্ম দিল একটি চেতনার, শিল্পীর গুণাবলীর নিজস্ব এক মূল্য-উপলব্ধির। আশ্চর্য সেই অনুভব, জনপ্রিয় শিল্পীর সাথে ওর যে দূরত্ব সে দূরত্বটা যেন এক নিমেষেই ঘুচিয়ে দিয়েছিল। মনে হয়েছিল মালুর, ওরা সমধর্মী নয় শুধু, ওরা সমমর্মী।

সে জন্যই বুঝি রাকীব সাহেবের কাছে অমন অকপটে নিজের কথাগুলো আজ বলতে পেরেছে ও। দ্বিধা আসেনি খাবার চাইতে সাহায্য প্রার্থনা করতে। বাকুলিয়ার মালু হৃদয়ে যার সুরের মন্থন, তার কাছে এ ছিল এক অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার। একটি সম্পূর্ণ নতুন ধরনের অভিজ্ঞতা। অপরিচিত এক অনুভূতি। দেশে দেশে সকল সৃষ্টি-সাধকই বুঝি এমনি আচমকা খুঁজে পায় আপনার শিল্পী সত্তা, আপনার সৃষ্টি-চৈতন্য। আর তখন ভেঙে যায় দেশ কাল ধর্ম গোত্রের গণ্ডি। ওরা তখন পৃথিবীর আনন্দ উৎসবে এক সুর এক হৃদয়।

গালে হাত দিয়ে ভাবনাটা শেষ হলে পর এই বিলগুলো টোটাল করে রাখবেন। কয়েক তোড়া বিল মালুর সুমুখে টেবিলের উপর রেখে মৃদু হাসলেন শচীন বাবু।

এটাই শচীন বাবুর স্বভাব। শিল্পানুরাগী মনটি তাঁর সব সময় প্রশ্রয় দিয়ে চলে মালুকে। সকালের দিকে গলা সাধতে গিয়ে দেরি হয়ে যায় মালুর। কখনো ডেকে পাঠান না শচীন বাবু। রাকীব সাহেবের ঘরে দুজনে মিলে কোনো একটি গানের সুর অথবা উৎপত্তি নিয়ে মেতে যায় আলোচনায়, নিঃশব্দে পাশে গিয়ে বসবেন শচীন বাবু। একমনে শুনবেন ওদের আলোচনা। আলোচনা শেষ না হলে পাড়বেন না কাজের কথাটা।

তাড়াতাড়ি হিসেবে মন দিল মালু। মোট অঙ্কগুলো নামে নামে মিলিয়ে তুলে রাখল খাতায়। কয়েকটা নতুন বিল তৈরি করে হাই তুলল। ফরমাশ দিল, এক কাপ চা।

এ ভাবে লুকিয়ে লুকিয়ে থাকছ কেন? দু একটা জলসা টলসায় আস। চল রেডিওতে পরিচয় করিয়ে দিয়ে আসি তোমায়। বার দুই ওর গান শোনার পরই কথাটা পেড়েছিল রাকীব সাহেব। আর সেই প্রথম বেতারে কণ্ঠ তুলবার একটি প্রচ্ছন্ন অভিলাষ বাসা বেঁধেছিল ওর মনের ভেতর। কিন্তু এড়িয়ে গেছিল মালু। নিজেকে নিয়ে তখনো তার অনেক লজ্জা।

রাকীব সাহেব, যেন পথ চলতে চলতে কুড়িয়ে পেয়েছেন মানিক। সে মানিক নিয়ে তার মহা আনন্দ। ব্যস্ত মানুষ তিনি। চারিদিকে তাঁর ডাক। তবু অশোকের আসরে সহজে কামাই দেন না তিনি। মালু, গান শুনতে এলাম তোমার। চোখ বুজে তন্ময় হয়ে শোনেন মালুর গান। কদাচ এখানে সেখানে শুধরিয়ে দেন দু একটি টান। আসর শেষে গল্প করেন। গল্প শেষে মালু এগিয়ে দেয় বাস স্টপে।

জান ভাই। মুসলমান ছেলেরা বাজনা শিখছে গান শিখছে দেখলে বড় ভালো লাগে আমার। ভালো লাগার কথাটা বলেই বিষণ্ণ আর ম্লান হয়ে যান রাকীব সাহেব। বুঝি হারিয়ে যান ফেলে আসা অতীতের স্মৃতিতে। টুকরো টুকরো কথায় উঠে আসে তার অতীত। বি.এ. পাস করে সরকারি চাকুরে হব এই ছিল বাবার স্বপ্ন। আমিও সেই স্বপ্নটাকেই মেনে নিয়েছিলাম। চাকরিতেই সচ্ছল জীবন, সামাজিক মর্যাদা। কিন্তু কী যে হল মনটার। বইয়ের পাতা ফেলে সুরের পেছনে ছুটে যায় মন। যেখানে গান সেখানে ছুটে যাই। বি.এ পরীক্ষা না দিয়েই পালিয়ে যাই বাড়ি থেকে। বাড়ি বিমুখ। আত্মীয়-স্বজনের মুখ ভার। বি. এ. পাস করে ছেলে হবে জজ ম্যাজিস্ট্রেট নতুবা কাছাকাছি কিছু। তা না, ছেলে চলেছে গান শিখতে? ছিঃ। গাইয়ে বলে কী ছেলের পরিচয় দেয়া যায় সমাজে না পাওয়া যায় ভালো একটা বিয়ের সম্বন্ধ? তা ছাড়া গাইয়ে ছেলের ভবিষ্যৎ-ই বা কী?

তবু মন আমার ফিরল না। সুরের পৃথিবী যে আমায় টেনে নিয়েছে তার কোলে। আত্মীয়-পরিজনের বিরাগ ভ্রূকুটি, সমাজের নীরব অবহেলা আরও কত দুর্গতি যে জুটল কপালে। আশীর্বাদ বলে গ্রহণ করলাম সে সব লাঞ্ছনা। সময় সময় উত্যক্ত হয়ে ক্ষেপে যেতাম, মুষড়ে যেতাম হতাশায়। তবু গান ছাড়বার কথা ভাবতে পারতাম না। সুরের সুধা একবার যে পান করেছে, সে কী ছাড়তে পারে তার মায়া? বলতে বলতে রাকীব সাহেবের চোখ জোড়া ছল ছল করে উঠত।

.

শ্রদ্ধায় মাথা নত করত মালু। শিল্পীর চিরন্তন বেদনায় টনটন করে উঠত ওর বুকের ভেতরটা।

নিউ গ্রান্ড হোটেলে দিন কাটে।

একমাস। দুমাস। যথারীতি কণ্ঠ পরীক্ষা দিয়ে আসে মালু। যথা পূর্বং উত্তর পায় আবার আসবেন।

স্বীকৃতির পথ যে কঠিন পথ, মালেক। আশ্বাস যুগিয়ে চলেন রাকীব সাহেব।

কেন মিথ্যে আশ্বাস দিচ্ছেন রাকীব ভাই?

মিথ্যে আশ্বাস? বুঝি আহত হন রাকীব সাহেব।

ওসব রেডিও ফেডিও আমার ভাগ্যে হবে না, বুঝে নিয়েছি, এখন অন্য পথ ধরতে হবে আমায়।

অন্য পথ?

রাস্তায় রাস্তায় গাইব আমি। তবু তো মানুষ শুনবে আমার গান?

হাসেন রাকীব সাহেব, দুষ্টু ছেলের পাগলামো দেখে যেমন করে হাসেন বড়রা, বলেন, বড্ড অস্থির হয়েছ।

নীরব হয় মালু। অস্থিরতা যদি অভিযোগ হয়, সেটা অস্বীকার করবে না মালু। ওর অন্তরের গভীরে যে অস্থির কল্লোল। ওর সুর ওর গান খাঁচায় বন্দী পাখির মতো ডানা ঝাপটিয়ে প্রকাশের মুক্তি কামনায় অধীর। এই সুরের প্রাণটাই তো ওকে টেনে এনেছিল শহর কলকাতায়। এই সুরের প্রাণটি নিভৃত ঘরের একাগ্র সাধনায় আজ আর তৃপ্তি পায় না। সে চায় প্রকাশ। সে চায় গান শোনাতে। এই প্রকাশের বেদনাই তো অশোকের মেসে অস্থির করে তুলেছিল ওকে। রাকীব ভাই কী বুঝে না এই অস্থিরতার অর্থ?

আচ্ছা আমি নিজে যাচ্ছি। দেখি কী করতে পারি। এবার শুধু আশ্বাস নয়, একটা প্রতিশ্রুতি দিলেন রাকীব সাহেব।

দুটো টেলিফোন করলেন রাকীব সাহেব। ঘুরে এলেন রেডিও অফিসটা। মালুকে ডেকে বললেন, ক্যাজুয়েল আর্টিস্টের লিস্টিতে তোমার নাম ঢুকিয়ে দিয়ে এলাম। এবার একটা চান্স তুমি পাবেই। অধৈর্য হয়ো না। কবে আসবে সেই চান্স?

কাবার হয়ে যায় মাস অধীর প্রতীক্ষায়। মাসের পিঠে মাস যায় ফুরিয়ে। এমন সময় গান গেল থেমে।

সুর হল স্তব্ধ।

৩৭.

দূরে কিসের যেন হল্লা। প্রথমে লঘু পরে কিঞ্চিৎ ভারি হয়ে আসে হল্লার মিশ্র আওয়াজ। কান পেতে বুঝতে চেষ্টা করল মালু। অনেক কণ্ঠের শ্লোগান।

আওয়াজ তার ক্রমশ উঁচুতে উঠেছে। স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হল শ্লোগানগুলো। ছ্যাঁত করে কানে এসে ধাক্কা খেলো কয়েকটি পরিচিত স্লোগান।

নারায়ে তকবীর–আল্লাহ-আকবার।

এ পাড়ায় তো এ ধ্বনি শোনার কথা নয়?

মাসিকের পাতায় চোখ বুলোতে বুলোতে বুঝি একটু অন্যমনস্ক হয়েছিলেন রাকীব সাহেব। শ্লোগানের ধাক্কা খেয়ে চমকে উঠলেন। আলগোছে ধরে রাখা মাসিকটা পড়ে যায় তার হাত খসে।

হঠাৎ চুপ চাপ। অসংখ্য ত্রস্ত পলায়নী পায়ের প্রতিধ্বনি দেয়ালে দেয়ালে আঘাত খেয়ে ছড়িয়ে পড়ে। স্লোগানগুলো প্রথমে বিক্ষিপ্ত পরে ক্ষীণতর হয়ে আসে। আবার সব কিছু স্তব্ধ হয়ে যায়।

ঠুক ঠুক টোকা বাজে দরজায়

ভেতরে আসুন।

প্রায় হুড় মুড় করে ঘরে ঢুকলেন শচীন বাবু। সে উত্তেজনাটা চাপতে গিয়েই শ্বাস পড়ছে তাঁর ঘন ঘন।

ব্যাপার-স্যাপার তো খুব ভালো ঠেকছে না রাকীব ভাই। দাঙ্গা বুঝি লেগেই গেল। তুমি এখুনি সরে পড়। বলা তো যায় না…

কী বললে? বুঝি তড়িতাঘাতে ছিটকে পড়েন রাকীব সাহেব। কিন্তু তক্ষুণি সামলে নেন। বসেন, পিঠটা খাড়া করে। দপ করে জ্বলে ওঠেন, কেন, কেন আমাকে সরতে বলছ শচীন?

আকস্মিক উগ্রতার মুখে চট করে কথা জোগায় না শচীন বাবুর। আর এই উগ্রতাটা যে বন্ধুত্বের অভিমান সেটা লক্ষ করে কী এক বেদনার কাতরতায় স্নান হয়ে আসে শচীনবাবুর মুখখানি।

বিপদ আছে বলেই তো বলছি। গলাটাকে খাট করে বললেন শচীন বাবু।

বিপদ? দশ বছর রইলাম এ পাড়ায় কোন লোকটা আমায় চেনে না বলতো? আর এখানে আমার বিপদ? সেই আহত অভিমানের কণ্ঠ রাকীব সাহেবের।

চেনে বলেই তো আশঙ্কাটা বেশি আমার। দিন কাল খারাপ। কার মনে কী আছে কে জানে?

বুঝেছি...। বাকী শব্দগুলো উচ্চারণ না করেই থেমে গেলেন রাকীব সাহেব। কী বুঝেছেন সেটাই বুঝি একটু খতিয়ে দেখছেন।

গোঁয়ার্তুমির কোনো অর্থ হয় না, নীরব বন্ধুর দিকে তাকিয়ে বললেন শচীন বাবু।

নীরবে ভাবছেন রাকীব সাহব।

দূর থেকে আবার হল্লা ভেসে আসে। ভাববার সময়ও যে বড় অল্প। সব দিক বিচার করে চলে যাওয়াই স্থির করলেন রাকীব সাহেব। একটা মিনিট দাঁড়াও। রাস্তাটা পরিষ্কার হল কিনা দেখে আসি। হুঁশিয়ার মানুষ শচীন বাবু। সব রকমের সতর্কতা না নিয়ে বন্ধুকে রাস্তায় ছেড়ে দিতে নারাজ। আস্তে করে দরজাটা ভেজিয়ে বেরিয়ে যান শচীন বাবু।

পাশের কোনো ঘরে টিক টিক করে ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলেছে। সে শব্দটা কী এক বিলম্বিত লয়ে ওদের ঘরে পৌঁছে যেন আর বেরুবার পথ পাচ্ছে না।

এক মিনিটের জায়গায় দশ মিনিট কাটিয়ে ফিরে আসেন না শচীন বাবু। এবার উল্টোদিকে হল্লা উঠেছে।

হল্লার আওয়াজটা কখনো বাড়ছে কখনো কমছে।

টিক টিক, সময়ের গতির সেই শব্দটা মাঝে মাঝেই মনে হয় থমকে থাকছে। অবশেষে ঘণ্টা কাবার করে ফিরে এলেন শচীন বাবু। চোখ মুখ উদ্বেগ ব্যাকুল।

রাস্তার ভিড়টা কমেছে। কিন্তু চৌমাথায় আর হোটেলের উল্টোদিকের রোয়াকে জটলা। আলাপী মানুষের জটলা নয়। পাড়ার বখাটে সব ছোকরা আর সন্দেহভাজনদের কী যেন ফিস ফিস পাঁয়তারা। ওদের হাবভাব মোটেই ভালো মনে হচ্ছে না শচীন বাবুর।

তা হলে? চিন্তান্বিত স্বরেই শুধালেন রাকীব সাহেব।

তা হলের জবাব না দিয়ে খবরগুলো জানিয়ে যায় শচীন বাবু। এখানে সেখানে হানাহানি লুঠতরাজ শুরু হয়ে গেছে। কর্পোরেশন স্ট্রীটের সোনারুদের দোকানগুলো সবই নাকি লুঠ হয়ে গেছে। মানিকতলার মুসলমানদের একটা বস্তি নাকি পেট্রল ছিটিয়ে মানুষ সুদ্ধ পুড়িয়ে ছাই করে ফেলা হয়েছে। সেই ছাই গায়ে

মেখে কুচকাওয়াজ করছে ভলান্টিয়ার বাহিনী। হোটেলের দোতলায় সেই যে ইম্পিরিয়াল টোব্যাকোর মুসলমান ভদ্রলোকটি ছিলেন তাঁকে নিরাপদ জায়গায় পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছিল শচীন বাবু সন্ধ্যা সন্ধ্যিই। শচীন বাবুর ছোট ভাই তাকে পৌঁছে দিয়ে এই মাত্র ফিরে এল। তার কাছে থেকেই এসব খবর নিয়ে এসেছেন শচীন বাবু। নিজেও কিছুদূর গিয়ে দেখে এসেছেন শচীন বাবু। বেশি দূর এগুনো যায়নি। মোটকথা রাস্তায় বের হওয়াটাই এখন বিপজ্জনক।

তা হলে? আবার শুধালেন রাকীব সাহেব। এ অবস্থায় হোটেলে থাকাটাই তো সমীচীন মনে করছি আমি।

হোটেলে আমি রয়েছি, কোন ব্যাটা কী করবে? এবার রাকীব সাহেবের প্রশ্নটার জবাব দিল শচীন বাবু।

ঠিক হল কামরাতেই থাকবে ওরা। শচীন বাবু নিজে পাহারা দেবেন। শেষ রাতে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়বে দাঙ্গাবাজরা তখন ওদের পৌঁছিয়ে দেবেন নিরাপদ অঞ্চলে।

যাবার আগে বাতিটা নিবিয়ে দেন শচীন বাবু। কয়েকটা মোম টেবিলের উপর রেখে বলেন, তোমার ঘরটা তো কারুর না চেনার কথা নয়? একান্ত প্রয়োজন পড়লে মোমবাতি ধরিয়ে নিও।

শুয়ে পড়লেন রাকীব সাহেব। মালুকেও ডাকলেন, উপরে গিয়ে আর কাজ নেই তোমার, এস এখানেই একটু গড়িয়ে নেয়া যাক।

কিন্তু, গড়ান তার হল না। পাড়া কাঁপিয়ে, আকাশ ফাটিয়ে স্লোগান উঠেছে বন্দে মাতরম্। ধুস ধাস শব্দ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে অথবা খুলে যাচ্ছে বাড়ির জানালা। সব লোক নেবে এসেছে রাস্তায়, বাড়ির ভেতর শাঁখ বাজাচ্ছে মেয়েরা।

হোটেলের বাসিন্দারা সব বারান্দায়।

ধড়ফড়িয়ে উঠে বসলেন রাকীব সাহেব।

খড়খড়িটা একটু ফাঁক করে বাইরে তাকাল মালু। রাস্তা আর গলিতে গিস গিস মানুষের ভিড়। কারো হাতে লাঠি, কারো হাতে চেলা ফাড়বার ভোঁতা দা। কারো হাতে ইটের টুকরো। খবর পাওয়া গেছে ওদিক থেকে মুসলমানরা নাকি নাঙ্গা তলোয়ার নিয়ে এগিয়ে আসছে। যে কোনো সময় এ পাড়ার উপর হামলা হতে পারে। এ পাড়াও তাই প্রস্তুত হচ্ছে।

সবার মুখে শঙ্কিত উত্তেজনা। চাপা কণ্ঠের ফিস ফিসানি। কানে কানে কথা বলা। চাপা হুংকার। মানব কণ্ঠে যে কত রকমের ধ্বনিতরঙ্গ সম্ভব এর আগে কখনো বুঝি জানবার বা শুনবার সুযোগ পায়নি মালু। হ্রস্বদীর্ঘ চিকন মোটা কর্কশ মোলায়েম খনখনে ঝনঝনে ভীতি চাপা হিস হিস তর্জন গর্জন, এ যেন কণ্ঠধ্বনির কোনো সমবেত যজ্ঞকাণ্ড। সেই ধ্বনি যজ্ঞের আড়ালে কী এক জান্তব বীভৎসতা যেন ওত পেতে রয়েছে। ক্ষীণ সেই শব্দাবরণ খুঁড়ে এখুনি বুঝি কোনো বিকট দানব ভয়ঙ্কর মুর্তিতে আত্মপ্রকাশ করবে।

হঠাৎ ছিঁড়ে গেল সন্দেহ ফিস ফিসানির ভারি পর্দাটা।

বন্দেমাতরম্। এ বাড়ি থেকে সে বাড়ি, এ পাড়া থেকে সে পাড়া ক্রমশ দূরে সরে যায় আওয়াজটা।

যেন তীর খেয়ে লাফিয়ে ওঠেন রাকীব সাহেব। ভয়ে, ত্রাসে শুকিয়ে এসেছে তাঁর মুখটা।

বন্দেমাতরম্। বন্দেমাতরম্। এবার সেই দেয়াল কাঁপা, আকাশ ফাটা গর্জন ওদের চারপাশ ঘিরে। হোটেলের ভেতরেও। সে কী গর্জন! কানে যেন তালা লাগবে।

দুহাতে কান ঢেকে চোখ বোজেন রাকীব সাহেব। খড়খড়িটা বন্ধ করে দেয় মালু। কী মনে করে আবার একটুখানি ফাঁক করে রাখে।

সেই আগের মতোই স্লোগানটা ক্রমশ পেছনে থেকে পেছনে সরে যায়। তার পর সবই স্তব্ধ।

হোটেলবাসীরা যে যার ঘরে গিয়ে খিল এঁটেছে। মুসলমানরা নাকি আপাতত আসছে না এ পাড়ায়।

আল্লাহু-আকবর আর বন্দেমাতরম, দুটো শব্দ দুটো ধ্বনিই আবাল্য শোনা মালুর। কী এক ঝংকার, কী এক ছন্দের মতো শব্দ দুটো বাজতো ওর কানে। কিন্তু, আজ শুধু পাশবিকতার হুংকার হয়েই যেন ধেয়ে আসছে সে ধ্বনি। উলঙ্গ হিংস্র এক মৃত্যুর ঘোষণা সে ধ্বনির আড়ালে।

বুঝলে মালু? বড় ভুল হয়ে গেছে। সন্ধ্যেসন্ধিই আমাদের কেটে পড়া উচিত ছিল। এখন তো দেখছি একেবারে বেঘোরে মৃত্যু। অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না রাকীব সাহেবের চেহারা। কিন্তু শুকনো গলার কম্পিত স্বরে লুকোনো থাকছে না তার ভয়টা।

ঘণ্টা আড়াই আগেও পালানোর কথায় ক্ষেপে গেছিল সে লোক। এ কী তার গলা? মনে মনে না হেসে পারল না মালু।

ভয়ডর যে মালুর নেই তা নয়। কিন্তু রক্ত মাংসের শরীরটার প্রতি যে এক ধরনের ভীরু মমতা সেটা যেন কোনো দিনই অনুভব করেনি ও। জানের ভয়টা কখনো বেচাইন করেনি ওকে। হয়ত তেমন পরিস্থিতিতে এখনো পড়েনি ও। অথবা মৃত্যুকে ভয় করবার মতো বয়সই হয়নি ওর।

নিঃশব্দে দরজাটা খুলে গেল।

মোমটা জ্বালিয়ে কাউচে গিয়ে বসলেন শচীন বাবু।

ভয়ে বুঝি কাঠ হয়ে বসে আছেন রাকীব সাহেব। কাউচের কোলে তাঁর আড়ষ্ট শরীরখানা কিছুতেই যে সহজ হতে পারছে না। শচীন বাবুকে কাছে পেয়ে ধড়ে যেন প্রাণটা ফিরে এসেছে তাঁর। কী ব্যাকুলতায় শুধালেন, কী খবর শচীন।

খবর খুব ভালো না রাকীব ভাই, এই যে পেছনের গলিতে দুঘর মুসলমান ছিল, ওদের সব শেষ হয়ে গেল। শচীন বাবুর থমথমে মুখে উদ্বিগ্ন মনের ছায়া।

স...ব। জান মাল?

স...ব। বাইরের মৃত্যুটা যেন চুপিসারে ঢুকে পড়েছে ওদের ঘরে। মৃত্যুর মতোই স্তব্ধতা ঘরময়। শুধু মোমের শিখাটি মৃদু কাঁপছে।

বদ্ধ জানালার পাশে বসে খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে রাতের কোলে পড়ে থাকা নিঃসাড় রাস্তাটাকেই যেন একমনে দেখে চলেছে মালু। এরি মাঝে বুঝি পাড়ার রক্ষী বাহিনী তৈরি হয়ে গেছে। কয়েকজন রক্ষী এদিক সেদিক ঘুরে এসে রোয়াকের উপর বসে পড়েছে। ওদের দেখাদেখি গলির ভেতর থেকে বড় রাস্তার বাড়ি থেকে দুচার জন করে লোক এসে জমছে। আবার সেই হিস হিস কথা কানে কানে ফিসফিসানি।

মালুর মনে হল গোটা পাড়াটাই আসলে ভীতির কুয়াশায় ঢাকা পড়েছে। ভয় পেয়েছে বলেই মানুষগুলো চেঁচিয়ে চিল্লিয়ে পরস্পর থেকে সাহস সংগ্রহ করার চেষ্টা করছে। ফিস ফিস গলাটা আর কিছুই নয়, শুধু পড়শির কাছে থেকে একটু ভরসা চাওয়া পড়শিকে জানিয়ে দেয়া আমিও আছি।

রাকীব ভাই, তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমাও। আমি আছি নিচে। আস্তে করে দরজাটা ভেজিয়ে নেবে যান শচীন বাবু।

ঘুম কোথায়!

সকালে উঠে সূর্যালোকে ঝলমল পৃথিবীটার উপর চোখ বুলিয়ে, বুক ভরে বাতাস টেনে নিশ্বাস নেবার নিশ্চয়তাটা যখন খুঁজে পাওয়া যায় না, মনের ভেতর তখন কী ঘুম আসে চোখে?

জানালার পাশেই বসে বসে কখন নাক ডাকাতে শুরু করেছে মালু। ফুঁ দিয়ে মোমটা নিবিয়ে দিলেন রাকীব সাহেব। বসে বসে বুঝি ঝিঁ ঝিঁ লেগে গেছে পায়ে। বার কয় পায়চারি করলেন। খুলে দিলেন রাস্তার দিকের দুটো জানালা।

কিন্তু, একি! তাঁর চোখের ধাঁধা? তাঁর মনের ভয় আশঙ্কা দুশ্চিন্তা রেণু রেণু খসে পড়ে কী আগুনের সমুদ্র বানিয়েছে তার অজানতে, তারই চোখের সুমুখে? সে আগুনের লাল আলোয় ভরে গেছে অন্ধকার ঘর? চোখ কচলিয়ে জানালার দিকে আর একটু এগিয়ে যেতে বুঝি মালুর গায়ে হোঁচট খেলেন রাকীব সাহেব। ভেঙে গেল মালুর ঘুমটা।

কলকাতার বিজলী আলোকে নিষ্প্রভ করে দিয়ে বুঝি আগুনের আলো জ্বলছে আকাশে।

ইস্ রাকীব ভাই। কী রকম আগুন লেগেছে, দেখেছেন! এতক্ষণে বুঝি টের পেল মালু।

কোথায়? কেমন বিভ্রান্ত স্বর রাকীব সাহেবের।

আকাশের দিকে চেয়ে তো মনে হয় গোটা কলকাতায়, বলল মালু। নিস্তব্ধ হোটেল।

ঘুমের মতো নিস্পন্দ চৌ-মাথা, গলিপথ। শুধু দূর আগুনের লাল ছায়া কেঁপে কেঁপে যায় ওদের ঘরের ভেতর।

দুম দাম। পটাপট কয়েকটা শব্দ হল।

হোটেলের ফটকে কিল পড়ছে।

একটা। দুটো। তারপর অনেক ঘুষি।

পা টিপে টিপে নিঃশব্দে শচীন বাবু এসে ঢুকলেন ঘরে।

এই, নেবে এস শীগগীর। কয়েকটা গুণ্ডা কিসিমের লোক দরজা খুলতে বলছে। অনবরত ধাক্কা দিয়ে চলেছে।

শীগগীর এস।

চেতনালুপ্ত সম্মোহিতের মতো শচীন বাবুর পিছু পিছু নেবে আসে ওরা। প্যান্ট্রির পেছনে কয়লালাকড়ীর অন্ধকার ঘরটায় ওদের সেঁদিয়ে দেয় শচীন বাবু। ফিস্ ফিসিয়ে বলে, চুপ চাপ পড়ে থাক। কোনো ভয় নেই। কামরায় কামরায় বাতি জ্বলে উঠেছে। হোটেলবাসীরা বেরিয়ে এসেছে চত্বরে, বারান্দায়। কৈফিয়ত চাইছে ওরা...দুটো মুসলমানকে বাঁচানোর জন্য এতগুলো হিন্দু সন্তানের জীবন বিপন্ন করার কী অধিকার আছে শচীন বাবুর।

বাইরের লোকগুলোরও মেজাজ বিগড়েছে। করাঘাতের পরিবর্তে পদাঘাত পড়ছে দরজায়। চিৎকার করে বলছে, প্রাণের মায়া থাকলে দরজা খোল শীগগীর। আবার অভয় দিচ্ছে জাত ভাইদের। আপনাদের কোনো ভয় নেই। খুলে দিন দরজাটা। ওই দুটো মুসলমানকে নিয়েই চলে যাব আমরা। যেন এতক্ষণ কিছুই টের পায়নি, শোরগোলে ঘুমটা ভেঙে যাওয়ায় ঈষৎ বিরক্ত হয়েছেন মাত্র, এমনি একটা নির্দোষ মুখভাব করে দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন শচীন বাবু।

আসুন, কী চাই।

শালা এতক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখে বলে কিনা আসুন? শচীন বাবুকে কনুইর গুঁতোয় পাশে সরিয়ে ভিতরে ঢুকল ওরা। টপাটপ সিঁড়ি ডিঙিয়ে উঠে গেল তেতলায়।

ঘর খালি।

সেই চিলে কোঠা, ছাদ, তেতলা দোতলা একতলা সব ঘরই তন্ন তন্ন খুঁজল ওরা।

না। মুসলমানগুলো নেই।

শালা আস্ত শয়তান। সরিয়ে দিয়েছে। কাট, এই শালাকেই কাট। কোমরের ভাঁজ থেকে ছুরি বের করে নেয় ওদের একজন। ছুরির ফলাটাকে বার দুই চক্কর খাইয়ে ছুটে আসে শচীন বাবুকে লক্ষ্য করে। চুপচাপ চেয়ে রয়েছেন শচীন বাবু। যেন কেটে ফেললে খুব বেশি অসুবিধা হবে না তাঁর।

না কেটে লাভ নেই। ছেলে পুলে সায় সম্পত্তি সহ পুড়িয়ে মার শালাকে। পেট্রোল ছিটিয়ে শালার হোটেলে আগুন লাগিয়ে দাও। নির্ঘাত অপমৃত্যু। পুড়িয়েই হোক আর কেটেই হোক মৃত্যুটা বুঝি বিনা ভোটেই পাস হয়ে যায়। দু পা এগিয়ে আসেন

শচীন বাবু। বললেন : আপনারা এসব কী বলছেন : রাকীব সাহেব যে সেই বিকেলে বেরিয়েছেন আর তো ফেরেননি।

শালা মিথ্যুক। সেই প্রথম লোকটি, কেটে মারার পক্ষেই যার মত, সে-ই বলল।

চল চল ওই পাকঘরগুলো সার্চ করতে বাকী আছে এখনো। সর্দার গোছের লোকটা ডায়নিং হল দেখে এসে ডাক দিল ওদের। প্যান্ট্রির দিকে এগিয়ে গেল ওরা।

৩৮.

কী ভীষণ রাত! দুঃস্বপ্নের যন্ত্রণার মতো, ভয়াল জন্তুর থাবার মতো গলার উপর চেপে থাকা এক রাত। এমন রাত-ও আসে মানুষের জীবনে? দোর গোড়ায় অপেক্ষা করছে মৃত্যু। নিষ্ঠুর নৃশংস মৃত্যু। ভেতরে কয়লা স্তূপের আঁধারে ধুক ধুক করছে দুটো প্রাণী সে মৃত্যুর প্রতীক্ষায়। এমন কালো রাতে, বিনা নোটিশে নির্দয় মৃত্যুর এমন অতর্কিত হানা, মৃত্যুকে তো এমন বীভৎসতায় কখনো কল্পনা করেননি রাকীব সাহেব? মরণরে তুঁহু মম শ্যাম সম...কতদিন আত্মস্থ ধ্যানস্থ রাকীব সাহেব আহ্বান করেছেন এই শ্যামসম সুন্দর স্নিগ্ধ মধুর মৃত্যুকে। আর আজ? মিথ্যা। মিথ্যা মৃত্যুর সেই আধ্যাত্ম কল্পনা। মৃত্যু ভয়ঙ্কর বীভৎস। মৃত্যু জীবনেরই শেষ।

চাক চাক কয়লার স্তূপ। ছাদ অবধি কয়লার পাহাড়। এরি মাঝে কেমন একটা খোরলের মতো জায়গা করে বসে আছে ওরা। কোনো ধারাল কয়লা সুঁচলো মুখ দিয়ে অনবরত বিঁধে চলেছে ওদের। দম আসছে বন্ধ হয়ে। অন্ধকারে মৃত্যুর বিকট মূর্তিটাই নাচছে ওদের চোখের সুমুখে। আর সেই অবস্থাতেই জীবন মৃত্যুর একটি নতুন দার্শনিক সংজ্ঞা খুঁজে চলেছেন রাকীব সাহেব।

আর এক রাতের কথা মনে পড়ল মালুর। সেদিনও এমনি আগুনে আগুনে লাল হয়েছিল কলকাতার আকাশ। মানুষগুলোও ক্ষেপে গেছিল। কেন ক্ষেপেছিল, সবটা সেদিন বুঝতে পারেনি মালু, যেমন বুঝতে পারছে না আজকের এই নির্বোধ হল্লাটা। সে রাতের কথাটা মনে পড়তেই রাবুর মুখটাও ভেসে উঠলো মালুর চোখের সুমুখে। দিনভর গোটা শহরটাই বুঝি পায়ে পায়ে মাড়িয়েছে রাবু। বিকেলের দিকে টিয়ার গ্যাস খেয়েছিল ধর্মতলায়। সেখান থেকেই মালুকে বিদায় দিয়ে বলেছিল : রাত দশটার সময় জ্যাঠার বাসা থেকে তুলে নিবি আমায়। হোস্টেলে পৌঁছিয়ে দিবি।

শুনে হেসেছিল মালু। যে সংস্কার থেকে ভীতির জন্ম সেটা বুঝি এক জন্মেও তাড়াতে পারে না কেউ। বিশেষ করে মেয়েরা। নইলে ছোট বেলায় গাছে চড়া, এখন ইউনিভার্সিটি-পড়া জিন্দাবাদ দেয়া মেয়ে কলকাতার মতো শহরেও সন্ধ্যার পর একলাটি বের হতে সাহস পায় না কেন?

ঠিক সময়ই পৌঁছেছিল মালু। পার্ক স্ট্রীটে জাহেদের বাসায়। কিন্তু ফিরে আসতে পারেনি। গাড়ি ঘোড়া বন্ধ। তামাম শহরের ছেলে মেয়েরা ঘর ছেড়ে রাস্তাগুলো সব দখল করে বসে আছে। এখানে সেখানে ট্রাম পুড়ছে, টায়ার ফাটছে। গুলির শব্দে আতঙ্কিত কাকগুলো ডানা ঝাপ্টিয়ে অস্থির হয়েছে। কী এক উন্মত্ত উল্লাসে মানুষগুলো আগুনের হোলি খেলছে। আজকের মতোই পোড়া গন্ধ আর ধোঁয়ার পুরু আস্তরে আচ্ছন্ন হয়েছে সে রাতের মহানগরী।

কী আজব এই কলকাতা। এমন সব কাণ্ড ঘটে যার কোনো যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। মানুষগুলো যেমন বছরের পর বছর পড়শি হিসেবে বাস করেও চেনে না একে অন্যকে, চেনার কথা ভাবেও না, জানা তো দূরের কথা। তেমনি এখানকার সব ঘটনা বিচ্ছিন্ন, সূত্রহীন। হয়তো আছে যোগসূত্র আছে একের সাথে অন্যের গ্রন্থি যা এখনো জেনে উঠতে পারেনি মালু।

আঁতকে উঠে দুজনেই সচকিত হল ওরা। মৃত্যু বুঝি দরজার সুমুখেই। মড় মড়িয়ে এগিয়ে আসছে মৃত্যুর পা।

কারা যেন উঁকি মারল। কে যেন লাঠি ঠোকাল কয়লার চাকে। কোত্থেকে যেন টর্চের আলো পড়ল। ঘরের বালবটা বুঝি কবে থেকেই খারাপ হয়ে আছে।

ধ্যাৎ শালা, এ-তো কয়লা ঘর! চল্।

মৃত্যুটা কী দরজা থেকেই ফিরে গেল?

মৃত্যুর শেষ মৃত্যুই। মৃত্যুর শেষ জীবন, সে কদাচিৎ। কেননা জীবনের জন্য মৃত্যুটা দুর্লভ। কিন্তু রাতের পর দিন প্রকৃতির অমোঘ ধর্ম। সেই ধর্মের বিধানেই শেষ হল রাত। মৃত্যুর শেষ মৃত্যু। সে মৃত্যু এল না। এল দিন।

.

পূব আকাশে দিনের হাতছানিটা স্পষ্ট হবার আগেই ওদের গাড়িতে পুরে ষাট মাইল স্পীড নিল শচীন বাবু। এরা জীবনের রাজ্যে ফিরে এল। অনুরক্ত বন্ধু, শিষ্যটির প্রতি কৃতজ্ঞতায় ছলছলিয়ে উঠল রাকীব সাহেবের চোখজোড়া। মনের

অনুভূতিটা ব্যক্ত করতে গিয়ে শচীন বাবুর হাত ধরে কেঁদে ফেললেন তিনি। চোখের অশ্রু জানিয়ে দিল গভীর অন্তরের কথাটা।

বিশ্রী রকম ঝাঁকুনি খাচ্ছে গাড়িটা। কলকাতার মসৃণ রাস্তাগুলো কখন গাঁয়ের চাক উঠা ক্ষেতের মতো এ্যাবড়ো থ্যাবড়ো হয়ে গেছে ওরা জানে না। এখানে ভাঙা ইটের স্তূপ। ওখানে সেই রেল লাইনের সাদা কালো পাথর কুচির ঢিবি। কী হবে এই সব দিয়ে? কার মাথায় ছুঁড়ে মারবে?

ওকি? দিনের রাজপথে মানুষের লাশ? একটি দুটি নয়, অসংখ্য। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ঢেলার মতোই রাস্তাময় ছিটিয়ে রয়েছে অসংখ্য মরা মানুষ। কেন মেরেছে কারা মেরেছে ওদের? আর কী বীভৎস ওই মৃত মুখ, চোখের দৃষ্টি!

কলকাতা জনারণ্যের জ্যান্ত মানুষেরা সব গেল কোথায়? সার্সি এঁটে অর্গল তুলে ঘরের অন্ধকারে অধর্মরা? ভয়ঙ্কর কোনো আশঙ্কায় ধুক ধুক মুহূর্তগুলো গুণে চলেছে? না, ওরাও মৃত। তাই মহানগরীতে আজ জ্যান্ত মানুষ নেই, শুধু মরা মানুষ।

মানুষ আর যন্ত্রের বিচিত্র শব্দ গর্জনে চঞ্চল কোলাহলময় কলকাতা। তার সব শব্দ, সব কোলাহল কোনো নির্দয় গৌতমের অভিশাপে চির মৌনতার রাজ্যে হারিয়ে গেছে যেন। মালুর মনে হল গল্পে পড়া সেই দৈত্য বিধ্বস্ত কোনো পাতালপুরীর মতোই আজকের কলকাতা। আর এই প্রথম কী এক ভীতির কাঁপুনিতে শিরার রক্ত যেন ঠাণ্ডা হয়ে এল মালুর। এই মৃতের নগরীতে শুধু ভয়। একটা মরা মানুষের বুকের উপর দিয়েই গাড়ির চাকাটা এগিয়ে যায়।

আ-হা-হা শচীন, একটু সামলে চল ভাই। দুহাতে মুখ ঢাকলেন রাকীব সাহেব। মৃতের ব্যথা হয়ত জ্যান্তদের চাইতে একটুও কম নয়।

শচীনদা শচীনদা থামুন। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল মালু। ইপাব তৈরিঃ আল মোস্তাইন বিল্লাহ

থামবে কী! কোন গলিতে কারা ওত পেতে আছে কে জানে? তবু পেছনে সিটের দিকে ঘাড়টাকে একটু কাত করে দেখে নিলেন শচীন বাবু। হ্যান্ডেলটা আল্গা করে একখানি পা বের করে দিয়েছে মালু।

আরে কর কী? পড়ে যাবে যে?

আমাকে যে নামতে হবে রাকীব ভাই। রাবু আপার খবর নেব না? একটা ভাবনা ট্রাক সুমুখে পড়ে শচীনের স্পীডটা কমে যায়। রাস্তায় লাফিয়ে পড়ে মালু।

আরে পাগল হলেন নাকি? এ বড় খারাপ পাড়া। শচীন বাবু গাড়ি থামিয়ে নামবার জন্য তৈরি হলেন বুঝি।

না। ও বড় গোঁয়ার। আসবে না। তুমি চালিয়ে যাও। পেছন থেকে বললেন রাকীব সাহেব।

৩৯.

তড়বড় করে নেবে মালু দেখল, ভুল জায়গায় নেবেছে। বিবেকানন্দ রোডটা আরো সামনে।

আশে পাশে সামনের দিকে একটু দূরে তাকাতে কেমন ভয় করে মালুর। তাই দৃষ্টিটাকে ঠিক পায়ের মাথায় ধরে রেখে হনহনিয়ে চলে ও। তবু ভয়টা যেন পায়ের সাথেই জড়িয়ে থাকে। পা গিয়ে ঠোক্কর খায় মৃত নগরীর বিকৃত বীভৎসতার মুখে।

মানুষের পেট। আধেকটা দূরে বিক্ষিপ্ত। বাকী আরেকটার ছিটানো নাড়িভুঁড়ি মালুর সামনেই পথটা আগলে রয়েছে। পাশ কাটাল না মালু। লাফ মেরে পেরিয়ে গেল।

একটি খোলা হাইড্রেন্ট। ল্যাংটা এক আদমের ছেলে। মাথার দিকটা হাইড্রেন্টের মধ্যে, পা জোড়া আকাশের দিকে কী এক ফরিয়াদের মতো উঁচিয়ে রয়েছে। ঘাতকেরা হয়ত তাড়াহুড়োয় ওর গোটা দেহটা গুম করতে পারেনি। অথবা ঠাসা হাইড্রেন্ট, ওর গোটা শরীরখানি ধরবার মতো জায়গা অবশিষ্ট নেই সেখানে।

হঠাৎ থমকে দাঁড়াল মালু। ভুলে যায় এখানে যে কোনো গলির ঘুপচিতে ওর জন্য ওত পেতে রয়েছে মৃত্যু।

গলির মুখের বাড়িটায় কে বা কারা আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। লেলিহান অগ্নিশিখা লাফিয়ে লাফিয়ে আপন গ্রাসে টেনে নিচ্ছে একটার পর একটা জানালা। কিছুক্ষণের মধ্যেই মানুষ-আসবাব সবই একাকার হবে।

ছাইয়ের গাদায় দাঁড়িয়ে থাকবে কিছু পোড়া ইট কিছু বা দগ্ধ লোহা। বাড়িটার কোনো কিছু আর নজরে পড়ে না। শুধু ধোঁয়া আর আগুন। তারই ভেতর থেকে বাতাস চিরে বেরিয়ে আসে মুমূর্ষ পুরুষ-নারী-শিশুর আর্তচিৎকার-বাঁচাও বাঁচাও, দয়া কর, বাঁচাও আমাদের! প্রাণ ভিক্ষার সেই আর্ত-আবেদনে পাষাণ গলবে,

ব্যাধের তীর খসে পড়বে হাত থেকে। কিন্তু পশুত্বের বর্বরতায় উন্মত্ত এই মহানগরীতে কে দেবে সাড়া মৃত্যুমুখী মানুষের আর্তচিৎকারে?

দ্রুত পা ফেলল মালু।

এই তো রাবু আপার হোস্টেল।

কিন্তু, ফাঁকা। দারোয়ানটা নেই। জানালাগুলো বন্ধ। একটুকরো শাড়িও উঁকি দিচ্ছে না কোনো ছিদ্র দিয়ে। তবে কী?

সেটা ভাবতে পারে না মালু। পথে পথেই তো দেখে এল ও।

কাকে চাই?

আচমকা কী এক ভয়ে কাঁটা দিয়ে গেল মালুর গাটা। ছেলেটাকে ভালো করে দেখল ও। হোস্টেলেরই পাশের বাড়ির রোয়াকে বসেছিল। মালুকে দেখে উঠে এসেছে। পেছনে ওরই বয়সী আর একজন।

এই হোস্টেলের ছাত্রীরা কোথায় গেছে বলতে পারেন? শুধাল মালু।

জবাব না দিয়ে ছেলেটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল মালুকে। পেছনের সঙ্গীর দিকে তাকাল ছেলেটা। যে কোনো অর্থ হতে পারে এমন একটা দৃষ্টি বিনিময় হল ওদের দুজনার। সঙ্গীটি যেন মাথা নাড়ল। একটা নিরাপদ দূরত্ব থেকে সন্ধানী চোখে যেন জরিপ করে গেল মালুর আপাদ মস্তক। তারপর একপা এগিয়ে কেমন রুক্ষ গলায় শুধাল : ঠিক কাকে চাই বলুন তো? মানে নাম... রাবেয়া খাতুন। ফিফথ ইয়ার ইতিহাসের ছাত্রী। যেন মরিয়া হয়েই বলে ফেলল মালু।

কিন্তু, বলেই ওর চক্ষু স্থির, রক্ত হিম। কোন্ গুপ্ত সংকেতে বেরিয়ে এসেছে এক ডজনেরও উপর জোয়ান জোয়ান ছেলে। হাতে ওদের সব ধরনের অস্ত্র, বন্দুক, ছোরা, লাঠি। নিমেষের মাঝেই ওরা ঘিরে ফেলল মালুকে। তা হলে...এখানে সব শেষ? ওর নিশ্বাসে আর ভারি হবে না এ পৃথিবীর বাতাস? সেই বাকুলিয়ার ছেলেটা রাশু, যাকে সোহাগ করে ডাকত মালু বয়াতি, এই মুহূর্তে পৃথিবীর সমস্ত আলো নিভে যাবে তার জন্য? ...কিন্তু, রাবু আপা? রাবু আপাকে কী কেটে ফেলেছে ওরা?

আরে মশায় কথা বলছেন না কেন? কী হল আপনার?

কে! মালু কথা বলছে না। আশ্চর্য তো? মারবার আগেও কৌতুক করছে এরা?

দুদুবার এটাক হয়েছে। শেষের বার তো ঠেকাবার জন্য বন্দুকই ছুঁড়তে হল। খবর গেছে লালবাগে। তবু এখনো আসছে না পুলিশ। বলা তো যায় না কখন আবার এটাক করে বসে। তা আমরাও রেডি, দেখছেন তো বন্দুক, এলোপাতাড়ি গুলি ছুঁড়ে চলব। দুচারটে মরে মরুক, মরা দরকার।

ও কী, ফ্যাল ফ্যাল করে দেখছেন কী? যান না ভেতরে। দেখা করে আসুন গিয়ে। আপনার দিদি বুঝি? তা মশায় আপনারাও তো বেশ লোক! দেখছেন হাঙ্গামা পাকিয়ে উঠেছে, কাল বেলা-বেলি এসে নিয়ে গেলেই পারতেন?

একটি রাত। একটি সকাল। পদে পদে মৃত্যুর আতঙ্ক। মৃত্যুর চেয়েও ভয়ানক, পল পল মৃত্যু ভয়ের নিদারুণ যন্ত্রণা। এতে যদি মানুষের বুদ্ধি চেতনা লোপ পায়, বেশি কী? এক গাল বোকার হাসিতে কিম্ভুত মুখ করে সপ্রতিভ হতে চেষ্টা করল মালু। আর ছেলেগুলোও হেসে উঠল। কাল থেকে তো হাসবার অবকাশ পায়নি ওরা! তাই হাসির এই মওকাটা পেয়ে পরম সুখে হাসছে।

রেসকিউ পার্টি এসে গেল। খোলা দুটো ট্রাক রিভলভারধারী সার্জেন্টের পাহারায়।

হোস্টেলের সেই পাশের বাড়িটা থেকে একে একে বেরিয়ে এল মেয়েরা। উঠে বসল ট্রাকে।

ওরা মুক্ত। মুক্তির আনন্দ ওদের মুখে। তবু আঁচলের খুঁটে চোখ মুচছে ওরা। প্রেম প্রীতি ভালোবাসার উৎস যে মানবতা সেই মানবতার প্রতি শ্রদ্ধায় মন ওদের নুয়ে এসেছে। ভেদ বুদ্ধির আর অমানুষিকতার মাঝে মনুষ্যত্বের যে মশাল ওদের জন্য জ্বলে উঠেছিল যাবার আগে বুঝি তারই উদ্দেশে দুফোঁটা অশ্রুর অর্ঘ্য রেখে যেতে চায় ওরা।

ছেলেগুলো হাত নাড়ল। রুমাল উড়াল। ওদের চোখে সেই আশ্চর্য জ্যোতি, যা গত কালকের ঘন দুর্যোগের রাতে ওদের পথ দেখিয়েছে। ধর্ষিত কলকাতার বেহুঁশ রাজপথ ধরে ছুটে চলে ওদের ট্রাক। এখানে ছিন্ন মুণ্ড ট্রাকের চাপায় থ্যাতলান শব। ওখানে ঘর পুড়ছে। লুট হচ্ছে পাশের একটি দোকান। আর ধোঁয়ায় আকাশটা যেন প্রেতের আলিঙ্গনে টেনে নিয়েছে গোটা শহরটাকে।

কেন? কেন এই মৃত্যু নির্মম, এই হানাহানি? সেই গলির মোড়ে লকলকে আগুনের শিখায় দগ্ধ নারী আর শিশুদের কাতর প্রাণ ভিক্ষার মতোই তীক্ষ্ণ এক আর্তনাদ বেরিয়ে এল মালুর বুক চিরে।

ওয়েলেসলি স্ট্রীটের ইভাকুউ ক্যাম্পে ট্রাকগুলো নাবিয়ে দিল ওদের। চল পার্কস্ট্রীটে পৌঁছিয়ে দিবি আমায়। এতক্ষণে মুখ খুলল রাবু। সেই যে ট্রাকে উঠে মালুর হাতের সাথে প্যাঁচিয়ে রেখেছিল পাঁচটি আঙ্গুল এবার আঙ্গুলগুলো খুলে নিল ও। হাতটা সরিয়ে নিল মালু।

মালু তাকায় রাবুর মুখের দিকে। নরক রাতের ছাপটা এখনো মিলিয়ে যায়নি ওর মুখ থেকে।

বাঁয়ে মোড় নিয়ে ইলিয়ট রোডে পড়ল ওরা।

ফিরিঙ্গীগুলোর বেজায় ফুর্তি মনে হচ্ছে। একটা কিছু বলার জন্যই যেন বলল মালু।

আজ তো ওদেরই ফুর্তির দিন সংক্ষেপে বলে পথ চলে রাবু।

ওর হাতের জিনিসটার উপর নজর পড়ল মালুর। চিনল সে। মালুকে সাথে নিয়েই কিনেছিল জাহেদ, রাবুর জন্মদিনের ওই উপহারটা।

মেজো ভাই কী বলবে জান? কৌতুক করে বলল মালু।

কী?

বলবে, রাবুটার কোনো আক্কেল নেই। আক্কেলই যদি থাকত তাহলে পালাবার সময় শাড়ি নয়, গহনা নয়, একটা ছড় ওঠা পুরনো হাতব্যাগ নিয়ে পালিয়ে আসে?

হেসে দেয় রাবু। আর হাসির সাথে রাঙিয়ে যায় ওর ঝিনুক-মসৃণ দুটো গাল।

মালুও হাসে, মনে মনে বলে এ-ই ভালো, আজকের দিনের টুঁটি চেপা আতঙ্ক-স্তব্ধতাকে হাসি দিয়েই উড়িয়ে দাও।

হঠাৎ রাবুর পায়ের দিকে চোখ পড়ে হো করে হেসে উঠল মালু। হাসি ওর থামে না।

রাবুর এক পায়ে স্যান্ডেল আর এক পা খালি।

এ তো ভারী মজা! তুমি এখনও টের পাওনি? অনেক কষ্টে হাসি থামিয়ে শুধাল মালু। বিব্রত রাবু তাড়াতাড়ি স্যান্ডেল খানা রাস্তার পাশে ছুঁড়ে দিল। উভয় পা স্যান্ডেল মুক্ত করে মালুর হাসিতে যোগ দিল।

সত্যি আজকের দিনে হুঁশ রাখা দায়। রাবুর বেখেয়ালীর পক্ষেই একটা যুক্তি তুলে ধরল মালু।

আসলে কখন ট্রাক আসবে, কখন বিবেকানন্দ রোড ছেড়ে নিরাপদ এলাকা মানে মুসলমান এলাকায় পৌঁছুবো, এ দুশ্চিন্তাটা সারাক্ষণ ঢিপ ঢিপ করছিল বুকের ভিতর। ট্রাকগুলো যখন এল তখন কী ভাবে যে বেরিয়ে এসেছি সেটা জানিনে। বলার প্রয়োজন নেই তবু কথাগুলো বলল রাবু। আচ্ছা রাবু আপা বলতে পার? কেন এমন হল, কেন এমন হয়?

কিছুক্ষণ চুপ রইল রাবু একটু বুঝি ভাবল। বলল, গোলামিকে সহ্য করা পাপ। দুশো বছরে অনেক পাপের বীজ জমেছে আমাদের রক্তে। এ হয়ত তারই ফল।

মালুর কাছে স্পষ্ট নয় কথাগুলো। জিজ্ঞাসু চোখে ও চেয়ে থাকে রাবুর মুখের দিকে। রাবু ততক্ষণে শেষ করেছে ওর কথাটা-নইলে বিদেশি শত্রুকে ভুলে গিয়ে নিজেরা নিজেরা মারামারি কাটাকাটি করব কেন আমরা? মালু আরও নির্দিষ্ট করে আরো স্পষ্ট করে বুঝতে চায় ব্যাপারটা। তুমি তা হলে বলতে চাও পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনে হিন্দু-মুসলমান মিলিত সংগ্রাম সম্ভব?

কেন সম্ভব নয়? ক্ষেতে ওরা লাঙ্গল দেয় একসাথে, আপিসে কারখানায় কাজ করে এক সাথে। ইংরেজের লাথি খায় এক সাথে। সংগ্রামটা এক সাথে করতে পারবে না কেন?

রাবুর মুখে, রাবুর কথায় ক্রোধ, ঘৃণা, বিক্ষোভ। চমকে তাকাল মালু। শুধাল, এ বিক্ষোভ কার বিরুদ্ধে রাবু আপা?

যারা এসব করে এবং করায় তাদের বিরুদ্ধে। নিজের বিরুদ্ধেও।

নিজের বিরুদ্ধে কেন?

কেননা, এই অমানুষিকতাকে, এই বিশ্বাসঘাতকতাকে আমি রুখতে পারছি। শক্তি নেই আমার। বিরুদ্ধপক্ষ আমার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী, অনেক বেশি…

কিন্তু শক্তির অভাবটা কখন হয় রাবু আপা? রাবুর কথাটা শেষ হবার আগেই শুধাল মালু।

জানি জানি, তুই বলবি যেখানে নিষ্ঠার অভাব সেখানেই শক্তির ঘাটতি, বিশ্বাসের মূল্য যেখানে দৃঢ় সেখানে কখনো শক্তির অভাব ঘটে না। কিন্তু বলতে পারিস,

গুণ্ডারা যখন হোস্টেলের উপর হামলা করল–মানবতার উপর অটল বিশ্বাসী হয়েও আমি কেন এত অসহায় বোধ করেছিলাম?

কিন্তু যারা গুণ্ডাদের রুখে দাঁড়াল, তোমাদের রক্ষা করল তারা মোটেই অসহায় বোধ করেনি।

ঠিক কথা। কিন্তু তারাও তো আমাদের এক রাতের বেশি রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিতে পারল না? তারা আমাদের শুধু সাহায্য করল নিরাপদে পালিয়ে আসতে। আমরা কৃতজ্ঞ, আমরা ভাবলাম–ওদের স্বদেশপ্রেম, ওদের মানবপ্রীতির তুলনা নেই। ওরা ভাবল, ওদের পবিত্র দায়িত্ব সমাধা করে ওরা মহত্ত্বের অধিকারী। কিন্তু সত্যি কী তাই?

এদের সংখ্যা তত বাড়বে, রাবু আপা। এরাই একদিন বিজয়ী হবে। তখনও কী তুমি একথাই বলবে?

না। কিন্তু যদ্দিন তা না হচ্ছে তদ্দিন তুই আমি-কেউ কী আত্মধিক্কার থেকে মুক্তি পাব?

ওরা এখন সার্কুলার রোডে এসে পড়েছে। যে দৃশ্য মালু দেখে এসেছে গ্রে স্ট্রীটের মোড়ে কর্ণোয়ালিস স্ট্রীটে, এখানেও সেই একই দৃশ্য। প্রায় জনহীন রাজপথ, এখানে সেখানে মৃতদেহ; একটি বাড়ি জ্বলছে ধিকি ধিকি ভেতরের মানুষগুলো হয়ত আগেই মরেছে। একটি আলকাতরার দোকান পুড়ছে।

আমার মুশকিলটা কী জানিস?

রাবুর প্রশ্নে ওর দিকে মুখ ফেরাল মালু।

আমি জানি কী আমার উচিত, কী আমার করা উচিত, কী হওয়া উচিত।

কিন্তু মনের এই ইচ্ছার সাথে আমার নিষ্ঠা আর ধৈর্যের বড় গরমিল। তাই হাত পা ছুঁড়ে চেঁচিয়ে চিল্লিয়েই দায়িত্বটা শেষ করি। পরিশ্রান্ত হই। অবাক হয়েও অবাক হয় না মালু। কলকাতার এই কবছরে খুব অল্প দিনই রাবুর সাথে দেখা হয়েছে ওর, কথা হয়েছে ঢের। মালু দেখেছে চৌদ্দ বছরের যে কিশোরীটি ষাট বছরের বুড়ো কলমা-পড়া স্বামীটির ঘর করবে বলে গোঁ ধরেছিল আত্মজিজ্ঞাসা আর আত্মবিশ্বাসে আজ সে এক সজাগ নাগরিক।

জাহেদকে আমার এজন্যই ভালো লাগে, ওর সমস্ত ইচ্ছা, সমস্ত কর্ম একটি মাত্র কেন্দ্র বিন্দুকে ঘিরে আবর্তিত। তাই নিবেদিত প্রাণ। রাবুর মুখে জাহেদের প্রশংসা,

এই প্রথম শুনল মালু। এবার সত্যি অবাক হল মালু। অবাক হয়েই রাবুর দিকে চোখ ফেরাল, দেখল, রাবুর মুখে কী এক লজ্জার আবীর।

দেড় গণ্ডা জেনানার খসম ওই বুড়ো জোব্বাওয়ালার চেয়ে আমি যে সুপাত্র এবং সুপুরুষ, সেটা মানবি তো?

না। যেন ছিপি আঁটা বোতল থেকে এক দলা গ্যাস ছাড়া পেয়ে সশব্দে বেরিয়ে এসেছিল।

বিধ্বস্ত বাসর ঘরে সেদিন আরো অনেক কথা, অনেক কান্না ঝরেছিল। কিন্তু রাবুর ওই শেষ উত্তরটা আর সেই উত্তর শুনে ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া জাহেদের মুখখানা মালুর মনে গভীর দাগ কেটে বসে গেছে। সে দাগ আজও মোছেনি।

আজও কী রাবু তাই ভাবে?

তবে মেজো ভাইয়ের সামান্য একটু প্রশংসা করতে গিয়ে অমন রাঙিয়ে উঠল কেন রাবু আপা? প্রাণ নিয়ে পালাবার মুহূর্তেও তার দেওয়া সামান্য উপহারটা ভুলে গেল না কেন?

দারুণ ইচ্ছে হলেও প্রশ্নটা মুখ দিয়ে উগরে ফেলবার মতো সাহস সঞ্চয় করতে পারল না মালু। জিজ্ঞেস করল অন্য কথা, কিন্তু এই কদিন আগেই তো তুমি তুমুল তর্ক বাধিয়েছিলে মেজো ভাইর সাথে। বলেছিলে, ভুলে করেছ মেজোভাই।

এখনো তাই বলি এখনো বলি ও ভুল করছে। কিন্তু ভুল হোক শুদ্ধ হোক ওতো কিছু করছে। ওতো রয়েছে মানুষের মাঝে, কর্মের মাঝে।

ওর রয়েছে ত্যাগের স্পৃহা। কর্মের মাঝেই ভুল শুধারাবার পথ ও পেয়ে যাবে, আজ হোক কাল হোক। কিন্তু আমি, আমরা অকম্মার দল? গলাবাজি ছাড়া আর কী করছি আমরা?

করতে না করছে কে, রাবু আপা?

মালুর খোঁচাটা এক ঢোকে গিলে ফেলল রাবু। তারপর চুপ করে গেল।

জনহীন সার্কুলার রোডে কয়েকটা শকুন জড়ো হয়েছে। হয়ত ওরা খবর পেয়েছে, এন্তার মানুষ খুন হয়েছে এই শহরে। পচা মাংসের লোভে তাই আকাশ ছেড়ে নেবে এসেছে ওরা।

শকুনগুলোকে পাশ কাটিয়ে মালু আর রাবু উল্টো ফুটপাতে এসে মোড় নেয় পার্ক স্ট্রীটের দিকে। যেন খুব মনোযোগ দিয়ে ফুটপাতের চতুষ্কোণ ঘরগুলো গুণছে রাবু। গুণতে গুণতে পা ফেলছে।

আমাকে খোঁচা দিয়ে কোনো লাভ নেইরে, মালু। হঠাৎ বলল রাবু। কেন? নিজেকে মুক্ত করতে পারলাম না আমি। আমি কেমন করে দেশকে, মানুষকে জাগাবার ব্রত নেব?

স্বস্তির হাওয়া বইল পার্ক স্ট্রীটের বাড়িটায়।

রাবু তাহলে অক্ষতই ফিরে এসেছে? সেদিনের পার্কসার্কাসে বুঝি এর চেয়ে বড় বিস্ময় আর কিছুই ছিল না।

আমরা তো ভেবে ভেবে মরি। কত টেলিফোন কত দৌড়াদৌড়ি তোর জ্যাঠাজীর। কিন্তু না ছিল যাবার উপায়, না খবর পাবার। শেষে রেসকিউ কমিটির কারা এসে বলে গেল মেয়েরা নিরাপদ, তবে গিয়ে একটু নিশ্চিন্তি। শেষ করে লম্বা দম নিলেন সৈয়দ গিন্নী। বয়স আর সুখের ভারে বেশ ওজনী হয়েছেন সৈয়দগিন্নী। ছেলেমেয়েরা ঘিরে ধরল রাবুকে। ওমা হিন্দুরা হাতের মুঠোয় পেয়ে ছেড়ে দিল তোমায়? স্কুলে পড়া কচি কচি ছেলেমেয়ে, ওরাই যেন সবচেয়ে বেশি অবাক হয়েছে।

আমরাও ছাড়িনি। ওই দেখ মল্লিক বাজার থেকে এখনো ধুঁয়ো উঠছে। এদিকে ডাক্তার ঘোষ কী করেছিল জান? বন্দুক দেখিয়ে ছিল। আর যায় কোথায়। মার মার করে ঝাঁপিয়ে পড়ল লোক। আচ্ছা এখন থাম তোমরা। ওদের থামিয়ে দিল রাবু। বাইরের ঘরে বসিয়ে রেখেছে মালুকে। পর্দাটা ফাঁক করে ডাকল ওকে, আয় ভেতরে আয়। বৈঠক ঘরের পর লম্বাবারান্দা। বারান্দার ডান পাশ ধরে ঘরের সারি। প্রথম কামরাটি জাহেদের। দ্বিতীয় কামরাটি ওরা ছেড়ে দিয়েছে রাবুর জন্য। মালুকে সে ঘরে এনেই বসাল ও।

বেরিয়ে গেল রাবু। ফিরে এল এক তশতরী মোহনভোগ আর পেয়ালা ভর্তি চা নিয়ে। তশতরী আর চায়ের কাপটা মালুর সুমুখে রেখে আবার বেরিয়ে গেল রাবু।

মোহনভোগের গন্ধটা মালুকে স্মরণ করিয়ে দিল, সকাল থেকে পেটে পড়েনি কিছু। গতরাতের আতঙ্ক উত্তেজনার মাঝে খাওয়াটা ছিল জবরদস্তি, না খাবার শামিল। চনচনিয়ে উঠল ওর ক্ষিধেটা। গরম তাপে যেন পুড়ে যাচ্ছে নাড়ি ভুঁড়িটা। তবু হাত তুলে তশতরিটা স্পর্শ করতে পারল না মালু।

ওকি, খাচ্ছিস না যে? খাবারটা তো আমি দিলাম। কখন আবার এসে পড়েছে রাবু।

তুমি দিলেই বা…কথাটা শেষ করতে পারে না মালু।

তীক্ষ্ণ বুঝিবা রূঢ় দৃষ্টিটা সূঁচের আগার মতো ওর মুখের উপর ধরে রাখে রাবু। বলে, আজ ওসব অভিমান রাখতো। খেয়ে নে।

মুখটা নাবিয়ে নেয় মালু। আশ্রিতের অন্নে ওর লালন। দয়ার অন্নকে তাই ওর ঘৃণা। পারলে বার বছর ধরে গিলে আসা সেই পরান্নটা উগরে ফেলত মালু। রাবু কী সেটা জানে না?

আর এই সেদিনের কথাটাও কী ভুলে গেছে রাবু? হ্যারিসন রোডের মোড়ে দেখা হয়ে গেছিল জাহেদের সাথে। হতচ্ছাড়া, কোলকাতায় এসে কোথায় কোথায় ঘুরছিস তুই, আমার সাথে দেখা না করে? বেশ রেগেই বলেছিল জাহেদ। আর অনিবার্য ভাবে হাতটাও বাড়িয়ে দিয়েছিল মালুর কানের দিকে। কিন্তু, অনেকগুলো বছর পেরিয়ে রীতিমতো জোয়ান হয়েছে মালু। তাছাড়া রয়েছে প্রকাশ্য রাজপথের ভিড়। বুঝি সে সব ভেবেই হাতটাকে অর্ধেক পথ থেকেই ফিরিয়ে এনেছিল জাহেদ। কিন্তু ওকে ট্রামে তুলে সোজা বাসায় নিয়ে এসেছিল। বলেছিল, বিছানাপত্র নিয়ে আয়, এখানেই থাকবি।

ঘোর আপত্তি তুলেছিলেন সৈয়দগিন্নী।

গাঁও বাড়িতে দুজন দশজন খায় থাকে, গায়ে লাগে না। কিন্তু বাপু, দুটো জাগির, পাঁচটা চাকর, কলকাতার কন্ট্রোলের বাজারে ওই নিয়েই হিমশিম খেয়ে যাচ্ছি আমি। তার উপর আর একজনের ঝামেলা। অত বরদাশত হবে না আমার।

বুঝি শরমে মরছিল রাবু। প্রতিবাদ করেছিল জাহেদ : কত লোকই তো ফালতু খাচ্ছে। তাছাড়া আমাদের বাড়িতেই জন্ম মালুর। আমাদের বাড়িতেই মানুষ। ওর তো দাবীও রয়েছে।

ছেলের যুক্তিতে বুঝি বা এক পা হটে আসেন সৈয়দগিন্নী। আল্লাহ যখন তৌফিক দিয়েছে গরিব কাঙ্গাল খাবেই তো। আমি বলছি ঝঞ্ঝাট; ঝঞ্ঝাট আমার ভালো লাগে না এ বয়সে। তা ছাড়া লোকের ভিড় রাশেদ একদম বরদাশত করতে পারে না।

সৈয়দ সাহেবের বড় ছেলে রাশেদ। কিছুদিন আগেই মুখে পাইপ আর বগলে মেম নিয়ে ফিরে এসেছিল বিলেত থেকে।

প্রত্যুত্তরে কী বলেছিল জাহেদ, শোনার জন্য অপেক্ষা করেনি মালু। সৈয়দ বাড়ির ফালতুর জীবনের ইতি টেনেছে ও অনেক আগে। পুনরায় পরভৃতিকার গ্লানি গায়ে মাখবার ইচ্ছে নেই ওর।

সেদিন বাড়িতেই ছিল রাবু। তার চোখের সুমুখ দিয়েই তো বেরিয়ে গেছিল মালু। তবু আজ অমন জিদ ধরেছে কেন রাবু? থাক, কষ্ট করে আর গিলতে হবে না তোকে। তশতরীটা সরিয়ে রাখল রাবু। চায়ের কাপটা অমনি পড়ে রইল।

কী এক লজ্জা থেকে যেন বেঁচে গেল মালু। কৃতজ্ঞ চোখ মেলে ও তাকায় রাবুর দিকে। ছোট্ট করে হাসে রাবু যেন বলে–বুঝেছি। উঠি এবার। দরজার দিকে পা বাড়ায় মালু।

এমন সময় বাইরের ঘরে শোরগোল শোনা গেল। ওকি? মেজ ভাই? রাবুই প্রথম চিনল।

কয়েকজন অপরিচিত লোক, ওদের কাঁধে জাহেদের অর্ধচেতন রক্তাক্ত দেহ। এই যে এদিকে। বারান্দার ডানে প্রথম ঘরটাই ওদের দেখিয়ে দিল রাবু। আস্তে আস্তে কাঁধ থেকে নাবিয়ে জাহেদকে বিছানায় শুইয়ে দিল ওরা। সংক্ষেপে বলে গেল ঘটনাটা।

রেসকিউ পার্টি নিয়ে কয়েকটা বিপন্ন পরিবারকে উদ্ধার করতে যাচ্ছিল জাহেদ। পথে লরীর উপর কে বা কারা ছেড়ে দিয়েছে দেশি বোমা। মাথায় চোট লেগেছে জাহেদের। ফার্স্ট এইড দেয়া হয়েছে। আশঙ্কার কারণ নেই।

ওদের মেলা কাজ। তাই ওরা চলে গেল।

যা তো মালু, ওই মোড়ে ডিসপেন্সারী। সঙ্গে করে নিয়ে আসবি ডাক্তারকে। মালুকে হুকুমটা দিয়েই জাহেদের দিকে মন দিল রাবু। মাথার পেছনটা ব্যান্ডেজ করা। সেখানেই বুঝি চোট লেগেছে বেশি। ঘাড়ে পিঠে চড়ে গেছে চামড়া। পাঞ্জাবিটা দুএক জায়গায় রক্তের দলায় কুচকে এসে সেঁটে গেছে গায়ের সাথে। কাঁচি দিয়ে ফড়ফড় করে পাঞ্জাবিটা কেটে ফেলল রাবু। ভেজা ন্যাকড়ায় ধুয়ে ফেলল জমাট বাঁধা ক্ষত।

ডাক্তার এল। ওষুধ দিল।

চড় চড় করে গায়ের তাপটা একশো চারে উঠে গেল জাহেদের।

মাথায় আইসব্যাগ চাপিয়ে ওর শিয়রের কাছে বসে রইল রাবু।

বের কর। এক্ষুণি বাড়ি থেকে বের করে দাও ওই বেতমিজ কমবখতটাকে। কার হুকুমে তাকে বাড়ি ঢুকতে দিলে তুমি। আদ্যোপান্ত শুনে গিন্নীর উপর হুংকার ছাড়লেন সৈয়দ সাহেব। ইংরেজ সরকারের অনুগত কর্মচারী এবং শান্তিপ্রিয় প্রজা সৈয়দ সাহেব। হাঙ্গামা হুজ্জত তাঁর না-পছন্দ। জেহাদই হোক আর ইংরেজ খেদার লড়াই-ই হোক, নিজের ছেলে সে-সবে জড়িয়ে পড়বে মাথা ফাটিয়ে আসবে, তাতে ঘোর আপত্তি সৈয়দ সাহেবের। আহা থামুন তো। ছেলের জান নিয়ে টানাটানি আর আপনি লেগেছেন গাল পাড়তে। সৈয়দগিন্নীর সংযত কণ্ঠে চিরন্তন মাতৃ-প্রতিবাদ।

রাখ তোমার মেয়েলি আদর। বলে দাও তোমার ছেলেকে–আমার বাড়িতে থেকে, আমার খেয়ে ওসব ভূতের বেগার চলবে না। চেঁচিয়ে চলেন সৈয়দ সাহেব।

পেছনেই দাঁড়িয়ে ছিল রাশেদ। এগিয়ে এসে বলল : আব্বা তো ঠিকই বলছেন, আম্মা। জাহেদটা স্রেফ ভ্যাগাবন্ড হয়ে যাচ্ছে। ওকে আর আশকারা দেয়া যায় না। স্ট্রিক্ট কন্ট্রোলে আনতে হবে।

বড় ছেলের কথাটা টেনে নিয়ে সৈয়দ সাহেব আরও শক্ত কিছু বলতে যাচ্ছিলেন হয়ত, কিন্তু তার আগেই ওদের সুমুখে বন্ধ হয়ে গেল ঘরের দরজাটা। ভেতর থেকে শুনা গেল রাবুর গলা, প্লিজ বড় ভাই চেঁচিওনা এটা রুগির ঘর।

ওষুধ আর ঘুমের ক্রিয়ায় দিন দুইয়ের মধ্যেই উঠে বসল জাহেদ। একটুকরো হাসির ঝিলিক মেলে মেঘমুক্ত আকাশের মতোই উজ্জ্বল হয়ে উঠল রাবু।

কপাল ফেটেছিল সেই কবে, এবার মাথাটাও ফাটল। বুঝলি? রাবুর উজ্জ্বল আভা ছড়ান মুখটার দিকে তাকিয়ে বলল জাহেদ।

বারে বারে অমন খোঁচা দাও কেন, মেজো ভাই?

তুই যেন মোটেই দিস না।

আমি যা করব তুমিও তাই করবে?

চুপ করে যায় জাহেদ।

খোলা ব্যান্ডেজটা ধীরে ধীরে পাট করে রাখে রাবু। তুলোগুলো ফেলে দেয় চিলুমচিতে। সযত্নে চিরনি বুলোয় জাহেদের মাথায় একটি একটি করে জটবাঁধা চুল আল্গা করে দেয়।

আলিগড় থাকতে তবু কিছু লেখাপড়া করতে। এখানে এসে তো সে পার্টটাও চুকিয়ে দিলে। পরীক্ষাটাও দিলে না। তুলো চেপে ওর মাথায় নতুন ব্যান্ডেজটা বাঁধতে বাঁধতে বলল রাবু।

কী বলতে চাস তুই?

বলতে চাই সারা জীবন কী এই হৈ-হুজ্জুতেই কাটবে নাকি?

তুই, তুইও একথা বললি? রাবুর হাত থেকে মাথাটা ঝটকা মেরে ছাড়িয়ে নেয় জাহেদ। উঠে বসে। ব্যান্ডেজের কাপড় আর তুলো ছিটকে পড়ে মেঝেতে।

রাবু ভাবলেশহীন। ব্যান্ডেজ আর তুলোটা কুড়িয়ে নেয় রাবু। ফেলে দেয় চিলুমচিতে। বের করে আনে ব্যান্ডেজের নতুন কাপড় নতুন তুলো। তারপর দুহাতের তালুতে জাহেদের মাথাটাকে টেনে আবার শুইয়ে দেয় ওকে। তুলো চেপে ব্যান্ডেজ বেঁধে চলে, যেমন বাঁধছিল একটু আগে। শুধু হৈ হৈ করলেই দেশসেবক হওয়া যায় না। পড়াশোনাও করতে হয়। শান্ত কণ্ঠে বলল রাবু।

মানে এম.এ. পরীক্ষাটা দিতে হবে, ডিগ্রীর লেজটা আর একটু দীর্ঘ করতে হবে। এই তো?

মানেটা মোটেই তা নয়। ডিগ্রী নেওয়া, না নেওয়া সে তোমার ইচ্ছে। কিন্তু দেশটাকে চিনতে হলে জানতে হলে যে একটু পড়াশোনার দরকার, এই সহজ কথাটা বুঝছো না কেন?

ও, এই পড়াশোনার কথা বলছিস? তবে যে খামোখা রাগ করলাম তোর উপর?

সে আর কী করা যাবে, অর্ধেকটা শুনেই তো রেগে বসলে তুমি। আচ্ছা আর রাগবো না, কখনো রাগবো না। বুঝলি? বলতে বলতে কী এক খুশিতে উচ্ছ্বসিত হল জাহেদ; দুহাত বাড়িয়ে ফস করে ধরে ফেলল রাবুর মুখটা। টেনে আনল; তারপর চেপে রাখল ঠোঁটের উপর। কয়েকটা নিস্তব্ধ মুহূর্ত। জাহেদের ঠোঁটের উষ্ণতায় মুখটা বিছিয়ে নিঃসাড় পড়ে থাকে রাবু। বুঝি ফুরিয়েছে ওর সংস্কারের আয়ু। বুঝি ভেঙে গেছে ওর অর্থহীন প্রতিরোধের দেয়াল।

রাবু আলগা হতে চায়। কিন্তু পারে না। দুটো শক্ত বাহুর আলিঙ্গনে আটকা পড়েছে ও। আর ওর নিস্তেজ স্নায়ুতে নেই আলগা হবার মতো সামান্য একটু শক্তি।

হয়ত অনেক কথা মনে পড়ছে ওদের। হয়ত কোনো কথাই এই মুহূর্তে মনে পড়ার মতো নয়, মনে পড়ছে। না এখন এই মুহূর্তে দুজোড়া ঠোঁটের উষ্ণতায় নিঃশেষ হওয়াটাই বুঝি একমাত্র সত্য।

অনেকক্ষণ পর নিজেকে ছাড়িয়ে নিল রাবু। বলল, ছাড় লক্ষ্মীটি কেউ এসে পড়বে।

৪০.

খেয়েছিস?

আলবৎ।

মিথ্যে কথা।

সহসা রাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে সত্য কথাটা গোপন করতে পারল না মালু। চুপ করে রইল।

আমার পয়সা দিয়ে বাজার থেকে কিছু আনিয়ে দিই। খাবি তো? নাকি এ বাড়িতে বসে খেতেও তোর আপত্তি।

হা না কী যে বলবে মালু ভেবে পায় না, ইতস্তত করে ও।

তার চেয়ে এক কাজ করি, আমিও খাইনি; চল্ কোনো হোটেলে গিয়ে খেয়ে আসি আমরা।

চল।

খেতে বসে অনর্গল কথা বলে গেল রাবু। অনেক নতুন খবর শোনাল মালুকে। পার্ক সার্কাস ময়দানে দাঙ্গা বিরোধী মিটিং হয়েছে। হিন্দু-মুসলিম মিলনের দাবী জানিয়ে সে মিটিংয়ে জাহেদ আর রাবু বক্তৃতা দিয়েছে। হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতি এবং শান্তির জন্য, দাঙ্গাবাজদের রুখবার জন্য শান্তি কমিটি হয়েছে। রাবু সে কমিটির মেম্বার হয়েছে। মেজো ভাই নেই? শুধাল মালু।

হা হা, সেও আছে কমিটিতে। কথার মাঝে বাধা পেয়ে বিরক্ত হয়েই বলল রাবু। বলে চলল : ব্রেবোর্ন কলেজে যে ইভাকুই ক্যাম্প হয়েছে সেখানে। ভলান্টিয়ার

হয়েছি। কলাবাগান গিয়েছিলাম, সেখানে বস্তির লোকেরা রায়ট ঠেকিয়েছে; কাউকে রায়ট করতে দেয়নি। বাইরে থেকে গুণ্ডারা গেছিল রায়ট বাধাতে। ওদের হটিয়ে দিয়েছে। তিলজলায় প্রায় সব বাড়িতেই লুটের মাল মজুদ ছিল। কিন্তু কী আশ্চর্য! আমরা অনুরোধ করলাম, আমি ছোটখাটো একটা বক্তৃতাও দিয়ে ফেললাম। ওরা সব লুটের মাল আমাদের হাতে তুলে দিল। বলল, এগুলো যাদের জিনিস তাদের কাছে তোমরা পৌঁছে দিও। আর বলল, যারা চলে গেছে ঘর ছেড়ে অন্য পাড়ায় তাদের ফিরিয়ে নিয়ে এস। আমরাই তাদের পাহারা দেব। অদ্ভুত সুন্দর অভিজ্ঞতা, তাই না?

রাবুর চোখে দীপ্তি। রাবুর মুখে অপার্থিব কোনো আনন্দের গর্বিত ঘোষণা। মুগ্ধ চোখে চেয়ে থাকে মালু। রাবুর এমন সহজ আনন্দিতরূপ সেই ছোটবেলার পর আর কখনও দেখেছে কিনা মনে পড়ল না মালুর।

রাবু বলে চলেছে, গতকাল মাওলালির দিকে আমরা শান্তি মিছিল বের করেছিলাম। জাহেদ তো কিছুতেই আমায় যেতে দেবে না মিছিলে। আমি বললাম, যাবই। অদ্ভুত এক যুক্তি দিল জাহেদ, গুণ্ডারা আক্রমণ করলে মিছিল সামলাব, নাকি তোমাদের রক্ষা করব? আমি বললাম, নিজেদের সামলিও তোমরা, দয়া করে আমাদের নিয়ে মাথা ঘামিও না, আমরা আত্মরক্ষা করতে জানি।

সেই দিঘলদেহী মেয়েটাকে মনে আছে তোর?

মালু ঠিক ধরতে পারল না। শুধাল, কোনটার কথা বলছ?

আরে, আমাদের ব্রেবোর্ন কলেজের সেই মেয়েটা, স্ট্রাইকের লিডার ছিল এই অজুহাতে যাকে কলেজ থেকে বের করে দিল প্রিন্সিপাল মিস গ্রস। আর আমরা আন্দোলন করলাম, মনে নেই?

হাঁ হাঁ চিনেছি, সেদিন ডালহৌসি স্কোয়ারের মিছিলেও ছিল তোমাদের সাথে।

সে মেয়ে তো প্রায় লাফিয়ে পড়ল জাহেদের ঘাড়ে; আপনারা পেয়েছেন কী? চিরকাল মেয়েদের অবলা ভেবে এসেছেন, আজও তাই ভাবেন, ভাবেন আমরা কী আর আত্মরক্ষা করতে জানি? আমি হলফ করে বলছি গুণ্ডাদের আমরা ঠেঙ্গাতে পারি এবং ঠেঙ্গাব।

কিন্তু পত্রিকায় দেখলাম তোমার মিছিল নাকি গুণ্ডারা আক্রমণ করেছিল শুধাল মালু।

আক্রমণ বলে আক্রমণ? রীতিমতো হামলা। তিন দল তিন দিক থেকে উন্মুক্ত ছোরা নিয়ে উন্মাদের মতো হামলা করেছিল। সত্যি কথা বলতে কী ভয় পেয়ে গেছিলাম, বাব্বাঃ ওরকম ছোরার নাচনে কার না ভয় লাগে।

তারপর? রুদ্ধশ্বাস মালু।

তারপর আর কী? মিছিলের কয়েকটা বেপরোয়া ছেলে লাঠি নিয়ে তাড়া করল ওদের। ওরা পালিয়ে গেল।

সবচেয়ে দুঃখজনক ব্যাপার কী দেখলাম, জানিস?

কি?

গরিব লোকরাই ক্ষেপেছে বেশি, অথচ এর ফলে ক্ষতি হচ্ছে ওদেরই সবচেয়ে বেশি।

ওরা ক্ষেপেনি, আমার মনে হয় ওদের ক্ষ্যাপানো হয়েছে।

সেটা অবশ্য ঠিক।

সহসা খাওয়া ছেড়ে সশব্দে হেসে উঠল রাবু। হেসে চলল।

পরিবেশকরা অবাক হয়ে চেয়ে রইল। মালুর হাতের চামচটা থেমে গেল। ভ্রূ কুঁচকে কী যেন বিড়বিড় করল পার্শ্ববর্তী টেবিলের নিঃসঙ্গ ভোজনকারী এক প্রৌঢ়।

কী হল, হঠাৎ বেপরোয়ার মতো হাসতে শুরু করলে?

ওই দেখ। ইশারায় দূরের টেবিলটা দেখিয়ে দিয়ে মুখে আঁচল পুরল রাবু। হাসিটা কিছুতেই চেপে রাখতে পারছে না ও।

মালু ঘাড় ফিরিয়ে দেখল দূরের সেই টেবিলে পড়ে রয়েছে চায়ের সরঞ্জাম। চেয়ারটায় হেলান দিয়ে নাক ডাকছে জাহেদ আর উর্দি পরা পরিবেশক চায়ের প্রতি ঘুমন্ত খদ্দেরের মনোযোগ আকর্ষণের ব্যর্থ চেষ্টায় হিমশিম খেয়ে চলেছে।

মালুও হেসে দিল। দূরের সেই পরিবেশকটিও যোগ দিল ওদের হাসিতে। হয়ত সেই হাসির শব্দেই জাহেদের চোখ খুলে গেল।

তাড়াতাড়ি ঢেলে নিল এক কাপ চা। দু ঢোকেই গিলে ফেলল। এসে বসল রাবুদের টেবিলে। শুধাল আচ্ছা তোরা এখানে? এতক্ষণ তো দেখিনি?

ওমা! ঘুমুলে কেউ কী আবার চোখে দেখে নাকি? জানতাম না তো? চোখ কপালে তুলল রাবু।

যাহ্ ঘুমুচ্ছিলাম কোথায়? চোখ বুজেছিলাম। প্রতিবাদ করল জাহেদ।

তা বটে, চোখ বুজে একটু নাক ডাকছিলে। ঘুমুচ্ছিলে কোথায়?

নিশ্চয় না, আমি নাক ডাকছিলাম না। তুই শুনেছিস?

আলবত শুনেছি। সাক্ষী চাই? হাত তুলে সেই পরিবেশককে ডাকল রাবু।

বেশ ডাক, সাক্ষী।

ওদের খুন সুড়িতে মনে মনে হাসে মালু। ওদের ও ছেলেমানুষি ঝগড়াটা কেন যেন ভালো লাগল ওর। ও বলল থাম মেজ ভাই আমিও সাক্ষী তোমার বিপক্ষে।

হাঁ দেখ না কাণ্ডটা। এতবড় হল ঘরে এতগুলো লোক খাচ্ছে তার মাঝে আক্কেলের মাথা খেয়ে নাক ডেকে ঘুমুচ্ছেন তিনি, আর এখন বলেন কিনা নিশ্চয় না। এদিকে বাহাদুরীর ঠেলায় আমার ঘরে টেকা দায়। রাত দুটোয় বাড়ি ফিরবে, ভোর সাতটায় যাবে বেরিয়ে, বলবে, দেখেছিস পাক্কা কুড়ি ঘন্টা খাটি, চার ঘণ্টা ঘুমোই। কেমন খাসা স্বাস্থ্য। পারবি আমার মতো হতে?

হয়েছে, হয়েছে, আমরা বুঝলাম জবর বক্তৃতা দিতে শিখেছেন মিস রাবেয়া খাতুন বি.এ.(হন)। এবার দয়া করে থামুন। বলল জাহেদ।

রাবু থামে না। তেমনি কপট গাম্ভীর্যে বলে চলে, কেন থামব?

উঠতে বসতে তাহলে এত কথাই বা শোনান হয় কেন?

আচ্ছা, আচ্ছা আর শোনাব না। এখন ধরতো এগুলো। কতগুলো ইংরেজি টাইপ করা আর বাংলা লেখা কাগজ রাবুর দিকে বাড়িয়ে দিল জাহেদ।

কী করতে হবে?

পৌঁছিয়ে দিতে হবে সমস্ত পত্রিকায়, নিউজ এজেন্সীতে।

সঙ্গে কে যাবে?

কেউ না।

না একলা এত জায়গা ঘুরতে পারব না আমি। তুমি থাকবে সঙ্গে?

যদি যেতেই পারতাম তবে কাজটাও তো আমিই করতাম। তোকে দিতাম নাকি। পোর্টফোলিওটা বন্ধ করে উঠে দাঁড়াল জাহেদ।

বেশ। কাজটা তাহলে হচ্ছে না।

মানে? ভ্রূ কুঁচকাল জাহেদ।

আমি যাচ্ছি না।

একটা প্রশ্রয়ের হাসি ফুটে উঠল জাহেদের ঠোঁটে, মৃদু তরঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল সারা মুখে, তারপর চোখের তারায় এসে স্তব্ধ হয়ে রইল ক্ষণকাল। ও বলল, কাল যে সারাদিন ঘুরলাম তোর সাথে?

বাজে কথা। নিজের কাজে ঘুরেছ। আমাকেও ঘুরিয়ে মেরেছ।

বেশ, কথা রইল, আগামী কালও ওরকম ঘুরিয়ে মারব।

সহসা উজ্জ্বল হয়ে উঠল রাবুর চোখ। পুরো গালে হাসল ও। শুধাল প্রতিশ্রুতি।

হ্যাঁ প্রতিশ্রুতি।

ওরা তিনজনেই গলা মিলিয়ে হাসল। জাহেদ বেরিয়ে গেল।

হাসির রেশটা এখনও জেগে আছে ওদের মুখে। পরিবেশক দ্বিতীয় দফা চা রেখে গেল টেবিলে।

রাবু আপা, তুমি ধরা পড়ে গেছ। বলল মালু।

কী রকম?

মেজো ভাইকে ভালোবেসেছ তুমি।

বুঝি চমকে উঠল রাবু। ঠোঁটের কোণে জেগে থাকা হাসির রেশটুকু সহসা কী এক কঠিন রেখায় রূপান্তরিত হল। কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ হয়ে রইল রাবু। তারপর মালুর ঢেলে দেওয়া চাটা হাতের কাছে টেনে বুঝি একটু সহজ হতে চাইল। বলল, তাতে কী হল?

এই হল যে এবার তালাকটা নিয়ে নেবে আর মেজো ভাইকে বিয়ে করবে।

সে হয় না।

কেন হয় না?

সে তুই বুঝবি না।

বুঝিয়ে বললেই বুঝি। মালু জিদ ধরে চেয়ে রইল ওর মুখের দিকে। কিছুক্ষণের জন্য বুঝি অন্যমনস্ক হয়ে রইল রাবু। অথবা অন্যমনস্ক চোখজোড়ার আড়াল নিয়ে কোনো একটি চিন্তার সুতো খুঁজে নিল। বলল জাহেদকে বিয়ে করলে ওরই ক্ষতি করা হবে।

কেন?

হয়ত আমি ওকে পোষ মানাতে চাইব। হয়ত ও নিজেই পোষ মেনে যাবে। আর দশজন পুরুষের মতো বৌ আর ঘর নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। তখন? তখন তো ওর মৃত্যু।

তা কেন হবে? তোমরা দুজনই তো আদর্শ সচেতন মানুষ। তর্কের জন্য তৈরি হল মালু।

নিজের উপর অতটা আত্মবিশ্বাস আমার নেই, সে তো তোকে আগেই বলেছি।

বেশ, তর্কের খাতিরে না হয় তোমার কথাটা আপাতত মেনে নিচ্ছি। কিন্তু মেজো ভাই? সে তো তোমাকে ভালোবাসে?

ওর জীবনটা এখনো যুক্তিনির্ভর নয়, আবেগনির্ভর, আমিও হয়ত তাই। সে জন্য বড় ভয় আমার। তাই তো এ সব কথা ওর সাথে আলোচনা করি না।

আলোচনা না করলেই কী সে সান্ত্বনা পাবে? তুমি পাও?

চুপ কর তো। ধমক দিতে গিয়ে বুঝি কেঁদেই ফেলল রাবু।

মালু দেখল উদ্গত কান্নার রেশটাকে সামলাতে গিয়ে রাবু মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে চোখে রুমাল চেপেছে। কিন্তু মালুর আজ জিদ চেপেছে, ও নাছোড়বান্দা। রাবুর দ্বিধা, রাবুর যন্ত্রণার উৎস খুঁজে পেতে হবে ওকে। ও শুধাল, চিরটা কাল এমনি থাকবে, রাবু আপা?

থাকলামই বা। ক্ষতি কী? বলেই উঠে দাঁড়াল রাবু। প্রসঙ্গটার এখানেই ইতি টানতে চায় ও।

রেস্তোরাঁর বিল মিটিয়ে বেরিয়ে এল ওরা।

চল্ বিবৃতিগুলো দিয়ে আসি প্রেসে। যাবি আমার সাথে? শুধাল বাবু।

চল

ওরা ট্রামে চেপে বসল।

৪১-৪৫

স্বচ্ছ আকাশ।

মিটি মিটি আলো দিচ্ছে অসংখ্য তারার বাতি।

সেই নরক রাতের আগুন নেই মহানগরীর আকাশে। ধোঁয়াও নেই। তবু মনে হয় মালুর, সে রাতের ভয়ংকর ছায়াটা এখনো ধাওয়া করে চলেছে এই মহানগরীর প্রতিটি মানুষকে। প্রতিটি মানুষের বুকে এখনো সেই নরক রাতের যন্ত্রণা, কাতর আর্তনাদ। মেয়ে কলেজটাকে একাধারে হাসপাতাল আর ইভাকুউ ক্যাম্পে রূপান্তরিত করেছে ওরা।

ঘর, বারান্দা, খোলা চত্বর, কোথাও একটু পা ফেলবার জায়গা নেই। স্টীমারে ডেকের যাত্রীদের মতো নারী পুরুষ এক সাথেই সারি সারি শুয়ে আছে সব। সর্বস্ব খুইয়ে আসা মানুষ, কবে যে আবার নিজেদের আস্তানা গড়ে তুলতে পারবে কে জানে?

দুদিকের ঘুমন্ত মানুষের চাপে দমটা বন্ধ হয়ে আসতে চায় মালুর। ঘামে জবজবে গায়ের জামাটা। ঘুম কিছুতেই আসে না। আর যখন ঘুম আসে না তখুনি যেন রাজ্যের যত চিন্তা এসে ছেঁকে ধরে মালুকে। রাবুর মুখটাই বার বার ভেসে ওঠে ওর বোজা চোখের সুমুখে।

পাস করে তো বেরুচ্ছ রাবু আপা। এবার মেজো ভাইকে নিয়ে ছোট্ট একটি সংসার পাত না কেন? বলেছিল মালু, মাস তিনেক আগে রাবুদের হোস্টেল থেকে কলেজ স্ট্রীটের দিকে হাঁটতে হাঁটতে।

কাউ ফলের কোয়ার মতো লাল টুকটুকে ঠোঁট জোড়া অকারণেই কামড়ে থেঁতলে একাকার করেছিল রাবু। তারপর বলেছিল, জাহেদ কী নীড় বাঁধবে? ঘরের সাথে তো ওর স্বভাবের বিরোধ। অথচ গতকাল দুপুরে ঠিক উল্টো কথা বলল রাবু। আশ্চর্য। মালু বুঝতে পারে না রাবুর সংশয় নিজেকে অথবা জাহেদকে নিয়ে।

আমার আব্বাকে মনে আছে তোর? কিছুক্ষণ পর শুধিয়েছিল রাবু।

বারে, মনে থাকবে না কেন? মালু যেন প্রতিবাদ করেছিল।

আম্মা তাকে পারেনি সামলে রাখতে।

খোদার পথে যে দেওয়ানা তাকে সামলে রাখবে কে?

দেশের পথে যে দেওয়ানা তাকেই বা সামলাবে কে। মালুর কথাটা শেষ না হতেই বলেছিল রাবু।

কিন্তু, তুমিই যেন বার বার ফিরিয়ে দিচ্ছ মেজো ভাইকে। একটু উত্ত্যক্ত হয়েই যেন বলেছিল মালু।

সেদিন এক টুকরো বিচিত্র হাসি ছড়িয়ে চুপ করে গেছিল রাবু। কেমন বদলে গেছে রাবু। এজমালি সম্পত্তির অর্ধেকের মালিক হয়েও থাকে না পার্ক স্ট্রীটের বাড়িতে। সেটা নাকি তার আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের পথে মস্ত বড় বাধা।

শুধু রাবু কেন, গোটা সৈয়দ বাড়িটাই কেমন যেন হয়ে গেছে। সহজ ঢং, সরল ধাঁচ সবই যেন বদলে গেছে। শহরের আবহাওয়ায় স্বার্থ চিন্তার চক্রজালে সেই ছোট বেলায় দেখা সৈয়দ বাড়ির সহজ গাঁথুনিটা যেন ভেঙে তছনছ হয়ে গেছে। হারিয়ে গেছে মমতা মাখা শান্ত স্নিগ্ধ পারিবারিক পরিবেশ। তাই জাহেদও আজ সে বাড়িতে খাপছাড়া, অনাদৃত।

এমন কেন হল? বাকুলিয়ার সৈয়দ বাড়িতে কেন আজ মমতার পরশ নেই? কলকাতা শহরটার উপরই রাগ হয় মালুর। এই শহরই কেড়ে নিয়েছে বাকুলিয়ার সৈয়দদের শ্রী, সৌষ্ঠব।

মরুগে সৈয়দরা। উঠে পড়ে মালু। পাউরুটিটা বগলে খুঁজে ঘুমন্ত মানুষের ফাঁকে ফাঁকে সাবধানে পা ফেলে নেবে আসে খোলা চত্বরে।

হাসি পেল মালুর। নিজের ভাবনার যার শেষ নেই সে কিনা কোন্ সব মানুষের কথা ভেবে চলেছে। এই কটা দিন তো কোনো রকমে ক্যাম্পেই কেটে গেল। তারপর? নেহাত ক্যাম্পের কিছু কাজকর্ম করে দিচ্ছে বলে রাতটাও কাটাতে পারছে। কিন্তু, এ রকম ফাঁকি দিয়ে আর কদ্দিন কাটাবে? তা ছাড়া খাওয়া? ক্যাম্প থেকে লঙ্গরখানার খাওয়া গত পরশু থেকে তার বন্ধ। অন্য ভলান্টিয়াররা সবাই বাড়ি থেকেই খেয়ে আসে, সে কেন ক্যাম্পের খাওয়া খাবে?

খাবার কথা মনে হতেই পেটটা যেন ক্ষিদের ব্যথায় চিন চিন করে উঠল মালুর। রুটিটাকে নাকের কাছে এনে শুঁকল ও। ইচ্ছে হল এক কামড়ে খেয়ে নিক। তাড়াতাড়ি নাকের কাছ থেকে সরিয়ে আবার বগলে পুরল রুটিটা।

আজ সকালে। কোনো দানশীলা মহিলা এসে রুটি আর জিলিপী বিলিয়ে গেছে দুঃস্থদের। কেমন করে যেন একটা রুটি আর দুখানি জিলিপী পৌঁছে গেছিল

মালুর হাতে। অর্ধেকটা রুটি আর জিলিপী দিয়ে বেশ তৃপ্তির সাথেই পেট ভরিয়েছে। মালু। বাকী অর্ধেকটা রেখে দিয়েছে, কাল সকালের জন্য।

আসলে সেই হোটেল ছেড়ে পালিয়ে আসার পর একদিন, মাত্র একটা বেলা মালু তৃপ্তির সাথে পেট পুরে খেতে পেরেছে। সে হল গত পরশু দুপুরে রেস্তোরাঁয়। কথাটা মনে পড়ে জিবে জল আসল মালুর।

একটা ভলান্টিয়ার তাঁবুর খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসল মালু। পা-টা ছড়িয়ে দিয়ে চমকে উঠল ও। শিশির ভেজা ঘাসের নরম স্পর্শে চমকে উঠবারই কথা। সেই কবে গ্রাম ছেড়েছে তারপর ঘাস দুব্বার নরম শরীর মাড়িয়ে পথ চলার যে রোমাঞ্চিত আনন্দ, সে তো এক রকম ভুলেই গেছে মালু।

অতর্কিতে অতীত এসে হানা দেয়। শূন্য গর্ভ আতঙ্কিত ভবিষ্যৎটাও বুঝি। বাকুলিয়ার সেই বয়াতি ছেলেটি, বাইশ বছরের জীবনে কত বিচিত্র পথ পাড়ি দিয়ে এল ও। কত কথা আজ মনে পড়ছে ওর। মেঘ এসে নিভিয়ে দিয়েছে তারার বাতিগুলো। আকাশটা অস্পষ্ট। পাশের তেরপল ছাউনিতে বাচ্চা একটি মেয়ে কেঁদে চলেছে অনেকক্ষণ। বুঝি তার মা, সান্ত্বনা দিয়ে চলেছে, রোতি কেঁউ, আল্লা নে তেরা কিছমত ছিন লিয়া। কিন্তু মেয়েটি শুনবে কেন ও সব কিসমতের ফের। দুধ খেয়েই বরাবর ঘুমোত যায় ও। আজ দুধ পায়নি তাই কান্না জুড়েছে ও। ঘুম তার আসছে না। এটা মাকে কেমন করে বুঝাবে ও, কান্না ছাড়া?

মালুর ইচ্ছে হল রুটিটা দিয়ে আসুক মেয়েটির হাতে। দুধের বদলে রুটিটা পেয়ে হয়ত খুশিই হবে মেয়েটি। কান্না থামিয়ে কচি মুখখানি হেসে উঠবে। ঘুমিয়ে পড়বে।

উঠে পড়ল মালু। দুপা এগিয়েও এল। কী যেন ভাবল। ফিরে এল। মনে মনে আবারও হাসল মালু। শুধু সৈয়দরা কেন, সে নিজেই তো কত বদলে গেছে। বদলে গেছে বলেই আগামী কালকের অনিবার্য উপোসের কথাটা ভাবতে হয় ওকে। রুটিটা বগলে চেপে ফিরে আসতে হয়। এটাই বুঝি মহানগরীর ধর্ম। মন থাকে না এখানে। মন যায় মরে। কেঁদে কেঁদে বুঝি ক্লান্ত হয়েই ঘুমিয়ে পড়েছে তেরপল ছাউনির মেয়েটি। দোতলার হাসপাতালের ঘরে কোন্ মুমূর্ষ যেন আর্তনাদ করে উঠল। রাস্তার ওপারে পার্কের উঁচু শিরিস শাখায় রাতের পাখিরা হঠাৎ ডানা ঝাপটিয়ে কেঁদে উঠল কী এক অজানা আতঙ্কে। ইচ্ছে হল মালুর, ওই আধখানা রুটি ছুঁড়ে ফেলে দিক নর্দমার জঞ্জালে। যে রুটি ওর একটি কোমল মানবীয় অনুভূতিকে পিষে মারল সে রুটি দিয়ে কেমন করে ক্ষুধা মিটাবে ও? গাটা

কেমন ভিজে এসেছে মালুর। কুয়াশা পড়ছে। মনে হল মালুর, মহানগরীর উন্মত্ত দিনের যত উত্তাপ রাতের নিভৃতে স্নেহধারার সিক্ত পরশ হয়ে নেবে আসছে। সেই পরশ ওর সর্বাঙ্গে, ওই খোলা বারান্দার ঘুমন্ত মানুষগুলোর মুখে।

সকালে ঝিকিমিকি রোদটা মুখে পড়তেই ধড়ফড়িয়ে উঠল মালু। সেই তাঁবুর খুঁটিতে হেলান দিয়ে ও বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছিল। প্রথমেই মনে পড়ল অর্ধেকখানি রুটির কথা। দুপাশে হাতড়াল ও। না, রুটিখানা ওর কোলের উপরই পড়ে রয়েছে।

তাঁবুর পেছনেই কল, মুখ হাত ধুয়ে চিবিয়ে রুটিটা খেল মালু। তারপর কলের মুখে মুখ লাগিয়ে পানি টানল। দিনের মতো ভরিয়ে নিল পেটটা।

ক্যাম্পের অফিস ঘরটার কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল মালু।

সবুজ মলমূলের উপর চাঁদতারা আঁকা ভলান্টিয়ারের গোল ব্যাজ বুকে এঁটে ঘর-বারান্দা করছে রাবু। নিজের ময়লা পোশাকের দিকে তাকাল মালু। এ পোশাকে রাবুর সুমুখে পড়লে রক্ষে নেই। অফিস ঘরটি এড়িয়ে পেছনের চওড়া বারান্দাটার দিকে গেল মালু। কিন্তু ততক্ষণ ওকে দেখে ফেলেছে রাবু। ডাক দিয়েছে পেছন থেকে, এই মালু শোন্। যা আশঙ্কা করেছিল মালু তাই হল। ওর ময়লা পোশাক, খোঁচাখোঁচা দাড়ি, অপরিচ্ছন্ন মুখ তেলহীন উস্কোখুস্কো চুল... সবটার উপর একটা শাণিত দৃষ্টি বুলিয়ে নিল রাবু। বলল, কী হয়েছে তোর। মনে হচ্ছে কোনো আস্তাবল থেকে বেরিয়ে এসেছিস?

যারা মানুষ নয় তারা তো আস্তাবলেই থাকে।

কী হল? এমন ঠেস দিয়ে কথা বলছিস যে? একটু অবাকই হল রাবু।

তুমিই বা আমার দারিদ্রকে এমন করে উপহাস করছ কেন? তোমার সামর্থ্য আছে, তুমি রোজ ধোয়া আর ইস্ত্রি করা শাড়ি পরতে পার। আমি পারি না। আমার সামর্থ্য নেই।

মালুর কণ্ঠে ঝাঁঝ। মালুর চোখে ক্ষুব্ধ অনুযোগ।

অবাক হওয়ার ধাক্কাটা সামলে নিয়ে তীক্ষ্ণ চোখে রাবু তাকাল মালুর দিকে, বলতে গেল কিছু। কিন্তু মালু তখনো থামেনি। আসলে তুমি যে সৈয়দ বাড়ির মেয়ে, থাকতে পার ফিটফাট, চলতে পার ছিমছাম, এই আভিজাত্যবোধটা তুমিও ছাড়তে পারনি এখনো।

আর আমি যদি বলি তুই একটা আস্ত অকর্মা। গা আছে, গতর আছে, বুদ্ধিরও কমতি নেই অথচ ভেসে বেড়াচ্ছিস অপদার্থ ভবঘুরের মতো। রাবু প্রায় চেঁচিয়ে উঠল।

সে জন্য দায়ী আমার জন্ম।

বাজে কথা। তোর জন্ম তোকে বলেনি খেটে খাবি না, রোজগার করবি না।

চুপ করতে হল মালুকে। কেননা ওরা পৌঁছে গেছে দোতলায় ভলান্টিয়ার অফিসে। সেখানে অনেক ভিড়। একটা টেবিলে অনেকগুলো কাগজ ছড়িয়ে রয়েছে। সেখানে চাল, ডাল, আটা, তেল, নুনের হিসেব। কাগজগুলো গুছিয়ে নিয়ে হিসেব করতে বসল রাবু। আমি আসি তাহলে? দরজার দিকে পা বাড়াল মালু।

না বস্। কথা আছে। হিসেব লেখা কাগজের উপর থেকে মুখ না তুলেই বলল রাবু। একটা চেয়ার এগিয়ে দিল মালুর দিকে। চা খাবি? শুধাল রাবু।

পেলে খেতে পারি।

এবার মুখ তুলে মালুর দিকে তাকাল রাবু। হাসল। বলল, এখনো চটে আছিস তুই।

সত্যি চটেছে এবং এখনো চটে আছে মালু। কেননা রাবুর হাসির উত্তরে হাসতে পারল না ও।

একটা মজার জিনিস দেখবি?

কি?

একটা চিঠি। বলেই হাত ব্যাগটা খুলল রাবু। বের করল চিঠিটা।

এগিয়ে দিল মালুর হাতে। চোখ বুলিয়ে গেল মালু :

জানের জান বিবিজান,
দোয়াপর সমাচার এই যে গুজাশতা সালে আপনাকে তিনখানা পত্র লিখিয়াছিলাম। এই সালের শুরুতেও এক পত্রে দোয়া ফরমাইয়াছিলাম। সেই সমস্ত পত্রে দীন-ই ইসলাম এবং আপনার খসমের প্রতি আপনার দায়িত্বের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলাম। আফসোস আপনার কোনো জবাব পাইলাম না। শুনিলাম আপনি পর্দা কলেজ ছাড়িয়া এখন সম্পূর্ণ বেপরদা হইয়াছেন এবং

বেগানা লোকজনের সঙ্গে হরদম ঘোরাফেরা করিতেছেন (নাউজুবিল্লা...)। আপনি কেন এভাবে নিজের উপর এবং ভবিষ্যতের আওলাদ ফরজন্দের উপর লানত ডাকিয়া আনিতেছেন আমার আদনা বুদ্ধিতে তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। আপনি কতবড় নেকবক্ত দরবেশের সাহেবজাদী, কতবড় পীরের জেনানা, এ কথা কী ভুলিয়া গিয়াছেন? নিশ্চয় আপনার উপর শয়তান ভর করিয়াছে, নচেৎ আপনি কীভাবে এই সব গোনার কাজে লিপ্ত হইতেছেন।

আল্লাহতালা বলেন : কুয়া আনফেসাকুম ওয়া আহলিকুম নারান।

অর্থাৎ তোমরা নিজেকে এবং পরিজনকে দোযখের ভীষণ অগ্নি হইতে বাঁচাও।

আল্লাহতালার এই সতর্ক বাণী মনে রাখিয়াই আমি আপনাকে বহুত নসিহত করিয়াছি, চিঠিপত্র মারফত বহুত হেদায়ত করিয়াছি। কিন্তু মনে হইতেছে আল্লাহর ইচ্ছা ভিন্নরূপ। আপনি সৎপথে ফিরিয়া আসিবেন না এবং মৃত্যুর পর অনন্তকাল দোযখের ভীষণ অগ্নিতে পুড়িতে থাকিবেন। এই রূপই সাব্যস্ত করিয়াছেন। যাহা হোক স্বামী হিসাবে আমার কর্তব্য পালনে আমি বিরত হইব না। কেননা বেওকুফ দুরাচারিণী স্ত্রীদের প্রতি স্বামীর কর্তব্য সম্পর্কে আল্লাহতায়ালাই কোরানে ফরমাইয়াছেন : প্রথমে তাহাকে বুঝাও স্বামী-স্ত্রীর আচার ব্যবহার ও নারীর আদর্শ ইত্যাদি সম্বন্ধে তাহাকে নসিহত কর, যদি তাহাতেও সে ভালো না হয়, তবে তাহার বিছানা পৃথক করিয়া দাও, ইহাতেও যদি সে ভালো না হয় তবে তাহাকে শাস্তি দাও।

আপনি যদি আল্লাহ্তালার নির্দেশিত পথে ফিরিয়া না আসেন তবে অবশ্যই আপনাকে অতি কঠিন শাস্তি পাইতে হইবে। আপনি বিবাহিতা স্ত্রী হইয়াও বৈবাহিক ধর্ম পালন করিতেছেন না, স্বামীর ডাকে সাড়া দিতেছেন না। উপরন্তু বেগানা মরদদের সহিত অশোভনভাবে মেলামেশা করিতেছেন। নিশ্চয় জানিবেন ইহা অতি শক্ত গোনাহ, এই গোনাহর শাস্তিরূপে দোজখে হাবিয়ার ভয়ঙ্কর আগুনে আপনাকে চিরকাল জ্বলিয়া খাক হইতে হইবে। হে মূঢ় বালিকা।

ইহাতেও কী তোর চৈতন্যোদয় হইবে না? এখনও কী তুই স্বামীর মহব্বতে ফিরিয়া আসিবি না? এখনও তুই কী স্বামীর নির্দেশ অমান্য করিবি? তুই কী আল্লাহতালাকে ভয় করিস না? তুই কী দোজখের আগুনকে ভয় করিস না?

দিলের দিল জানের জান ছোট বিবিজান।

আপনার সমস্ত অপরাধ আমি অতীতেও ক্ষমা করিয়াছি, এখনও ক্ষমা করিতে পারি। কেননা আপনার খানদানকে আমি পছন্দ করি, আপনাকে মহব্বত করি। এই কারণেই আপনাকে আমি শক্ত কোনো বদদোয়া অথবা কোনো লানত দিতে পারি না। এই কারণেই, কখনো আল্লার দরবারে ফরিয়াদের হাত উঠাইলেও আবার সে হাত নামিয়া আসে। আপনি চিরকাল দোজখের আগুনে পুড়িবেন, এ

কথাটা আমি কল্পনা করিতে শিহরিয়া উঠি। আমার দিলে সদমা পয়দা হয়। অতএব পত্র পাওয়া মাত্র চলিয়া আসিবেন। এই পত্রের উত্তর লিখিবেন। সাতদিনের মধ্যে আপনি না আসিলে অথবা আপনার কোনো চিঠিপত্র না পাইলে আমি স্বয়ং কলিকাতা আগমন করিব।
আর একটি কথাও আপনাকে জানান প্রয়োজন মনে করিতেছি। আপনি নিশ্চয় অবগত আছেন আপনার বড় আপা অর্থাৎ আমার বড় বিবি এন্তেকাল ফরমাইয়াছেন। তাহার অবর্তমানে সংসার ছারেখারে যাইতেছে। কেননা আপনার অন্য আপারা একেবারেই নালায়েক। তাহা ছাড়া আমারও সেবা শুশ্রূষার দরকার। আপনি আসিলে সব দিক দিয়াই উত্তম। সর্ব শেষে সর্বশক্তিমান আল্লাহতালা যিনি মালেকুল মউত গায়েবুল গনি, তাঁহার নিকট দোয়া চাহিতেছি তিনি যেন আপনার নাপাক দিল সাফ করিয়া দেন, আপনাকে নেকপথে পরিচালিত করেন, শয়তানের কুপ্রভাব হইতে আপনাকে রক্ষা করেন।
ইতি
আলহাজ্জ শাহসুফি গোলাম হায়দার মোহাদ্দেদী।

ছোটবেলার কথা মনে পড়ল মালুর। গোনাহর কথা শুনলে ভয় পেত মালু। দোজখের জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডের কাহিনী শুনে শিউরে উঠত। আর রাবু, আরিফাকে গোনার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য কত ব্যাকুল প্রার্থনায় চোখের পানি ফেলত মালু।

মালু দেখল ছোটবেলার অনেক বিশ্বাস, অনেক সংস্কার আর মোহ যেমন ভেঙে গেছে তেমনি ভীতি নামক বস্তুটাও কখন অদৃশ্য হয়েছে মনের কোণ থেকে। মালুর হৃদয়টা আজ দুর্বোধ্য কোনো ভয়ে কেঁপে কেঁপে আড়ষ্ট হল না, মালুর চোখের কোণে আজ প্রার্থনার জল জমল না। মালুর চোখের ক্ষতে আজ ঘৃণার আগুন। অজস্র শিখায় জ্বলে উঠল সে আগুন। রাবু আপা। কেন তুমি বিদ্রোহ কর না? কেন এই অত্যাচার সহ্য করে চলেছ তুমি? এ অন্যায়ের প্রতিবাদ শুনি না কেন তোমার কণ্ঠে?

আশ্চর্য! রাবু হাসছে আর আঙ্গুলের ইশারায় চুপ করতে বলছে মালুকে। রাবুর নিস্পৃহতা অসহ্য। মালু বুঝি কেঁদে ফেলবে! প্রায় কান্নার মতোই শুধাল, কেমন করে তুমি হাসতে পার রাবু আপা। তোমার কী ঘৃণা নেই? বর্বরকে, কুৎসিতকে তুমি ঘৃণা কর না?

ঘৃণা আছে বলেই তো হাসতে পারি। এবারও হাসল রাবু। হিসেবের খাতাটা বন্ধ করে ক্যাম্প রেজিস্টারটা টেনে নিল।

এই উত্তরের প্রত্যুত্তরে আরও অনেক প্রশ্ন ঠেলে আসে। মালুর ক্রোধ শান্ত হয় না। কিন্তু এক দঙ্গল মেয়ে ভলান্টিয়ার ঢুকে পড়েছে ঘরের ভেতর, শুরু করেছে উড়ো কথার কিচিরমিচির। কে একটা স্লিপ এগিয়ে দিয়েছে রাবুকে, অফিসে ওর তলব পড়েছে।

যাসনে কোথাও। এখুনি আসছি আমি। মালুকে বসতে বলে একতলার সিঁড়ি ধরে নেবে গেল রাবু।

মালুর উপস্থিতি সম্পর্কে এতক্ষণে বুঝি সজাগ হয়েছে মেয়েগুলো। তাই চুপ করে গেছে ওরা। ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারে মালু অবরোধের দেয়াল ভেঙে এই প্রথম ওরা বেরিয়ে এসেছে পৃথিবীর মুক্ত অঙ্গনে। বুঝি তাই ঠোঁটে ওদের কথার খই, মুখে ওদের আলোর দীপ্তি, ওদের চোখে বিস্ময়। নতুন পাওয়া স্বাধীনতার উচ্ছলতা ওদের সর্ব অঙ্গে, ওদের হাসির ফোয়ারায়।

যেমন নেবে গেল সিঁড়ি ধরে তেমনি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উঠে এল রাবু। বলল, চল, বাসায় ডাক পড়েছে। জরুরি টেলিফোন।

কে ডেকেছে, কেন ডেকেছে জিজ্ঞেস করতে গিয়েও রাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে থেমে গেল মালু। অস্বাভাবিক গম্ভীর রাবু। সিঁড়ি দিয়ে উঠবার পথে কে যেন ওর মুখের সমস্ত রক্ত টেনে নিয়েছে। ওর মুখটা কাগজের মতো সাদা।

বৈঠকখানায় পা রেখে ওরা চমকে উঠল, থমকে দাঁড়াল।

বৈঠকখানার গালিচার উপর জায়নামায বিছিয়ে বসে আছেন আলহাজ্জ শাহসুফি গোলাম হায়দার মোজাদ্দেদী সাহেব। দুপাশে তাঁর দুই খাদেম। সারা ঘর সৈয়দ বাড়ির ছেলে মেয়েতে ভর্তি। খবর শুনে আরিফাও এসেছে ইঞ্জিনিয়ার স্বামী, দুই ছেলে, তিন মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে। যে যেমনটি পেরেছে কোনোরকম জায়গা করে বসে গেছে ঘরে, কারো মুখে রা নেই। সৈয়দদের মেজ বৌ, সেও আজ দুচোখে বিস্ময় ফুটিয়ে নির্বাক হয়েছে, জড়োসড়ো বসে আছে ভিড়ের ভেতর।

সারা বাড়িতে সৈয়দ সাহেবই একমাত্র চলমান মানুষ, এ ঘর ও ঘর করছেন, কী করবেন কী বলবেন বুঝতে পারছেন না। অবশেষে পাকঘর থেকে বের করে এনেছেন কালিঝুলিতে একাকার শতজীর্ণ একট তালপাখা। মাথার উপর ঘূর্ণায়মান বিজলী পাখার অস্তিত্ব সত্ত্বেও তাল পাখাটা জামাতাজির খাদেমের হাতে তুলে দিয়ে যেন হাঁপ ছাড়লেন সৈয়দ সাহেব।

ওদিকে সৈয়দগিনী স্বহস্তে শরবত বানাতে গিয়ে দু দুবার গ্লাস ভেঙেছেন। অতঃপর দাসীর হাতে শরবতের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে ভাড়ার ঘরে আত্মগোপন করেছেন।

অবাক মানে মালু। সেই দীর্ঘদেহ, উন্নত নাসিকা, গৌরবর্ণ নূরানী চেহারা; মেহেদী রং দাড়ি, মেহেদী রং বাবরি, যেমনটি দেখেছিল এক যুগ আগে ঠিক তেমনটি দেখছে আজো।

সুঠাম দেহটিকে জড়িয়ে সেই অপরূপ অলংকার-ধবধবে চাপকান বুটিদার চোগা। সেই আতরের সুবাস। শুধু কাছে এসে, তীক্ষ্ণ চোখে, একটু খুঁটিয়ে দেখলেই বুঝি ধরা পড়ে যায় মোজাদ্দেদী সাহেবের ফাঁকিটা।

নজরে পড়ে তার চোখের কোলে চিতিপড়া কুঞ্চিত চাম, কপালের কুঞ্চন রেখায় বয়সের ছাপ। কিন্তু সে বয়স কত হবে? পঞ্চাশও হতে পারে সত্তরও হতে পারে। তার চেয়ে বেশিও হতে পারে। অবাক মানে মালু, কেমন করে বয়সকে ফাঁকি দিয়ে চলেছেন মোজাদ্দেদী সাহেব?

ছোটবেলায় সাপের চোখ দেখেছে মালু। তীব্র তীক্ষ্ণ অস্থির সন্দিগ্ধ। সাপের চোখ এক মুহূর্ত কোথাও স্থির থাকে না। ওর মনে হল অনেকদিন পর আবার সাপের চোখ দেখছে ও। কারো মুখের উপর, কোনো কিছুর উপর এক মুহূর্তও স্থির থাকছে না মোজাদ্দেদী সাহেবের চোখ। ঘরের প্রতিটি নরনারীকে, প্রতিটি শিশুকে, প্রতিটি আসবাবকে মুহূর্ত দৃষ্টির তীক্ষ্ণতায় দংশন করে চলেছেন, ঘরময় এক ভীতি বিহ্বল সম্মোহনের কালো পর্দা বিস্তার করে রেখেছেন মোজাদ্দেদী সাহেব। মোজাদ্দেদী সাহেবের চোখে চোখ রাখতে পারে এমন মানুষ বুঝি পৃথিবীতে নেই। কিন্তু মোজাদ্দেদী সাহেবের নূরানী মুখটা আসলে নিস্পৃহ, কোনো নিরাকারের ধ্যানে শান্ত সমাহিত। ক্রোধ নেই, ঘৃণা নেই, খেদ নেই, লোভ নেই, প্রেম নেই সে মুখে। শুধু আছে প্রোজ্জ্বল সেই নূরানী চমক, গৌরবর্ণ চামড়ার গায়ে সুখাদ্য, সুস্বাস্থ্য ও সুখী জীবনের টকটকে আভা।

মোজাদ্দেদী সাহেবের হাতে তসবি। ঠোঁটের মৃদু কম্পন থেকে বোঝা যায় তিনি দরুদ পড়ছেন।

মোজাদ্দেদী সাহেবের সেই সাপের চোখ এক মুহূর্তের জন্য, শুধু এক মুহূর্তের জন্য রাবুকে দেখল। আবার যেমন ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছিল তেমনি ঘুরে চলল। মোজাদ্দেদী সাহেবের মুখে কী কোনো ভাবান্তর এল?

মনে হল না। শুধু শোনা গেল তিনি বলছেন তারই এক খাদেমকে লক্ষ্য করে তওবা, তওবা, ইয়ে কেয়া জামানা আগিয়া। এতনা বড়া সৈয়দ কামেল আলেম আওর দরবেশকা লাড়কী বেপর্দা ঘুরতা ফিরতা হ্যায়। সেরপর থোড়া কাপড়া ভি নেহী হ্যায়। আওর বেগানা মরদ কা সাথ? তওবা তওবা নাউজুবিল্লাহ্ ...।

বেগানা মরদ মালু একবার তাকাল রাবুর দিকে। কী ভাবছে রাবু? হয়ত ওর হৃদয় জুড়ে আজ আগুনের ঝড়, আদিম পৃথিবীর সেই অগ্নিমথিত কান্না। হয়ত ওর হৃদয়টা একেবারেই নিস্তরঙ্গ। কোনো ক্ষোভ নেই, ঘৃণা নেই, আলোড়ন নেই সেখানে, আছে শুধু নিঃসাড় করা জমাট ভয়ংকর এক স্তব্ধতা। হয়ত ভাববার চিন্তার সমস্ত শক্তিই লোপ পেয়েছে ওর।

আশ্চর্য। এর মাঝেও মোজাদ্দেদী সাহেব আর তার দুই খাদেমকে চোখ বুলিয়ে দেখল রাবু। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের দেখল তারপর ভিড় কেটে চলে গেল ভেতরে।

পৃথিবীতে এমন লোক কিছু রয়েছে যে কোনো অঘটনের সময় মাটি খুঁড়ে যারা উঠে আসবেই এবং অঘটনের সাথে জড়িয়ে পড়বেই। অন্তত এই মুহূর্তে জাহেদকে দেখে তাই মনে হল মালুর।

বগলভর্তি ফাইল, হনহনিয়ে এল জাহেদ। বৈঠকখানার ভিড়টা দেখে একবার থমকে দাঁড়াল। তারপর বাড়ির চাকরটাকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকতে ডাকতে চলে গেল ভেতরে।

আর একদিনের কথা মনে পড়ল মালুর। সেদিনের মতো ক্রুদ্ধ রাগে জাহেদ কী ফেটে পড়বে না? জামাতাজীকে চ্যাংদোলা করে তুলে দিয়ে আসবে না শিয়ালদ স্টেশনে?

একপা দুপা করে জাহেদের ঘরে এসেই বসল মালু। বিছানায় উপুড় হয়ে কী যেন লিখছে জাহেদ। মালুকে হয় দেখল না নতুবা দেখেও গ্রাহ্য করল না।

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল মালু। হাই তুলল। বার দুই কাসল তারপর উঠে গিয়ে একটা বই তুলে নিল শেলফ থেকে। বইয়ের পাতা ওল্টাল খস খসিয়ে। কিন্তু অত করেও জাহেদের দৃষ্টিটা আকর্ষণ করা গেল না। অবশেষে মরিয়া হয়েই বলল মালু, এসেছে তো!

জাহেদ তখন লেখাটা শেষ করে কতগুলো সাদা কাগজ টেনে নিয়েছে, সাদা কাগজগুলোর পিঠে পিঠে কার্বন সাজিয়েছে। তারপর কলম ফেলে পেন্সিল টেনে

নিয়েছে।

এসেছে তো! আবারও বলল মালু।

দেখলাম তো! বলল এবং একপলক মালুর দিকে চাইল জাহেদ। আবার কপিতে মন দিল।

বিস্মিত হল, ক্ষুব্ধ হল, ক্রুদ্ধ হল মালু। এই দুর্যোগের দিনে কেমন করে নির্লিপ্ত থাকতে পারে জাহেদ?

মেজো ভাই! তুমি কিছুই করবে না? কিছুই বলবে না? চেঁচিয়ে উঠল মালু।

যেন বিরক্ত হয়েছে এমনিভাবে কার্বন আর কাগজগুলো গুটিয়ে ব্যাগে ভরে নিল জাহেদ। বলল সত্যি মালু, তুই এখনো একেবারেই ছেলেমানুষ রয়ে গেছিস। আজ যে আমার কোনো কিছু বলার উপায় নেই, সেটা, দেখতে পাচ্ছিসনে তুই? তুই কী দেখছিস না, এ নৃশংসতার যে বলি তার কণ্ঠে প্রতিবাদ নেই, তার চোখে ঘৃণা নেই?

আশ্চর্য! শেষের কথাগুলো বলতে গিয়ে জাহেদের গলাটা কেঁপে গেল। অবরুদ্ধ অভিমানে অথবা আপন অসহায়তার বেদনায় ও বুঝি এখনি ভেঙে পড়বে। অবাক হল মালু। বক্তৃতার গলা শ্লোগানের গলা জাহেদের। এ গলা মিটিংয়ে মঞ্চে ঝড় তুলেছে, তর্কে বিক্ষোভে আবেগে উচ্ছ্বাসে আগুন ধরা বারুদের মতো বিস্ফোরিত হয়েছে। সেখানে কোথায় লুকিয়েছিল এই করুণকম্পন এই দুর্বলতা? তবু বলল মালু, সেদিনও তো প্রতিবাদ করেনি রাবু আপা।

সেটা ছিল ১৯৩৭ সাল। আজ ১৯৪৬ সাল। সেদিন নিজের ভালো মন্দ বুঝবার মতো বয়স বুদ্ধি কোনোটাই ছিল না ওর। আজ ওর বিবেক ওর কর্তব্যবোধ সব কিছু নিয়ে ওর যে জীবন তার মালিক একমাত্র সে-ই। ও যা করবে তাই তো হবে। আমি কী ওর উপর কিছু চাপিয়ে দিতে পারি? একান্ত যুক্তিসংগত কথা, পরিণত মনের কথা। তবু কথাগুলো বলতে গিয়ে গলাটা আবার কাঁপল জাহেদের! কেন কাঁপল? ওর মুখের দিকে তাকিয়ে হয়ত তারই উত্তর খুঁজছিল আর কী যেন বলতে যাচ্ছিল মালু। কিন্তু বলা হল না। সমস্ত বারান্দাটা তোলপাড় করে এল রাবু, এসে তছনছ করল জাহেদের আলনাটা।

কী খুঁজছিস? কেমন ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল জাহেদ।

তোয়ালে। কী করেছ আমার তোয়ালে?

তোয়ালে? আমি নিয়েছিলাম নাকি? তেমনি ভয়ে ভয়ে বলল জাহেদ।

একশো বার বলেছি নিজের জিনিস নিজে সামলে রেখ। আমার তোয়ালে আমার সাবানে হাত দেবে না। তবু যদি আক্কেল হয় একটু। যতসব অনাসৃষ্টি অভ্যেস। এর তোয়ালে, ওর লুঙ্গি আর একজনের জামা, হাতের কাছে যা পড়ল, বলা নেই কওয়া নেই একটু জিজ্ঞেস করা নেই, অমনি গায়ে জড়িয়ে নিলেন সাহেব। এমন নোংরা অভ্যাসও মানুষের হয়? ছিঃ! রাবু চেঁচায় আর তছনছ করে ঘরের যত জামা-কাপড়। অবশেষে বাথরুমে পাওয়া গেল তোয়ালেটা আর সাবানের কৌটোটাও। জিনিসগুলো নিয়ে যেমন তোলপাড় করে এসেছিল তেমনি ঘরটা তোলপাড় করে চলে গেল রাবু।

কী যেন বলতে এসেছিলেন জাহেদের আব্বা সৈয়দ সাহেব। কিন্তু রাবুর ওই ক্রুদ্ধ মূর্তিটার মুখোমুখি হয়ে কোনো কথা সরল না তাঁর মুখ দিয়ে। শুধু ঘর আর বারান্দার মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে দেখলেন রাবুকে, দেখলেন জাহেদ আর মালুকে। কেন যেন একবার তাকালেন এদিক ওদিক, বুঝি দেখে নিলেন আর কেউ আছে নাকি কাছাকাছি। ইতস্তত করলেন। একটু সাহস সংগ্রহ করলেন। তারপর বিশেষ কাউকে নয়, ওদের তিনজনকে অথবা গোটা বাড়িটাকেই উদ্দেশ্য করে বললেন, এই প্রথম এল জামাইটা। বুজুরগ পরহেজগার আল্লাপরস্ত লোক, তাকে বৈঠকখানাতেই বসিয়ে রাখবে? একবার ভেতরেও আনবে না?

না করছে কে আব্বা? ঘর থেকে শোনা গেল জাহেদের উত্তর।

এক মুহূর্তও আর দাঁড়ালেন না সৈয়দ সাহেব। দ্রুত উঠে গেলেন দোতলায়।

তাঁর নিজের মনের দ্বিধাকে তিনি কেমন করে লুকিয়ে রাখবেন?

রাবু বেরিয়ে এসেছে ঘর থেকে বারান্দায়। এক হাতে ওর ছোট একটা সুটকেস, আর এক হাতে লম্বা ঝোলা। পেছনে চাকরের মাথায় বেডিং।

কোথায় চললে রাবু আপা?

সুটকেসটা ধরতো! প্রশ্নের জবাব দিয়ে ওর হাতে সুটকেসটা তুলে দিল রাবু।

বৈঠকখানার সবগুলো চোখ স্তব্ধ বিস্ময়ে দেখল রাবুকে। দেখল ওর হাতের ব্যাগটা, পেছনে মালু, তার পেছনে বেডিং মাথায় চাকরটাকে মোজাদ্দেদী সাহেবও দেখলেন।

কেউ চোখ ফিরিয়ে দেখল না। মোজাদ্দেদী সাহেবও না।

কারও দিকে, কোনো দিকে তাকাবে না, সোজা বেরিয়ে যাবে, হয়ত তা ভেবেছিল রাবু। কিন্তু মোজাদ্দেদী সাহেবের দৃষ্টিকে বুঝি কেউ কখনও পাশ কাটিয়ে যেতে পারেনি। রাবুও পারল না। ঘরের মাঝামাঝি এসে থমকে দাঁড়াতে হল ওকে। মোজাদ্দেদী সাহেবের চোখজোড়া সাঁড়াশির মতো গেঁথে নিয়েছে ওকে।

মালু দেখেছে সাপের চোখ, আপন ক্রূরতায় সদা চঞ্চল সদা অস্থির। কিন্তু মালু দেখছে শিকারের মুখোমুখি, ছোবলের পূর্ব মুহূর্তে স্থির, তীরের ফলার মতো তীক্ষ্ণ সে চোখ। সে চোখের মতো ভয়ংকর কিছু নেই পৃথিবীতে। এ ভয়ংকর দৃষ্টিকে অগ্রাহ্য করে রাবু বুঝি এগুতে চাইল এক পা।

ঠ্যারো।

রাবুর পা-টা যেমন উঠিয়েছিল বুঝি তেমনি রয়ে গেল।

ঠ্যারো বাত শুনো। ক্রুদ্ধ গর্জনে ফেটে পড়লেন মোজাদ্দেদী সাহেব। কয়েকটি মুহূর্ত সেই গর্জনের প্রতিধ্বনিটা ঘরের মেঝেতে আছড়ে পড়ে বুঝি ভূমিকম্প সৃষ্টি করে গেল।

কোথায় যাচ্ছেন আপনি? সহসা কণ্ঠটাকে স্বাভাবিক করে সাফ বাংলায় শুধালেন মোজাদ্দেদী সাহেব!

পা কাঁপছে রাবুর। হয়ত এখনি হাঁটু ভেঙে পড়ে যাবে মাটিতে। হয়ত কিছু বলল ও। কিন্তু-শোনা গেল না কিছু।

এখানে বেগানা মরদ আছে। আমার খাদেমরা আছে। আপনি মাথায় ঘোমটা দিন। এবার একটা আদেশ দিলেন মোজাদ্দেদী সাহেব।

পা এখনও কাঁপছে রাবুর। মুখ রক্তহীন। কপালে ঘাম। এখুনি বুঝি সংজ্ঞা হারাবে রাবু। ওর শক্তি ফুরিয়ে এসেছে।

ঘোমটাটা দিন। আরও উচ্চৈঃস্বর হল মোজাদ্দেদী সাহেবের আদেশ।

আশ্চর্য! ঘামজমা কপালের নিচে রাবুর চোখ দুটো সহসা যেন জ্বলে উঠল এক জোড়া আগুন পাওয়া বারুদের মতো। জ্বলে উঠে স্থির হল সেই সাপের চোখের উপর!

ওর তিক্ত অতীত আর অজানা ভবিষ্যৎ–বুঝি তারই মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে রাবু। মোজাদ্দেদী সাহেবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বুঝি ভয়কে জয় করল রাবু।

রাগে ফুলছেন, ক্ষেপছেন মোজাদ্দেদী সাহেব। এবার চেঁচিয়ে উঠলেন মোজাদ্দেদী সাহেব, এখনও খসমের নির্দেশ অমান্য করছেন আপনি? আমি বলছি আপনি মাথায় কাপড় দিন।

না।

না। একটি শব্দ। যেন একটি বজ্রের বিস্ফোরণে কাঁপিয়ে গেল সারা ঘরটা, ঘরের লোকগুলোকে, মোজাদ্দেদী সাহেবকেও।

একমুহূর্তও দেরি করল না রাবু। প্রায় দৌড় নেবে এল রাস্তায়।

৪২.

উঠতি মুসলিম মধ্যবিত্তের এলাকা পার্ক সার্কাস। হিন্দুও ছিল, সংখ্যায় তারা কম। কিছু কাটা পড়ছে দাঙ্গায়। বাকীরা উঠে গেছে বালিগঞ্জ অথবা ভবানীপুর।

পার্ক সার্কাসে নতুন করে পত্তন হয়েছে মন্নুজান হোস্টেলের। হোস্টেলেই ফিরে এসেছে রাবু।

হোস্টেলের জীবনটা ভালো লাগে আমার। পড়ি। কাজ করি। নিজের মতো করে থাকি। আত্মীয়স্বজন কারও তোয়াক্কা রাখিনে।

সাবাস! এই তো যুগের কথা, নতুন যুগের নতুন নারীত্বের কথা। খুশি হয়ে রীতিমতো হাততালি দেয় মালু।

চুপ করতো। দিনে দিনে ফাজিল হয়ে উঠছিস তুই। ধমক ছাড়ল রাবু। রাবু চটেছে। সেদিনও চটেছিল।

মোজাদ্দেদী সাহেবের মুখের উপর অমন একটা না ছুঁড়ে মেরে রাবু যখন নেবে এসেছিল রাস্তায়–মালু মনের খুশিটা ধরে রাখতে পারেনি। বলেছিল এর নাম বিপ্লব। বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক।

কটমটিয়ে তাকিয়েছিল রাবু। তারপর কিছু দূরে দাঁড়ান ফিটন গাড়িটার দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলেছিল, গাড়িটাকে ডাক। মালগুলো তোল। মালুর দুরন্ত কৌতূহল। রাবুর হোস্টেলের সিঁড়িতে মালগুলো নাবিয়েই ও ফিরে এসেছিল পার্ক স্ট্রীটের বাড়িতে।

পার্ক স্ট্রীটের বাড়ির সামনে তখন ট্যাক্সি দাঁড়িয়েছে। সদরে ট্যাক্সিতে উঠবার আগে মোজাদ্দেদী সাহেব ছোটখাট একটা ভিড়ের সৃষ্টি করে ফেলেছেন রাস্তার

পাশে। সৈয়দবাড়ির বুড়োবুড়ি ছেলেমেয়েদের চরিত্র ইমান আর ধর্ম সম্পর্কে অত্যন্ত খোলাখুলি ভাবে স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করছেন মোজাদ্দেদী সাহেব। রাবু সম্পর্কেও তাঁর আখেরী মতামতটা প্রকাশ করছেন, এই আউরত কসবী হয়ে গেছে, তাকে নিয়ে আপন অন্দরমহলের পবিত্রতা নষ্ট করবেন না মোজাদ্দেদী সাহেব।

বাড়ির ভেতর জাহেদকে খুঁজে পায়নি মালু। রাবুর পিছু পিছুই বেরিয়ে গেছিল ও।

অবাক হয়েছিল মালু। রাস্তার লোক উপভোগ করছিল মোজাদ্দেদী সাহেবের জবান। সৈয়দবাড়ির কেউ প্রতিবাদ করছিল না, দরজায় খিল এঁটে কী এক বিহ্বল আতংক আর ভয়ে জড়োসড়ো বসেছিল সবাই।

ভিড় ভেঙে মালুই এগিয়ে এসেছিল। মোজাদ্দেদী সাহেবকে ঠেলে ট্যাক্সিতে তুলে দিয়েছিল।

এরপর ক্যাম্পে রাবুর সাথে দেখা হয়েছিল মালুর। ঘটনাটা বলেনি মালু। আজ বলল।

নিঃশব্দে শুনল রাবু। চুপচাপ পথ চলল। ওরা হাঁটছে ব্রাবোর্ন কলেজের ক্যাম্পের দিকে।

মাস্টার সাহেবকে মনে আছে তোর? হঠাৎ শুধাল রাবু।

বাহ্, কেন মনে থাকবে না?

মাস্টার সাহেব বলতেন, এই তো, এইতো সমাজের চেহারা। এ চেহারাটা পাল্টাতে হবে।

খাঁটি কথা। সায় দেয় মালু।

এখানে সেখানে ব্যক্তিগত প্রতিরোধ তখনই সার্থক যখন সেটা রূপান্তরিত হয় সমষ্টিগত প্রতিবাদে।

মালু পুরোপুরি সায় দিতে পারল না রাবুর কথায়। বলল, সার্থকতার কথা পরে। কিন্তু ছোট ছোট ব্যক্তিগত প্রতিরোধগুলোই তো সমষ্টিকে অনুপ্রাণিত করে। যেমন ত্যাগ, একের ত্যাগ অন্যকে প্রেরণা জোগায়।

রাবুর উত্তরটা শোনা গেল না। ওরা পৌঁছে গেছে কলেজের চত্বরে। সেখানে চত্বর আর বারান্দা জুড়ে রীতিমতো এক জটলা।

ভিড় এড়িয়ে রাবু উঠে গেল উপরে। জটলার ভেতরেই দাঁড়িয়ে পড়ল মালু।

দেখুন, আমি রায়টের বিরুদ্ধে। মানুষের শুভবুদ্ধি কখনো সায় দিতে পারে না এই অমানুষিক হানাহানির পক্ষে। কিন্তু, শুধু নিন্দে করলেই কী দাঙ্গা থেমে যাবে? থামবে না। আপনাকে যেতে হবে গভীরে, খুঁজে বের করতে হবে এ দাঙ্গার অন্তর্নিহিত কারণ। দৃঢ় সংযমে ধীরে ধীরে কথাগুলো বলছেন রাকীব সাহেব। সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্ত, ভেদবুদ্ধি। এটাই তো এ দাঙ্গার অন্তর্নিহিত কারণ। কিন্তু আমরা তো চোখে ঠুলি এঁটেছি। কিছুই দেখব না বলে মনস্থির করেছি। হাত নেড়ে নেড়ে জবাব দিচ্ছে অন্য বক্তা। মালু তাকে চেনে না।

বক্তার কথায় বুঝি অসহিষ্ণুতা, তাই একটু হাসলেন রাকীর সাহেব। বললেন : এই তো মুশকিল তোমাদের নিয়ে। এ্যালজেব্রার ফরমুলায় ফেলে সব সমস্যার সমাধান খোঁজ তোমরা। এই যে মুসলমান জাতটা, খাস বাংলাদেশে, প্রায় দুশটি বছর ধরে এত অবিচার এত অসম্মান কুড়িয়ে আসছে তার সমস্ত দোষ কী ইংরেজের ঘাড়ে চাপিয়েই সন্তুষ্ট থাকবে তোমরা? স্বীকার করি পরাধীনতার যত কুফল সবই আমাদের রোয়ায় রোয়ায়, কিন্তু আসন্ন স্বাধীনতার সনদে আমাদের নিরাপত্তা, আমাদের নিজস্ব বিকাশের গ্যারান্টি যদি না পাই...।

এক্সাক্টলী। পার্কসার্কাসটাকে বালীগঞ্জ বানাও, বেশি বেশি মুসলমানকে ডেপুটি বানাও রাইটার্স বিল্ডিংয়ের বড় বড় চেয়ারে কিছু মুসলমান বসাও, আপনার মতে তা হলেই সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। আমিও হয়ত ওখানে একমত আপনার সাথে; কেননা আপনার আমার মতো মধ্যবিত্তের সমস্যাটা একান্ত চাকরির সমস্যা। কিন্তু রহিমুদ্দী, সলিমুদ্দী অগুনতি খেটে খাওয়া মানুষ, তাদের কী হবে। হিন্দু বা ইংরেজকে হটিয়ে আমি কলিমুল্লা আপনি সলিমুল্লা, ম্যাজিস্ট্রেট হলে ডাণ্ডাটা কী ওদের মাথায় একটু আস্তে মারব? আপনার ভাই আলিমুল্লা যদি কেশোরাম জুট মিলের পাশে আর একটি রহিম জুট মিল বসায় সে কী শ্রমিকগুলোকে কম শোষণ করবে?

দমবার পাত্র নন রাকীব সাহেব। নির্বিচলভাবে আগের কথাটাই শেষ করলেন তিনি। আমরা মুসলমান। নিজেদের আচার রীতি, নিজেদের মানস দিয়ে গড়ে তুলতে চাই নিজেদের জীবনটা। দেশের সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় যতদিন আমাদের এই জন্মগত অধিকারে স্বীকৃতি না দেবে ততদিন এই ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা চলতেই থাকবে। এটা কী বুঝছ না তুমি? অপর বক্তার উত্তরটা যেন তৈরিই ছিল। রাকীব সাহেব থামতে না থামতেই বেরিয়ে এল উত্তরটা : আমরা মাথা ফাটাফাটি করে মরি। ওদিকে মজাসে রাজত্ব করুক ইংরেজ, এই তো?

তা নিজেদের ঘর যদি সামলে না উঠতে পারি রাজত্ব ওরা করবেই তো? নিজেদের সমস্যা আর বিরোধগুলো যদি আমরা নিজেরা নিস্পত্তি করতে না পারি তবে বলব আমরা স্বাধীনতার উপযুক্ত হইনি এখনো।

কিন্তু সমস্যার গোড়ায় তো ইংরেজের অনুচরগুলোই ইন্ধন জুগিয়ে চলেছে রাকীব ভাই। আর আমরা হিন্দু মুসলমান খেলছি তাদের হাতে। আমরা শত্রুকে ভুলে গেছি, ছুরি মারছি ভাইয়ের বুকে। এ তো মহাপাপ, রাকীব ভাই। স্বাধীনতার বিরুদ্ধে কোটি মানুষের মুক্তি সংগ্রামের বিরুদ্ধে এর চেয়ে জঘন্যতম কোনো অপরাধ হতে পারে কী? কী জবাব দেব আমরা ভাবী বংশধরদের?

আবেগ উন্মথিত কণ্ঠ ছেলেটির। ক্ষণকাল নিঃশব্দ চমকে ওকে দেখলেন রাকীব সাহেব, কী যেন বলতে গেলেন। কিন্তু অসংখ্য কাকলী গুঞ্জনে চাপা পড়ে যায় তাঁর কথাগুলো।

প্রজাপতির ঝাঁকের মতো এক দঙ্গল মেয়ে এসে ঘিরে ধরেছে রাকীব সাহেবকে।

ভীষণ ফাঁকি দিচ্ছেন, রাকীব ভাই! একদিনও এলেন না রিহার্সালে। গানগুলোর কী হবে বলুন তো?

রাকীব ভাই, আপনি কী ডোবাবেন আমাদের?

আজ কিন্তু ছাড়ছি না আপনাকে।

ওদের সব অভিযোগের জবাবে সরল চোখের মিষ্টি দৃষ্টি দিয়ে হাসেন রাকীব সাহেব। ওই স্মিত হাসিটাই বুঝি ওদের নিরস্ত্র করতে যথেষ্ট।

মেয়েদের ছেড়ে সেই তার্কিক ছেলেটির দিকেই আবার তাকালেন রাকীব সাহেব। উৎফুল্ল কণ্ঠটাকে বেশ উঁচু মাত্রায় তুলে বললেন, দেখ হে, দেখ। দেখে শেখ। মুসলমান মেয়েরা নাটক করছে। ঘরের কোণে জেনানা দর্শকের জন্যে নয়, একেবারে খোলা ময়দানে তোমার আমার সকলের জন্য। সেই যে কোন্ পত্রিকায় না লিখেছে, ক্ষুদে পাকিস্তান জিন্দাবাদ, তার অর্থটা এবার হৃদয়ঙ্গম করতে পারছ তো? নতুন শক্তির বাধন ছিঁড়েছে, তাকে রুখবার শক্তি মোল্লাদেরও নেই, তোমাদেরও নেই। বুঝে নাও কথাটা।

কথাটা শেষ করেই এমন এক কাণ্ড করে বসলেন রাকীব সাহেব যার জন্য প্রস্তুত ছিল না মালু। ভিড়ের এক কোণে একরকম লুকিয়েই ছিল মালু। তবু বুঝি এড়াতে পারেনি রাকীব সাহেবের দৃষ্টি।

ওহে দূরে দূরে কেন, এদিকে এসো। ডাকলেন রাকীব সাহেব। তারপর মেয়েদের দিকে তাকিয়ে বললেন : গায়ক আবদুল মালেক। খাঁটি, যাকে বলে একেবারে কাঁচ্চা সোনা, মানে পিউর গোল্ড। শোননি তো ওর গান? শুনলে আর আমার কাছে আসবে না। রিহার্সালটা ও-ই চালিয়ে নেবে। হেরফের হবে না, একদম পাকা ব্যবস্থা।

আদাব দিল মেয়েরা।

প্রতি অভিবাদনে হাতটা তুলতে গিয়েও বুঝি উঠাতে পারল না মালু। বিচিত্রবর্ণা প্রজাপতির মতো এতগুলো অপরিচিতা মেয়ের উৎসুক সন্ধানী চোখের সুমুখে হাত পা বুঝি ঠাণ্ডা হয়ে আসে মালুর।

ওরা একটা থিয়েটার আর একটা বিচিত্রা করছে দাঙ্গাপীড়িতদের সাহায্যার্থে। বুঝতেই পারছ, সকাজ-উদ্দেশ্য মহৎ। গানগুলো তুমি একটু দেখে দিও। নিজেও গাইবে বইকি? ফরজ কাজ কিন্তু, করতেই হবে। বুঝলে তো? মালুর কাঁধে হাত রেখে বললেন রাকীব সাহেব।

সায় না দিয়ে উপায় কী মালুর!

রাকীব সাহেবকে ছেড়ে এবার বুঝি মালুকেই ছেঁকে ধরে মেয়েরা।...

দি সার্কাস রেঞ্জ। রোজ তিনটের সময় রিহার্সাল শুরু হয় আমাদের। ঠিক সময় আসবেন কিন্তু।...ও... চেনেন না? বেশ, চলুন সঙ্গে, চিনে আসবেন।

ওরা কথার খই ফুটিয়ে চলে। মূক মালু ঘেমে একসা।

উঁহু এখুনি ওকে নিয়ে টানাটানি কর না। আমার সাথে জরুরি কাজ ওর। বললেন রাকীব সাহেব। বেরিয়ে এলেন মেয়েদের ব্যূহ ভেঙে। হাঁপ ছেড়ে বাঁচল মালু। রঙিন ডানা উড়িয়ে প্রজাপতির ঝাঁকের মতোই বুঝি উড়ে বেরিয়ে গেল মেয়ের দলটা।

রাকীব ভাই, চিরদিনই আপনি ফাঁকিবাজ। দিব্যি সটকে পড়লেন। যেতে যেতে একেবারে শেষ লাইনের মেয়েটি ঘাড় ফিরিয়ে বলল।

সে কথার ধারেও গেলেন না রাকীব সাহেব। চোখ নাচিয়ে ছুঁড়ে দিলেন একটা টিপ্পনিঃ ভুল করেছিসরে হাসিনা। এমন সকালে ছাই রংটা একটু মানায় না। ওটা অপরাহ্ন বেলার বৈরাগ্য রং।

হাসিনা বুঝি হটবার পাত্রী নয়। চিবুক বেঁকিয়ে গ্রীবা দুলিয়ে জবাব দিল ও। পছন্দ হল না তো? বেশ, কাল থেকে কিন্তু খাঁটি গেরুয়া ধরছি আমি।

মুখ ফিরিয়ে নিলেন রাকীব সাহেব।

মেয়ের দঙ্গলটা দূর থেকেই পাঠিয়ে দিল একটা হাসির হরা। তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল দেয়ালের ওপারে, রাস্তায়।

এই শোন্। একটি মেয়ে ভলান্টিয়ার যাচ্ছিল সুমুখ দিয়ে। ওকে ডাকলেন রাকীব সাহেব।

রিলিফ করতে এসেছিস, না প্রেম করতে এসেছিস?

এমন বেয়াড়া প্রশ্নের জন্য বুঝি প্রস্তুত ছিল না মেয়েটি। লজ্জায় লাল হয়ে যায় ওর শ্যামলাপনা মুখ।

মেয়েটির খোঁপায় একজোড়া সাদা টগর। আচমকা হাত বাড়িয়ে ফুল দুটি তুলে নিলেন রাকীব সাহেব, বললেন, যা। ভাগ। ত্রস্তে পালিয়ে বাঁচল মেয়েটি।

হো হো করে হেসে বাতাস ফাটালেন রাকীব সাহেব। মালুর দিকে তাকিয়ে বললেন, আমার এক প্রিয় ছাত্রী।

নির্দোষ হাসি। হাল্কা কৌতুক। কিন্তু সে কৌতুকে যোগ দিতে পারে না মালু। কোথায় যেন বাধে ওর। অথচ, কেমন সহজ অন্তরঙ্গতায় সকালের এক ঝলক উজ্জ্বল রোদের মতো ওই প্রজাপতির ঝাঁকে আপনাকে ছড়িয়ে দিলেন রাকীব সাহেব। এতটুকু আড়ষ্টতা নেই, সংকোচ নেই। আনন্দ বিতরণ আর গ্রহণের এ বুঝি এক দুর্লভ গুণ। সে গুণ নেই মালুর।

জীবনে এই প্রথম কোনো কিছু নেই বলে দুঃখ হল মালুর। আর যার আছে সেই সৌভাগ্যবানের প্রতি কী এক ঈর্ষার আঁচে দগ্ধ হল।

এ যেন এই মহানগরীর এক নতুন আর অভাবনীয় দিক। এখানেই এই ঈর্ষার জন্ম। কেমন কুৎসিত স্থূল আর অসহ্য তার জ্বালা। হৃৎপিণ্ডের কোনো অচিন গহ্বর থেকে উঠে এল সেই ঈর্ষাবোধ, ঘেন্না ছড়িয়ে দিল ওর সর্বাঙ্গে। ক্ষুদ্রতাবোধ, ঘিনঘিনে এক অস্বস্তি আর লজ্জা। মালুর মনে হল এই মহানগরীর মেলায় ও শুধু অপাংক্তেয় নয়, অশোভন।

আচ্ছা লক্ষ্মীছাড়া ছেলে তো তুই। গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে সেই যে উধাও হলি, আর দেখা নেই।

বারে, কোথায় উঠেছেন সেটা জানলে তো দেখা হবে?

রাস্তায় নেবে ফুটপাত ধরে হেঁটে চলে ওরা।

কী কাজ ছিল বলছিলেন? শুধাল মালু।

বাসায় তো চল। তারপর ধীরে সুস্থে শুনবি। বললেন রাকীব সাহেব।

ধীরে সুস্থে শোনার আরামটা তো আপনিই কেড়ে নিলেন। তিনটের সময় যেতে হবে ওই মেয়েদের দঙ্গলে। এই ময়লা পোশাকে যাওয়া যায়?

সত্যি তো। তা হলে কী করা যায়? সহানুভূতির ভান করে গম্ভীর হয়ে যান রাকীব সাহেব।

পার্ক স্ট্রীট যাব। সেখান থেকে মেজো ভায়ের একজোড়া পোশাক নিয়ে নেব। এছাড়া আর উপায় কী?

মালুর দুশ্চিন্তা দেখে হাসি বুঝি চেপে রাখতে পারেন না রাকীব সাহেব।

তা হলে আমি যাই। পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে এসে ডানমুখো হল মালু।

খবরটা তা হলে শুনবে না? আপনি বলছেন না যে।

আহা ভালো খবর এত তাড়াতাড়ি বলে ফেললে মজা থাকে নাকি? কী যেন রহস্য রাকীব সাহেবের কথায়।

ভালো খবর? বুঝি ধাঁধায় পড়ল মালু।

তোমার রেডিও কন্ট্রাক্ট তিনদিন ধরে পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। একটা খোলা খাম মালুর হাতে তুলে দিলেন রাকীব সাহেব।

সত্যি? হাতের আঙ্গুলগুলো বুঝি কাঁপছে মালুর।

শুধু হাত নয় বুকের ভেতরটাও কাঁপছে মালুর।

দুরু দুরু বুকে কম্পিত হাতে খামের ভেতরে কাগজটা বের করে আনল মালু। মেলে ধরল চোখের সুমুখে।

মালুর মনে হল এতদিনের সমস্ত যন্ত্রণা সমস্ত লাঞ্ছনা সার্থক। আজ খুলে গেছে মধুময় আনন্দিত জীবনের দুয়ার।

৪৩.

রহস্য বৈচিত্র্যে অনুপম আশ্চর্য সুন্দর এই পৃথিবী। অদ্ভুত এই পৃথিবীর মায়া। সেই যে দৈত্য বিধ্বস্ত মৃতের নগরী কলকাতা সেও বুঝি কাফন খুলে বেরিয়ে এসেছে জীবনের রাজ্যে। জীবনের রক্ত চলাচল তার ধমনীতে। আবার ট্রাম নেবেছে রাস্তায়। গাড়ি ঘোড়া, যন্ত্র আর মানুষের বিচিত্র ঐকতানে আবার মুখর মহানগরী।

সেই যে উন্মাদ খুন খারাবি–সে ছিল যেন হঠাৎ জ্বরের ঘোরে দুর্বোধ্য বিকার। কেটে যাচ্ছে সে বিকারের ঘোর। ছুরির ডগায় শানিয়ে ওঠা যে ভাষা, তার বদলে সহজ প্রেম আর প্রীতির ভাষাটা যেন ফিরে পাচ্ছে মানুষ। নিজের ভাষায় আবার কথা বলতে শুরু করেছে মহানগরীর নাগরিক। এই বুঝি মহানগরীর ঢং। ক্ষণে ক্ষণে তার নতুন রূপ, অভাবনীয় প্রকাশ। অবাক মানে বাকুলিয়ার সেই খোকা বয়াতি আবদুল মালেক। এতদিন আজব আর অপরিচিত মনে হয়েছিল এই শহরটাকে। অবগুণ্ঠিত ছিল তার মোহিনী রূপ। অনুদ্ঘাটিত ছিল তার বিপুল ঐশ্বর্য। তাই তো সেই নরক রাতের পর থেকে মালু কেবলই অভিসম্পাত দিয়ে চলেছিল এই মহানগরীর উদ্দেশে।

কিন্তু আজ?

বিশাল এই নগরীর স্পন্দন ওর আপন সত্তার গভীরে।

মার্ভেলাস। ইউনিক। শৈলেন বাবুই আনন্দে উচ্ছাসে লাফিয়ে উঠেন।

বার বার পিঠ চাপড়ে দেন মালুর।

পর পর প্রোগ্রাম পেল মালু।

অজেয় গ্যাস্টিন প্লেস খোশ আমাদের দ্বার খুলে দিয়েছে ওর জন্য। ওর সাধনার মুখে খড় কুটোর মতো উড়ে গেছে সব বাধা।

মালুর মনে হয়, এতদিনে বুঝি সার্থক ওর নগর-অভিযান। গানের সুরে দূর বাকুলিয়ার সেই সীমাহীন দিগন্তকে মালু টেনে এনেছে এই মহানগরীর ক্ষুদ্র আকাশে। একটি নতুন উপহার পেয়ে যেন কৃতজ্ঞ মহানগরী। বুঝি প্রতিদানে এই মহানগরী বিপুল তার সম্পদ ভাণ্ডার উজাড় করে ঢেলে দিয়েছে তরুণ শিল্পীর পায়ে।

এও বুঝি মহানগরীর কোনো মহাকৌতুক। অজ্ঞাতকে, অক্ষমকে, শক্তিমানকে সবাইকেই সে টেনে নেবে, কিন্তু গ্রহণ করবে না কাউকে। যার আছে সাধনার ধৈর্য, শক্তির দুঃসাহস, তাকেও অনেক কষ্ট করেই যেন পথ কেটে নিতে হয়। রুদ্ধ কপাট ভেঙে অন্তঃপুরে অধিকার প্রতিষ্ঠা করে নিতে হয়।

মালু যেন অল্প আয়াসেই প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেল সেই অন্তঃপুরে। সেখানে মহানগরীর আপন সুর, বিচিত্র ঐকতান। সেই মহাতানে লীন মালুর অস্তিত্ব।

শহরটাকে গভীরভাবে ভালোবেসে ফেলেছে মালু। চমকে উঠবারই কথা। সেই মালু, বাকুলিয়ার মিঞা-সৈয়দরা দেশ ছেড়েছে বলে বিদ্রূপের গান বেঁধেছিল, সে-ই কিনা এই শহরের মায়ায় আটকা পড়ে গেল?

সব কিছুই সুন্দর। সব কিছুই অপরূপ। ওই এ্যাসফাল্টের রাস্তা, ট্রামের ঘর্ঘর শব্দ, বাসের কিউ, মাথার উপরে মাকড়সার সুতোর মতো ছড়ান অজস্র বিজলী তার। টেলিফোনের খাম্বার উপর দাঁড়িয়ে থাকা কাকটাও কৃষ্ণশ্রীতে আজ রূপবান।

যুদ্ধ থেমে গেছে তবু বাফেলওয়ালগুলো ভাঙা হয়নি। বিজলী বাতির চোখে যে কালো ঠুলি পরান হয়েছিল সেগুলো নামান হয়নি। পার্ক সার্কাস ময়দান বা অন্য কোনো পার্কেই হাঁটার উপায় নেই। ট্রেঞ্চে ভর্তি। সেই ট্রেঞ্চগুলো এখনও ভরাট হয়নি। রোজই মেজাজ খারাপ করত মালু, নগর কর্তৃপক্ষ আর ইংরেজের বাচ্চা লাল বাঁদরগুলোর বিরুদ্ধে জিবে শান লাগাত। কিন্তু বাফেলওয়াল, বাতির মুখের কালো বোরখা, পার্ক সার্কাস মাঠের ট্রেঞ্চ, কোনোটাই আর বিসদৃশ মনে হয় না মালুর। মনে হয় এই তো স্বাভাবিক, এই তো কলকাতা, এবড়ো থেবড়ো নানা অমিল আর গরমিলের মহাতান, মহানগরী। আর তার চেয়েও সুন্দর এর মানুষগুলো, উদার আকর্ষণীয়। আর মালু বুঝি এই নগরীর সবারই প্রিয়। রিহার্সালের মেয়েগুলো বিমুগ্ধ চোখে শ্রদ্ধা ঝরায়, দেখা হলে আদাব দিয়ে বাড়িতে দাওয়াত জানায়। গানের মাস্টার হিসেবে বহাল করে।

ছাত্ররা আসে অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ নিয়ে।

বুকে জড়িয়ে ধরে জাহেদ। বলে, সাধনার ধন মিছে যায় না কখনো। শুধু সাবধানী দেয় রাবু। বলে, মাথাটা ঠিক রাখিস। তারপর বম্বে ক্রাউনে নিয়ে ব্রেইন কাটলেট খাওয়ায়।

৪৪.

কুয়াশা ঢাকা ভোর। দূরের ট্রামটাকে দেখে মনে হয় বুঝি এক চাক কুয়াশাই ছুটে আসছে। ভিজে রাস্তা। পিছল ফুটপাত।

এসপ্লানেডের মোড়টা পেরিয়ে আচমকা পেছন থেকে একটা ধাক্কা খেল মালু। কে যেন হুড়মুড়ি খেয়ে পড়েছে ওর ঘাড়ে।

আরে অশোকদা?

সেই যে বৌবাজারের মেস থেকে বেরিয়ে এসেছিল মালু আর দেখা হয়নি অশোকের সাথে। আর এখন, এখানেই তো দেখা হওয়া স্বাভাবিক। জায়গাটা হিন্দুরও নয়, মুসলমানেরও নয়। জায়গাটা বিদেশি শাসকদের বিপণি কেন্দ্র। তাই সবাই আসে এখানে, নির্ভয়ে।

কেমন আছেন অশোকদা? খুশি ছড়িয়ে শুধাল মালু।

রানু মারা গেছে। বিনা ভূমিকায় মালুকে এতটুকু প্রস্তুতির অবকাশ না দিয়েই বলে ফেলল অশোক।

মৃত্যুই বোধহয় টেনে এনেছিল ওকে। এখানে বেড়াতে এসেছিল ভাশুর বাড়ি। এখান থেকে যাবে তালতলি। আজ যাই কাল যাই করে যাওয়া হচ্ছিল না।

তারপর? রুদ্ধশ্বাস মালু।

ওর ভাশুরের বাসাটা ছিল বেনে পুকুরে। সেই রাতেই আক্রান্ত হয় ওরা। কোনো রকমে ঠেকিয়ে রেখেছিল রাতটা। সকাল পর্যন্ত পারল না ঠেকাতে। সবাই মারা পড়ল। বেঁচে গেল শুধু রানুর ছোট বাচ্চাটা। লেপ তোশকের গাদির ভেতর পড়েছিল। লক্ষ করেনি কেউ।

মনে পড়ল মালুর। যে সময়টিতে রাবুর শূন্য হোস্টেলটার সুমুখে দাঁড়িয়ে নৃশংস কোনো মৃত্যুর প্রতীক্ষায় চেতনা হারিয়েছিল মালু, ঠিক সেই সময়টিতে নগরীর আর এক প্রান্তে আর একটি মৃত্যু অনেক কিছু ছিনিয়ে নিয়ে গেছে এ পৃথিবী থেকে।

কারো মৃত্যু যে অনেক অর্থই কেড়ে নেয় জীবনের, আলোভরা পৃথিবীটাকে ঢেকে দেয় নিকষ আঁধারে, বুঝি এই প্রথম উপলব্ধি করল মালু।

তারপর? তারপর কী, অশোকদা? চেঁচিয়ে শুধায় মালু। আশেপাশের সচকিত লোকগুলের দিকে তাকিয়ে বুঝি হুঁশ হল ওর।

কেন যেন মনে হল মালুর, মৃত্যুর পরও বেঁচে রয়েছে রানুদি। আর সেই রানুদির অনেক খবরই নেবার রয়েছে, অনেক কিছুই জানার রয়েছে।

অশোকদা শুনুন!

অশোক ততক্ষণে চলন্ত একটা ট্রামে লাফিয়ে উঠেছে। সেখান থেকেই মুখ ঘুরিয়ে বলছে : আমার বড় তাড়া। এই শহরে অসহ্য যন্ত্রণা। আজই রওনা দিচ্ছি দ্বারকার পথে। শিগগিরই ফিরে আসছি। দেখা করিস মেসে।

ফড়িংয়ের মতো তেমনি এখানে সেখানে লাফিয়ে ঝাঁপিয়েই বুঝি দিন কাটছে অশোকের। বেন্টিং স্ট্রীটের মোড় কেটে দ্রুত অপসৃয়মাণ ট্রামখানার দিকে কী এক বেদনার দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকে মালু। এসপ্ল্যানেডের চৌমাথা পেরিয়ে আবার ধর্মতলার রাস্তাটা ধরল মালু। আস্তে আস্তে হেঁটে চলল।

মাত্র কয়েকদিন আগে যে সার্থকতার আনন্দে উপচে উঠেছিল ওর মনটা, মহানগরীর বিচিত্র ছন্দতানে নিবিড় আত্মীয়তার অনুভূতিতে আপনাকে বিরাট আর সম্পদময় মনে হয়েছিল ওর–সবই যেন উবে গেল এক লহমায়। রাস্তায় লোক চলছে পাতলা পাতলা। কলকাতার বিশাল জনস্রোত, কাঁধে ঘেঁষাঘেঁষি করে, গায়ে গায়ে হুড়মুড়ি খেয়ে চলা, সেই জনস্রোত যেন অতীতের কোনো কিস্সা কাহিনী।

সজাগ ইন্দ্রিয়, সতর্ক পা, কেমন ছাড়া ছাড়া ভাবে চলছে আজকের নাগরিক। ওদের মুখে মহানগীর আতঙ্ক, ওদের চোখে কী এক সন্দেহ, কী এক অবিশ্বাস। ওরা যেন আপন দেশের মাটিতে হাঁটছে না। প্রাণটাকে হাতে নিয়ে ওরা যেন হাঁটছে কোন শত্রুপুরীর অনাত্মীয় পথে। তাই এত ভীত শঙ্কিত পদক্ষেপ ওদের।

গাটা যেন কাঁটা দিয়ে গেল মালুর।

মহানগরীর নাগরিক: ফিরে পেয়েছে তার আপন ভাষা। আপন ভাষায় আবার কথা বলছে সে। তাই তো ভাবছিল মালু। এত বড় মিথ্যাটাকে কেমন করে সত্য বলে ভেবেছিল মালু?

আপন আনন্দের সুরখানা চোখে বুঝি ভুলই দেখেছিল ও। এমনিই বুঝি হয়। বাইরের পৃথিবীতে আমরা শুধু আপন মনের প্রতিবিম্বটাই দেখি, দেখতে চাই। তাই সঠিক দেখাটা কদাচিৎ সম্ভব হয় জীবনে।

মহানগরীর ক্ষত এখনো শুকায়নি। কলঙ্কের চিহ্নগুলো এখনো অদৃশ্য হয়নি। দৃষ্ট ব্যাধির বিষাক্ত জীবাণুরা এখনো কিলবিল করে বেড়ায়, প্রকাশ্যে নয়, নগর দেহের গোপন অন্ত্রে, গিঁঠে গিঁঠে।

কোন্ বন্যায় ভেসে যাবে এত ব্যাধির জীবাণু?

অকস্মাৎ সেই যুদ্ধ কালের বিষাক্ত তালতলির কথাটা মনে পড়ল মালুর। রিক্ততার হাহাকার ভরা দখিন ক্ষেত, বিরানা গ্রাম আর তালতলির তাল সারির মাথায় সে শকুনগুলো।

সেই শকুনির দলটা এখানে বুঝি বিষাক্ত লালা ঝরিয়ে চলেছে। উড়ে উড়ে সর্বত্র ছিটিয়ে দিচ্ছে সে বিষ-লালা। সে বিষ পান করে মানুষ হারিয়েছে তার সত্তা, আত্মাকে করেছে কলুষিত, মনকে করেছে পঙ্গু।

দ্রুত পা চালায় মালু। এত মৃত্যুর বেড়াজাল থেকে বুঝি পালিয়ে বাঁচতে চায় ও।

৪৫.

স্যার।

সেই কখন থেকে বেয়ারা করিম দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করছে। কে যেন মালুর সাথে দেখা করবে বলে অপেক্ষা করে আসছে অনেকক্ষণ। মুখ তোলে না মালু। কাগজের উপর চোখ বুলিয়ে চলেছে ও।

পাঁচ মিনিট পর। কথাটা বলেই আবার কাগজের তাড়ায় ডুব দেয় মালু। সই চালায় খস খস।

উদ্বেল ভক্তি। জানবার বুঝবার সে কী সীমাহীন আকুতি। গভীর মনোযোগের সাথে চিঠিগুলো পড়ে মালু। উত্তর দেয় সব চিঠিরই, নিষ্ঠার সাথে, সময় নিয়ে, সুন্দর করে।

এটা ওর গানেরই অংশ। তাই গানের মতোই একাগ্রতা ঢেলে উত্তরগুলো লেখে মালু। ডাকে ফেলবার আগে পড়ে দেখে আর একবার।

উদ্বেল ভক্তি। জানবার বুঝবার সে কী সীমাহীন আকুতি। গভীর জিজ্ঞাসা। নিবিড় মমতা। চিঠিগুলো পড়ে আর অভিভূত হয় মালু। দূর দূরান্তে ছড়ান কত শ্রোতা মালুর। এই চিঠিগুলো যেন ওদের আত্মার পরিচয়। ওদের প্রশ্ন, ওদের কৌতূহল, ওদের প্রশংসা–সবই যেন শিল্পীর প্রতি উষ্ণ এক প্রীতির ঘোষণা। সে প্রীতির

স্পর্শে বল পায়, শক্তি পায় মালু। তাই উত্তর দেয়ার পরও চিঠিগুলো জমিয়ে রাখে মালু। অফিসে আর বাড়িতে পুরনো চিঠির ছোট খাট টিলে বানিয়ে তুলেছে ও।

স্যার, বাজে কাগজ মেলা জমেছে, ফেলে দেব? করিম মিঞা কত দিন অনুমতি চেয়েছে।

না না। ও সবে হাত দিও না তুমি। চেঁচিয়ে উঠেছে মালু। বুঝি সাত রাজার ধন। যক্ষের মতো আগলে থাকে মালু।

"...মুগ্ধ হই, বিস্মিত হই তোমার গান শুনে। কখনো হারিয়ে যাই সুরের বন্যায়। কখনো চমকে উঠি। প্রশ্ন করি নিজেকে : এত সম্পদ এত ঐশ্বর্য আমার। এই ঐশ্বর্যকে চিনে নিতে এত দেরি লাগল কেন। ধিক্কার দেই নিজেকে....

আমার সেই ঐশ্বর্যকে চিনিয়ে দিলে তুমি। আমার অনাবিষ্কৃত ভাণ্ডার আমারই সুমুখে তুলে ধরলে তুমি। আমার গৌরব ফিরিয়ে দিলে আমাকে। তাই তো তুমি শিল্পী। তুমি সার্থক। প্রণাম তোমাকে। ইতি–"
রি–।

পড়াটা শেষ করে খামটা উল্টে পাল্টে দেখল মালু। একই খাম, হলদেটে রং দামী বিলেতী কাগজের খাম। একই হস্তাক্ষর, সেই একই জেনারেল পোস্ট অফিসের কালি জড়ান অস্পষ্ট ছাপ। ভালো লাগে মালুর। কী এক রোমাঞ্চিত ছোঁয়ায় সাড়া জাগে প্রাণে। কিন্তু আজ অবধি এই অচেনা রি-র চিঠির উত্তর দিতে পারে না মালু। স্যার আরো দুজন সাহেব এসেছে দেখা করতে। মালুর অন্যমনস্কতার সুযোগে বুঝি একটু সাহস সঞ্চয় করে নিল করিম।

বসতে বল। আগের সাহেবটাকে নিয়ে এসো। চিঠি পত্রের ফাইলটা সরিয়ে রাখে মালু। নোট বইয়ের ফাঁক থেকে মুখ বের করে আসছে দুতা কাগজ। চোখ পড়ায় মালু টেনে নিল কাগজের তা। বিরক্ত রেখার কুঞ্চন জাগে ওর জোড়া ভ্রূর সংগম কেন্দ্রে।

ইস, নজরুল জয়ন্তীর গানগুলোর রিহার্সাল এখনো শুরু হয়নি। বিড় বিড় উচ্চারণ করে মালু। আবার নোট বইয়ের ভেতর চাপা দিয়ে রাখে কাগজগুলো। কী এক অসন্তোষে ছুঁড়ে দেয় নোট বইটা। বক্স ফাঁইলের উপর একটু কাত হয়ে পড়ে থাকে নোট বই। করিম মিঞা তোমাকে আবার বলছি। লোকজন এলে ফওরান বিদায় করে দেবে। দেখছ না, কত কাজ জমেছে। ছড়ান দুটো হাত উল্টিয়ে সেক্রেটারিয়েট টেবিলটার উপর ঘুরিয়ে আনল মালু। ফেলে রাখা

কাজের বিপুল পরিমাণটা যেন স্পষ্ট করেই দেখিয়ে দিল করিম মিঞাকে। করিম সবে এসেছে ওঘর থেকে। পুরো কথাটা বোধ হয় কানে যায়নি ওর। তবু অভ্যাস মতোই বলল, জী স্যার।

আবার জী স্যার? না করেছি না স্যার বলতে? খেঁকিয়ে ওঠে মালু।

জী। মুখ নাবিয়ে নেয় করিম।

আর একটা শক্ত কিছু বলতে যাচ্ছিল মালু। সামলে নেয়। করিমের পেছনেই আগন্তুক ভদ্রলোক।

বসুন।

দেখুন, নেহাৎ অপারগ হয়েই আপনাকে বিরক্ত করতে এলাম। আপনি যদি একটু দয়া...

ইনিয়ে বিনিয়ে বলবে লম্বা ভনিতা, সে ভাবেই বুঝি প্রস্তুত হয়ে এসেছিল ভদ্রলোক। কিন্তু শুরুতেই বাদ সাধল মালু! কী বলবার সে কথাটাই বলে ফেলুন না। ভূমিকার কোনো প্রয়োজন আছে?

তেলতেলে চেহারা কেতাদুরস্ত ছেলেটি। মালুর অপ্রত্যাশিত রূঢ়তায় হকচকিয়ে যায়, গুলিয়ে যায় তৈরি করা কথাগুলো। কেমন আমতা আমতা করে বলে : হ্যাঁ, দেখুন, আপনি যদি কিছু মনে না করেন...মানে, আপনার কী সময় হবে?

না। শুধু রুক্ষ নয়, বড় অভদ্র মালুর জবাবটা। অপমান বোধে রাঙ্গিয়ে উঠে মুখ নীচু করে ছেলেটা।

বুঝি কৃপাবোধে নরম হয়ে আসে মালু। আর একটু হলে সশব্দে হেসেই দিচ্ছিল। হয়ত বড় লোকের সুখে পালা অপদার্থ ছেলে। অথবা অক্ষর বর্জিত ছোকরা সহসা পয়সা বানিয়ে ফেলেছে। মনে মনে ভাবল মালু। এবার বলে ফেলুন আপনার কথাটা। আমার মেলা তাড়া। মুচকি হেসে অভয় দিল মালু।

ভড় ভড় করে বলে গেল ছেলেটি : দেখুন! আমার একটি ছোট বোন, খালাত বোন। কলেজে পড়ছিল। পড়া ভালো লাগে না। এখন বাড়িতেই বসে আছে।....

এবং বাড়িতে বসে সকালে চা পান করে। দুপুরে ভাত খায়, রাতে খায় পরোটা। তারপর ঘুমুতে যায়। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখে...বলুন বলুন। বলে চলুন। ছেলেটির কণ্ঠস্বর নকল করে ভেংচিয়ে চলে মালু। অর্থহীন ভনিতায় এবার

সত্যিই চটেছে মালু। প্লিজ, মেহেরবানী করে শুনুন আমার কথাটা। বোনটির আমার ভারি শখ, গান শেখে। বেশি না, হপ্তায় দুটো করে বৈঠক নেবেন, মাসে হবে আট কী নয়টি বৈঠক, প্রতি বৈঠকে দশ টাকা করে আশি বা নব্বই। তা আপনাকে শতটা পুরিয়েই দেব। বলুন, আপনি রাজি?

না।

কিন্তু, আপনাকে ছাড়া যে আর কারু কাছে গান শিখবে না আমার বোন।

দুঃখিত। আপনার বোনের শখের গান শেখানোর মতো ফুরসুত হাতে নেই আমার।

দেখুন, একশোয় না হয়, দেড় শো? যা চাইবেন আপনি। তবু দোহাই আপনার…

সাহেবের বুঝি খুব পয়সা আছে?

এমন একটা বেমক্কা আক্রমণে চুপসে যায় ছেলেটা। ফ্যাকাশে মুখে কথা জোটে না ওর।

ইশারা পেয়ে ততক্ষণে অপর দর্শনার্থীদের নিয়ে করিম ঢুকে পড়েছে ঘরের ভেতর। ওদের দিকে মন দেয় মালু।

দেড় শো থেকে দু শোতেও উঠতে পারে ছেলেটা, এই ফাঁকে সে কথাটা জানিয়ে দেয়। সাড়া না পেয়ে বেরিয়ে যায় ক্ষুণ্ন মুখে।

দুভদ্রলোককে বিদায় দিয়ে আবার কাজে মন দিল মালু।

অনেক কাজ ওর। অনেক দায়িত্ব।

নাজিমুদ্দীন রোডের সেই হলদে বাড়িটা। সেদিন সেটাই ছিল ঢাকার বেতার ভবন।

এবাড়ির একটি নির্দিষ্ট কক্ষকে কেন্দ্র করে মালুর নতুন জীবন। কর্মঠাসা সদা উদ্বিগ্ন ব্যস্ত জীবন।

সাফল্য নাকি নিয়ে আসে দায়িত্বের বোঝা। সে দায়িত্বের ভার বইতে হয় সাফল্যের নতুন নতুন পরীক্ষার সিঁড়ি ডিঙিয়ে। তাই নাকি নিয়ম। সে নিয়মেই কদাচিৎ একটু ফুরসুত মিলে মালুর। গান শেষ হল তো শুরু হল রিহার্সাল। আর সে রিহার্সালের মা বাপ আগা-মাথা কোনো কিছুরই ঠিক নেই। অমুক এল তো তমুক এল না। অমুককে আনতে ছোট। ততক্ষণ হাতপা গুটিয়ে বসে থাক। সব চেয়ে মুশকিল মেয়েগুলোর অভিভাবকদের নিয়ে। দেশটা আজাদ হলেও সমাজ

বা পারিবারিক জীবনে আজাদীটা মকসো করতে সায় দেয় না তাঁদের রক্ষণশীল মন। রেডিও থিয়েটার সিনেমা, সবই তাঁদের চোখে সমান, ইতরামি আর নোংরামির আখড়া। অতএব সে সব জায়গায় বাড়ির মেয়েদের নাচতে গাইতে দিতে নারাজ তারা।

অবশ্য, তাঁরা বলেন, মালেক সাহেবকে তাঁরা বিশ্বাস করেন। তিনি অর্থাৎ মালেক সাহেব স্বয়ং নিয়ে যাবেন মেয়েদের, খেয়াল রাখবেন ওদের উপর। অর্থাৎ বদ ছেলেদের পাল্লায় পড়ে ফষ্টিনষ্টির সুযোগ যেন না পায় ওরা। তারপর প্রোগ্রাম শেষে পৌঁছিয়ে দিয়ে যাবেন বাড়ি বাড়ি। তাহলে দুএকজন নেহাৎ মোল্লা কিসিমের অভিভাবক ছাড়া আর সবাই রাজি। উপায় কী! সে দায়িত্বটা পুরোপুরিই নিতে হয়েছে মালুকে।

মেজো ভাই, দেখছো কাণ্ডটা? বাড়ি বাড়ি গিয়ে মেয়েদের কুড়িয়ে আনতে আর ফেরত দিয়ে আসতেই দিনের কতগুলো ঘণ্টা চলে যায় আমার। একটু পড়ব, একটু অনুশীলন করব, সে উপায় নেই। এর উপরেও কত গার্ডিয়ানের যে পায়ে ধরতে হয়। ক্ষুণ্ণ, অভিযোগ ভরা স্বর মালুর। কার উপর রাগ করছিসরে?

এই কমবখৃত অভিভাবকগুলো

হো হো করে হেসে দেয় জাহেদ। স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে স্নেহ ঝরিয়ে বলে : একটু ধৈর্য ধর, একটু সবুর কর। তুই ভুলে যাচ্ছিস, মধ্যযুগীয় পঙ্ককুণ্ড থেকে উঠে আসছি আমরা। পিছিয়ে পড়া জাত, স্বাধীনতার সনদটা পেয়ে গেলাম বলেই রাতারাতি বদলে যাবে দৃষ্টিভঙ্গিটা, ভাবছিস কেন?

চুপ করে শোনে মালু। এ সব যে বোঝে না সে তাও নয়। কিন্তু এত সব ঝামেলা সামলে নিজের জন্য যে একটুও সময় পাচ্ছে না ও। সেখানেই তো ওর যত ক্ষোভ, যত অভিযোগ।

শোন্ মালু। এই দেশের মাটির ধাঁচই আলাদা। এ মাটির মানুষ একবার যেটাকে ধরে, তার শেষ অবধি দেখে একেবারে হেস্ত নেস্ত করেই ছাড়বে। আজ তোর অভিযোগ, উৎসাহিত ছেলে পাচ্ছিস না–কাকে গান শেখাবি, ঘর ছাড়তে নারাজ মেয়েরা। কিন্তু দেখছিস না তুই, শুরু হয়ে গেছে উৎসাহের প্রথম জোয়ার? আরম্ভ হয়েছে ঘর ছাড়ার অভিযান? তোড়ের মুখে এই অভিযান কোথায় গিয়ে শেষ হবে সে আজ কল্পনাও করতে পারবি না তুই। তোর পক্ষেই তখন তাল মিলিয়ে চলা দায় হয়ে পড়বে।

পরিচিত সেই বক্তৃতার ঢংয়ে কী এক উদ্দীপনায় বলে চলে জাহেদ। সেই ছোট বেলার মতো প্রতিটি কথায় প্রশ্নাতীত বিশ্বাসটা হয়ত আসে না মালুর কিন্তু শুনতে ভালো লাগে মালুর। নিজের বুকেও যেন প্রচণ্ড এক প্রেরণার শক্তি পাক খেয়ে যায়।

বাঁধ যখন ভেঙেছে একবার দুর্বার সেই স্রোতের মুখে কোনো সংস্কার, কোনো সনাতনী বাঁধনই আর টিকছে না। এটা মনে রাখিস। শুধু নিজের কাজটা নিষ্ঠার সাথে করে যা। এই দেশকে যে তোর অনেক কিছু দেবার আছে! মালুর কাঁধে সস্নেহ হাতের স্পর্শ বুলিয়ে কথাটা শেষ করে জাহেদ। জাহেদের উৎসাহে ঝামেলা পেরেশানীর ভারটা হয়ত একটু কম মনে হয় মালুর। কিন্তু সময় নিয়ে টানাটানি ওর দিন দিন বেড়েই চলেছে। এর উপর রয়েছে দৈনিক গড়পড়তা দুটো ট্যুশনি আর একটা গানের স্কুলের এক ঘণ্টার মাস্টারি। এ সব সেরে যখন একটুখানি সময় ছিনিয়ে নেয় মালু তখন হারমোনিয়ামটা নিয়ে বসে। সঙ্গে থাকে খাতা কলম। নতুন কোনো গানে সুর বাঁধে। পুরনো গানের সুর সাধে। কিন্তু, সে আর কতক্ষণ। ক্লান্তির ঘুমে বুজে আসে চোখের পাতা। শিথিল হয়ে ঢলে পড়ে শ্রান্ত দেহ। এমনি করে ক্ষুদ্র হতে হতে ক্রমশ বিরল হয়ে আসছে ওর অনুশীলনের অবসরটুকু।

এই অতৃপ্তিটা ঢেকে রাখতে পারে না মালু। অসন্তোষের চাপা আগুনটা ধিকি ধিকি পুড়িয়ে যায় ওর বুকের ভেতরটা। এই অসন্তোষের আগুনটাই বুঝি উল্কার আকারে ঝরে পড়ে তাদের উপর যারা আসে অনুগ্রহের প্রত্যাশায়, আসে প্রলোভনের ডালি নিয়ে। আসে দুর্লভ সময়ে অকারণ ভাগ বসাতে।

তাই বলে নিজের সহজ স্বভাবটাকে একেবারেই পাল্টিয়ে দেবে মালু? বুদ্ধি দিয়ে, চিন্তা দিয়ে এই পরিবর্তনটাকে কেমন করে স্বাভাবিক বলে গ্রহণ করবে মালু?

এ যেন ওর নিজে বিরুদ্ধেই কঠিন এক সংগ্রাম। নিজের সাথেই ওর সংঘাত। আপন শিল্পীসত্তার সাথে সামাজিক সত্তার, আপনার অন্তর্নিহিত মানবাত্মাটির বিরুদ্ধে শিল্পী আত্মার দায়িত্বের বোঝাঁটাই যেন অস্থির করে তুলেছে ওকে। সে অস্থিরতার চাঞ্চল্যে নিজেকে যেন ধরে রাখতে পারছে না ও। পারছে না সংযত পরিমার্জিত সামাজিক আচরণের স্পষ্ট একটা সীমারেখা টেনে নিতে। উগ্রতার, হয়ত আত্মম্ভরিতার একটা দূরত্ব আপনার অজানাতেই গড়ে তুলেছে ঘর সংসার করা স্বাভাবিক মানুষগুলোর সাথে। কিন্তু মালু তোত কোনোদিন এমনটি ছিল না? এখানেই, বুঝি স্ববিরোধিতা। বুদ্ধির সাথে আচরণের। বিশ্বাসের সাথে ব্যবহারের। এখানেই বুঝি বিরোধ, শিল্পী মানুষের সাথে সামাজিক মানুষের।

গোলগাল চেহারার সেই কেতাদুরস্ত ছেলেটার প্রতি অহেতুক দুর্ব্যবহারের জন্য অনুতপ্ত হয় মালু।

দেয়ালে টাঙানো ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে কুঁচকে আসে ওর জ্ব জোড়া। অফিস বন্ধ করার সময় প্রায় হয়ে এল। ওর না বেরুনো পর্যন্ত করিম আর কেরানী ইয়াসীনকেও বসে থাকতে হবে। বুঝি ওদের দিকে চেয়েই ফাঁইলগুলো বন্ধ করে রাখল মালু। কয়েকখানি চিঠি বেছে নিয়ে পুরে নিল হাত ব্যাগে। শোবার আগে উত্তরগুলো লিখে রাখবে।

সেই হলদেটে খামটা একটি স্বতন্ত্র মর্যাদায় রাখা আছে এক পাশে। দামী কাগজটা রেশমের মতো চক চক করছে। চিঠিখানা তুলে বুক পকেটে রেখে দিল মালু।

এ এক অদ্ভুত মেয়ে। প্রায় হপ্তায় হপ্তায় চিঠি লিখে চলছে। উত্তর চায় না। হয়ত নিজেকে খুশি করার জন্যই লেখে, তাই উত্তরের প্রয়োজন নেই ওর।

কিন্তু মেয়ে কী? খটকা লাগে ওর মনে। কেমন করে এই অনামাকে মেয়ে ধরে নিয়েছে মালু? গোটা গোটা হাতের লেখা দেখে? সে তো পুরুষেরও হতে পারে।

সেই প্রথম থেকেই কেন যেন মনে হয়েছে মালুর, ওই উৎসাহ ভরা পত্রগুলোর উৎস কোনো রহস্যময়ী মেয়ে। ওর গানের অনুরক্তা। ওর শুভার্থিনী। প্রিয় শিল্পীর কাছে বুঝি প্রেরণার অজ্ঞাত ঝরনা হয়েই থাকতে চায় মেয়েটি।

একটুখানি হাসি ঠোঁটের প্রান্ত থেকে উঠে এসে সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ে মালুর। ওই বিচিত্র কৌতুকিনীর চিঠিগুলো মালুর জন্য নির্মল এক আনন্দ।

করিম, ইয়াসীন, -চললাম। বেরিয়ে এল মালু।

গেটের সুমুখেই অপেক্ষমাণ রিক্সাটায় চড়ে বসল ও, বলল–টিকাটুলি। ঘরোয়া জলসা বলেই জানা ছিল মালুর। কিন্তু বাড়িটার ভেতরে ঢুকে ওর চক্ষু স্থির। প্রশস্ত আঙ্গিনায় শামিয়ানা টাঙিয়ে চেয়ার পেতে রীতিমতো শানদার জলসার আয়োজন। শামিয়ানা ছাড়িয়ে বারান্দা তক ভরে গেছে লোকে।

অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ মালু। উদ্যোক্তরা পূর্বাহ্নেই সে কথাটা ঘোষণা করে দিয়েছেন। হয়ত তাই এত লোক। সার্থক শিল্পীর গর্ব আর আনন্দের তৃপ্তিতে ভরে যায় মালুর বুকটা। ওর নামে যে কোনো জলসায় ভিড় করে আসে শ্রোতার দল।

প্রধান শিল্পীর মর্যাদা সম্পর্কে সজাগ মালু। মন দিয়ে গাইল ও। গাইল তালতলি বাকুলিয়ার সেই আদিম সুরে। ভূমিষ্ঠ হয়েই যে সুর শুনে আসছে এ দেশের

মানুষ। যে সুরে স্বপ্ন রচনা করেছে, অতীতকে দেখেছে, ভবিষ্যৎকে ডেকেছে।

ওরা শুনল ওদের নাড়ির সুর, ওদের মাটির সুর। ওরা চমকিত হল। মালু থামল।

নিস্পন্দ নির্বাক দর্শক। সুরের মূর্ছনায় বুঝি তলিয়ে গেছে ওরা। ওদের চেতনালোক কোনো অতীন্দ্রিয় আবেগে যেন ঘুমিয়ে গেছে। অথবা সুরের পাখায় ভর করে ওরা হারিয়ে গেছে নিজেদেরই কোনো ভাবলোকে, বিলীন হয়েছে স্পর্শে আর দৃষ্টির অতীত সুরেরই কোনো নিজস্ব পৃথিবীতে।

তারপর যেন অকস্মাৎ বিমূঢ় চমকের ঘোর কাটিয়ে ওরা ভেঙে পড়ে প্রচণ্ড হাত তালিতে। সামনে থেকে, পেছনে থেকে, চারিদিক থেকে ওরা ভেঙে পড়ে প্রচণ্ড হাত তালিতে। সামনে থেকে ওঠে চিৎকার–আবার আবার। মালু চোখ ফিরাল সেই মেয়েটির দিকে। প্রথম সারির দক্ষিণ কোণে ছবির মতো বসে আছে যে মেয়েটি। এখনো, চোখ মুদে আছে, যেন স্বপ্ন দেখছে ও। সেই স্বপ্নের আমেজেই বুঝি ঠোঁটের কার্নিশে ফুটে উঠেছে একটি চিকন মৃদু হাসির রেখা, আলো আঁধারের সন্ধিক্ষণের ছায়াটির মতোই অস্পষ্ট কিন্তু অপরূপ। ওর ফর্সা টকটকে মুখখানিতে লাবণ্যের পাতলা ছিলকের মতো লেগে রয়েছে বুঝি অতীন্দ্রিয় সেই সুর-লোকের মায়া। হাত জোড় করে মাফ চাইল মালু, আর গাইতে পারবে না সে।

কিন্তু জ্বলে উঠেছে ওর ভেতরটা, রোমকূপের অসংখ্য ছিদ্র দিয়ে সে জ্বালাটা পলায়নের পথ খুঁজেও যেন পথ পাচ্ছে না। ব্যর্থ নিরুপায় কোনো কান্নার মতো ওর শরীরটা ফুলে ফুঁসে উঠেছে। সহসা কী এক অপমান এসে বিঁধল ওর শিল্পী সত্তাকে।

চোখ খুলছে না কেন মেয়েটি? এখনো কী ও ডুবে রয়েছে মুর্ছিত সুরের স্বপ্ন মায়ায়? এত লোক...ওরাই বা কেন ঝিমিয়ে পড়ল নির্জীব নিস্তেজ স্বপ্নালুতায়? মালু তো গায়নি কোনো ঘুম পাড়ানি গান! তার চেয়ে রেগে মেগে যদি তেড়েই আসত ওরা, অথবা শিস দিয়ে অঙ্গ দুলিয়ে একটা ইতর হুল্লোড় মুচিয়ে তুলত, তা হলেই যেন খুশি হত মালু, তৃপ্তি পেত। গানের সুরে মানুষের হৃদয়টা নিঙড়ে নিয়ে তার মনের কথা আর ভাষার ফোয়ারাটা যদি খুলেই না দিতে পারল মালু, তবে কী সার্থকতা ওর গানের? আজই প্রথম নয়। বিমুগ্ধ শ্রোতাদের মোহাবিষ্ট মুখের দিকে তাকিয়ে আগেও প্রশ্নটি মনে জেগেছে ওর।

চোখ মেলেছে মেয়েটি। মখমলের মতো নরম চোখ। শিশির ফোঁটার মতো টলটলে ওর চোখের তারা। ত্রস্তে মুখ ঘুরিয়ে নিল মালু। মেয়েটিও বুঝি এক খুঁট আঁচল তুলে ঢাকতে চাইল ধরা পড়ার লজ্জাটা।

উদ্যোক্তাদের একজন এসে হাত জোড় করল, স্যার আর একটা গান আপনাকে গাইতে হবে।

বেশ। রাজি হল মালু। পাশে বসা নবীন গায়ক বরকতের দিকে তাকিয়ে বলল ও, বরকত তুমি একটা বাউল ধর! ইতিমধ্যে মেজাজটা একটু দুরস্ত করে নিই আমি।

আজ নিয়ে বার দশেক, কী আরো বেশি, দেখা হল মেয়েটির সাথে। কথা হয়নি একবারও। শুধু চকিত একটি দৃষ্টি বিনিময়। একটু বা চোখের হাসি। একটু রাঙিয়ে ওঠা। তারপর মুখ ঘুরিয়ে নেওয়া।

একরাশ লজ্জার বোঝায় মিইয়ে গেছে মালু। মেয়েটিও। মেয়েটির অস্তিত্ব সম্পর্কে কেমন করে যেন সজাগ হয়ে উঠেছে মালু।

যে কোনো জলসা অথবা আসরে ও আসবেই, এটা আজকাল এক রকম ধরেই নেয় মালু। মঞ্চে উঠে প্রথমেই মেয়েটিকে খোঁজে ও। পেয়েও যায়। সেই প্রথম সারির কোণের সিটে পটের ছবিটির মতো বসে আছে মেয়েটি। এও এক ধাঁধা।

অচেনা সেই পত্র লেখিকার মতো এও বুঝি এক অদ্ভুত মেয়ে। নীরবতার আড়াল থেকে শুধু দৃষ্টির ভাষায় নিরন্তর উৎসাহ যুগিয়ে চলেছে মালুকে। আপনাকে উন্মোচিত করবার এতটুকু ব্যগ্রতা নেই ওর। ব্যগ্রতা নেই চোখের ভাষাকে মুখের বোলে ফুটিয়ে তুলবার।

কিন্তু মেয়েটির চোখে শুধু কী প্রেরণার ভাষা? কী যেন নিবেদন, সুরে সুরে আপনাকে লীন করার কী এক ব্যাকুলতা, কতদিনের ভীরু চাহনিতে তাই যেন দেখতে পেয়েছে মালু।

সেদিন ছিল টিকেটের ব্যবস্থা। কোনো দাঁতব্য কাজে সঙ্গীত জলসা। প্রথম সারির কোণের চেয়ারে পঞ্চাশ টাকার সিটে বসেছিল মেয়েটি। নিশ্চয় কোনো পয়সাওয়ালার মেয়ে। অথবা বউ? না, বউ নয়। তাই যদি হত তবে একটা সুখী আত্মমগ্ন পুরুষ মুখ মেয়েটির পাশে দেখা যেত নিশ্চয়। মালু তো মেয়েটিকে বারবার একলাই দেখে আসছে।

গায়ক গায়িকাদের মাঝে বসে এমনি সব কথাই ভাবছিল মালু। ভাবতে ভাবতে চোখ গিয়ে পড়েছিল কোণের চেয়ারটিতে। হৃৎপিণ্ডটা কেঁপে উঠেছিল মালুর।

বুঝি অনেক দুঃখ মেয়েটির। দুঃখের ভারে নুয়ে এসেছে ও। এ দুঃখের পীড়ন থেকে কেউ কী মুক্ত করবে না ওকে? মেয়েটির শিশির টলটল চোখের তারায় এ

কথাগুলোই যেন লেখা ছিল সেদিন। ওর মুখের উপর থেকে দৃষ্টিটা তুলে নিতে সেদিনের মতো কখনো এত কষ্ট পায়নি মালু। আর একটা দিন ছিল ব্যতিক্রম। মেয়েদের কলেজের কী এক উৎসব। মেয়েটি সেদিন প্রথম সারিতে ছিল না। ছিল দাঁড়িয়ে, মঞ্চের উইংসে। লাল সালুতে মোড়া একটি বাঁশের গায়ে কাঁধের ভারটা ছেড়ে দিয়েছিল ও। হাত দুটো ছিল বুকের উপর, একটি অপরদিকে জড়িয়ে। শাড়ির আঁচলটা ছিল কোমরে প্যাঁচান। উদ্ধত বক্ষের ভারে ওর সরু কোমরটি বুঝি বেঁকে গেছিল। অথবা সে ছিল ওর হেলান দিয়ে দাঁড়াবার ভঙ্গি। অদ্ভুত মনোরম ভঙ্গি। কিন্তু, ওর চোখের দিকে তাকিয়ে পলকেই মুখটা ঘুরিয়ে নিয়েছিল মালু। কী ছিল মেয়েটির চোখে?

দিগন্তের কিনারে সদ্য ঘুম ভাঙা কোনো মেঘের হাতছানি? তেমনি একটা কিছু যা ব্যক্ত করা যায় না, পুরোপুরি বোঝা যায় না। শুধু অনুভব করা যায়।

ওর চোখের কোলে যেন জমেছিল ঘন কৃষ্ণ মেঘের সকরুণ স্তব্ধতা। সেখানে। ছিল হারিয়ে যাওয়ার ডাক, কী এক মিনতি আর গভীর আকুতি পরম সমর্পণের। বার বার তাকিয়ে সে চোখের অতগুলো নীরব কথা পড়তে হয়েছিল মালুকে।

আরো আশ্চর্য! সেদিন চোখ ফিরিয়ে নেয়নি মেয়েটি। যেন জিদের বশে বাজি ধরেই তাকিয়ে ছিল মালুর দিকে।

তারপর কয়েকটা গানের শেষে আড়-চাহনিটা আর একবার উইংসের দিকে পাঠিয়েছিল মালু। তখন বিজয়িনীর কৌতুকে নাচছে মেয়েটির চোখ জোড়া। যেন ঠিকরে পড়ছে কী এক বিদ্রূপ! উপেক্ষা করবে? সে শক্তি নেই তোমার। চোখে চোখ না মিলিয়ে পারলে কই উদাসীনতার ভান করতে? যা ইচ্ছে তাই মনে করতে পার তুমি। কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাব? চোখে চোখ রেখে জবাবটা দিয়ে ফেলছ না কেন?

এ কী প্রশ্ন কথা-না-বলা মেয়েটির?

অজানা এক রোমাঞ্চে দুলতে দুলতে সেদিন বাড়ি ফিরেছিল মালু। নীরব চোখের সেই জিজ্ঞাসাগুলো ছুটে এসেছিল ওর পিছু পিছু। কথা-না-বলা মেয়েটি কী চায় মালুর কাছে? মালু জানে না। মালু শুধু জানে, যখন ও ভাবে মেয়েটির কথা, মধুর এক রোমাঞ্চের আবেগে দোল খায় মালু ঘুমের মাঝে, কাজের ফাঁকে। এ এক অনুভূতি মালুর জীবনে। বুঝি বিচিত্র কৌতুকিনী মেয়ে। মধুর এক প্রচ্ছন্নতায় আপনার আকর্ষণকে দুর্নিবার করে তুলতে চায়। অথবা বড় ভীতু মেয়ে। দারুণ

ইচ্ছে মনে কিন্তু সাহস নেই এগিয়ে এসে এক টুকরো হাসি বা দুটো কথার বিনিময় করুক মালুর সাথে।

জলসা শেষে কত লোকই তো ঘিরে ধরে মালুকে। জনপ্রিয় শিল্পীর একটু হাসি অথবা দুটো কথার প্রসাদ পেয়ে কৃতার্থ মনে করে নিজেদের। কিন্তু ওই নাম না-জানা চোখে-চোখে-কথা-বলা মেয়েটি কখনো আসে না মালুর কাছাকাছি। ভিড়ের সাথে মিশে গিয়ে অলক্ষেই বেরিয়ে যায় ও। সেই নবীন গায়ক শেষ করেছে। আবার দাবী উঠেছে মালুর জন্য। চিৎকার করছে দর্শকরা।

মালুর মনে হল চিৎকারটা যেন ধীরে ধীরে ইতর হল্লায় রূপান্তরিত হচ্ছে। ওকে দিয়ে যেন জোর করেই গান গাওয়াবে ওরা।

মেজাজটা আবার বিগড়ে গেল মালুর।

ওরা কী জানে না গাইয়ে বাজিয়ে লিখিয়েদের জোর করে বাগ মানান যায় না? হৃদয় মনের সুকুমার বৃত্তি নিঙড়িয়ে যারা রস আহরণ করে তাদের উপর কী জবরদস্তি চলে? জোর খাটিয়ে কোনোদিন কেউ কী পেয়েছে ওদের কাছ থেকে কাজ হাসিল করতে? কী এক গোঁ চাপল মালুর। অবজ্ঞা আর বিতৃষ্ণায় হাত গুটিয়ে বসে রইল ও। গান সে গাইবে না, দেখা যাক কী করে ওরা। অসাবধানেই বুঝি দৃষ্টিটা ওর ঘুরে গেল সেই কোণের আসনটির দিকে। স্বপ্নঘোর ভেঙে গেছে মেয়েটির। কোমল এক দীপ্তি এসেছে ওর চোখে। অন্যদের হয়ে যেন মাফ চাইছে ও। আর ছোট্ট একটি অনুরোধ এঁকে রেখেছে চোখের কোণে। অনুচ্চারিত সেই আবেদনটা কেমন করে অস্বীকার করবে মালু? তবলচিকে ইশারা দিয়ে গলাটা একটু ঝেড়ে নিল মালু।

একটি পুরনো গানে নতুন সুর যোজনা করল মালু। সুরটিও বোধ হয় পুরনো। কিন্তু নতুন তার ঝংকার। নতুন ঠাট। নতুন ব্যঞ্জনা। ঘুম পাড়ায় না টেনে নেয় না স্বপ্নের অলস পরিমণ্ডলে। মোহের পর্দা আচ্ছন্ন করে না মনকে।

এ এক উদ্দামতার গান। যৌবনের উদ্দামতা। চিরকালের যৌবন যা টগবগিয়ে উপচে পড়ে, ফেনা ছাড়ে। হয়ত ভারি করে তোলে জীবনের বাজে খরচের হিসেব। কিন্তু, সুপ্তি-মুক্তির সেই তো সুর। শুধু আরোহণ অবরোহণের শঙ্কা মুক্ত। হয়ত তাই এ গানের ভাষা মোলায়েম নয়। এর উচ্চারণ অমসৃণ, এর স্বর যেন শিলায় শিলায় প্রচণ্ড ঘর্ষণের রুদ্র নির্ঘোষ। এ কী করছে মালু? ও কী সম্বিত হারাল? রুক্ষতার-ছন্দে এ কোনো ভৈরবী রাগিণীর আরাধনা করছে ও?

হিমশিম খেল তবলচি। হয়রান হল বাজিয়া। ওদের হাত আর চলতে চাইছে না; আঙ্গুল এসেছে অবশ হয়ে। কিন্তু এ যে সুর। সুরের তো অন্য উম্মাদনা। চাঁদের আকর্ষণ যেমন করে টেনে নেয় পৃথিবীর পানি, নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের বুকে তোলে জোয়ারের আলোড়ন, তেমনি অপ্রতিরোধ্য সুরের আকর্ষণ। উন্মাদের মতোই যন্ত্রের বোল তুলে গেল ওরা। যেন আচমকাই থেমে গেল ওরা।

কিন্তু, একি? কোনো প্রতিক্রিয়া নেই দর্শকদের আসনে। যেন থম ধরে গেছে ওরা। অথচ ওরা সজাগ। স্বপ্নালুতার পর্দা নামেনি ওদের চোখের উপর।

ওরা হাত তালি দিল। উত্তাপ নেই সেই তালিতে। নেই ওদের প্রিয় শিল্পীর প্রতি সেই উচ্ছ্বসিত প্রশংসার কলকাকলি। কে ওদের বলে দেবে এই এক পুরুষ আগেও নজরুল নামের কোনো কবির কণ্ঠে এ গান জীবনের প্লাবন ডেকেছিল। এ গানের ভাষা এসেছিল সে কবিরই কলমের সাধনায়। লাল হয়ে এল মালু। যেন লাঞ্ছিত হয়েছে ও। এ রুদ্র রাগিণী গ্রহণ করল না ওর শ্রোতারা।

কত বিশ্বাস, কত আশ্বাস ও দুটো চোখে। যেন বলছে : বুঝেছি আমি বুঝেছি। আজীবন এ গানই গেয়ো তুমি। মালু দেখল মখমল নরম চোখ গলে ঝরে পড়েছে স্নিগ্ধ সহানুভূতি আর অন্তহীন মমতার ধারা। সে ধারা ধুয়ে দিল ওর লাঞ্ছনার গ্লানিটা।

অনুষ্ঠান শেষ হল। কলকলিয়ে বেরিয়ে গেল শ্রোতার দল। জলযোগ আর ধন্যবাদের পালাটা শেষ করে আমন্ত্রিত শিল্পীরাও চলে গেল একে একে।

গেটটার কাছে এসে থমকে পড়ে মালু। মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে সেই নাম না-জানা চোখে-চোখে-কথা-বলা মেয়েটি। মালুকে দেখে এগিয়ে এল ও। একটা চিরকুট মালুর হাতে গুঁজে দিয়ে সরে পড়ল। গেটটা পেরুতে গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। যেন বাতাসও শুনতে না পায় তেমনি মৃদুকণ্ঠে বলল : অপেক্ষা করব কিন্তু।

অবাক হবারও বুঝি অবসর পেল না মালু। সেই তখন থেকে দাঁড়িয়ে ছিল মেয়েটি? চিরকুটের ভাঁজটা খুলে ফেলল ও। লেখা আছে : ... লারমিনি স্ট্রীট উয়ারী। আগামী কাল বিকেল সাড়ে পাঁচটা। কোনো সই নেই লেখার নিচে।

গেট পেরিয়ে দেখল মালু, একখানি কালো গাড়ি মোড় নিয়েছে বাঁ দিকের রাস্তায়।

৪৬-৫০

শহরের পথে পথে কত বিস্ময়। কত ধাঁধা। মালু যেন এখনো তার হদিস করে উঠতে পারে না। সেই যে মহানগরী, যা ছেড়ে এসেছে মালু এত বছর বাস করেও তার বিচিত্র জীবনের বেড় পায়নি মালু। আর এই ছোট্ট শহরটি যেন ওই মহানগরীরই একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ। পদে পদে বিস্ময় ঘেরা জটিলতা এখানেও।

ওই নাম-না-জানা চোখে-চোখে-কথা বলা মেয়েটি, আর সেই নামহীন ঠিকানা হীন চিঠির উৎস কোনো মেয়ে, ওরা এই শহরেরই জটিলতার অংশ। ওরা বিচিত্র ধাঁধা।

চিরকুটটার সাথে সেই ঠিকানাহীন চিঠিগুলো মিলিয়ে দেখল মালু। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রতিটি ছত্র প্রতিটি শব্দ অক্ষর আর টান, পাশাপাশি রেখে মিলিয়ে চলল।

না। সন্দেহের এতটুকু অবকাশ নেই। ঠিকানাহীন অক্ষরের সাথে কথা-না বলা মেয়েটির হাতের লেখার সামান্য অমিল নেই। হয়রান মানে মালু। একি অদ্ভুত কৌতুকবোধ মেয়েটির? হয়ত অন্য কিছু। কিন্তু মেয়েটা কেমন বোকা বানিয়ে গেল মালুকে। যে লেখে চিঠি, ঠিকানা জানায় না, যার চোখে অভয়, মুখে নীরবতা– দুটো মেয়ে যে এক হতে পারে, প্রশ্নটা কোনোদিনই জাগেনি মালুর মনে। মালু না হয়ে যদি হত কোনো শহুরে ছেলে যাদেরকে বলা হয় চৌকস, দুটো কিস্সার মাঝে অদৃশ্য সূত্রের যোগাযোগটা অনায়াসেই খুঁজে পেতো ওরা। পৌঁছে যেত অনিবার্য সিদ্ধান্তে। ইপাব তৈরিঃ আল মোস্তাইন বিল্লাহ

মালুর আনাড়িপনায় নিশ্চয় মনে মনে হাসছে মেয়েটি।

একটা অনিশ্চিত সুন্দর বিকেলের মিষ্টি প্রতীক্ষায় দিনটা কেটে গেল মালুর।

গেটের কাছাকাছিই দাঁড়িয়েছিল মেয়েটি। পাতলা কাঠের ফালির ছোট্ট গেট। কোমর সমান উঁচু। ওকে দেখে গেটের মাথায় বাঁকান লোহার আংটাটা আলগা করে এক পাশে সরে দাঁড়াল মেয়েটি। বলল না, আসুন, অথবা অন্য কিছু। শুধু চোখের একটি চকিত ঝিলিকে জানিয়ে দিল খুব খুশি হয়েছে ও।

কথা যখন বলবেনই না আপনি তখন উদ্যোগটা আমাকে নিতে হচ্ছে। গেট পেরিয়ে দোতলা দালান অবধি নুড়ি ছড়ান ছোট্ট পথটিতে পা রেখে বলল মালু। তারপর মেয়েটির দিকে চোখ এনে শুধাল : কী নামে ডাকব বলুন তো?

যে নামে ভালো লাগে আপনার? উত্তরটা যেন আগে থেকেই তৈরি রেখেছিল মেয়েটি।

শহুরে চতুরতার আবহাওয়ায় অনেকগুলো বছরই তো কাটিয়ে দিল মালু। কিন্তু, এ ধরনের সপ্রতিভতায় এখনো বুঝি তেমন অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারেনি। বিব্রত হল মালু। আমতা আমতা করেই বলল : মানে, মানে, আপনার নামটা…

ভারি দুঃসাহস তো আপনার। প্রথম সাক্ষাতেই নাম জানতে চাইছেন? মৃদু হাসির রেখা মেয়েটির মুখে।

বারে প্রথম সাক্ষাৎ কেন হবে?

তাহলে বলুন তো কোথায় কোথায় দেখেছেন?

যেখানেই গান সেখানেই…

যেখানেই গান সেখানেই? যেন অবাক হয়েছে মেয়েটি। কেমন টেনে টেনে মালুর কথাটারই পুনরুচ্চারণ করল।

বসুন। ঘরে এসে একটা কাউচের দিকে ইশারা দিয়ে বলল মেয়েটি। নিজেও বসল পাশের কাউচে।

সত্যি তো। ওদের তো আর প্রথম পরিচয় নয়! অনেক দিনের চেনা জানা। সহজ হয়ে আসে মালু। পায়ের উপর পা রেখে আরামের ভঙ্গিতে হেলান দিল ও, বলল : আপনি কিন্তু আমাকে প্রচণ্ড এক বিস্ময়ের চমক লাগিয়ে দিয়েছেন!

বিস্ময়ের চমক? খুব মজা পাচ্ছে ও, তেমনি করে মালুর কথাটারই পুনরাবৃত্তি করল মেয়েটি। চোখের কোণে দ্যুতির তরঙ্গ খেলিয়ে শুধাল আবার, কী রকম চমক, বলুন তো?

রকম বড় মারাত্মক। দুর্বোধ্য এক ধাঁধা, যার কোনো কিনারা পাই না।

ধাঁধা? কেমন ধাঁধা? আবারও মালুর কথা দিয়েই কথা বলে মেয়েটি। চিঠি লিখবেন, ঠিকানা জানাবেন না। পত্র দেবেন, উত্তর চাইবেন না। চেয়ে থাকবেন, কথা বলবেন না। শেষে ঠিকানা দিলেন, নাম রাখলেন লুকিয়ে।

শুনেছি, যে থাকে লুকিয়ে শিল্পীরা নাকি তাকেই উন্মোচন করে। আপনার হৃদয়ে তেমন কোনো বাসনা জাগেনি কখনো?

মালু বোবা। কোত্থেকে এক ঝলক রক্ত ছুটে এসে মুখময় ছড়িয়ে পড়েছে ওর, কানের লতিগুলো গরম করে তুলেছে। নিজের এই নাজেহাল অবস্থাটা যেন নিজের আয়নায় স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে মালু।

মেয়েটি কিন্তু মিটি মিটি হেসে চলেছে। ওর মুখমণ্ডল চোখের মতোই স্নিগ্ধ আর মিষ্টি ওর মুখের হাসিটা।

অপরাধটা তাহলে স্বীকার করছেন? হাসি থামিয়ে সহসা গম্ভীর হয়ে গেল মেয়েটি।

শুধু নাজেহাল নয়, ওকে অপরাধী, হয়ত কাপুরুষ প্রতিপন্ন করেই ছাড়বে মেয়েটি।

পায়ের উপর রাখা পাটা নাবিয়ে নড়েচড়ে বসল মালু। বলল : অপরাধ কার এখুনি সে বিচার নাই-বা করলেন। কিন্তু হয়রানির আমার একশেষ হয়েছে, সেই প্রথম চিঠি পাবার পর থেকে। অদম্য আগ্রহ চেনবার জানবার অথচ উপায় নেই, এটাকে হয়রানি বলবেন না?

জীবনে বুঝি কারো জন্য হয়রানি পোহান নি?

না।

মেয়েটির সমাজে বুঝি অমন স্পষ্ট করে কথা বলার রেওয়াজ নেই। হয়ত সে জন্যই হঠাৎ করে চোখ তুলে ওকে দেখল মেয়েটি। বলল : একটু আগে যে বলেছিলেন ধাঁধা, সেই ধাঁধাটা?

মানে আপনি, বিচিত্র ওই পত্রদান, প্রথম সারির কোণের আসনটায় বসে থাকা সেই শুভেচ্ছা, সেই মমতার সুধা ঝরান একজোড়া চোখ, সবই-সবই শুধু হয়রানি, তাই না? কৌতুক ঝরে মেয়েটির হাসিতে।

নিজের কথার প্যাঁচে পড়ে নিজেই যেন ঠকে যাচ্ছে মালু। ত্রস্তে প্রতিবাদ উঠল : না না। হয়রানি হবে কেন? সে তো আনন্দ। ওর নৈপুণ্যের অভাব দেখে আবারও বুঝি হাসল মেয়েটি।

পর্দা ফাঁক করে উঁকি দিল একখানি মাঝবয়সী মুখ। বলল : রিহানা, তোমাদের চা কী এখানে পাঠাব, না ডাইনিং রুমে আসবে?

এখানেই চাটা জমবে, তাই না? খুব নীচু গলায় মালুকেই শুধাল মেয়েটি। কিন্তু ওর মত বা উত্তরটার জন্য অপেক্ষা করল না। পর্দার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল–এখানে।

অদৃশ্য হয়ে গেল মাঝবয়সী মুখখানি।

মা। মালুর দিকে তাকিয়ে বলল মেয়েটি।

নামটা কিন্তু সুন্দর আপনার।

ও। এই ফাঁকে শুনে নিলেন বুঝি? কিন্তু আপনি তো জানতে চেয়েছিলেন কী নামে ডাকবেন।

ছোট্ট একটা হু উচ্চারণ করে মুখ নামিয়ে নেয় মালু। সপ্রতিভ রিহানার সুমুখে আজ ও বিধ্বস্ত।

কিছুক্ষণ কেটে যায় চুপচাপ।

চা এল। চায়ের সাথে নাশতা।

বলুন না, কী নামে ডাকবেন? নাশতার তশতরিটা এগিয়ে দিয়ে রিহানাই শুধাল এবার।

কেন, রিহানা নামটি তো বেশ?

ও নামে তো সবাই ডাকে। যেন ক্ষুণ্ণ হল রিহানা।

যে নামে সবাই ডাকে মালুও কী যে সেই নামে ডাকবে ওকে? মালু ডাকবে ওর সুর ভরা কণ্ঠে, ওর নিজের দেয়া নামে, নিজের রচা অভিধায়। অনুযোগের চোখে তাই যেন বলে গেল রিহানা।

ভাবতে হবে যে, মাথা চুলকিয়ে বলল মালু।

এতদিন ভাবেননি বুঝি? মালুর আনাড়িপনায় আর একবার যেন হাসল রিহানা।

মায়ের মুখখানি আর একবার উঁকি দিয়ে গেল। পর পর আরো কয়েকখানি মুখ পর্দা সরিয়েই চকিতে অদৃশ্য হয়ে গেল।

শুধু কৌতূহল নয় ওদের, আরো কিছু। হয়ত সন্দেহ। সোমত্ত কুমারী মেয়েকে একেবারে পাহারাবিহীন পরপুরুষের সান্নিধ্যে ছেড়ে দেয়ার আধুনিকতাটা বোধ হয় এখনো রপ্ত হয়নি এ বাড়িতে। অন্তত তাই মনে হল মালুর। গান শেখাতে গিয়ে অনেক ছাত্রীর বাড়িতে এ অভিজ্ঞতাটা পেয়েছে ও। তবু অস্বস্তিটা কাটিয়ে উঠতে পারেনি ও, অবিশ্বাসের এমন স্পষ্ট ইঙ্গিতকে উপেক্ষা করার মতো নির্লিপ্ততা আয়ত্ত হয়নি ওর। রুমালে মুখ মুছে উঠে দাঁড়াল মালু।

সে কী? একটি করুণ মিনতি অস্ফুটে ঝরে পড়ল রিহানার মুখ থেকে। ও দৌড়ে গেল ঘরের কোণে। সেখানে ছোট্ট একটি টুলের উপর রাখা হারমনিয়ামটা এনে রাখল নিচের গালিচায়। বলল : এবার গান হবে। আজকের গানের শ্রোতা শুধু আমি।

অনুরোধ নয় রিহানার। মনের সুন্দর ইচ্ছাটাকে সহজ আদেশের ভঙ্গিতে ব্যক্ত করে গেল ও? যেন এটাই স্বাভাবিক, যেন কতদিন এমনি করে ওকে গান শুনিয়েছে মালু।

যেন চুম্বকের আকর্ষণে হারমোনিয়ামটার কাছে এসে বসল মালু। গান ধরল।

ওর সুমুখেই গালিচার উপর পা গুটিয়ে বসল রিহানা।

আঞ্চলিক টানের একটি দেহাতী গান ধরেছে মালু। সেই পুরানো দিনের মালু বয়াতির কণ্ঠে গাওয়া গণি বয়াতির গান। পুরানো গান, পুরানো সুর, কিন্তু নতুন প্রাণ। কথা তার মুখ্য নয়, মুখ্য তার ভাব। সুর তার প্রধান নয়, ঝংকার তার প্রাণ। ভাবে আর ঝংকারে প্রাচীন গান গেয়ে যায় নতুন অর্থ, নতুন বিস্তার। এ যেন সেই মান্ধাতার আমলের বুড়ো বাতাস, বসন্তের ছোঁয়ায় যার রূপ-শ্রী-গন্ধ সবই গেছে বদলে।

কী এক আবেশ মুগ্ধতায় নিমীলিত রিহানার দুটো চোখ। কখনো কেঁপে যায় চোখের পাতাগুলো হাওয়া লাগা পাঁপড়ির মতো। তারপর যেন প্রদীপের স্নিগ্ধ ঔজ্জ্বল্যে জ্বলে উঠলো চোখ জোড়া। কাছে আরো আছে যেন মালুর মুখের উপর নেবে এল সে চোখ। সুরগুলো বুঝি আপনাদের বিছিয়ে দিয়েছে সে চোখের মখমল কোলে। ধীরে ধীরে ঘন নিবিড়তায় ঠাই নিয়েছে স্থির অকম্প মণির গভীরতায়। তারপর কী এক উত্তাপ হয়ে ঝরে পড়ছে, একটি নিবেদিত হৃদয়ের উষ্ণতা নিয়ে ফিরে আসছে ওদেরই স্রষ্টার কাছে।

এ দৃষ্টির আশ্বাস, এ নির্ভয় প্রেরণা, এতদিন দূর থেকেই তো পেয়ে আসছে মালু। কিন্তু আজ ওরই সুরগুলো মধুর সে দৃষ্টির নির্মাল্য নিয়ে অনাস্বাদিত কোনো অমৃত ধারার মতো ঝরে পড়ছে। সে ধারায় অবগাহন করছে মালু। এ এক আশ্চর্য মধুর অনুভব মালুর জীবনে। মালু কৃতার্থ। এ তো আর মোহ নয়। অচেনার রহস্য মোড়া রোমাঞ্চও নয়। এ যে ওর গান সুর ভাব, ওরই আত্মার প্রতিবিম্ব। ও দেখছে। অনুভব করছে। লেহন করছে। শিশির টল টল সেই একজোড়া চোখ। আজ যেন বন্দীত্বের ডাক সে চোখের ভাষায়। যে হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি ওই চোখ, সে হৃদয়ের

গভীরে বুঝি লীন হল মালু। সে হৃদয়ের গভীরে ওর সুরের প্রতিভাস, ওর গানের প্রতিধ্বনি।

চোখের কথায় আর গানের সুরে ঘরের ভেতর ওরা রচনা করে নিল মায়াময় এক পৃথিবী। মায়াময় সেই পরিবেশে ওরা বিমুগ্ধ, আচ্ছন্ন নয়। সত্তায় ওদের সঙ্গীতের অনুরণন, কিন্তু বিশ্লেষণ সচেতনায় উন্মুখ ওদের তন্ত্রী। সুরের পাখায় ভর দিয়ে খুইয়ে গেল না ওরা কল্পলোকের কোনো বিবশ অচেতনতায়।

সূক্ষ্ম আনন্দবোধটিকে সূক্ষ্মতর করে চুনিয়ে চুনিয়ে উপভোগ করছে ওরা। সুডোল ছোটখাট হাত রিহানার। সে হাত সুন্দর শৈথিল্যে উঠে আসে ওর খোঁপার দিকে। খোঁপার গন্ধরাজ কলিটি খুলে বাড়িয়ে দেয় মালুর দিকে।

আপনাকে সম্পূর্ণ করে তুলে দেয়ার যে প্রতীক, সে ফুলটা গ্রহণ করল মালু। ঠোঁট দিয়ে স্পর্শ করল, নাকের কাছে এনে গন্ধ নিল। তারপর যত্ন করে রেখে দিল বুকের পকেটে।

আসি তা হলে? হারমোনিয়ামের চাবিগুলো বন্ধ করে উঠে দাঁড়াল মালু।

কাল আসছেন, ঠিক আজকের সময় বিকেল সাড়ে পাঁচটায়। বলল রিহানা।

কালই? আশ্চর্য হল, খুশিও হল মালু।

হ্যাঁ, কালই তো! আপনি যে এখন আমার মাস্টার। গান শেখাচ্ছেন। যেন আগে থেকেই এসব ঠিক করা, মালুই ভুলে যাচ্ছে।

মাস্টার? গান শেখাচ্ছি? রিহানা বুঝি ওকে শেষ পর্যন্ত নাজেহাল আর বেকুব বানিয়েই ছাড়ল।

আপনি সত্যিই একটা বোকা। কিচ্ছু বোঝেন না। কেমন দুষ্টু হেসে বলে রিহানা

এ ব্যাপারে কেমন করে আর দ্বিমত থাকতে পারে মালুর? সত্যিই সে বোকা।

গানই যদি না শেখাবেন, তবে এ বাড়িতে আসবার পথটা কী, বলুন তো?

কিছু বোঝেন না আপনি। সেই মখমলের চোখে এবার চটুল তরঙ্গ খেলা। ঠিকই। রিহানার মতেই সায় দেয় মালু, কিছু বোঝে না ও

আচ্ছা, কাল পর্যন্ত তবে বিদায়। শাড়ির ঢেউ তুলে দোতলার দিকে উঠে যায় রিহানা

মালু আসে। গান শেখায় না, গান করে।

রিহানা বসে। গান শেখে না গান শোনে।

সেই ছোট ঘরটিতেই বসে ওরা। গানে আর সুরে বুঝি স্বপ্ন বোনে। স্বপ্ন নামের চোখের কোলে। চোখের মিনতিতে ঝরে পড়ে হাজার গান। তারপর গান যায় থেমে। স্তব্ধ হয় সুর। সুরের প্রতিধ্বনিটিও মিলিয়ে যায় ধীরে ধীরে। শুধু ঘরময় ছড়িয়ে থাকে একটি সূক্ষ্ম অনুরণন। সে বুঝি ওদের হৃদয়ের স্পন্দন।

তুলতুলে নরম হাত রিহানার। কখন সে হাত উঠে আসে মালুর মুঠোয়। মালুর স্পর্শ পেয়ে যেন কথা কয়ে ওঠে আঙ্গুলগুলো। টনটনিয়ে ওঠে রিহানার হাতের আঙ্গুলগুলো। কিন্তু মিষ্টি, অদ্ভুত মিষ্টি সেই ব্যথাটা। হাতটা সরিয়ে নেয় রিহানা।

কী মনে হয় জান? চোখ তুলে বলল মালু।

কী? সুখের ভারে আধবোঝা অস্ফুট স্বর রিহানার।

মনে হয় তুমি আমার গানের মেয়ে, আমার সুরের মেয়ে।

গানের মেয়ে? আমি তোমার সুরের মেয়ে? কী এক আনন্দের ঢেউ নেচে যায়। রিহানার মুখের ঔজ্জ্বল্যে। গান? স্বর? সে তো অনেক আবেগ, অনেক আনন্দ, হৃদয় নিঙড়ান অনুভূতি? আমি কী তাই?

ঠিক তাই। ওর মাথার উপর হাত রাখল মালু।

জানো? বড় ভয় করে আমার। এত সুখ কী সইবে আমার কপালে? অমঙ্গল আশঙ্কায় বুঝি কেঁপে যায় রিহানার স্বর।

অমন ভাবছ কেন গো?

কী জানি। আগে কী ভেবেছি কখনো? না। এখনি যেন মনে এল, বলে ফেললাম।

না, অমন করে ভেব না।

ভাববো না? সত্যি বলছ তো? মালুর কাছ থেকে যেন আরো আশ্বাস চায় ও। চুপ করে কী যেন দেখে মালুর মুখের ডোলে। তারপর হঠাৎ করে শুধায় : আচ্ছা মালু, নিজেকে যখন আর ধরে রাখতে পারলাম না আমি, নির্লজ্জের মতো প্রকাশ করলাম; তার আগে তুমি কখনও ভাবতে আমার কথা? যখন দেখতে প্রথম সারির কোণের চেয়ারটিতে সাধারণ একটি মেয়ে বোকার মতো…

ওহ রে, কি রে আমার বোকা। ওকে থামিয়ে দেয় মালু। মিষ্টি করে হাসে। নরম করে তাকায়, বলে : এক জোড়া কোমল চোখের স্নিগ্ধ আলো সারাক্ষণ ঘিরে থাকত আমায়।

সত্যি? গ্রীবা ভঙ্গিতে বাঁকা রামধনুর অপরূপ রেখা আঁকে রিহানা। অপূর্ব ওর এই ভঙ্গিটা। ভালো লাগে মালুর।

আংটিটা খুলে খেলা করে রিহানা। মালুর কড়ে আঙ্গুলে লাগিয়ে পরখ করে। দেখে, উল্টে-পাল্টে। খুলে নিয়ে আবার গলিয়ে দেয় আপন মধ্যমায়। ধ্যাত, বাসায় একটুও মন ভরে গল্প করা যায় না। অভিযোগটা যেন মালুর বিরুদ্ধে তেমনি করে ওর দিকে তাকায় রিহানা।

এ এসে বসলো, ও এসে উঁকি মারল। আমার একটুও ভালো লাগে না। এবার আরো স্পষ্ট রিহানার অনুযোগের স্বরটা।

ভাল যদি না লাগে, কীই বা তার প্রতিকার হতে পারে! গালে হাত দিয়ে তাই যেন ভাবে মালু। ভেবে বুঝি উপায় পায় না খুঁজে। তাই গম্ভীর হয়ে যায়।

কেমন মরদ গো তুমি? আমাকে নিয়ে যাবার মতো একটি জায়গাও নেই তোমার? সহসা যেন একটা বিদ্রূপ ঝিলিক তুলে যায় রিহানার কণ্ঠে। চমকে তাকায় মালু। রিহানার মুখে লঘু হাসির চপলতা।

রিহানাকে কী নিজের ঘরে নিয়ে যাবে মালু? ওর তো রয়েছে একখানি ঘর। একলাই থাকে ও। ওদের নিভৃত আলাপনে উঁকি দেবার মতো কেউ থাকবে না সেখানে। কিন্তু কী এক সংকোচ আর লজ্জা এসে যেন টিপে ধরে ওর গলাটা। রিহানার অমন স্পষ্ট অভিপ্রায় সত্ত্বেও আমন্ত্রণের কথাটা কিছুতেই উচ্চারণ করতে পারবে না মালু। বুঝেছি এ ব্যবস্থাটাও আমাকেই করতে হবে। কোনো কম্মের নও তুমি। কী যে অকম্মাকে নিয়ে পড়লাম। কৃত্রিম অভিমান রিহানার।

একেবারেই অকম্মা। হাতে-নাতেই প্রমাণিত হয়ে গেল। স্বীকার করতেই হয় মালুকে।

কিন্তু, কম্ম যা করার সে তো তুমিই করছ, প্রথম থেকেই। আমার তো শুধু গান।

হাঁ মশাই হাঁ। তোমার শুধু গানই। আমুদে গলায় এবার মালুর কথাতেই সায় দেয় রিহানা। বুঝি আশ্বস্ত করে ওকে।

বেশ, ব্যবস্থা হল, আগামীকাল দুপুরে তুমি আমায় খাওয়াচ্ছ। ওই যে নতুন রেস্টুরেন্ট খুলেছে রমনায়, সেখানে।

রিহানার বুদ্ধি আর পরিষ্কার মাথাটার তারিফ না করে পারে না মাল। এক মিনিটের মধ্যেই একটা চমৎকার ব্যবস্থা বের করে ফেলেছে মাথা থেকে।

একটু স্বস্তিও পেল মালু। বাসার চাইতে রেস্তোরাঁর সাক্ষাৎটা বুঝি নিরাপদ।

৪৭.

কেবিনের আব্রুতে বসে আছে ওরা। পাশাপাশি। ধুঁয়ো ছাড়ছে কফির পেয়ালা।

কথা বলছে ওরা। নীরবতার মাঝে পরস্পর সান্নিধ্যটাকেই কী এক বিমুগ্ধতায় উপভোগ করে চলেছে। ওদের অনুভূতি জাগছে বুঝি কোনো শব্দহীন সঙ্গীতের শান্ত প্রবাহ। সুন্দর নৈকট্যে হারিয়ে যাবার মোহবিস্তার ওদের ঘিরে।

আধ বোজা চোখ মালুর, কী এক সুখের আচ্ছন্নতায় জাবর কাটা গরুর মতো। নিশ্বাস টানে ও। বাতাসের সাথে রিহানার নিবিড় ঘনিষ্ঠতার আস্বাদ এসে ভরে দেয় বুকটা।

রি-নু। যেন দূর কোনো স্বপ্নের ডাক মালুর কণ্ঠে।

দুনিয়ার যত দুষ্টুমি রিহানার মুখে। ছোট্ট হেসে সে দুষ্টুমিগুলো যেন ছড়িয়ে দেয় মালুর সারা গায়ে। একটু সরে বসে। কিন্তু আঁচলটি রেখে যায় মালুর কোলে।

হঠাৎ মুখর হয় রিহানা। ওর সুগোল ছোট ছোট হাত আর মুখের পেশী গুলো চপল চাঞ্চল্য ছড়িয়ে যায়।

সে কী মজাই না হোত। ভোরে উঠেই ঝাঁপিয়ে পড়তাম পত্রিকার ওপর খুঁজতাম ক্লাব-জলসার খবরগুলো। সব সময় যে তোমার নাম থাকত তেমন নয়। কিন্তু কোনো অনুষ্ঠান গানের হোক, সাহিত্যের হোক, ধরে নিতাম তুমি আসবেই।

আর কী আশ্চর্য। তুমি আসতে। স্রেফ আন্দাজের উপর এসে কতদিন যে তোমায় পেয়ে গেছি। আহা, সে হিসেবটা যদি লিখে রাখতাম। তখন কী আর জানতাম নাগাল পাব তোমার...

নাগাল বলতে নাগাল! একেবারে হাতের মুঠোয়। ওকে থামিয়ে নিজের কথাটা বলে নিল মালু।

আহা শোন না। মালুর মাথার কয়েকটা চুল আঙ্গুলে প্যাঁচিয়ে টেনে ধরে রিহানা।

বড় খারাপ তোমাদের এই পত্রিকাগুলোর স্বভাব। মা-বাপ নেই ওদের খবরের। খবর দিল অমুক তারিখে অমুখ জলসা। এ দিকে তারিখটা যে পাল্টিয়ে গেল সে খবরটি ছাপাবার নাম নেই। কতদিন যে বেকুব বনেছি আমি। এই না দেখে কী ব্যবস্থা করলাম, জান?

পানির মতো কলকল করে গড়িয়ে পড়ছে রিহানার কথা। মন দিয়ে তাই শুনছে মালু। সংক্ষেপে শুধু ওর প্রশ্নটাই ফিরিয়ে দেয় ওকে; কী করলে?

সে এক মজার ব্যাপার। আমার ছিল এক চেলা, ইংরেজিতে যাকে বলে স্টুজ, আমার খালাত ভাই। ওকে লাগালাম কাজে। তোমার গতিবিধির পাকা খবর ও-ই সংগ্রহ করে আনত আমার জন্য। সোজা গোয়েন্দাগিরি আর কী!

ঝর্নাধারা যেন আপন আনন্দে বয়ে চলেছে। মালু বাধা দেয় না। কিন্তু ও ভাবে কিসের জন্য রিহানার এই প্রচ্ছন্নতার কৌতুক? হয়ত আদৌ প্রচ্ছন্ন নয় রিহানার মন। কৌতুকের রেশ নেই সেখানে। এই মন একান্ত ভাবেই অপরিণত, তরল রোমান্টিকতায় ভরপুর। সেই তরল মনের খোরাক মালু।

রিহানার নিবিড় নৈকট্য শব্দহীন সঙ্গীতের মায়া। সেই মায়ায় হারিয়ে গিয়েও এ কথাগুলো মনে জাগে মালুর।

রিহানা তখন জিজ্ঞেস করছে, ব্যাপারটা খুব মজার না? বিশেষ করে কোনো মেয়ের পক্ষে?

মজারই বটে। ছেলেরাই এদেশে মেয়েদের পিছু ছোটে। মেয়েরাও যে ছোটে, এদেশে এটা নতুন।

আহা ফুলে যে একেবারে ঢোল হচ্ছে। কিন্তু মশাই আমি সে কথা বলিনি। আমি বলছিলাম, ওই স্পাই লাগানোটা।

সেটা শুধু মজার নয়, রীতিমতো রোমাঞ্চকর লোমহর্ষক ঘটনা। বলল মালু।

যাহ্ ফাজিল, কেন ঠাট্টা করছ? মালুর গালে ছোট্ট একটা চড় বসিয়ে দিল রিহানা। চড় বসান হাতটা খপ করে ধরে ফেলল মালু। সে হাতের প্রসারিত তালুতে মুখ বিছিয়ে চোখ বুজল মালু।

কফির ঠাণ্ডা পেয়ালাটা ঠেলে দিয়ে চেয়ারের গায়ে হেলান দিয়েছে রিহানা। যেমন মুখর হয়েছিল হঠাৎ, তেমনি হঠাৎই চুপ করে যায় ও।

এতক্ষণে, এই যেন প্রথম চোখ মেলে চাইল মালু। দেখল এক পিঠ ছড়ান চুল রিহানার। চুলের অবিন্যস্ত গোছাগুলো ওর মুখের চারপাশে, বুকের উপর এলোমলো। কালো চুলের ঝালর মেলা ওর ফর্সা মুখখানির দিকে লোভীর মতো চেয়ে থাকে মালু। সে মুখ বুঝি মেঘের আলিঙ্গনে এক খণ্ড শুভ্রতা। ধীরে ধীরে মালুর হাত জোড়া এগিয়ে গেল। তুলে নিল এক মুঠো চুল। তারপর মেঘের সুতোর মতোই সেই চুলগুলোকে ছড়িয়ে দিল আপন মুখের উপর।

৪৮.

ঝিরঝিরে ভোরের হাওয়ার আলতো ছোঁয়ায় ঘুম ভাঙে মালুর।

রাতে বুঝি বৃষ্টি হয়েছিল। বাতাসে তার শৈত্য স্পর্শটা লেগে রয়েছে এখনো। মালুর ঘরের বাতাস কী এক গন্ধে আমন্থর। বুক ভরে সে গন্ধটা টেনে নিয়ে আবার চোখ বুজল মালু। তারপর হাতখানি বাড়িয়ে দিল শিথানের দিকে। তুলে নিল সেই মিহি সুবাসের উৎসটি।

কয়েকটা শুকনো গন্ধরাজ, শুকিয়ে কেমন খরখরে হয়ে গেছে তার পাপড়ি গুলো। আর কয়েক গাছি চুলের একটা গোল চাকতি।

বার বার ওর চুলগুলো এলোমেলা করে দিচ্ছিল মালু। মাথাটা সরিয়ে নিয়ে শুধিয়েছিল রিহানা, আমার চুলটা বুঝি খুব পছন্দ তোমার?

খুব! মনে হয় মেঘের সুতো, নরম ভিজে ভিজে। আর অপূর্ব এক সুরভি।

মাঝে মাঝে কেমন সুন্দর কথা বলে মালু। সেটাই বুঝি ভাবছিল রিহানা। অনেকক্ষণ তাকিয়ে ছিল মালুর মুখের দিকে। তারপর ছিঁড়ে নিয়েছিল কয়েকখানি চুল। সুন্দর চাকতির মতো বানিয়ে গুঁজে দিয়েছিল মালুর পকেটে। বলেছিল নাও, আমার সুরভিটা রইল তোমার সাথে।

আর প্রতিদিনের বিদায়ের উপহার ওই গন্ধরাজগুলো। শুকিয়ে চিমসে আর বিবর্ণ ফুলগুলো। তবু কোনোটাই ফেলে দেয়নি মালু।

চুলের ছড়াটি আর গন্ধরাজের শুকনো পাপড়িগুলো নাকের কাছে ধরল মালু। আবার টেনে নিল সেই বিচিত্র সৌরভ।

হঠাৎ মনে পড়ল ওর। এ গন্ধের সাথে ওর যেন আবাল্য পরিচিতি। রানুর ঘরে ছড়িয়ে থাকত চাঁপার সুবাস। তালতলির সব বাড়িতেই যেন ভূর ভূর করত এ গন্ধটি।

সৈয়দ বাড়ির বাতাসে উড়ে বেড়াত যে ফিনফিনে এক সুরভি, সেটা ফুলের ছিল না। বিশেষ কোনো তেল বা প্রসাধনেরও নয়। সে ছিল বড় বাড়ির মেয়ে রাবু আর আরিফার বিচিত্র এক অঙ্গ সুরভি।

আশ্চর্য হয়ে যায় মালু। সেই একই সুরভি এই গন্ধরাজ মেয়েটাকে ঘিরে। ওরা একই জাতের, একই গোত্রের। বুঝি সবটাতেই অমন মিল ওদের। শিথানের চাদরটা উল্টিয়ে হাতে ধরা সুরভিগুলো রেখে দিল মালু।

চাদরটা আবার ঠিক করে রাখল। তারপর উঠে এল। হারমোনিয়ামটা টেনে সুর সাধতে বসল মালু।

মুহূর্তের মাঝেই উল্লসিত এক উন্মাদনায় হারিয়ে যায় মালু। সুরের সমুদ্রে একক অবগাহনের এই মুহূর্তগুলো বুঝি পরমতম আনন্দ, বুঝি গোটা পৃথিবীর বিনিময়ে কিনে নেওয়া কোনো দুর্লভ সম্পদ। রিহানার মুখটাও এই মুহূর্তে ম্লান আর অদৃশ্য। এই ঘরে এতক্ষণ ছড়িয়ে থাকা ওর সুরভিটুকুও মুছে গেছে। অন্য কোনো জগতের অন্য এক সুরভি, অন্য এক অনুভব এসে ঘিরে নিয়েছে মালুকে। সেখানে লুপ্ত এই পৃথিবীর অস্তিত্ব, রিহানা, বেতার ভবন–সব কিছু। কিন্তু সত্যি কী হারিয়ে যায় মালু? অতি মাত্রায় সজাগ আর সতর্ক ওর তন্ত্রীর সূক্ষ্মলোক, যেখানে ওকে বিচার করতে হয়, বিশ্লেষণ করতে হয়। শ্রবণেন্দ্রিয়ের সূক্ষ্ম সুচের আগায় বিদ্ধ করে যেতে হয় সুর তান লয়ের সামান্যতম বিচ্যুতি। এখানেই অধ্যবসায়, ধৈর্য আর নিষ্ঠার পরীক্ষা। এখানেই আনন্দলোকের সেই বিচিত্র সুধা। যেন একতাল মোম নিয়ে বসেছে মালু। চেপে চেপ্টে ফুলিয়ে চটকিয়ে বার বার ভেঙে গড়ে মহা সৃষ্টির প্রয়াস চলেছে ওর। সৃষ্টির এই মহালগ্নে পৃথিবীর সমস্ত আনন্দ আর বেদনা এক সাথে মিলে মিশে কী যেন প্রলয়ের ডাক দিয়ে যায় ওর অন্তরের গভীরে।

সুর থামিয়ে অকস্মাৎ নিজের দিকে তাকায় মালু। অনুভব করে অন্তরের অতলে আনন্দ বেদনার মিশেল সেই প্রলয় মূর্ছনা। অবাক হয় ও। সুরের সাধনা কী বিচিত্র পৃথিবীর সন্ধান দিয়ে গেছে ওকে। আজ সে পৃথিবীর সাথে রিহানার অস্তিত্বটাও যেন অবিভাজ্য। রিহানাকে বুঝি আর বাদ দেয়া যাবে না মালুর জীবনের কোনো কিছু থেকে। নতুন রচা একটা স্বরলিপির উপর চোখ রেখে আবার গলা ছাড়ল মালু। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গেই থেমে যেতে হল ওকে। কে যেন কড়া

নাড়ছে নিচে। গলা বাড়িয়ে দেখল মালু নিচের বাসিন্দারাই খুলে দিয়েছে দরজাটা। সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছে একটি মেয়ে। পেছনে একজন পুরুষ। হুরমতি বুয়া?

হাঁরে ভাই আমি। চিনতে পারছিস?

ভাল করে দেখবার আগেই দুটো শীর্ণ বাহুর আলিঙ্গন টেনে নিল মালুকে। বিব্রত হল মালু। ছাড়িয়ে নিল নিজেকে।

পেছনে তাকিয়ে আরো আশ্চর্য হল মালু। ওকি! এস এস। ওরা বসল।

হুরমতি তো নয়, হুরমতির কংকাল। খেংরা কাঠির মতো শরীর। চিমসে যাওয়া হাতে মুখে বিশ্রী কালচে মতো দাগ। স্বাস্থ্যের সাথে সাথে রূপটিও গেছে ওর। সেই কাঁচা হলুদ রংয়ের ক্ষীণতম আভাটুকুও আজ খুঁজে পাওয়া যায় না ওর মুখে।

এ কেমন করে হল হুরমতি বুয়া? কিন্তু মালুর প্রশ্নটা যেন মালুকেই ব্যঙ্গ করে গেল।

আমার অসুখ। এইটুকু বলে চুপ করে গেল হুরমতি।

লেকুর দিকে তাকাল মালু। আগের চাইতে অর্ধেক হয়ে গেছে ও। কিন্তু জীবন সম্পর্কে এখনও কী এক তপ্ত আগ্রহ আঁকা ওর চোখের কোলে। ওদের জিজ্ঞাসা না করেও বুঝল মালু, এই শহরেই কোথাও ঘর পেতেছে ওরা। উজোন টেনে টেনে ওরা ক্লান্ত হয়নি এখনো। কত ঘূর্ণির আবর্তে পড়েছে। স্রোতের মোচড়ে হাড় ভেঙেছে, ছিটকে পড়েছে। তবু কিসের জোরে, সর্বস্ব হারিয়েও দ্বৈত জীবনের সুর মিলিয়েছে ওরা? কে রাখে সে খবর। মালু তো ভুলে গেছিল ওদের। আজই বা সে খবর শোনবার ফুরসত কোথায় মালুর? অথবা মনটাই তার বদলে গেছে। স্মৃতির পাতা উল্টিয়ে বিগত অধ্যায়কে স্মরণ করতে চায় না মন।

অথচ... হুরমতি, লেকু ওদের নিয়ে দুর্ভাবনার অন্ত ছিল না মালুর। কিশোর দিনের কত দুঃখবোধ, কত চোখের জল ঝরিয়েছে ওদের জন্য। ওদের কেন্দ্র করেই কিশোর মনের কত আকুতি, কত নিষ্ফল ক্রোধ গুমরে উঠেছিল সেদিন। আজ বুঝি তার সামান্য চিহ্নও খুঁজে পায় না মালু।

আসলে সংকুচিত হয়ে এসেছে মালুর পৃথিবীটা। ইচ্ছা উদ্দেশ্য বাসনা, আহ্নিক গতির মতো ওর গোটা জীবনটাই এখন আবর্তিত হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে।

গান-বেতার-ছাত্রী, সম্প্রতি রিহানা। জীবনটা এখন এই নির্দিষ্ট আবর্তন। স্বপ্নও বুঝি তাই। এর বাইরে কোনো স্বপ্ন নেই, কোনো অন্বেষণ নেই জীবনের।

বাকুলিয়ার হুরমতি, লেকু ওরা আর জীবনের অংশ নয় মালুর। ওদের সাথে অনেক তফাত আজকের মালুর। তবু অতীতটাকে তো কাঁচি দিয়ে কেটে ফেলতে পারেনি মালু। তাই ওদের কথা শুনতে হয়। ওদের বেদনায় ভার হয়ে আসে বুকটা।

হুরমতির ব্যারাম। ডাক্তার দেখাবার সামর্থ্য কোথায় লেকুর। হাসপাতালে যদি ভর্তি করিয়ে দিতে পারে মালু, সেই আশাতেই ওর কাছে আসা। রেডিও অফিস থেকেই গত বিকেলে ঠিকানাটা সংগ্রহ করে এনেছিল লেকু। চল। জামা পরে বেরিয়ে এল মালু। পেছনে লেকু-হুরমতি। রিকশা চালায় লেকু। সে রিকশাতেই চড়ে বসল মালু আর হুরমতি।

কত টাকা পাও? কিছু না বললে খারাপ দেখায় তাই জিজ্ঞেস করল মালু।

কত আর! কোনোদিন পাঁচ। কোনোদিন চার। কোনোদিন আবার ছয়েও উঠে যায়। এর থেকে মালিকের ভাড়া কাটা যাবে। তিন সাড়ে তিন। মনে মনে একটা হিসেব কষল মালু। বলল! গড়ে তা হলে সত্তর-আশি টাকা থাকে মাসে। দু জনের সংসার এতে চলে কেমন করে?

লেকুও বুঝি অবাক হল এই উদ্ভট প্রশ্নে। জবাব দিল না।

লেকুকে ছেড়ে হুরমতির দিকেই মনোযোগ দিল মালু। কী অসুখ, কবে থেকে শরীর খারাপ ইত্যাদি, সবই কেমন সৌজন্যের প্রশ্ন। নিজের কানেই বেখাপ্পা ঠেকছে মালুর।

আধময়লা একটা মিলের শাড়ি হুরমতির পরনে। কিন্তু দেহ ওর ফুলেল তেলের গন্ধ ছড়ায় এখনো। এখনো বুঝি সেই তেল ব্যবহার করে ও। যেন আচমকা ওর কপালটার উপর নজর পড়ল মালুর। উদ্ধত কপালে সেই বিদ্রোহের তিলক বুঝি শিলার লিখন, কোনোদিন বিলুপ্তি নেই তার।

পুরনো ব্যধি। জ্বরটাতো মনে হয় টাইফয়েড। দেখে শুনে বললেন ডাক্তার।

পরিচিত ডাক্তার। মালুর অনুরোধে বিনা হয়রানিতেই ভর্তি করে নিলেন। দাওয়াইর একটি লম্বা তালিকা মালুর হাতে দিয়ে বললেন, এই ওষুধগুলো কিনে দিয়ে যাবেন।

মালুর চোখে প্রশ্ন। লক্ষ করে আবার বললেন ডাক্তার, আপনি তো শুধু ভর্তি করিয়েই খালাস হতে চান না। চিকিৎসা চান। বুঝেছি। হাসল মালু।

মানি ব্যাগটা খুলে কয়েকটা দশ টাকার নোট বের করল ও। টাকা আর ওষুধের তালিকাটা লেকুর হাতে দিয়ে বলল : ওষুধগুলো কিনে এই ডাক্তার সাহেবের হাতে দিয়ে যেও। বাকী টাকা রেখে দিও তোমার কাছে। রোজ কিছু ফল কিনে দেবে হুরমতিকে। গেইটের কাছে রাখা লেকুর রিকশাটা। লেকু ডাকল : আসেন, আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

ত্রস্তে যেন দুপা পিছিয়ে এল মালু। লেকু ওকে আপনি করে বলছে? আসবার সময় হুরমতি ছিল সাথে, তাই লেকুর রিকশায় চড়ে মনটা ওর খচ খচ করলেও কোনো অপরাধ বোধ করেনি। কিন্তু এখন মনে হল মালুর লেকুর রিকশায় জীবনে কখনো উঠতে পারবে না ও।

নাছোড়বান্দা লেকু। রিকশাটাকে ঘুরিয়ে একেবারে মালুর পায়ের কাছে এনে দাঁড় করায়, বলে : অল্প পথ। আর ওষুধের দোকানে ও পথেই তো যাচ্ছি আমি।

না না তুমি জলদি চলে যাও ওষুধ কিনতে। লেকুকে কোনো কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে গেট ছেড়ে রাস্তার দিকে দ্রুত পা ফেলল মালু। কী এক অপরাধ বোধ যেন পেছন থেকে তাড়া করে চলেছে মালুকে! মালু বুঝতে পারে না কী সেই অপরাধ।

ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও বিকেল বেলায় একবার হাসপাতালে এসে হুরমতিকে দেখে যাবার ফুরসুতটা করে উঠতে পারেনি মালু। পরদিন বিকেলে এসে দেখা পেল না হুরমতির।

সবার অলক্ষে দুপুর বেলায় হাসপাতাল ছেড়ে চলে গেছে হুরমতি। ডিসচার্জ সার্টিফিকেট নেয়নি। ডাক্তার নার্স কাউকে কিছু বলেনি। মালু কী আর কোনো দিন খোঁজ পাবে হুরমতির?

অনেক কাজ জমে আছে অফিসে। অনেক লোক বসে আছে দেখা করবার আশায়। নতুন গায়কদের কণ্ঠ পরীক্ষা, তারাও এসে গেছে। পরীক্ষার্থী আর দর্শনার্থীদের বিদায় দিয়ে চেয়ারটায় এসে বসল মালু। সংবিধাননামাগুলোয় সই সেরে ডাকটা দেখল। দ্রুত চোখ বুলিয়ে গেল। চিঠিপত্রের ওপর। এর মাঝে দুটো চিঠি রিহানার। গুণী গো গুণী! কণ্ঠে তোমার এত সুধা, কিন্তু মনের ভেতর এত সীসে ঠেসে রেখেছ কেন গো?...

সারাটা দিন কেমন করে বন্দী থাক ওই হলদে পিঁজরায়? একবারও কী আমার কাছে ছুটে আসতে ইচ্ছে করে না তোমার?

লক্ষ্মীটি, আজ একটু সকাল সকাল এসো। অহো, বিকেলগুলোকে যদি আর একটু লম্বা করা যেতো। যায় না? ইতি।

প্রতি বিকেলটা এখন বাঁধা রিহানার জন্য। কোনো দিন বা দুপুরটাও। তবু যেন তৃপ্তি আসে না রিহানার। না-বলা থাকে অনেক কথা। তাই চিঠি লেখে ও। পাঁচ সাত লাইনের ছোট্ট চিঠি। অজস্র উচ্ছ্বাস অসংযত আবেগ। কখনো বা অভিমান। ছেলে মানুষিই বলে মালু। তবু ভালো লাগে মালুর।

ইচ্ছে হলো মালুর রিসিভারটা তুলে দুটো কথা বলুক রিহানার সাথে। কিন্তু বাড়ান হাতটা ফিরে এল ওর। সারা ঘরটা যেন চেয়ে রয়েছে ওর দিকে। কী কথা বলবে ও, তাই শোনার জন্য যেন উন্মুখ ঘরের আসবাব আর ওই দুটো মানুষ, করিম, ইয়াসীন। আর ও দিকে রিহানার বাড়িতে? সেখানেও তো ধরা পড়ে যাবে মালু।

মালুর মনে হয় গেঁয়ো শরম বোধটা এখনও ছাড়তে পারেনি ও। তাই কোনোদিনই রিহানাকে টেলিফোনে ডাকতে পারেনি ও। রিহানার বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও।

এই অপারগতার কারণটা শুনে হেসে লুটোপুটি খেয়েছিল রিহানা। ঠাট্টা করেছিল : টেলিফোন করতে শরম লাগে, পাছে কেউ দেখে ফেলে, শুনে ফেলে। এ কোন্ ধারা প্রেমিক গো!

স্যা-বলেই জিব কাটল করিম। বলল, হুজুর

আবার? চোখ পাকিয়ে ওর দিকে তাকায় মালু।

কিন্তু, করিম বুঝি আজ বেপরোয়া। ব্যাপারটার একটা হেস্তনেস্ত না করে ছাড়বে না ও। বলল করিম : স্যার না, হুজুর না, তবে বলব কী? সত্যি তো। কী বলে সম্বোধন করবে করিম? মালু হল উপরওয়ালা। তাই সম্বোধনের শব্দও হতে হবে সম্মানসূচক। এ দিকটা ভেবে দেখেনি মালু।

পাশের টেবিলে ইয়াসীন। মালুর দুরবস্থাটা দেখে বুঝি ঠোঁট টিপে হাসছে ও। তাড়াতাড়ি মুখটা ঘুরিয়ে নিল মালু। করিম মিঞার পা থেকে মাথা অবধি নজরটা বুলিয়ে নিয়ে বলল : কিছু না বললেই হয়। মানে এ-ই, হে-ই এ সব তো? ওই রাস্তার যত ছোটলোকদের মতো! চটে যায় করিম মিঞা। আঠার বছর ধরে নানা অফিসে এই কাজ করে আসছে সে। কিন্তু এমন বেঢপ সাহেব কখনো দেখেনি ও।

এমন বেয়াক্কলে কথাও শোনেনি কখনো। বিড় বিড় করে ওর দুর্ভাগ্যটার উপরই সকল দোষ চাপিয়ে দিয়ে বেরিয়ে যায় করিম মিঞা।

ময়মনসিংহের আবদুল বয়াতি পা ভেঙে শয্যাশায়ী। আসতে পারবে না জানিয়েছে। কাছে এসে জানায় ইয়াসীন।

এ্যাঁ! তা হলে? চেয়ার থেকে বুঝি ছিটকে পড়বে মালু। একটা স্থিরীকৃত প্রোগ্রাম বানচাল হবার অর্থ যে কত ঝামেলা দিকদারী সেটা মালু বা ইয়াসীনের মতো করে আর কে বুঝবে।

চটপটে বুদ্ধিমান ইয়াসীন। একটা উপায় নিজেই বের করে ফেলল ও। গুনাই বিবির দলটা এখনো ঢাকা ছাড়েনি। ওদের আর একটা প্রোগ্রাম দিয়ে দিলে কেমন হয়? শ্রোতারাও পছন্দ করবে।

চমৎকার চমৎকার। খুশিতে ইয়াসীনের পিঠটা চাপড়ে দিল মালু। রিসিপসন রুমেই তো বসে আছে ওদের লোক। ডেকে নিয়ে আসি? বলল ইয়াসীন।

যাও। এখখুনি।

ইয়াসীন বেরিয়ে গেল।

কাগজ-পত্রগুলো ঠেলে রাখল মালু। রিহানার চিঠিটার উপর আর একবার চোখ বুলিয়ে রেখে দিল পকেটে। টেলিফোনটার দিকে চোখ পড়ল। লোভ হল। ঘরটা এখন একেবারেই খালি। রিহানাকে কী ডাকবে একবার?

ক্রিং ক্রিং যেন মালুরই গোপন ইচ্ছায় সাড়া দিয়ে বেজে উঠল টেলিফোন। হাঁ, রিহানারই গলা। হাত ঘড়িটার উপর চোখ বুলিয়ে আনল মালু। প্রত্যাশিত সময়ের কিছু আগেই আজ রিহানার ফোন এল।

হ্যালো...। কী এক উৎকণ্ঠা রিহানার স্বরে।...তুমি কিন্তু এসো না বাসায়। ভীষণ ব্যাপার ঘটে গেছে।...আচ্ছা শোন। অফিসেই তো আছ তুমি থাকো, আমি আসছি।

কী সে ভীষণ ব্যাপার। মালু কী জানতে পারে না।

এত অস্থির হচ্ছ কেন, রিহানা? কী হয়েছে, বল না শুনি?

না। এখন না। আসছি...

হ্যালো।

না। নির্জীব তার। রিহানা ছেড়ে দিয়েছে লাইন।

ধুক ধুক প্রতীক্ষায় মুহূর্তগুলো গড়িয়ে যায়।

গত রাত আর আজকের একটি বেলা। এর মাঝে এমন কী ঘটে গেল! এমন ভীষণ ব্যাপার, যা টেলিফোনে আলাপ করতে পারে না রিহানা? মিনিটের কাঁটাটা গড়িয়ে গড়িয়ে ঘণ্টা পার করে দেয়।

আকাশ পাতাল, সম্ভব অসম্ভব ভেবে চলে মালু। কিন্তু, আসছি বলে এখনো আসছে না কেন রিহানা? এত দেরি হবার কোনো কারণ খুঁজে পায় না মালু।

অবশেষে এল রিহানা

ও কাঁপছে। ও ভয় পেয়েছে। কী এক শঙ্কা টেনে নিয়েছে ওর মুখের রক্ত। পাণ্ডর মুখের রক্তহীন সাদা শুকনো ঠোঁট জোড়া কিছুতেই নড়তে চাইছে না। আর ওর চরিত্রে এবং প্রকাশে যা ছিল গভীরতার স্বাক্ষর সেই মখমল চোখের স্নিগ্ধ দীপ্তিটা কারা যেন ছিনিয়ে নিয়েছে। সেখানে এখন বিহ্বল আতঙ্ক।

বাবা মা বড় ভাইয়া, সবাই জেনে ফেলেছে। কাল রাতে ওরা শাসিয়েছে আমায়। বলেছে : গান শেখা বন্ধ, বাইরে যাওয়া বন্ধ। ঘুস ঘুস পরামর্শ চলেছে ওদের রাত ভর। সকালে ওদের আখেরি সিদ্ধান্তটা জানিয়ে দিয়েছে–পরশুদিন আমার বিয়ে, আমার সেই খালাত ভাইয়ের সাথে।

যেন দুঃসাধ্য চেষ্টায় কথাগুলো বলল রিহানা। বলে, হাঁপাল কিছুক্ষণ। হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে ছোট ছোট নিশ্বাস টানল অনেকগুলো। তারপর বলল : আমি পালিয়ে এসেছি।

বুদ্ধিটা যখন সজাগ চিন্তাটাও তখন স্পষ্ট। মনের গতিটা যুক্তির নিয়ন্ত্রণে। কিন্তু হৃদয়, শুধু মাত্র হৃদয় দিয়েই যখন বুঝতে হয়, ভাবতে হয়, অনুভব করতে হয় তখন যুক্তির বাধ যায় ভেঙে। দুর্বার এক আবেগের প্লাবনে ভেসে যায় মানুষের স্বাভাবিক সতর্কতা, পৃথিবীর ছোট বড় হিসেব।

চলো। একটা আস্তানা তো আছে আমার! একজনার যখন অসুবিধে হয় না, দুজনারও হবে না নিশ্চয়।

একটু হাসল মালু।

সে হাসির ছটা পড়ল রিহানার মুখে। ও বলল–চলো।

৪৯.

ওরা যেন হারিয়ে রইল।

পৃথিবীর কোনো অনন্ত মায়ায় লীন হল ওদের সত্তার ভেদ।

মালুর কাছে এ এক অভাবনীয় পরিপূর্ণতা। হৃদয়ে ওর আশ্চর্য আর নিটোল এক স্থিতি। সার্থকতা আর সাফল্যের আনন্দ উত্তেজনায় উদ্দীপ্ত হয়েছে মালু। কিন্তু পরিপূর্ণতার এই শান্ত স্থিতিটা যেন সব কিছুকেই ছাড়িয়ে যায়।

ওরা ঘুরে বেড়াল।

শ্রীহট্ট, রাঙ্গামাটি চট্টগ্রাম। উত্তর বঙ্গের গেরুয়া মাটির দেশে।

ট্রেনে চড়ল। নৌকায় করে ঘুরল। গরুর গাড়ি, মোষের গাড়িতে চড়ল। আড়াই মাস পর ফিরে এল।

কী এক আচ্ছন্নতায় রিহানা বুঝি ঘুমিয়ে থাকে সারাক্ষণ। সুখের ভারে ঘুম ঘুম আবেশে নিজেকে মেলে দেয়, রেণু রেণু ঝরিয়ে দেয় আপনাকে। দুকোষ ভরে সে আনন্দ রেণু তুলে নেয় মালু। মিশিয়ে দেয় আপনার অস্থি পাঁজরে।

চলো না ঘুরে আসি। মালুর বুকের কাছটিতে এতটুকু হয়ে বলে রিহানা। কোথায় যাবে? তার চেয়ে কী এই ভালো না? এমনি নিঃশব্দে মুখোমুখি বসে থাকা?

তাহলে চলো সিনেমায়।

এত আনন্দ আর এত আলো ছড়ান এই ঘরে। সেটা ফেলে বদ্ধ ঘরে চোখ খারাপ করতে যাবে? চোখের কোলে কৌতুক খেলিয়ে বলল মালু। তারপর রিহানার ঠোঁটে চিবুকে এঁকে দিল দুরন্ত দুষ্টমি। যাও–নিজেকে আলগা করে শিথিল খোঁপাটা পাট করে রাখে রিহানা। এসো, গান শোন। ওর কোলে মাথা রেখে চোখ বুজে গান শুনল রিহানা। গান শেষ হলেও ওর কোলে মুখ গুঁজে অনেকক্ষণ নিথর হয়ে পড়ে রইল। উঠে বসল, বলল : বাবা মার সাথে দেখা করে আসি। যাবে? একটু যেন চমকে উঠল মালু। শুধাল : ওঁরা কী আমাদের গ্রহণ করবেন? তাঁরা কী চান আমরা যাই?

মা তাঁর মতো পাল্টিয়েছেন। বিয়ে যখন করেই ফেলেছি আমরা, তিনি আমাদের মেনে নেবেন। তার ধারণা, আমরা যদি বাবার সুমুখে গিয়ে উপস্থিত হই, বাবাও

মেনে নেবেন।

কী করে জানলে?

আমার এক বান্ধবীর মারফত খবর পাঠিয়েছেন মা।

জানালার বাইরে ল্যাম্পপোস্টটার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে মালু। কী যেন ভাবে।...

চুপ করে গেলে যে? শুধাল রিহানা।

তোমার ভাইরাও-তো একবার আসতে পারত।

হয়ত বাধছে ওদের মর্যাদায়।

মর্যাদা কী আমার নেই? বুঝি অসাবধানেই কড়া ঝাঁঝ ফুটল মালুর কথায়।

তা হলে যাচ্ছ না?

না।

চুপ করে যায় ওরা। নিকটের কোনো বাসা থেকে ভেসে আসছে ক্রুদ্ধ এক শিশুর কান্না। এক মনে সে কান্নাটাই যেন শুনে চলেছে ওরা।

এ ভাবে দিন রাত বাসায় বসে বসে আমার ভালো লাগছে না বাপু। না আছে দুটো গল্প করার লোক, না আছে একটা পরিবেশ। অনেকক্ষণ পর বলল রিহানা।

ধুপ করে কী যেন পতনের শব্দ পেল মালু ওর হৃৎপিণ্ডের অতলে। সামলে নিল মুহূর্তেই। সহজ হেসে বলল : বা রে আমি রয়েছি সারাক্ষণ তোমার পাশে পাশে। ঘরময় আমাদের গান আর সুরের মেলা। তবু তোমার পরিবেশ লাগবে?

লাগবে না? শুধু গান নিয়েই কী বাঁচতে পারে মানুষ?

পারে না? এবারও বুঝি চমক খেল মালু। বলল : আমি তো জানতাম গানের মাঝেই তোমার অস্তিত্ব, সুরের ধারায় তোমার প্রাণ।

ভালো জিনিসটিও কী সব সময় ভালো লাগে?

তিন মাসেই কী সব বাসি হয়ে গেল?

নিরুত্তর রিহানা সুমুখের দেয়ালটার দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে থাকে। সেখানে একটা টিকটিকি। স্থির স্ফটিক চোখ টিকটিকির। সে চোখ দিয়ে রিহানাকেই যেন দেখছে টিকটিকিটি।

হয়ত একঘেয়েমির ক্লান্তি এসেছে রিহানার। বাপ মা ভাইবোন আত্মীয় পরিজনদের ছেড়ে কখনো দূরে থাকেনি। তাই এই ছোট্ট-পরিসরের সংকুচিত জীবনে একটু বাইরের হাওয়া চায় ও। ভাবল মালু, বলল : চল, রাবু আপার বাসা থেকে বেড়িয়ে আসি। সেই কবে গেছিলাম। এর মাঝে রাবু আপা বুঝি তিন চার বার দেখে গেছে আমাদের।

টিকটিকিটা দৌড়ে পালিয়ে গেল চৌকাঠের আড়ালে। সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে রিহানা। হঠাৎ মুখটা নাবিয়ে মালুর চোখে চোখে তাকাল ও। বলল, উনি তোমার কেমন আপা?

কী জানতে চাইছে রিহানা? রাবুর পরিচয় পেতে গেলে মালুর গোটা জীবনটাই যে শুনতে হবে ওকে।

আর একদিন শুনে নিও, সংক্ষেপে বলল মালু।

এ কথার পর রাবুর বাসায় বেড়াতে যাবার প্রসঙ্গটা যেন আপনা আপনিই চাপা পড়ে গেল।

ওরা চুপ করে গেল।

জানালার কপাট কাঁপিয়ে এক দমকা বাতাস এল। গলির আবর্জনার গন্ধে ভরে গেল ঘরটা। নাকে আঁচল চাপল রিহানা, বলল : ইস, কী দুর্গন্ধ। এখানে মানুষ থাকে? তুমি যে বাসা খুঁজছিলে কী হল তার?

খুঁজছি।

খুঁজছি নয়, জলদি কর। এই ঘিঞ্জি ঘর আর এই নোংরা পাড়ায় দম বন্ধ হয়ে মরব আমি। অনুযোগের স্বর রিহানার।

খোঁজ খবর তো কয়েক জায়গায়ই লাগিয়েছি। কিন্তু, জান তো টাকা থাকলে ঢাকার বাজারে হিমালয় পর্বতটাও কিনতে পাওয়া যায়। যা পাওয়া দুঃসাধ্য সে হল বাড়ি। আত্মপক্ষে কেমন একটা কৈফিয়তের মতো শুনাল মালুর স্বরটা।

খট খট, দুটো শব্দ হল দরজায়।

কে? নিচে এসে দরজাটা খুলে দিল মালু। রিহানাও পিছে পিছে নিচে এসে উঁকি দেয়।

ওমা। আহসান ভাই। এসো এসো। কী আমার সৌভাগ্য। উচ্ছ্বসিত হয় রিহানা। ফিরতি সিঁড়িগুলো ডিঙিয়ে যায় তরতর করে।

আমার খালাত ভাই, আহসান। চাটগাঁয়ে খুব বড় ব্যবসা। ঢাকায়ও। পরিচয় করিয়ে দেয় রিহানা।

হয়ত নিষ্প্রয়োজন পরিচয়টা। পুরনো পরিচিতের মতোই হাত মিলায় মালু। অভ্যর্থনা জানায়–বসুন।

জান, এই আহসান ভাই-ই ছিল আমার একমাত্র বন্ধু। এর কথাই তোমাকে বলছিলাম। সেই তো তোমার সব খবর জোগাড় করে আনতে। তিন মাস বিচ্ছিন্নতার পর আত্মীয় মানুষের সঙ্গ পেয়ে বুঝি উপচে পড়ছে রিহানা। তোমরা গল্প কর। আমি আসছি এখুনি। মালুর দিকে অপাঙ্গে একটা ইশারা ছেড়ে পাশের ছোট্ট ঘরটিতে অদৃশ্য হয়ে যায় রিহানা।

ফ্যামিলির তরফ থেকে নিজের তরফ থেকে তো বটেই, কগ্রাচুলেশান জানাচ্ছি আপনাকে। বিলম্বের জন্য লজ্জিত। আটকা পড়ে গেছিলাম খুলনায়। পাকা আঙ্গুরের মতো টসটসে মুখে সপ্রতিভ হাসি ফোঁটায় আহসান।

ভ্রূ উঁচিয়ে তাকায় মালু।

পরিবেশ ভেদে কত তফাত মানুষের। রেডিও অফিসের সেই কাচুমাচু অপ্রস্তুত মুখ আগন্তুকটিকে আজকের আহসানের মাঝে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। এমনিই বুঝি হয়। টাকা আনা পাই, যোগ আর গুণের বিরাট অঙ্কের স্থূল হিসেবের জগতে যারা সার্থক সপ্রতিভ সেই মানুষগুলোই সূক্ষ্ম কোনো কারুময় পরিবেশে কেমন বুদ্ধিহারা। সইতে পারে না সেই পরিবেশের ধারাটা। হয়ত তাই সহজ হতে গিয়ে সেদিন হাস্যাস্পদ হয়েছিল আহসান। আর কারুময়ী এক কন্যার প্রেম পেতে গিয়ে নিজেকে করে তুলেছিল তার আজ্ঞাবহ দাস। কিন্তু নিজের পরিবেশে আর দশটি মানুষের মতোই সহজ স্বাভাবিক আহসান।

দেখুন, জীবন সম্পর্কে আমি খুব ইয়ে, মানে ইংরেজরা যাকে বলে স্পোর্টস্ ম্যান-লাইফ। দৌড়ে আপনারই জিত হয়েছে। হঠাৎ গোলাকার মুখটা মালুর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল আহসান। একটুক্ষণ থেমে আবার বলল, আমার হারটাকে, বলতে পারি, সাহসের সাথেই গ্রহণ করেছি আমি। আর পরাজিতের প্রতি

আপনিও নিশ্চয় একটা উদার মনোভাব নেবেন, যেমন আলেকজান্ডার নিয়েছিল পুরুর প্রতি। কী বলেন? করমর্দনের ভঙ্গিতে মালুর দিকে হাত বাড়িয়ে দিল আহসান। অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রসারিত হল মালুর হাত।

আচমকা কেন যেন কেঁপে গেল মালু। কী এক সন্দেহ অথবা ঈর্ষা বিদ্যুতের মতো দৌড়ে গেল ওর মনের উপর দিয়ে। আহসান কী এখনো আশা রাখে?

চা আর নাশতা নিয়ে এল রিহানা।

নিন। ভদ্রতার খাতিরেই অতিথিকে পরিবেশন করল মালু। কেন যেন আলেকজান্ডার আর পুরুর সেই উদ্ভট উপমাটা এখনো ঘূর্ণির মতো ঘুরে চলেছে ওর মাথায়।

আহসান ভাই, একটা ভালো বাসা খুঁজে দাও না আমাদের! নখের চিমটেয় একটা কেকের কণা ভাংতে ভাংতে বলল রিহানা।

ভা-লো-বা-সা? কেমন করে যেন উচ্চারণ করল আহসান। তারপর গোলক মুখখানা ফুটবলের মতো ফুলিয়ে পুরো গাল হাসল ও। বলল তার আর অভাব কী? আমার বাড়িটা তো খালিই পড়ে থাকে। এসে থাক না তোমরা!

মালুর চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝি সম্মতি খুঁজল রিহানা। মুখটা অন্য দিকে ফিরিয়ে নিল মালু।

বেশ তোমার একতলাটা ছেড়ে দাও আমাদের। কত ভাড়া নেবে বল! কেন যেন গলার স্বরে অতিরিক্ত স্পষ্টতা আর জোর জুড়ে দিল রিহানা।

নিষেধের ইশারা দিল মালু। কেশে হাত নেড়ে ওর দৃষ্টিটা আকর্ষণ করার চেষ্টা করল। কিন্তু রিহানা উত্তরের প্রতীক্ষায় তাকিয়ে রয়েছে আহসানের মুখের দিকে।

আহসান বলছে : জানি তোমাদের মর্যাদায় বাধবে, ভাড়া একটা গছাবেই আমাকে। তা, যা খুশি একটা দিও। তারপর মালুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল : তাহলে উঠে আসছেন কবে? আগামী হপ্তায় আমাকে আবার ছুটতে হবে করাচী।

কী বলবে মালু? রিহানাই উত্তরটা দিক। বলুক, না ধন্যবাদ। কাতর মিনতির দৃষ্টিটা রিহানার মুখের উপর ধরে রাখল মালু।

না। রিহানা এক মনে চায়ের পেয়ালার ধুঁয়ো দেখে চলেছে। তারপর কিছু একটা বলার জন্য ও যেন মুখটা তুলল। কিন্তু, ততক্ষণে আহসানের দেয়াল কাঁপানো

হাসিটা ছিটকে পড়েছে ওদের মাঝে।

আপনি কী বলছিলেন? ল্যাংবোট? হা হা হা। আর আমি কী ছিলাম, জানেন? এন এভার অবলাইজিং স্লেভ মানে বশংবদ গোলাম। হা হা হা। হাসির চোটে ওর টসটসে মুখের লালচে আভাটা যেন ঝিলিক খেলে গেল। মানুষের হাসি কেমন করে এত বিশ্রী, এত কদর্য হতে পারে?

গা-টা বুঝি ঘিন ঘিন করে ওঠে মালুর। এখুনি মানুষের এই ইতর সংস্করণটিকে আস্তে করে তুলে জানালা গলিয়ে ফেলে দিতে পারলেই যেন স্বস্তি পেত মালু।

যাই বলুন, মেয়ে জাতটার বাহাদুরি আছে। ওরা বাঘকে ভেড়া বানায়, মানুষকে পশু বানায়, অমানুষকে আবার মানুষও বানায়। ওরা সবই পারে। ওদের অসাধ্য কিছুই নেই..বলে চলেছে আহসান।

রিহানাকেই দেখছে মালু। দেখছে ব্যথাভরা চোখের অনুযোগ মেলে, আহত বিস্ময়ে। কিন্তু সে দৃষ্টি স্পর্শ করে না রিহানাকে। আপনি গুণী, আপনি সাধক। আপনার কাছে হার মেনেছি বলে আমার কোনো লজ্জা নেই, এ কথা কিন্তু হলফ করেই বলতে পারি মিস্টার মালেক। হাসতে হাসতেই বলে চলেছে আহসান।
ইপাব তৈরিঃ আল মোস্তাইন বিল্লাহ

আচ্ছা আসি। হঠাৎ হাসি এবং কথা থামিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল আহসান। চায়ের জন্য ধন্যবাদ ছিল। রিহানার দিকে তাকিয়ে বলল : ধুয়ে মুছে ঘরগুলো রেডি করে রাখব। যখন খুশি চলে এসো তোমরা।

ভালোই হল ব্যবস্থাটা। পাড়াটাও ভালো। বাড়িটা চমৎকার। ভাড়াটাও নিশ্চয় আনরীজন্যাবল কিছু হবে না। আহসানকে বিদায় দিয়ে অনেকটা স্বগতোক্তির মতো বলল রিহানা।

শক্ত উত্তরে ফেটে পড়ার মুখেই সামলে নিল মালু। শুধু সেই অমানুষিক চেষ্টার ক্ষীণ একটি রেশ জেগে রইল ওর ঠোঁটের কুঞ্চনে।

কেমন নির্দোষ চোখ তুলে তাকায় রিহানা। সে চোখে চাঁদের হাসি মোমের আলো।

আর সে চোখের নিচে গলে গেল মালুর দৃষ্টির ঘৃণা, মনের প্রাচীর। ওর মনের বাধা ডিঙিয়ে রিহানার ইচ্ছাটাই পথ করে নিল।

৫০.

নতুন বাসায় এসে খুশির ঝর্নায় উপচে পড়ে রিহানা, মনের মতন করে সাজায় ঘরগুলো-বসবার ঘর, শোবার ঘর, খাবার ঘর। সব ঘরেই ওর নিপুণ হাতের বিন্যাস। কার্পেটের রংয়ে, আসবাবে, সাজে, কুশানের আস্তরে, দেয়ালের ছবিতে ওর মার্জিত রুচির ছোঁয়া।

মনের মতন ঘর পেয়ে, সে ঘরকে মনের মতন সাজিয়ে সত্যি খুশি রিহানা। রিহানার এই খুশিকে উপেক্ষা করতে পারে না মালু। রিহানার খুশির ঢেউ ভাসিয়ে নিয়ে যায় মালুর মনের দ্বিধা।

সুন্দর করে সাজে রিহানা। সকালে এবং বিকেলে। গোসল করে নতুন বেশে রিহানা যখন এসে বসে সাজানো ড্রয়িং রুমে তখন ওকে আরও সুন্দর, আরও আকর্ষণীয় মনে হয় মালুর। প্রলুব্ধের মতো চেয়ে থাকে মালু। মালুকে স্বীকার করতে হয়, এই ঝকঝকে ঘরের ঔজ্জ্বল্যেই মানায় রিহানাকে। এখানে রিহানা বরবর্ণিনী নিরুপমা। ইসলামপুরের সেই পচা গলির নোংরা ঘরে কিছুতেই মানায়নি, মানাতো না ওকে। সেখানে ম্রিয়মাণ ছিল ওর রূপ, এমনকি ওর তন্বী দেহের আকর্ষণটাও।

কোমরে হাত দিয়ে ঘরের দেয়ালগুলো নিরীক্ষণ করে রিহানা, বলে, অল্প আলো একটুও ভালো লাগে না আমার। আলো হবে ঝলমল উজ্জ্বল।

মালুকে তাই ছুটতে হয় মিস্ত্রীর সন্ধানে। মিস্ত্রী এসে নতুন পয়েন্ট লাগিয়ে যায়, চারদেয়ালে চারটে, মাঝখানে ঝাড়।

অসম্ভব। পঁয়তাল্লিশ পাওয়ার বালব চলবে না। ওতে নিজের হাতটাই চোখে পড়বে না তোমার। রিহানা ভ্রূ কুঁচকায়।

মালুকে আবার ছুটতে হয় দোকানে। ফরমাশ মাফিক পাল্টিয়ে আনতে হয় বাবগুলো। কোটা পঁচাত্তর পাওয়ার। কোটা একশো পাওয়ার। আর যখন সব কটি আলো জ্বালিয়ে দিয়ে মধুর হাসির তৃপ্তি ছড়ায় রিহানা-মালু তখন বোবা। মালুকে তখন মেনে নিতে হয় রিহানাই ঠিক। নিম আলোটা অন্ধকারের চেয়েও কুশ্রী। আলোকে হতে হবে ঝলমল উজ্জ্বল। সেই ঝলমল উজ্জ্বল আলোর রাজ্যে বুঝি রূপের রানী রিহানা।

মুগ্ধ মালু।

ব্যবসার কাজে করাচী ঘুরে ফিরে এসেছে আহসান। বেরোবার পথে, ফেরবার পথে রিহানার ঘরে একবার উঁকি দিয়ে যায়। প্রশংসা করে রিহানার রুচির, ওর

সাজানো ঘরের মনোরম স্নিগ্ধতার। নতুন পাড়ায় এসে কেন যেন শখ চেপেছে মালুর, রিহানাকে নিয়ে বেড়াবে, এখানে সেখানে, কাছে দূরে, নির্দিষ্ট কোথাও নয়।

রিহানার শখ, ওর ভাষায়, শপিংয়ের অর্থাৎ বাজার করবার। ও যায়, মালুকে নিয়েই যায়, বাজার করতে। কখনও দুপুরে যখন ভিড় থাকে না পথে অথবা দোকানে। কখনও বা সন্ধ্যায়। কখনও রিকশায় চড়ে, কখনও বা আহসানের ভক্স ওয়াগনে।

চল না সিনেমায় যাই। সোহাগী স্বরে আমন্ত্রণ জানায় মালু।

সিনেমায় আপত্তি নেই রিহানার, মালুর সাথে সিনেমায় যায়। কিন্তু দশ মিনিটের বেশি সিনেমা কখনও দেখে না রিহানা। সেলুলয়েডের গায়ে প্রতিবিম্বিত চিত্রগুলো অন্ধকার সিনেমা হলের পর্দায় জেগে উঠতে না উঠতেই ঘুম পায় রিহানার। ও ঘুমিয়ে পড়ে। সন্ধ্যার শো বলে নয় ম্যাটিনী শোতেও দেখেছে মালু, দশ মিনিটের মধেই ঘুমিয়ে পড়েছে রিহানা। অগত্যা বাড়ি ফিরে আসতে হয় মালুকে। বাড়ি এসেই সজাগ রিহানা। কিছুক্ষণের অনুপস্থিতিতে কোথাও ধূলো পড়েছে এক কণা, অথবা কোনো একটা টেবিলক্লথ এলোমেলো হয়েছে বাতাসে, তাই নিয়ে কোমর বেঁধে লেগে যায় রিহানা।

নিঃশব্দ জিজ্ঞাসার চিহ্ন হয়ে চেয়ে থাকে মালু। রিহানার হয়ত চোখে পড়ে। রিহানা বলে, আসলে, সিনেমা আমার একটুও ভালো লাগে না।

কী ভালো লাগে? মালুর স্বরে ক্ষুব্ধ বিরক্তিটা চাপা থাকে না।

মখমল চোখের তারায় অনুরাগ ফুটিয়ে অপরূপ হল রিহানা। মালুর প্রশ্নটাই ফিরিয়ে দিল মালুকে–কী ভালো লাগে? ভালো লাগে এই ঘর আর তোমাকে। বুঝলে? তারপর দুহাতে মালুর গলা জড়িয়ে ওর কাঁধে মুখ রাখল রিহানা। নিথর হল। কিছুক্ষণ পর ঘুমিয়ে পড়ল।

মনের ক্ষুব্ধ বিরক্তিটা কখন ভেসে গেছে রিহানার সোহাগের ধারায় জানতে পারে না মালু।

এও এক পরামার্শ্চ অথবা ধাঁধা মালুর কাছে। সেই মধুমাসের কথা। রিহানাই তখন বায়না ধরত সিনেমায় যাওয়ার।

ঘর সাজানো শেষ হয় না রিহানার। নিত্য নতুন খুঁত বের হয়। আর সে খুঁত ঢাকতে প্রয়োজন পড়ে নতুন আসবাবের, নতুন সাজের।

জমান টাকাগুলো যে দুহাতে উড়িয়ে দিচ্ছ। ভবিষ্যতের কথাটা একবার ভাবছ কী? ভীরু, ভীরু একটা প্রতিবাদ জানায় মালু।

রাখতো তোমার কিপ্টেমি। ওকে থামিয়ে দেয় রিহানা। তারপর অনুপম সেই চোখের হাসিতে ধুইয়ে দেয় ব্যথা পাওয়া মালুর মুখের অন্ধকার।

তিন মাসের ছুটিটা ফুরিয়ে গেল মালুর।

সেই ঘুম ঘুম আবেশে রেণু রেণু ঝরে পড়া রিহানা, মায়া মুগ্ধতার কোল ছেড়ে বুঝি জেগে উঠল।

জেগে উঠল ওরা দুজনই।

আচম্বিতে।

প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেয়ে।

হঠাৎ বিস্ফোরণে।

৫১-৫৫

আপিসে এলো মালু।

প্রথমেই এগিয়ে এল করিম মিঞা। গাল ভরা তার হাসি। চোখ ভরা খুশি।

বলল, পেয়েছি।

কী পেয়েছ, শুধাল মালু।

ওই যে ডাক? স্যারও না। হুজুরও না, ভাই। কৃতিত্বের আনন্দে চকচকিয়ে যায় করিম মিঞার চোখ।

ভাই? বাহ্ চমৎকার তো, ছোট বড় আমরা সব ভাই, তাই না করিম মিঞা?

নতুন সম্বোধনটা খুব পছন্দ হয়ে যায় মালুর, সহকারী ইয়াসীনেরও। সেও হাসছে মিটি মিটি।

কিন্তু, এই তিন মাস করিম কী শুধু এ কথাটাই ভেবে চলেছে? চোখে শ্রদ্ধা ঝরিয়ে ওর দিকে তাকায় মালু।

কী ইয়াসীন সাহেব! ওপক্ষের খবর কী? করিমকে ছেড়ে এবার ইয়াসীনের দিকে মন দেয় মালু।

লজ্জায় রাঙিয়ে ওঠে ইয়াসীন। ফাইলের আড়ালে মুখ লুকিয়ে ছোট্ট করে বলল, পরীক্ষা তো শুরু হয়েছে।

শুরু হয়েছে? তবে আর ভাবনা কী?

ইয়াসীনের চেয়ে মালুরই যেন বেশি ফুর্তি। চেয়ার ছেড়ে উঠে আসে ও। ইয়াসীনের কাঁধে হাত রেখে বলে, মক্কার মিনার তা হলে দেখা যাচ্ছে? লাজুক হাসিতে রাঙিয়ে যায় ইয়াসীনের কালোপানা মুখখানি।

ভাই করিম। এসো এদিকে। লাগাও চা মিষ্টি। করিমের হাতে দুটো টাকা তুলে দিল মালু। বলল আবার : খবর টবর রাখ কিছু?

পরীক্ষা হচ্ছে তো!

খবর কী আর রাখেন করিম মিঞা! ইয়াসীনের ওপক্ষের খবরটা এ আপিসের অনেকেই তো রাখে। তিন বছর ধরে ওপক্ষের সাথে ঝুলে রয়েছে ইয়াসীন। কিন্তু ওপক্ষ বড় কড়া পক্ষ। বলে রেখেছে, ম্যাট্রিক পাস না করে একটা চাকরির ব্যবস্থা না করে বিয়ে টিয়ের কথা কানেই তুলবে না।

প্রতীক্ষার ধৈর্যে আপন অনুরাগকে লালন করে আসছে ইয়াসীন। বিগত তিনটি বছর প্রতিদিন নতুন নতুন কল্পনার রং ফেলে চলেছে প্রত্যাশিত সেই একটি দিনের স্বপ্নে। অবশেষে শুরু হয়েছে ম্যাট্রিক পাসের পরীক্ষাটা। করিম মিঞাও খুশি খুশি চোখের এক ঝলক হাসি ছড়ায়। তারপর বেরিয়ে যায় মিষ্টি কিনতে।

অনেকদিন পর আপিসে এসেছে মালু। দেখা সাক্ষাৎ, এ কামরা সে কামরা গল্প করেই কাটিয়ে দিল দিনটা। একেবারে শেষ ঘণ্টায় দু একটা ফাঁইলের উপর চোখ বুলিয়ে বাড়ি ফেরার জন্য উঠে দাঁড়াল ও, বেজে উঠল টেলিফোন।

রাবু বলছে : আমি যাচ্ছি তোর বাসায়, দরকারী কথা আছে তোর সাথে। শীগগির চলে আয়।

বাসায় এসে দেখল মালু, রাবু পৌঁছে গেছে, নতুন বাসার ঘরগুলো ঘুরে ঘুরে দেখছে। প্রশংসায় কলকলিয়ে তুলছে ওদের নীরব আঙ্গিনা। পাক ঘরে গিয়ে চেখে দেখছে নতুন বৌর রান্না।

মালুকে দেখে প্রশংসার তোড়টা যেন বেড়ে যায় রাবুর। বলে, ভারি লক্ষ্মী বৌ তোর সাত রাজার ভাগ্যি মালু, এমন বৌ পেয়েছিস, মাথায় তুলে রাখবি। বুঝলি? তারপর সোনাবরণ হাত দিয়ে রিহানার চিবুকটা তুলে ধরে আদর করে রাবু।

গল্প গুজবে সন্ধ্যা পেরিয়ে রাতটাও কিছু দূর গড়িয়ে যায়। তবু দরকারী কথাটায় আসে না রাবু।

এক সময় উঠল রাবু, যাবার আগে রিহানার হাতটা ধরে বলল : কাল রাতে আমার বাসায় তোমাদের দু জনের দাওয়াত রইল। আগে আগেই এসে পড়ো। গল্প করা যাবে। কেমন?

ওকে রিকশায় তুলে দিতে রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে এল মালু।

মালু, চাকরিটা আমি ছেড়ে দিলাম, রাস্তায় নেমে বলল রাবু।

হঠাৎ? কী ব্যাপার?

ব্যাপার দেশে যাচ্ছি। কালই যাচ্ছি।

কালই? কেন? কী এক উদ্বেগ মালুর কণ্ঠে।

আব্বা ফিরে এসেছেন বাড়িতে। এই শেষ বয়সে একটু সেবা যত্ন কী তাঁর প্রাপ্য নয়?

কী তার প্রাপ্য আর কী নয়, সে আমি জানি না। কিন্তু, তুমি কী শুধু তাঁর সেবার জন্যই দেশে চলেছ?

জবাব না দিয়ে রিকশায় চড়ে বসল রাবু। বলল, ও কথা বাদ দে। যে জন্য তোর কাছে আসা, মেজো ভাইকে একটা খবর দিতে পারবি? দুপল কী যেন ভাবল রাবু, বলল আবার, না খবর নয়, একেবারে সঙ্গে করে নিয়ে আসবি আমার বাসায়।

কেন, মেজো ভাই বাসায় নেই?

তা হলে কী আর তোর কাছে ছুটে আসতে হত? বেঘোরে পড়ে কোথায় কখন যে মরে থাকবে লোকটা? আল্লাহ জানে।

মালু কী ভুল শুনল? না, ভুল দেখল? কেমন ভেঙে ভেঙে গেল রাবুর কম্পিত কণ্ঠ। চোখের কোণে দুটো মুক্তোর বিন্দু চিক চিক করে ঝরে পড়ল অকস্মাৎ।

কোনো কিছু শুধাবার আগেই মালু দেখল, রাবুকে নিয়ে বেশ কিছু দূর এগিয়ে গেছে রিকশাটা।

নতুন রাস্তার বিরল আলোর মিটি মিটি ছায়ায় মালুর চোখের সুমুখে ভেসে উঠল আর এক ছবি। কানে এসে বাজল অনেক কথা। কলকাতার দাঙ্গা থেমে গেছে। মেয়েদের কলেজের সেই আশ্রয় শিবিরটা গুটানোর কাজে ব্যস্ত রাবু আর জাহেদ। গেইটেই ওদের সাথে দেখা। কোনো কথা নয় এখুনি পাকড়াও কর ওকে, বলল জাহেদ।

নিশ্চয়। এখুনি। বলল রাবু।

মালুকে একরকম লুফে নিয়েই ট্রামে চড়ে বসল ওরা।

কয়েকদিন আগে বেশ বড় ধরনের একটা সাংস্কৃতিক জলসা বসেছিল পার্ক সার্কাস ময়দানে। সেখানে প্রচুর হাততালি পেয়েছে মালু। সেটাকে উপলক্ষ করে আজ ওকে খাওয়াবে জাহেদ এবং রাবু।

শুনলাম তোর গান। ভালো লাগল আর বুকটা কী এক গর্বে ভরে গেল। ট্রামে বসে বলল রাবু।

উত্তর না দিয়ে অপলক চোখে রাবুকেই দেখছে মালু। সেই দাঙ্গাবিরোধী মিছিলগুলোর শেষে রাবুর মুখে যে আনন্দিত দীপ্তি দেখেছিল মালু সে দীপ্তি যেন আরও উজ্জ্বল আরও প্রখর হয়েছে। এখন জাহেদের সাথে রাবুও বজবজ আর গার্ডেনরীচের বস্তি এলাকায় ঘুরে বেড়ায়, মিটিং করে, বক্তৃতা দেয়। জাহেদের সব কাজের সঙ্গী ও। বুঝি সেই কর্মের আনন্দটাই আশ্চর্য এক সৌন্দর্যের ছটা হয়ে লেপে রযেছে রাবুর মুখে। আর রাবু যেন ফিরে পেয়েছে সেই চৌদ্দ বছর বয়সের হারিয়ে যাওয়া হাসিটা বাব্বা। এ্যাদ্দিনে সেই পুরনো হাসিটা ফিরে এল মুখে, বলল মালু।

তুই এ সবের কী বুঝিসরে? কপট ধমকে ওকে থামিয়ে দেয় রাবু। চৌরঙ্গীর কোনো আধা বিলেতী আধা দেশীয় রেস্তোরাঁয় একটা টেবিলে মালুর সঙ্গীত সাফল্যের উৎসব বসাল ওরা।

ওরা ফিরে গেল অতীতে, বাকুলিয়ায়, তালতলিতে। ওরা স্মরণ করল সেকান্দর মাস্টারকে, লেকু-কসিরকে। ফেলু মিঞাকেও। ওরা চলে এল বর্তমানে। অনিশ্চিত ভবিষ্যৎটাকেও চোখের সামনে যতটা সম্ভব স্পষ্ট করে তুলে ধরতে চাইল ওরা।

আর একদিন খেতে খেতে রাবুকে যে কথাটা বলেছিল আজ এক ফাঁকে জাহেদকেও সে কথাটাই বলল মালু। বলল, মেজো ভাই, এবার বিয়েটা করে ফেল।

দেশ জুড়ে স্বাধীনতার লড়াই। এ সময় বিয়ে? ক্ষেপেছিস তুই? জাহেদ উড়িয়ে দিতে চাইল মালুর আবদারটা।

হটবার পাত্র নয় মালু। মালু বলল, এটা কোনো যুক্তির কথা হল না, মেজো ভাই।

কেন?

তুমি কী বলতে চাও তোমার বন্ধু ওই অজিতদার চেয়ে বেশি কাজ কর তুমি? অজিতদার চেয়ে বেশি ত্যাগ তোমার? অজিতদা তো বিয়ে করেছে মালতিদিকে। তোমার চেয়ে স্বাধীনতার লড়াই কী কম করছেন তারা? একটা হাল্কা কথার উত্তরে এমন গুরুগম্ভীর কথা পাড়বে মালু, ভাবতে পারেনি জাহেদ। মুহূর্তের জন্য হকচকিয়ে গেল ও। তারপরই হেসে উঠল সশব্দে। হা আল্লা! কোথায় জাহেদ, কোথায় অজিতদা। কোথার মালতি দি আর কোথায় সৈয়দ রাবেয়া খাতুন। ছি। সত্যি বলছি মালু, তোমার মাথা খারাপ হয়েছে।

মাথা যে খারাপ হয়নি মালুর সেটা সবিস্তারে এবং সপ্রমাণে উপস্থিত করছিল মালু কিন্তু ততক্ষণে অন্য দিক থেকে এসে গেছে কঠিনতর প্রতিবাদ। রাবেয়া খাতুন কী কখনও মালতি দির সাথে তুলনা করেছিল নিজের? আহত, বুঝি বা অপমানিত কণ্ঠ রাবুর।

ওই দেখ আর একজন গাল ফুলিয়েছে। জোর করেই হাসল জাহেদ। বলল আবার, আরে আমি কী তুলনা করছিলাম? কথার পিঠে একটা কথা এসে পড়ল, এই তো।

মোটেই না। কথার পিঠে আসার মতো কথা এটা নয়।

পাশাপাশি যারা বাস করে, এক সাথে কাজ করে তাদের মাঝে শ্রেষ্ঠ এবং সাধারণ, উত্তম এবং অধমের তুলনা আসবে। না আসাটাই তো অস্বাভাবিক। মালতির সাথে তুলনাতে আপত্তি নয় রাবুর। রাবুর আপত্তি–যে তুলনা আমি কখনও করিনি, যেখানে আমার ক্ষুদ্রত্ব আর অকিঞ্চিৎকর অস্তিত্ব নিয়ে আমি নিজেই ব্রিত, জীবনটাকে কিছু মাত্র অর্থপূর্ণ করে তোলার জন্য আমার চেষ্টার অন্ত নেই সেখানে কেন তুমি বারবার খোঁচা দেবে? পানিতে টলটল করছে রাবুর চোখ জোড়া। এখুনি বুঝি কেঁদে ফেলবে রাবু।

দেখছিস মালু? মাথা শুধু তোরই খারাপ হয়নি, এই মহিলারও মাথা খারাপ হয়েছে। পরিহাসের স্বরে আবহাওয়াটাকে সহজ করতে চাইল জাহেদ। আমি পাগল, এ কথাই তো বলবে তুমি। কোনোদিন তো পারলে না আমাকে সম্মানের মর্যাদা দিতে। হিতোপদেশ, নীতি কথা, উপহাস, করুণা, ভালোবাসার নামে অনুকম্পা এ সবই তো পেয়ে আসছি ছোট বেলা থেকে। আর কেন মেজো ভাই... জাহেদ... আমি আর সহ্য করতে পারি না...কথার দমকে দমকে দ্রুততর রাবুর বুকের উঠানামা। মালুর মনে হয় বিশাল কোনো সমুদ্রের জলরাশি এখুনি আছড়ে পড়বে সে বুকের বাঁধ ভেঙে। কেমন করে, কোন কথা তুলে এই অপ্রীতিকর প্রসঙ্গটা চাপা দেবে ভেবে পায় না মালু।

থ মেরে গেছে জাহেদ। কোত্থেকে কোথায় এসে গেছে রাবু।

যেন মালুরই অনুচ্চারিত প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে এসে গেল একদল ছেলে মেয়ে, রাবু এবং জাহেদেরই বন্ধু। ওরা খেতে এসেছে। যে দম্পতিকে কেন্দ্র করে এত কথা সেই অজিত এবং মালতিও আছে দলের ভেতর। মালুদের টেবিলের পাশে এসেই বসল ওরা। তর্ক করতে করতেই ঢুকেছিল ওরা। টেবিলে এসে তর্কটা আরো তুমুল হল।

দেখে নিও নুরেমবার্গ ট্রায়ালে কিচ্ছু হবে না।

মানে? তুমি কী বলতে চাও লক্ষ কোটি নির্দোষ নর-নারীর রক্তে যাদের হাত রঞ্জিত সেই নাৎসী ঘাতকদের শাস্তি হবে না?

দু চারটে চাঁইকে লোক দেখানো শাস্তি দিলেও দিতে পারে কিন্তু বেশির ভাগই পার পেয়ে যাবে। দেখছ না ইংরেজ আর মার্কিনরা ইতিমধ্যেই জার্মানীর পশ্চিম অংশে ব্যবসা করতে লেগেছে, ওদের পিঠ চাপড়াতে শুরু করেছে?

অসম্ভব। মানুষের ইতিহাসে জঘন্যতম অপরাধে অপরাধী যে হিটলার তার পাপের দোসরগুলোকে সমুচিত শাস্তি দেবে না এমন বিচারক নেই পৃথিবীতে। পৃথিবী দেখেছে হিটলারের গ্যাস চ্যাম্বার অসউইজ, বুখেন ওয়ার্ল্ড, পাইকারী নরহত্যা, শিশু হত্যা। এ পাপ মানুষ কখনো ক্ষমা করবে না।

সিরাজ এ তো তোমারই মনের বাসনা। ব্রিটিশ সরকারের মনোভাবটা যে কী সে তো ভারতকে দিয়েই বুঝতে পারছ। যুদ্ধের সময় মানবতার বুলি খই ফুটিয়েছে চার্চিলের মুখে। আর এখন? সোজা বলে বসল, ভারতকে স্বাধীনতা দেয়া হবে না।

ইয়াল্টা চুক্তির কালি এখনো শুকোয়নি, কিন্তু ইতিমধ্যেই সে চুক্তি ভঙ্গ করতে লেগেছে ওরা।

না ভাই, স্বাধীনতার কথা যদি বল তবে আমি বলব এটা আমাদেরই মোহ। গোল টেবিলে বসে স্বাধীনতা পাওয়া এ আমি বিশ্বাস করি না।

জাহেদও যোগ দিয়েছে ওদের তর্কে।

ইয়াল্টা থেকে পটসড্যাম, জাঞ্জিবার থেকে জিব্রাল্টার, জেনী লী থেকে রুশ বীরাঙ্গনা তানিয়া, মেদিনীপুরের মাতঙ্গিনী হাজরা–ওদের তর্কালাপের পরিধি বেড়েই চলে।

মালু আর রাবু নীরব শ্রোতা। এক সময় উঠে পড়ল ওরা। জাহেদের দিকে একবার তাকাল। ইশারায় বোঝাল জাহেদ-তোমরা যাও, আমি এখানেই আছি।

বড় অন্যায় করলাম। অহেতুক কষ্ট দিলাম জাহেদের মনে। রাস্তায় পড়ে বলল রাবু।

আমি তো অবাক হচ্ছিলাম। অমন আনন্দিত পরিবেশে সহসা নিরানন্দকে ডাকলে কেন তুমি? বুঝি উত্তরের প্রত্যাশায় রাবুর মুখের দিকে তাকাল মালু।

রাবুর চোখে থমথমে অন্ধকার। রাবুর মুখে অরুদ কোনো বেদনার কান্না। মার নিজেরই ভ্রম হয় মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে ট্রামে ওর পাশে বসেছিল আনন্দের ঔজ্জ্বল্যে দীপ্তিময়ী যে মেয়ে সে বুঝি অন্য কেউ।

রাবু আপা, তোমার অনেক দুঃখ, মেজো ভাইয়ের অনেক কষ্ট। আমার একটুও ভালো লাগে না।

শত দুঃখেও মানুষ হাসে। বুঝি তেমনি হাসল রাবু। বলল, আমাদের দুঃখে তোর বুঝি ঘুম হয় না?

সত্যি ঘুম হয় না আমার বিশ্বাস কর রাবু আপা।

আবারও হাসল রাবু। বলল, তুই এখনও সেই বার বছরের খোকাটিই রয়ে গেছিস। হারে এখনো কী কথায় কথায় কেঁদে বুক ভাসাস তুই? মালু বুঝল সহজ হয়ে আসছে রাবু। নীরবে রাবুর কথাগুলোই শুনে গেল ও।

আসল কথা কী, জানিস? আমাদের একান্ত ব্যক্তিগত আর ছোট ছোট দুঃখ কষ্টগুলোকে অযথা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বড় করে দেখি আমরা। আর সত্যিকার বড়

বড় দুঃখ যা তোর আমার ব্যক্তিগত কষ্ট বা দুঃখ নয়, যা বিশাল মানব গোষ্ঠীরই দুঃখ সে সব হয় আমাদের স্পর্শ করে না, অথবা কিছুক্ষণের জন্য ব্যথিত হয়েও ভুলে যাই সহজে।

বুঝলাম না। বুঝবার আশায় রাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল মালু। আমার নিজের কথাটাই ধরা যাক। অল্প বয়সে, যখন আমার কোনো বুদ্ধি গজায়নি, বাবার পছন্দমতো বরের সাথে তিনি বিয়ে পড়িয়েছেন আমার। খুবই অন্যায়। কিন্তু এ রকম অন্যায় ঘটনা তো রোজই ঘটছে আমাদের দেশে। এর চেয়েও সহস্রগুণে কঠিন এবং নৃশংস পীড়নে ভুগছে আমাদের দেশের মেয়েরা। তাই না?

নিশ্চয়। একমত হয়ে ঘাড় নাড়ল মালু।

একটু আগে মুখে মুখে ঘুরছিল কয়েকটি নাম-মিউনিক, ডানকার্ক, লেনিনগ্রাড, প্যারি, বুশেনওয়াল্ড–এই এক একটি নামের পেছনে পৃথিবীর লক্ষ কোটি মানুষের কত ত্যাগ, কত যন্ত্রণা, কত দুঃখ। মানব জাতির এত বড় দুঃখের পাশাপাশি আমার এই ব্যক্তিগত দুঃখটা কী তুচ্ছ আর হাস্যকর নয়? গভীর আবেগে কম্পিত স্বর রাবুর। এক নিশ্বাসেই কথাগুলো বলেছিল রাবু। তারপর উদাস চোখে চেয়েছিল দূর পথের দিকে।

কলকাতায় রাবু এবং জাহেদের সাথে এটাই মালুর শেষ সাক্ষাৎ। এর কিছু দিন পর লন্ডন আর দিল্লী থেকে যুগপৎ এক ঘোষণা প্রচারিত হয়েছিল। সে ধাক্কায় ওরা সবাই চলে এসেছিল ঢাকায়।

ঢাকায় এসে ব্যক্তিগত প্রসঙ্গগুলো তোলেনি মালু। রাবুও না। বাড়ি ছেড়ে স্কুলের শিক্ষিকার চাকরি নিয়ে কেন আলাদা বাসা করেছে রাবু, সে প্রশ্নও শুধায়নি মালু। শুধায়নি শিক্ষিকার খুঁটিনাটি ব্যস্ততার জীবনে কোথায় ঠাঁই দিয়েছে মেজো ভাইকে?

কিন্তু, এ কী জীবন বেছে নিচ্ছে রাবু! প্রজাপতির মতো রঙিন পাখনা উড়িয়ে কতো মেয়েই তো এই নতুন রাজধানীতে এনে দিয়েছে বর্ণের শোভা! কই, ওরা তো, তোমার মতো নয়? ওদের হাসির চমকে বাতাস উত্তীর্ণ। ওদের চরণ ছোঁয়ায় মুখর শতাব্দীর ধূলো জমা এ শহরের পথ। এই শহরের নব ছন্দের গান ওদের কণ্ঠে। কই, ওরা তো তোমার মতো হাল্কা বাতাসের উড়ো পথটাকে দুঃখের কাঁটা ছড়িয়ে দুর্গম করে তোলেনি? দুর্নিবার ইচ্ছা জাগল মালুর, দৌড়ে গিয়ে প্রশ্নটা শুধিয়ে আসুক রাবুকে। দুকদম এগিয়ে আপন মনেই হেসে উঠল মালু। রিকশাটা হয়ত এতক্ষণে রাবুকে ওর বাসায় নামিয়ে দিয়ে ছুটছে অন্য কেরায়ার পেছনে।

৫২.

সকাল সকাল হাজিরা বইতে একটা সই মেরে বেরিয়ে পড়ল মালু।

জাহেদের কয়েকটা আড্ডার খবর জানত মালু। আর চিনত তার দু একজন বন্ধুকে। সে সব আড্ডায় গেল ও। সে সব বন্ধুদের কাছে খোঁজ নিল। তাদের মুখে শুনে আরও কত বাসায় পাত্তা লাগাল মালু। কিন্তু কোথাও পাওয়া গেল না জাহেদকে। কেউ বলল, এই তো সেদিন খেয়ে গেছে। কেউ বলল, গেছে চাটগাঁয়। কেউ বা বলল শ্রীহট্টে। নির্দিষ্ট সমাচার কারো কাছেই নেই।

পার্ক স্ট্রীটের বাড়িটা শান্তি নগরে কিছু জমি আর একটা দোতলা বাড়ির সাথে বদল করেছে সৈয়দরা। কোনো অর্থ হয় না সেখানে খোঁজ করার। তবু সেখানেও গেল মালু।

মালুর কপাল। সৈয়দ সাহেব আপিসে ছুটি নিয়ে বাড়িতেই অবস্থান করছেন, এটা জানার কথা নয় ওর। আর পড়বি তো পড়, সৈয়দ সাহেবের সামনেই পড়ে গেল মালু।

প্রশ্ন শুনে তেলে বেগুনে হলেন সৈয়দ সাহেব। ওই বদমাইশটার খোঁজ নিতে এসেছ বাড়িতে? বাড়িতে তো ভদ্রলোকেরা থাকে। সে কী ভদ্রলোক? সে তো ভেগাবন্ড, কুলি মজুর আর দুনিয়ার যত কমজাত কমবখত ছোট লোকদের সাথে সে। সেখানে খোঁজ নাও গিয়ে।

মালু মরিয়া। যেমন করে হোক জাহেদের খোঁজ তো ওকে পেতে হবে। ও শুধাল কিন্তু বাড়িতে কী মাঝে সাঝেও আসেন না তিনি? শেষ কখন এসেছিলেন?

বাড়ি আসবে? বাড়ি এলে ওর ঠ্যাং ভেঙে দেব না আমি? জান? ওই কমবখতটার জন্য আমার একটা প্রমোশন আটকে রয়েছে?

অধিক প্রশ্ন নিরর্থক। সিঁড়ি ধরে নেবেই যাচ্ছিল মালু। কিন্তু সিঁড়ির মাথায় ফুটফুটে একটি মেয়ে ওর ছোট্ট হাতের ইশারায় থামতে বলল মালুকে। কাছে এসে ফিসফিসিয়ে বলল, দাদী তোমাকে ডাকছে। সিঁড়ি ধরেই আবার উঠে আসছিল মালু। মেয়েটি বলল, উঁহু পেছন দিয়ে এসো। বাড়ির দক্ষিণ পাশে খিড়কি দরজা, পুরানো আমলের মতো। সেই দরজা দিয়ে মেয়েটা মালুকে নিয়ে গেল ভেতরে। মালু দেখল বারান্দায় বসে সৈয়দগিন্নী শাড়ির আঁচলে চোখ মুছছেন। পায়ে হাত দিয়ে সালাম করল মালু। মালুকে দেখেই অঝোর কান্নায় ভেঙে পড়লেন সৈয়দগিন্নী। কাঁদতে কাঁদতে সৈয়দগিন্নী যা বললেন তার সারার্থ–

মাস দুই আগের কথা। হঠাৎ রাতের বেলায় এসেছিল জাহেদ। তিরিশটা টাকা চেয়ে নিয়েছিল। রুই মাছ দিয়ে প্রচুর ভাত খেয়েছিল, মনে হচ্ছিল অনেক দিন খায়নি। রাত বাড়তেই চলে গেছিল। তারপর কিছুলোক ওর খোঁজ খবর করে গেছে। সৈয়দগিন্নীর সন্দেহ সরকারের যে দফতরের অন্যতম মাথা সৈয়দ সাহেব স্বয়ং, লোকগুলো সেই স্বরাষ্ট্র বিভাগেরই। অর্থাৎ সাদা পোশাক পুলিশ। ছেলের কোনো খোঁজ পান না সৈয়দগিন্নী। ছেলেকে একবারটি দেখেছেন সেই দুমাস আগে। কেঁদে কেঁদে বুক ভাসিয়ে চলেছেন সৈয়দগিন্নী। মালু যেন অবশ্যই তাকে খুঁজে বের করে অন্তত কিছুক্ষণের জন্য পাঠিয়ে দেয় মায়ের কাছে।

এই প্রসঙ্গে সৈয়দ সাহেব সম্পর্কেও নিজের অভিমতটা তিনি খোলাখুলি ব্যক্ত করলেন। বললেন, বুড়োর ভীমরতি ধরেছে। উঠতে বসতে ছেলের মুণ্ডপাত করে চলেছেন। সকাল বিকাল মুখে শুধু এক কথা-প্রমোশন প্রমোশন। প্রমোশন প্রমোশন করেই বুড়ো পাগল হবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই সৈয়দগিন্নীর।

সৈয়দগিন্নীকে সালাম করে বিদায় নিল মালু। বারান্দাটা পার হয়েই আবার মুখোমুখি পড়ল সৈয়দ সাহেবের। আপন মনেই আফসোস করে চলেছেন সৈয়দ সাহেব, ওই কমবখত্ কমজাতটার জন্যই তো! নইলে আমার দু বছরের জুনিয়ার সে উঠে যায় আমার উপরে?

বুঝি হঠাৎ চোখে পড়ে মালুকে। খেঁকিয়ে ওঠেন, এই ছোকরা! তুমি এখনো এ বাড়িতে? বের হও।

বেরিয়ে এল মালু। চলতে চলতে ভাবল মানুষের লোভের কী শেষ নেই? পাকিস্তানের বদৌলতে সৈয়দ সাহেব ধাই ধাই করে উপরে উঠছেন, আড়াই বছরে তিনটি পদোন্নতি পেয়েছেন। চতুর্থ পঞ্চম বা তার পরেও যদি উপরে উঠবার জায়গা থাকে সেখানে পৌঁছুবার সুযোগ তিনি হয়ত পাবেন একটু ধৈর্য ধরলেই। তবু কেন এত অতৃপ্তি, এত অধৈর্য সৈয়দ সাহেবের?

আরিফার ইঞ্জিনিয়র স্বামীর বাসাটা নীলক্ষেত। সেখানেও ঢুঁ মারল মালু। কিন্তু আরিফা বা তার স্বামী কাউকে পাওয়া গেল না। আরিফার ছেলেটা বলল, সিদ্ধেশ্বরীতে আমাদের নতুন বাড়ি উঠছে, আব্বা আম্মা দেখতে গেছেন।

মালুর মনে খটকা লাগল। এই নতুন বাড়িটা গত বছরই শেষ হয়েছিল এবং ভাড়াটে বসেছিল বলে শুনেছিল মালু। তাই শুধাল ও, এ বাড়িটা শেষ হয়েছিল গেল বছর?

ধ্যাৎ আপনি কিছু জানেন না। গেল বছর তো ধানমন্ডির বাড়ি উঠেছিল। এ বছর উঠছে সিদ্ধেশ্বরীতে, পাশাপাশি দুটো বাড়ি। মালুর অজ্ঞতায় ছেলেটার বুঝি কৃপা হল। কৃপা মিশিয়ে হাসল ও। বলল, জানেন? ঢাকা শহরে এই নিয়ে আমাদের চারটে বাড়ি হল। একটা আমার। একটা নন্তুর। বাকী দুটো দুবোনের। বিয়ের সময় যৌতুক হিসেবে লিখে দেওয়া হবে ওদের নামে। আব্বা বলেছেন, এরপর যত বাড়ি হবে সব আমার নামে। আমি বড় ছেলে কিনা, তাই।

একটা আস্ত বাড়ির মালিক সে, ভবিষ্যতে আরও অনেক বাড়ির মালিক হবে, এ খবরটা মালুকে জানাতে পেরে খুশি ছেলেটা। ডগমগিয়ে হাসছে ও। মালুও হাসল।

মালুর হাসিতে বুঝি উৎসাহ পেল ছেলেটা। বলে চলল, কিন্তু বাবাটা একেবারেই বোকা। তিনি তো ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করেছেন। সে-ই ক-বে। জানেন না, আর্কিটেকচার একটা আলাদা বিদ্যা। তেজগাঁর বাড়িটা বাবা নিজেই ডিজাইন করেছেন। ছিঃ। কী যে চেহারা বাড়ির! আমিও বলেছি ও বাড়ি আমি ছোঁব না।

কিন্তু সিদ্ধেশ্বরীর বাড়ি?

এক্সেলেন্ট। হবে না কেন? চীফ আর্কিটেক্ট মি. গ্যারি…

আমি আসি। উঠে দাঁড়াল মালু। আরও অনেক বাড়িতে ঢুঁ মারতে হবে। ওকে।

না সে কী! লাঞ্চের সময় হল। আব্বা-আম্মা তো এখুনি এসে পড়বেন। আপনি একটা কোল্ড ড্রিঙ্ক খাবেন?

মালুর সম্মতির জন্য অপেক্ষা না করে এক দৌড়ে ভেতরে চলে গেল ছেলেটা। নিজেই তশতরির উপর চড়িয়ে নিয়ে এল এক গ্লাস লেমন স্কোয়াশ।

ছেলেটা ঠিকই বলেছে। মালুর হাতের গ্লাসটা শেষ হবার আগেই এসে পড়ল আরিফা আর ওর স্বামী।

মালুর প্রশ্নটা শুনে কিছুক্ষণ নিঃশব্দে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল আরিফা। তারপর শুধাল, তুইও কী এসব করিস নাকি?

না।

খবরদার। এ সবের ধারে কাছেও যাবি না। জীবনটাই মাটি হয়ে যাবে।

মালু উপদেশ শুনতে আসেনি। এসেছে কাজে। কাজের কথাটাই আবার তুলল ও, আপনি কী জানেন কোথায় পাওয়া যাবে মেজো ভাইকে? দু-চার দশদিনের ভেতর এদিকে কী এসেছিল মেজো ভাই?

কী করে আসবে! যা ডরু তোর দুলা ভাই। কেবলই বলে, আমার চাকরি যাবে, সবাই উপোসে মরবে। শেষে আমিই বারণ করে দিয়েছি মেজো ভাইকে।

আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল আরিফা, থেমে গেল। স্যুট বদলিয়ে লুঙ্গি পরে স্বামীটি এসে বসেছে পাশে।

বাবুর্চি এসে খবর দিল খাবার দেয়া হয়েছে টেবিলে।

মালু উঠে দাঁড়াল।

আরিফা বসেই রইল। গালে হাত দিয়ে কী যেন ভাবছে ও। হঠাৎ শুধাল, রাবু কেমন আছে রে?

আশ্চর্য! আবাল্য এক সাথে যারা মানুষ হল তারা আজ পরস্পরের কোনো খোঁজ রাখে না।

জানি না, ইচ্ছে করেই মিথ্যা বলল মালু।

দেখা হলে মেজো ভাইকে বলিস এ সব যেন ছেড়ে দেয়। আমি জানতাম হিন্দুরাই স্বদেশি করে। মুসলমানরা কেন স্বদেশি করবে? মুসলমানদের এসব পোষায় না।

শেষ উপদেশটা দিয়ে আরিফা চলে গেল খাবার ঘরের দিকে। আরও অনেকগুলো বাড়ি এবং আপিসে হানা দিল মালু। সর্বত্র এক জবাব–জাহেদের খবর জানে না তারা। দু একজন, যাদের জাহেদের সাথে একসঙ্গে ঘুরতে দেখেছে। মালু, তারা জাহেদ নামের কাউকে চিনতেই অস্বীকার করল।

আশ্চর্য! একটা জ্যান্ত মানুষ এমন করে হারিয়ে যেতে পারে? তাও এই ছোট্ট শহরে? তবে কী বাইরে কোথাও আছে জাহেদ? কী করছে? কোথায় থাকছে?

হঠাৎ থানার কথা মনে পড়ল জাহেদের। পৃথিবীর যাবতীয় হারানো আর প্রাপ্তির খবর তাদের কাছে নাকি থাকে। সোজা পুলিশ সাহেবের কামরায় গিয়ে হাজির হল মালু।

মালুকে সাদরে অভ্যর্থনা জানালো পুলিশ সাহেব। মালুর নাম এবং গানের সাথে পরিচয় আছে তার।

সব শুনে কী এক রহস্য মিশিয়ে পুলিশ সাহেব হাসলেন, বললেন, আমরাও হন্যে হয়ে খুঁজছি জাহেদ সাহেবকে। কিন্তু তিনি আলেয়া–এই আছে তো এই নেই।

রহস্য অথবা হেঁয়ালি। মালু কিছুই বুঝল না। বোকার মতো চেয়ে রইল পুলিশ সাহেবের মুখের দিকে।

আচ্ছা আসুন একটা জরুরি কনফারেন্স রয়েছে আমার। আপনিও তো খুঁজেছেন তাঁকে, যদি কোনো খোঁজ পান তবে অনুগ্রহ করে জানাবেন আমাদের।

পুলিশ সাহেব চলে গেলেন কনফারেন্স কামরায়।

তবু হাল ছাড়ল না মালু। পত্রিকা অফিসগুলোতে যাতায়াত ছিল জাহেদের। সেখানে গেল মালু। কিন্তু সেখানেও এক জবাব। জাহেদের কোনো খবর জানে না তারা।

শুধু একটি আপিসে একটা লোক মালুকে টেনে নিয়ে গেল এক পাশে। কেমন ধমকের স্বরে বলল, আপনি কী ক্ষেপেছেন? এখানে খুঁজতে এসেছেন জাহেদ সাহেবকে? এই আপিসে তো গিস গিস করছে স্পাই। শীগগির চলে যান।

মালুকে এক রকম ঠেলে বের করে দিল লোকটা।

মালুর ইচ্ছে হল এই শহরের, এই দেশের সব কটি বাড়ি তন্ন তন্ন করে খুঁজবে ও। কোথায় যাবে জাহেদ? নিশ্চয় মরে যায়নি? মালুর বিয়ের দিন। আচমকা যেন পাতাল ফুঁড়ে উঠে এসেছিল জাহেদ। বগলে ছিল রিহানার জন্য একখানা শাড়ি আর মালুর জন্য গুটি কয় বই। আজাদী তো হল মেজো ভাই, এবার একটু বিশ্রাম নাও। এর ফাঁকে বলেছিল মালু।

বিশ্রাম কিরে? এখনই তো কাজের ধুম। মালুর কথায় কী এক মজা পেয়ে খুব করে হেসেছিল জাহেদ।

নতুন বৌ নিয়ে ব্যস্ত ছিল রাবু। বুঝি শুনে ফেলেছিল জাহেদের কথাটা। দূর থেকেই বলেছিল, কাকে কী বলছিস রে মালু? তোকে, আমাকে সবাইকে স্বর্গ রাজ্যে না নিয়ে তো ছাড়বে না মেজো ভাই। বিশ্রাম নেয়ার সময় কোথায় তার? রাবুর মুখে আনন্দিত কৌতুক, খুশির ছটা। কিন্তু ওর কথার মাঝে লুকানো থাকে না প্রচ্ছন্ন কোনো অভিমান, চাপা এক অনুযোগ। এই অভিমান, এই অনুযোগের যে কোনো প্রতিকার নেই রাবুর চেয়ে ভালো করে, এ কথাটা আর কে জানবে। তবু ওর অজ্ঞাতেই কতদিন এই অভিমান অনুযোগের আকারে ঝরে পড়েছে, মালু

তার সাক্ষী। আজ চেপে ধরল মালু। এই তো মুশকিল তোমাকে নিয়ে রাবু আপা। নিটোল খুশির মাঝেও একটা স্ক্রু ঢুকিয়ে বসে থাকবে।

এই চুপ। নওসা কথা বলে না।

মালু চুপ করে গেছিল। কিন্তু ততক্ষণে চেঁচিয়ে উঠেছিল জাহেদ, ঠিক বলেছিস মালু। ঠিক বলেছিস। আর একটু বলতো?

তারপর জাহেদের সাথে আর দেখা হয়নি মালুর।

ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হল মালু। কোথাও জাহেদের কোনো খবর না পেয়ে হতাশ হল। দুপুরটা পার করে দিয়ে জোহরের শেষ সময় ফিরে এল বাসায়। অপেক্ষা করে করে বোধ হয় চোখের পাতায় ক্লান্তি নেমেছে রিহানার। ঘুমিয়ে পড়েছে ও।

রিহানা ওঠ। খাবে না? জামা ছাড়তে ছাড়তে ডাকল মালু।

ঘুম জড়ান কণ্ঠে চাকরটাকে ডাকল রিহানা। মালুকে উদ্দেশ্য করে বলল, যাও খেয়ে নাও গিয়ে।

তুমি খাবে না? অসুখ করেনি তো? উদ্বেগ ঝরল মালুর কণ্ঠে। হাত রেখে দেখল রিহানার কপালটা। না, কিছু হয়নি।

বিবি সাহেব খেয়ে নিয়েছেন আপনার খাবার দিয়েছি। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বলে গেল চাকরটা।

আমি বাইরে খেয়ে এসেছি রে। তুই খেয়ে নে। ওকে জানান দিয়ে গুম হয়ে বসে রইল মালু। তারপর শুয়ে পড়ল রিহানার পাশে বিছানার খালি জায়গাটুকুতে।

এমন তো হয়নি কোনোদিন? না হয় ফিরতে একটু দেরি হয়েছে ওর! তাই বলে এমন নির্মম উদাসীনতায় ঘুমিয়ে থাকবে রিহানা? না খেয়েও অপেক্ষা করে থাকুক এমন কোনো অযৌক্তিক দাবী নেই মালুর। তবু খচ করে কাঁটার মতো কী যেন বিঁধে যায় মনের কোণায়।

টেবিল সাজিয়ে অপেক্ষা করত রিহানা। মালু এলেই দুজনে মিলে খেতে বসত। অভ্যস্ত হয়ে গেছিল মালু। অদ্ভুত এক মমতা লুকিয়ে থাকত ওই অপেক্ষাটুকুর মাঝে। আজ অপেক্ষা করে নেই রিহানা। ঘুরে ঘুরে ক্ষিধে পেয়েছিল মালুর। পেটটা চনচন করছিল। সেই খালি পেটটার মাঝে কী এক অসহ্য ভার জায়গা করে নিয়েছে এখন। কোথায় উবে গেছে ক্ষিধেটা। চোখ বুজে পড়ে রইল ও।

রিহানার সুরভিটা নাকে এসে লাগছে। আজ গন্ধরাজ জড়িয়ে নেই ওর চুলের গুচ্ছে। তবু গন্ধরাজের সুবাস মিশিয়ে ওর চুলে যে বিচিত্র সুরভি, তার আকর্ষণের এতটুকু কমতি নেই। যেন অজানতেই মালুর মুখটা ডুবে গেল রিহানার ছড়ানো চুলের অরণ্যে।

উঠে বসল মালু। ছোট খাট সুডোল দুটো হাত রিহানার, যেন মেলে রয়েছে। মধুর কোনো প্রত্যাশায়। আস্তে করে সে বাহুর কোমলতায় আপন মুখের স্পর্শ রাখল মালু।

আপন মনেই হেসে উঠল মালু। ঠুনকো একটা কারণে রিহানার উপর অমন মন ভার করার অর্থ হয় কিছু।

পাক ঘরে এসে চা করল মালু। জালের আলমিরা থেকে সকালের বানানো হালুয়া, কয়েকটি ফল আর বিস্কিট এনে সুন্দর করে সাজালো টেবিলটা। গ্লাসগুলো চাকরকে দিয়ে পরিষ্কার করে ধুইয়ে নিল। নিজ হাতে পানিটা মুছল, পরিপাটি করে সাজাল টেবিলটা। তারপর রিহানার কানের কাছে মুখটা এনে ডাকল রি, ঘুম ভাংলো? এসো, আমি চা করেছি তোমার জন্য।

কাত ফিরলো রিহানা।

ওর ঠোঁটে ঠোঁট জড়িয়ে আবার ডাকল মালু।

আহ্ মর। আদিখ্যেতা দেখে আর বাঁচিনে। উঠে বসল রিহানা। এক রকম হিড় হিড় করে ওকে টেনে এনে চায়ের টেবিলে বসিয়ে দিল মালু। এখনও ঘুম লেগে রয়েছে রিহানার চোখে। চোখের পাতাগুলো ডলে কচলে বুঝি ঘুমটাকে তাড়াল রিহানা। সোজা তাকাল মালুর দিকে। শুধাল, কী হয়েছে তোমার? ক্ষেপলে কেন?

না তো? ক্ষেপলাম কোথায়।

তুমি যদি ভাব খাবার সাজিয়ে হাতে পাখা নিয়ে, বউ তোমার অপেক্ষা করে থাকবে, তবে ভুল করছ।

আমি. ও রকম কিছু ভাবি না। রিহানার কথাটা শেষ হবার আগেই বলল মালু।

তোমার ইচ্ছে মতোই চলবে বউ, তেমন বউ বিয়ে করনি তুমি।

জানি।

চা-টা বিস্বাদ। বিস্কুটগুলো যেন লোহার ঢেলা, গলা দিয়ে গলতে চায় না কিছুতেই। নিঃশব্দে রিহানাকেই দেখছে মালু।

রিহানার মুখে বিরক্তি। রিহানার চোখে বিতৃষ্ণা।

তোমারই বা কী হল? অমন ক্ষেপেছ কেন? স্বাভাবিক স্বর মালুর।

উত্তর দিল না রিহানা। শুধু বিতৃষ্ণ দৃষ্টিতে একটি অবহেলা ছুঁড়ে মারল মালুর দিকে, টেনে নিল বিস্কুটের তসতরিটা। দাঁতের নিচে একটা বিস্কুট গুঁড়ো গুঁড়ো করে ঠেলে দিল গলার দিকে। এক নিশ্বাসে শেষ করল, পেয়ালার চা। তাকাল মালুর দিকে, যেন শুধাল, আরও কিছু বলার আছে তোমার?

এক রকম মরিয়া হয়েই বিস্বাদ চা-টা মুখের ভেতর ঢেলে নিল মালু, বলল তুমি তৈরি হও। আমি সে ফাঁকে গোসলটা সেরে নিই।

আমি যাচ্ছি না।

কেন?

ভালো লাগছে না। মাথা ধরেছে।

কিন্তু রাবু আপা যে নিজে এসে তোমায় দাওয়াত দিয়ে গেল।

দিলইবা।

না না রিহানা। দাওয়াতের কথা না হয় বাদ দাও। রাবু আপা চলে যাচ্ছে, তার সাথে একবার দেখা করব না আমরা? অনুনয়ের স্বর মালুর।

ভারি আমার বয়ে গেছে। অশ্রদ্ধায় ঠোঁট বাঁকায় রিহানা।

আসতে পারি? অনুমতির অপেক্ষা না করেই ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ে আহসান।

বসুন। সৌজন্যের খাতিরে একটু ঝুঁকে পাশের চেয়ারখানি দেখিয়ে দেয় মালু।

আরে সাহেব, এক বাড়িতে থেকেও আপনার দেখা পাওয়া দায় হয়ে পড়েছে দেখছি। স্বরটাকে দরাজ করে অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা করে আহসান।

চা ঢেলে পেয়ালাটি এহসানের দিকে এগিয়ে দেয় রিহানা।

আচ্ছা, আপনারা গল্প করুন। উঠে এল মালু।

মালু স্নান সারল। জামা কাপড় পরল। বার দুই ডাকল রিহানাকে।

শুনেও বুঝি সাড়া দিল না রিহানা।

পর্দাটা ঈষৎ সরিয়ে দেখল মালু, গল্প করছে ওরা। বৃথাই রিহানার দৃষ্টিটা আকর্ষণ করার চেষ্টা করলো ও।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে।

মালু রাস্তায় পড়ল।

ঘোরাঘুরিটাই সার হল তোর। কী আর করবি! আমার যেমন কপাল! ব্যর্থ অন্বেষণের খবরটা শুনে বলল রাবু।

সবই গোছানো সারা। শুধু সুটকেসটা বাকী।

খাটের উপর তাক করে রাখা শাড়ি ব্লাউজ তোয়ালে, নিত্যকার দরকারি জিনিস। একটা একটা করে এগিয়ে দেয় মালু।

দেখা হলে বলিস মেজো ভাইকে, ওর চোখের আলো আমার পথের সম্বল। ভরা সুটকেসের ডালাটা চাপতে চাপতে বলল রাবু।

কিছু বলে না মালু। নীরবে চেয়ে থাকে রাবুর ব্যস্ত হাতগুলোর দিকে। অনেকক্ষণ পর বলল মালু : রাবু আপা, তোমার কথাই ঠিক। মেজো ভাইদের জন্য কিছু লোককে সারা জীবন শুধু দুঃখই পেয়ে যেতে হয়।

শুধু দুঃখটাই দেখছিস? এর পেছনে যে লুকিয়ে আছে আনন্দ আর গৌরবের ফল্গুধারা, সেটা দেখছিস না? ক্লিক করে সুটকেসের তালাটা টিপে দিল রাবু।

রাবু আপা। আমার বিয়ের সময় মেজো ভাইয়ের সাথে দেখা হয়েছিল তোমার। সেই কী শেষ দেখা?

না। তারপর সে-ই দেখা করেছিল একদিন দশ মিনিটের জন্য। কথা হয়নি।

এর মাঝে কোনো চিঠিপত্র পাওনি মেজো ভাইয়ের?

দুটো চিঠি পেয়েছি তিন ছত্রের। ভালো থেকো, আমি ভালো। ব্যাস।

চাবির গোছাটা হাত ব্যাগে পুরে নিল রাবু। তারপর বইয়ের ট্রাঙ্কটার উপর সুটকেস রেখে তার উপর বসল রাবু।

আচ্ছা, রাবু আপা! তুমি কী শুধু দরবেশ চাচার সেবার উদ্দেশেই দেশে চললে? হঠাৎ শুধাল মালু।

তা, কেন, মানুষের মাঝে মেজো ভাইয়ের কাজ। সে কাজটা যদি আমারও হয়, আপত্তি আছে তোর?

একটুও না। রাবুর বলার ঢংটা দেখে ফিক করে হেসে দিল মালু

তালতলির মেয়েদের স্কুলটা বন্ধ হয়ে গেছে। সেই স্কুলটাকে আবার আমি চালু করব, আমাদের বাইর বাড়ির খালি দালানটায়।

আগের কথাটাকে বুঝি আরো খোলসা করে বলল রাবু।

মালুকে বিব্রত করল না রাবু। জিজ্ঞেস করল না, কেন আসেনি রিহানা।

হয়ত আঁচ করতে পেরেছে ও।

নিমন্ত্রণের খাবারগুলো ঢাকা রয়েছে টেবিলে।

সেদিকে তাকিয়ে বলল মালু, একটুও খেতে ইচ্ছে করছে না রাবু আপা।

খাবি না? তাহলে উঠিয়ে নিক খাবারগুলো? আমারও ক্ষিধে নেই। ঝি এসে উঠিয়ে নিল খাবারগুলো।

৫৩.

গার্ডের হুইসেলটা বেজে উঠল। সবুজ নিশানটা ঘন ঘন আন্দোলিত হল।

রাবু আপা। ক্ষমা করে দিও মেজো ভাইকে। ওর হয়ে আমিই মাফ চেয়ে নিলাম তোমার কাছে। কেমন ধরে এল মালুর গলাটা।

ছিঃ! ও কথা বলিসনে মালু। মানদণ্ডের মতো দাঁড়িয়ে আছে মেজো ভাই, তোর সামনে আমার সামনে সবার সামনে। সে তো বিশুদ্ধতার প্রতীক।

কেঁপে গেল ট্রেনের ইস্পাত দেহটা।

যেন চমকে চাইল মালু। বিজলীর শিখারা বুঝি চাক বেঁধেছে রাবুর চোখের তারায়। চিকচিক জোনাকির মতো জ্বলে উঠছে ওর চোখজোড়া।

কী এক জ্যোতির্ময়ীর ভাষায় কথা বলে যায় সে চোখ।

দীর্ঘদেহী অজগরের মতো ধীর মন্থর গতিতে এঁকে বেঁকে বেরিয়ে গেল ট্রেনটা।

দিনের মতো ফুটফুটে আলো চারিদিকে। অথচ কী এক তমিস্রার গহ্বরে যেন তলিয়ে যাচ্ছে মালু। কানে এসে বাজছে দ্রুত বিলীয়মান প্রতিধ্বনি, রেলের ইস্পাত পিঠে পিঠে ছড়িয়ে পড়া কী এক আর্তনাদ। মাথার উপরে তারা ভরা আকাশের অনন্ত বিস্তৃতির মাঝে কী যেন খুঁজল মালু।

বড় গরম প্ল্যাটফরম। রাস্তায় এসে বুকের বোতামগুলো খুলে দিল মালু। ভালো লাগল মালুর। নিশ্বাসের সাথে টেনে টেনে হাওয়া খেল। ফুসফুসটাকে ধুয়ে নিল। আর একটু চাঙ্গা হবার জন্য রাস্তায় দাঁড়িয়ে মাটির গেলাসে চা খেল।

বাসায় ফিরতে ফিরতে দেরি হয়ে গেল মালুর। মনে মনে লজ্জিত হল। গাড়ি ছেড়ে গেছে সেই দশটায় তারপর বারটা অবধি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছে, কোনো স্ত্রীর কাছেই এটা সন্তোষজনক কৈফিয়ত নয়। কিন্তু কৈফিয়ত তৈরির কষ্টটা করতে হল না ওকে, ঘরগুলো সব অন্ধকার। রিহানা নেই বাসায়।

কোনো সন্ধ্যায় তো একলা বাইরে যায়নি রিহানা? তা ছাড়া এত রাত অবধি কোথায়ই বা থাকবে ও।

উপরে সাহেবের সাথে বেরিয়েছেন বিবি সাহেব। মালুর প্রশ্নের জবাবে বলল ছেলেটা।

কখন রে?

আপনি বেরিয়ে যাবার কিছুক্ষণ পর। বলে, হাই তুলল ছেলেটা। কাঁচা ঘুমেই জেগে উঠেছে ও।

যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে মালু, ছাইয়ের মতো ফ্যাকাশে হয়ে এসেছে ওর মুখ। কী এক অবসাদ এসে টেনে নিচ্ছে স্নায়ুর শক্তিটা। আর কত কী উঁকি দিয়ে যাচ্ছে মনের পর্দা সরিয়ে।

ছিঃ একি ভাবছে ও। নিজেকে শাসায় মালু।

দুটো মন ওর। শিল্পী মন, দরদী উদার। স্বামী মন, রক্ষণশীল, অধিকার কাতর। সব মনই বুঝি এমনি। এমনি দ্বিখণ্ডিত। আর দুয়ের মাঝে সংঘাত চলেছে অবিরাম।

কী বিশ্রী ইঞ্জিন, এই ভক্স ওয়াগন। সারা গায়ে ঝাঁকুনি তোলা বিকট শব্দ। হিটলার বুঝি মরে গিয়েও তার মাথাটা রেখে গেছে ওই ইঞ্জিনের ভেতর। ভক ভক করে

হঠাৎ থেমে গেল ইঞ্জিনটা। তারপর টুক করে আলগা হল ঘরের ভেজান দরজাটা।

রিহানা এল। মালুকে দেখল কী দেখল না। বাথরুমে গিয়ে হাতে মুখে পানি ছিটিয়ে এল। দরজার ছিটকিনিটা এঁটে দিল। চুল ছাড়ল। রাতের প্রসাধন সারল। বসল খাটে। অকারণেই পা জোড়া ছুঁড়ে দিল সুমুখের দিকে। এক পাটি স্যান্ডেল বাথরুমের দরজায় ঠক করে শব্দ তুলে ছিটকে পড়ল অদূরে। তারপর শাড়ি আর ব্লাউজটা সিথানে রেখে শুয়ে পড়ল রিহানা।

শুয়েও চোখ বোজে না রিহানা। তেরছা চোখে চেয়ে থাকে মালুর দিকে। ড্রেসিং টেবিলটার পাশে মোড়ার উপর বসে আছে মালু। সেও যেন প্রাণপণে অস্বীকার করতে চাইছে রিহানার উপস্থিতিটা।

মালুর দৃষ্টিটা উদ্দেশ্যহীনভাবেই ঘুরে বেড়ায় এদিক ওদিক। ঘুরতে ঘুরতে আচমকা যেন ঠোক্কর খেল ওই তেরছা চোখের সাথে। তক্ষুণি সরে গেল অন্য দিকে।

শেষ শো সিনেমা দেখে এলাম। যেন দেয়ালকে উদ্দেশ্য করেই বলল রিহানা।

মাথা ধরার বাহানাটার প্রয়োজন ছিল কী?

আবার চুপচাপ।

এ এক অসহ্য নীরবতা। ঠাণ্ডা ছুরির মতো বসে যায় গায়ের মাংসে। ট্রেনে উঠে আফসোস করল রাবু আপা, যাবার আগে দেখা হল না তোমার সাথে।

আহ রাখতো তোমার রাবু আপার কথা, ছিলে যার চাকর তার বাড়িতে যাও দাওয়াত খেতে, লজ্জা করে না তোমার? আবার বউকেও সাথে নিয়ে যেতে চাও?

কী হল রিহানার? একী বলছে ও? ওর ঘৃণা ছিটানো মুখের দিকে নিরুত্তরে চেয়ে রইল মালু।

বাপ নেই। মা নেই, ঘর নেই, বাড়ি নেই। পরের বাড়িতে ফায়-ফরমাশ খেটে মানুষ। যাকে বিয়ে করেছ তার কাছে এই পরিচয়টা গোপন রেখেছিলে কেন, বলতে পার? রিহানার কণ্ঠ যেন বিষ ঢেলে চলেছে। চোখ ফিরিয়ে নিল মালু। ওই ঘৃণার মুখের দিকে চেয়ে থাকতে পারে না ও। সে-সব তো জানতে চাওনি তুমি! স্বরটাকে শান্ত আর সংযত রাখল মালু।

ও সেটাও আমার অপরাধ? চীট কোথাকার!

প্রচণ্ড এক ঝাঁকুনি খেয়ে গোটা ঘরটাই বুঝি কেঁপে গেল। সবই অস্পষ্ট সবই ঝাপসা মালুর চোখের সুমুখে। সংযমের সেই মহাশক্তিটার দিকে হাত বাড়াল মালু। সোজা হয়ে বসল।

কোত্থেকে, কী শুনেছে রিহানা। আর তারই ভিত্তিতে স্পষ্ট একটা অভিযোগ তৈরি করে নিয়েছে মালুর বিরুদ্ধে। বুঝি মোহ ভেঙেছে ওর। অনুতাপের জ্বালায় পুড়ছে ওর অন্তরটা। তাই মুক্তি খুঁজছে ও। সে কথাটা খোলসা করে কী বলতে পারে না ও? তা না করে এ কোন নর্দমার কাদা ঘাঁটছে রিহানা।

বাইরে মাঝ রাতটা গড়িয়ে গেছে। শিশিরের ভার নিয়ে চুপিসারে নেবে এসেছে শেষ রাত। ভেতরে অসহ্য গরম, গুমোট নীরবতা।

পাখার গতিটা বাড়িয়ে দিল মালু।

বাতিটা ওভাবে জ্বালিয়ে রাখলে আর এক জনের ঘুমের ব্যাঘাত হয়।

দেয়ালের দিকে মুখ করে বলল রিহানা।

উঠে এসে সুইচটা টিপে দিল মালু।

এক রাশ অন্ধকার দৌড়ে এসে ঢেকে দিল ওদের নগ্নতা। সেই ভালো। আলোর চোখের নিচে জিবের পর্দা ছিঁড়ে বেআব্রু হতে রুচিতে বাধছে মালুর। বিছানায় এসে বসল মালু। তারপর যে সন্দেহটা একমাত্র অন্ধকারেই উচ্চারণ করা যায় তাই ব্যক্ত করল : রিহানা ভালোবাসাটা তা হলে মোহই ছিল? সে মোহ ভেঙে গেছে তোমার? মুক্তি যদি চাও সে পথে তো অন্তরায় নাই কোনো?

আহ্, বকবকানি রেখে শুয়ে পড়তো! ঘুম পাচ্ছে আমার। ঝাঁঝ উড়িয়ে পাশ ফিরল রিহানা।

সঙ্গে সঙ্গেই বুঝি ঘুমিয়ে পড়ল রিহানা। নিশ্বাসের শব্দটা ভারি হয়ে আসছে ওর। একটু নাকও ডাকছে যেন।

পা তুলে খাটের মাথায় হেলান দিয়ে বসল মালু।

বাইরে শিশির ভারি বাতাসের দোল খেয়ে দুলছে পাম গাছের মাথাটা। পাম পাতার মায়া ছেড়ে টপ টপ শিশির ফোঁটা ঝরে পড়ছে মাটিতে, সে শব্দে ক্ষণে ক্ষণে যেন চমকে উঠছে মালু।

শেষ রাতের বিশীর্ণ চাঁদটা চুপি দিয়ে যায় জানালার ফাঁকে। এক চিলতে ম্লান জ্যোৎস্না নিথর অবশতায় শুয়ে রয়েছে রিহানার খোলা বুকে। প্রকৃতির মতোই। নিরাবরণ শুভ্রতায় উদ্ধত রিহানার উদলা বুক।

আশ্চর্য। হঠাৎ বিস্ফোরণের তোলপাড় তুলে এখন কেমন অঘোরে ঘুমুচ্ছে রিহানা। আর কী ঠাণ্ডা ওর গাটা। ওর দিকে আর একটু সরে এল মালু।

আর একটু নিবিড়তায়, আর একটু ঘন হয়ে স্পর্শ করা যায় না রিহানাকে? রক্তে আদিমতার স্বাদ তুলে, দেহে আত্মায় লীন হয়ে ঠিক আগের কোনো রাত্রির মতো, চমৎকার একটি অনুভূতিকে রাঙিয়ে তোলা যায় না?

না।

কঠিন একটি ধাক্কা খেয়েই যেন ফিরে এল মালুর হাতখানি। গানের রাজ্যে সুরের পাখায় ভর করে উড়ে এসেছিল যে মেয়ে রিহানা, বুঝি এক রাতেই সরে গেছে অনেক দূরে। সেখানে গান নেই। প্রেম নেই।

আর একবার, আর একবার ওকে স্পর্শ করতে চাইল মালু। চাইল বুকের উষ্ণ তাপে, দুবাহুর নির্মম পেষণে ওকে ছিন্নভিন্ন করে দিতে। আশ্চর্য। মালু পারল না। মালুর হাত সরল না। আকর্ষণের বুঝি মৃত্যু হয়েছে। ম্লান জ্যোৎস্নাটা, রিহানার খোলা বুকের আশ্রয় ছেড়ে, আস্তে আস্তে চলে গেল ঘরের বাইরে। ফর্সা হয়ে উঠছে পূর্বের আকাশটা। দূরে কোথায় কিচির মিচির করে গেল ভোরের পাখি। হাত বাড়িয়ে তেপয় থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা তুলে নিল মালু। একটা সিগারেট ধরিয়ে সুমুখের ভাবনাগুলোকে যেন ছাই করে নিতে চাইল ও।

৫৪.

স্বচ্ছ নীলিমার নিচে আদিগন্ত সবুজের বিস্তার। চোখ জুড়ায়, মন ভোলায়। দোয়েল কোয়েলের কূজনে মায়া মুখর জীবন। এ দেশের গ্রাম বলতে এমন একটি ছবিই তো আমরা ভাসিয়ে তুলি চোখের সুমুখে। পুস্তকের পাতায় এখনও আঁকা রয়েছে এমনি এক বিকৃত চিত্র।

যাকে বলি পল্লী সুর, লোক গীতিকার মিষ্টি ডাক, সেখানেও এমনি শান্ত স্নিগ্ধ কল্পনা। সে সুর কখনো বিরাগী, কখনো ললিত মূর্ছনায় নিবিড় কখনো বা একতারার একঘেয়েমিতে মন্দ মধুর, মিষ্টি। সে সুর, সে ছন্দ থেকেই তো মালুর জন্ম। তারই প্রকাশ কণ্ঠে। তবু কী এক জিজ্ঞাসা অস্থির করে তুলেছে ওকে। বার বার মনে হয়েছে ওর, এ শুধু গলিত চর্বণ–আপনার শিল্পীদীনতাকে ঢেকে রাখবার

এক করুণ প্রয়াস। এ যেন সেই ফেলু মিঞার মতো শুধু অতীতকে, লুপ্ত গৌরবকে সম্বল করে বাঁচার চেষ্টা। দুনিয়ার সুমুখে নিজেকে হাস্যাস্পদ করে তোলা।

ছোট বেলার বাকুলিয়া তালতলি। নৌকা করে গায়ের পর গা ঘুরে বেড়ান, গনি বয়াতির দল নিয়ে। তার পর বিচিত্র সেই মহানগরীর আজব জীবন তর তর করে বয়ে যাওয়া কোনো শান্ত ধারা নয়, এ এক বিচিত্র সংঘাত-ক্ষুব্ধ জীবন। এ জীবনটাই যেন আজ তার সমস্ত দাবি নিয়ে উঠে এসেছে মালুর সুমুখে। মালুর কণ্ঠে সে চায় প্রকাশ।

বুঝি তাই ললিত রাগিণীতে রুদ্র ভৈরবীর ঝংকার ঢালল মালু। মিষ্টি একতারায় তুলল ঝড়ের বোল। শীর্ণ স্রোতের মন্দ ছন্দে হেলে দুলে চলে না। এ সুর। এ যেন পাহাড়ী ঝর্না, অজস্র ধারার উদ্দাম বেগে দুকুল ভাসিয়ে তার তৃপ্তি।

আর কী আশ্চর্য! মালুর হাত গেছে খুলে। ছোট বেলায় মুখে মুখে ছড়া কেটেছে, গান বানিয়েছে মালু। কিন্তু সে ছড়া বা গানগুলোকেই লিখে ফেলা যায় কালির অক্ষরে, এ কথা ভাবেনি মালু। এমন কোনো ইচ্ছেও কোনো দিন জাগেনি ওর মনে। কিন্তু আজ যখন ঝড়ো হাওয়ার মাতম জেগেছে মনে তখন সব কিছু যেমন সুর হয়ে বাজতে চায় তেমনি কথা হয়ে ফুটতে চায়।

মালু গান লেখে কাটে। আবার লেখে। আবার কাটে।

মালু জানে না ওর মনের ঝড় ফুটে উঠবে কোন অক্ষরের অবয়বে। মালু জানে না ওর ভক্ত শ্রোতারা কেমন ভাবে গ্রহণ করবে ওর নতুন সুর। দ্বিধা সন্দেহ মালুর নিজের মনেও।

কিছুদিন আগে এক জলসায় ওর এই নতুন গান নতুন সুরে গেয়েছিল মালু। রিহানা তখন রিহানা ছিল না, ছিল কথা না-কওয়া নীরব দৃষ্টির মেয়ে। সেদিন রিহানার বিস্ফারিত চোখে মালু দেখেছিল অজানার আতঙ্ক। শ্রোতারা ছিল স্তব্ধ নির্বাক।

হয়ত ওরা বোঝেনি। হয়ত ভালোই লাগেনি ওদের। শুধু উদ্যোক্তাদের ভেতর একজন বলছিল পেছন থেকে, না এটা জমল না। বিরোধিতার পরোয়া করে না মালু, করবেও না। শুধু...শুধু ও যদি বুঝতো, স্পষ্ট করে বুঝতো, কোন্ তারে, কোন্ যন্ত্রে ও প্রকাশ করবে এই নতুন সুর। নেকাব চিকের আড়ালে রূপসীর হাতছানি, পূর্ণরূপ যে তার এখনো অনুঘটিত মালুর দৃষ্টির সুমুখে।

অবসর ছিনিয়ে নিয়ে গলা সাধতে বসে মালু। নিজের কথাটা ব্যক্ত হবে নিজেরই সুরে সেও যে এত বড় দুর্ঘটনা, তা কী জানত মালু? পরীক্ষা নিরীক্ষায় শ্রান্তি নেই ওর।

সুর তান লয়, সবই মিলল। কিন্তু কথায় রয়ে গেল কী এক জড়িমা, কী এক বেসুর। তারপর হয়ত কথার ব্যঞ্জনায় সুর গেল বদলে। উল্টিয়ে পাল্টিয়ে সবটাই আবার নতুন করে ধরতে হয় মালুকে। মনের কথাটাকে সাজাতে হয় নতুন কোনো ছন্দে। যে ছন্দে সুর তাল মিশ খেয়ে সৃষ্টি হয় ঐক্য, ঐক্যের ঝংকার। কথায় আর সুরে, অনুভূতি আর ধ্বনিতে এই সাম্য, এই ঐক্যই বুঝি সকল সঙ্গীতের উৎস।

মালু খোঁজে সংঘাত-ক্ষুব্ধ জীবনে সেই ঐক্যের সুরকে। নিঃশব্দে সুমুখে এসে বসে রিহানা। ওর মখমল চোখের নরম আলোতে কত আশ্বাস, কত ভরসা। গা। আর চুল থেকে ও ছড়িয়ে দেয় সেই গন্ধরাজ মিশেল সুরভি। সুরলোকে হারিয়ে গিয়েও যেন জেগে থাকে মালু শুধু ওই অনন্যা চোখের আলোটুকুর জন্য, সুধার মতো ওই সুরভিটুকুর জন্য। রিহানার উপস্থিতি আরাধনার সামান্য ফাঁকিটুকুও যেন ভরাট করে দেয়। সুরের অমিল আর অনৈক্যের মাঝে এনে দেয় সুন্দর এক ঐক্যের সংগতি। অবাক হয়ে মালু ভেবেছে কেমন করে এক হয়ে গেছে ওর গান আর ওর প্রেম।

আজ এল না রিহানা।

কয়েকদিন ধরেই গানের সময় কাছে এসে বসে না ও। গান বুঝি আর ভালো লাগে না ওর। বিরক্তি ধরে গেছে গানে।

তাই বলে শূন্য থাকে না সুরের পৃথিবীটা। চারিদিকে সুরের বৃত্ত রচনা করে তারই মাঝে ডুবে যায় মালু। যতক্ষণ ঘরে থাকে এমনি এক নিরাপত্তার ব্যূহ তৈরি করে আপনাকে রক্ষা করে চলে মালু।

কিন্তু রিহানা বুঝি ধরে ফেলেছে মালুর ফাঁকিটা। ছোট ছোট ঢিল ছুঁড়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয় ওর নাজুক ব্যূহের দুর্বল প্রতিরোধটা। প্রথম ঢিল : ধোপার হিসেবটা একটু মিলিয়ে দেখতো। ব্যাটা এন্তার ঠকিয়ে চলেছে। সাথে সাথে হিসেবের খাতাটাও মালুর দিকে ছুঁড়ে দেয় রিহানা। খাতাটা এক পাশে সরিয়ে রেখে বেহালার তারে ছড় টানে মালু। রিহানা চলে যায় পাক ঘরের দিকে। নাশতার তদারকটা সেরে এসে ছুঁড়ে দেয় দ্বিতীয় ঢিল : আর পারি না। কত দিন ধরে বলছি ভালো একটা বাবুর্চি দেখ, এই ছোকরাকে বিদায় দাও। না শোনে কথা। না করে কাম, আলসের হাঁড়ি।

বেহালাটা ফেলে হারমোনিয়ামটা টেনে নেয় মালু।

তৃতীয় ঢিল : এশিয়া ফার্নিচার স্রেফ জুচ্চোরি করেছে। সদ্য কেনা চেয়ার, এখনি বেঁকে গেছে হাতল। ব্যাটাদের আজই একটা খবর দিও মনে করে। চুলটাকে পিঠের উপর ছড়িয়ে দিয়ে রিহানা চলে যায় স্নান করতে। আজ যেন যেতে না যেতেই সারা হয়ে যায় স্নানটা।

চতুর্থ ঢিল : এ মাসে বাজারের টাকা কম দিয়েছিলে, খেয়াল আছে? আজ টাকা লাগবে।

ইশারায় আলনায় ঝোলানো পাঞ্জাবীটা দেখিয়ে দিয়ে নিস্তার পেতে চায় মালু। কিন্তু, তারটা যে ছিঁড়ে গেল কেটে গেল তাল। সুর উঠবে কেমন করে?

টাকার কথায় আরো কথা মনে পড়ে গেল মালুর। ছেড়ে দিল হারমোনিয়ামের হাওয়াটা। রিডের ওপর তুলে দিল ঢাকনাটা। তারপর শুধাল : আচ্ছা, রাবু আপার টাকাগুলো কী তোমার কাছে রেখেছিলাম?

সে তো খরচ হয়ে গেছে। তুমিই তো খরচ করলে।

আমি খরচ করেছি? চকিতে যেন অবিশ্বাস দৌড়ে গেল মালুর চোখে।

নিশ্চয় আমি চুরি করিনি? অথবা গোপনে পাচার করিনি বাপের বাড়ি? গানের গলা না থাক বাপের আমার টাকার অভাব নেই।

আহা, তাই কী বললাম আমি! মনে পড়ছিল না কী না…

তাই, বৌর উপর একটু সন্দেহ হল মাত্র। বেশি কিছু না! জিবটা যেন বিদ্রূপে নেচে যায় রিহানার।

যেন স্থূল কথার ভোঁতা দা। সামান্য একটু তীক্ষ্ণতাও নেই। সেই ভোঁতা দার নির্দয় আঘাতে সুমুখের মানুষটাকে বুঝি কেটে ছিঁড়ে একেবারে নস্যাৎ করে দিতে চায় রিহানা।

ভাবনায় পড়ে যায় মালু।

দুটিও নয়, চারটিও নয়। পাঁচশো টাকা!

টাকাগুলো রাবুর। বিয়ের পর সেই খরচার মওসুম। টাকাগুলো মালুর হাতে দিয়ে বলেছিল রাবু : আমার পাশ বইটা জমা পড়ে আছে ব্যাংকে। এত টাকা সঙ্গে

রাখতে চাই না। তোর কাছেই রাখ। দরকার পড়লে খরচ করিস।

এত কথার প্রয়োজন ছিল না। ওকে সাহায্য করতে চায় রাবু; নিঃশব্দ কৃতজ্ঞতায় গ্রহণ করেছিল মালু। ফিরিয়ে দেবার কথাটা এতদিনে মনে হয়নি মালুর। কিন্তু দেশে গেরামে কত বিপদ আপদ! দরকারের সময় কোথায় হাত পাতবে রাবু!

মালুর মনে পড়ল, বিয়ের দুদিন পরেই খরচা টরচা গিয়েও যে হাজার দুই টাকা ছিল হাতে, সেটা দিয়ে রিহানার নামে একটা সেভিংস একাউন্ট খুলেছিল।

রিহানা, তোমার সেভিংস একাউন্টে কত টাকা আছে? নরম করেই শুধাল মালু।

সেভিংস একাউন্ট যেন শব্দ দুটো জীবনে এই প্রথম শুনছে রিহানা। তারপর হঠাৎ মনে পড়ে গেছে তেমনি এক ঢংয়ে ভ্রু কুঁচকে বলল : ও, হ্যাঁ। গোটা পনের মানে একাউন্টটা খোলা রাখার মতো টাকা রয়েছে বোধ হয়।

তা হলে? রাবু আপার টাকাটা শুধবো কোত্থেকে? কী এক অসহায়তায় যেন নিজেকেই শুধাল মালু।

তা হলে আমি একটা চাকরি নিই? নতুবা বাপের বাড়ি থেকে চেয়ে আনি? মালুর গালে ঠাস করে যেন দুটো চড় বসিয়ে দিল রিহানা।

ওহ্ রিহানা। তুমি অসহ্য, কেন বারবার তোমার বাপের খোটা দিচ্ছ। টাকা আছে তার অঢেল, সে আমি জানি। আর আবগারী কর্তারা কেমন করে টাকা বানায় সেও তো কারো অজানা নয়?

ও আমি অসহ্য? প্রথম উক্তিটাকেই তুলে নেয় রিহানা। কী এক হিংস্রতার তলোয়ার হয়ে চেয়ে থাকে মালুর দিকে।

মখমলের মতো নরম যে চোখ, যে চোখ ছড়িয়ে দিত স্নিগ্ধ আলোর দ্যুতি, এমন ভয়ংকর আর বীভৎস হতে পারে সে চোখের দৃষ্টিটা?

কোথাও যেন একটু আশ্রয় চাইল মালু। হাত বাড়াল আপন অন্তরের স্থৈর্য আর আত্মসংবরণের সেই শক্তিটির দিকে। নির্বাক হল। নিঃশব্দে বেরিয়ে এল সদর রাস্তায়।

ইয়াসীন, কিছু টাকা ধার দিতে পার? এ্যাসিস্ট্যান্টের কাছে অবলীলায়, হাত পাতল মালু।

মালেক সাহেবকে বরাবর টাকা ধার দিতেই দেখেছে ইয়াসীন, চাইতে দেখেনি। তাই বিস্ময়ের সুঁচ হয়ে যেন বাতাসের সাথেই গেঁথে রইল ও। তারপর গলা নামিয়ে শুধাল, কত লাগবে। এই ধর, পাঁচ শো।

পাঁ-চ শো?

এক আধ শো কম হলেও চলে যাবে। আশার আলো দেখে চাহিদাটা একটু নাবিয়ে নিল মালু।

তিন শো দিতে পারব। এখুনি চাই?

না। কাল পেলেও অসুবিধে হবে না।

ঠিক মাথার উপরকার এই সায়েবটির কাছে থেকে প্রশ্রয় আর স্নেহ পেতেই অভ্যস্ত ইয়াসীন। কিন্তু সেও যে দিতে পারে, খুশি করতে পারে সেই মানুষটিকে যে কখনো হাত পাতে না কারু কাছে, এটা বুঝি ইয়াসীনের জীবনে একটা অভাবনীয় আনন্দ অভিজ্ঞতা। খুশি হয়ে ওঠে ইয়াসীন। কিন্তু, তুমি যে দিচ্ছ, সামনে তো তোমার খরচার সময়। হঠাৎ শুধাল মালু।

আরো ভালো হল। জমা রইল আপনার কাছে। ঠিক প্রয়োজনের সময়টিতে চেয়ে নেব?

আর একজনও এমনি ধরনের কথা বলেই সাহায্য করেছিল মালুকে। কিন্তু প্রয়োজনের সময় তার কখনো আসবে না, কখনো ফেরত চাইবে না ও। এটা ভালো করেই জানে মালু।

তাই বলে মালুর কর্তব্যে বিচ্যুতি ঘটবে কেন।

সকাল থেকে যে ভারটা চেপেছিল বুকের উপর, ইয়াসীন যেন সে ভারটা নামিয়ে অনেক হাল্কা করে দিল মালুকে। তারিখ ঠিক করলাম। বলেই যেন টেবিলটার সাথে মিশে গেল ইয়াসীন।

তাই নাকি? কবে? চেয়ার ছেড়ে ওর দিকে এগিয়ে এল মালু। পয়লা আশ্বিন। টেবিল থেকে মুখ না তুলেই বলল ইয়াসীন। আশ্বিনের সোনা ঝরা লগ্ন? বাহ্, চমৎকার দিন তো? উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে মালু।

কিন্তু? ইতস্তত ইয়াসীন।

কিন্তু কী, ইয়াসীন?

ঘর যে এখনো পেলাম না। বৌকে তো আর মেসে রাখা যায় না।

সত্যি তো, বৌ কী আর মেসে থাকতে পারে? অনেক দিন পর গলা ছেড়ে হাসল মালু। হাসি থামিয়ে যেন কৈফিয়ত চেয়ে বসল, বাসা পাচ্ছ না, এ্যাদ্দিন বলনি কেন।

এ আর বলবার মতো কথা কি; পকেটে টাকা নিয়ে ঢাকায় যত অলিগলি চষে বেড়াচ্ছি। কিন্তু ঘর কোথায়; ঘর থাকলে তো লোকে ভাড়া দেবে; ঘর না পাওয়ার পক্ষেই যেন একটা যুক্তি খাড়া করতে চাইছে ইয়াসীন।

টেবিলের ড্রয়ার থেকে একটা চাবি বের করল মালু। চাবিটা পকেটে ছেড়ে দিয়ে বলল, হয়েছে ওঠ এবার।

রিক্সায় চড়ে বসল ওরা।

ওর একটা চাকরিও হয়ে গেছে। মিউনিসিপ্যাল স্কুলে। শিক্ষিকা। বলল ইয়াসীন।

তবে তো সোনায় সোহাগা। পরীক্ষার ফল না বেরুতেই চাকরি; ইয়াসীনের পিঠে একটা খুশির থাপ্পড় বসিয়ে দিল মালু।

ফল বেরুতে এখনো হপ্তা দুই দেরি। তবে প্রাইভেটলি জেনে নিয়েছি আমি। ও পাস করেছে। সেকেন্ড ডিভিশনে।

এ্যাঁ, তুমি কী রকম লোক হে। এতগুলো ভালো খবর পেটের ভেতর লুকিয়ে রেখেছ? এখন বুঝছি কেমন করে পয়লা আশ্বিন এত জলদি এসে গেল। সত্যি যেন অন্যায় হয়েছে তেমনি করে মুখ নাবিয়ে হাসে ইয়াসীন।

বাসাটা পেয়ে মহা খুশি ইয়াসীন। এটা ওর কল্পনার অতীত ছিল। দোতলার খোলামেলা ঘর। বিজলী বাতি, কলের পানি, পাক ঘর। তার উপর রীতিমতো সস্তা ভাড়া। আজকের এই স্বার্থপর ঢাকায় কে কার জন্য এতটা করে। ঝেড়ে মুছে সাফ করে রাখ, বলল মালু। চাবিটা গুঁজে দিল ইয়াসীনের হাতে। আপনি বাসাটা রেখে দিয়েছিলেন কেন? সিঁড়ি দিয়ে নাবতে নাবতে শুধাল ইয়াসীন।

যদি কখনো কাজে লাগে। এই তো কেমন চমৎকার কাজে লেগে গেল? মালু হাসল।

ইয়াসীনও হাসল। ওর কাছে বাসাটা না চাইতে পাওয়া আকাশের চাঁদ।

জান ইয়াসীন? তোমাদের এই প্রতীক্ষাটি ভারী সুন্দর। আমার খুব ভালো লাগে তোমাদের কথা ভাবতে। হঠাৎ গলাটাকে কী এক আবেগে কোমল করে বলল মালু।

প্রসঙ্গটা এলেই লজ্জায় রাঙিয়ে ওঠে ইয়াসীন। মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে দোকানের সাইনবোর্ডগুলোর উপর মন দিল ও। সত্যি বুঝি ভালো লাগে মালুর। নির্বাচিতাকে, স্বপ্নের রাণীকে সচ্ছলতার প্রশস্ত অঙ্গনে বরণ করে নেবে বলে মাসের পর মাস টাকা জমিয়ে চলেছে ইয়াসীন–সেই কবে থেকে। আর যে স্বয়ম্ভর মালা হাতে দিন গুনে চলেছে, সেও আসতে চায় না নিরাবরণ শূন্য হাতে। বন্ধনের সাথে সাথে। আশ্বাসও দিতে চায়। দিতে চায় অর্ধেক রাজত্ব। তাই পরম সহিষ্ণুতায় তৈরি করেছে নিজেকে, নিজের আয়ের পথটা নিশ্চিত করেছে। শুধু সুধাটুকু বুঝি নিতে চায় না, সে মেয়ে। যা ভার, যা দায় তাও ভাগ করে নেবে আধাআধি। বিঘ্নমুক্ত হোক, সার্থক হোক ওদের আশ্বিনের লগ্ন। মনে মনে কামনা করল মালু।

আজ তুমি আমার সাথে খাবে।

একটা রেস্টুরেন্টের সামনে রিকশা থেকে নেবে পড়ল ওরা।

পদে পদে আজ অপ্রস্তুত ইয়াসীন। ওর ঠিক মাথার উপরের কর্তাটি, ফাইলের ভেতর আর গানের চিন্তায় যে ডুবে থাকে অষ্টপ্রহর, সে মানুষটি আজ কেমন গা ছেড়ে দিয়েছে।

দুপুরটা আর এই অপরাহ্নটা আজ এত ভালো লাগছে কেন মালুর? যা পাওয়া গেল না নিজের জীবনে সেটাই স্নেহাস্পদ কারো জীবনে সার্থক হতে দেখলে এমনি ভালো লাগে বুঝি। অথবা এ-এক ধরনের ঈর্ষা, যে ঈর্ষাটাকে ভালো লাগায় রূপান্তরিত করেছে মালু।

খেতে খেতেই মনে পড়ল মালুর, খাবার সাজিয়ে রিহানা আর অপেক্ষা করেনা ওর জন্য।

অকারণেই ইয়াসীনকে নিয়ে এ রাস্তা সে রাস্তা এ দোকান সে দোকান ঘুরে বেড়াল মালু। ঘর-সংসারের কত উপদেশ দিল, যেন সংসার করে করে বুড়ো হয়ে গেছে ও। তারপর বিকেল নাগাদ ফিরে এল বাসায়। পরিপাটি করে সাজছে রিহানা। চোখটা চট করে ফিরিয়ে নিতে পারে না মালু। ইচ্ছে হয় চেয়ে থাকুক।

খাবে না বেরুবার আগেই বলে গেলে পার। চাকরটাকে আর কষ্ট করে রাঁধতে হয় না। ওকে দেখেই ঝাঁঝিয়ে উঠল রিহানা। নিরুত্তরে পাখাটার নিচে এসে বসল মালু। একটু ঠাণ্ডা হল। মুখ হাত ধুয়ে এল। তারপর পোশাকটা বদলে বেরিয়ে গেল ছাত্রীদের গান শেখাতে। গেইটটার কাছে এসে পেছনে শুনতে পেল রিহানার গলা–আমার ফিরতে দেরি হলে তুমি খেয়ে নিও।

গান শিখিয়ে রোজ রাতে যে সময়টিতে ফেরে মালু ঠিক সে সময়ই ফিরলো ও। রিহানা তখনো ফেরেনি। উপরে নিচে গোটা বাড়িটা অন্ধকার। ঘরে পা রেখেই মাথাটা ঝিম করে ধরে গেল মালুর। ওর মনে হল কী এক ষড়যন্ত্রের কূটজালে এ বাড়ির সমস্ত বায়ু সরে গেছে অন্য কোনো পৃথিবীতে। এখানে বায়ুহীন নিঃসীম শূন্যতা। এখানে নিশ্বাস নেয়া যায় না। ভীত পশুর মতো ত্রস্ত পায়ে বাইরে ছুটে এল মালু।

পল্টন তখন খোলা মাঠ। তখনো দেয়ালের অবরোধ ওঠেনি, উদ্যত হয়নি বেপারি হাতের আক্রমণ। লাট ভবনের কোণা থেকে সেই ফকিরাপুল, ফকিরাপুল থেকে পল্টনের সেই পরিত্যক্ত চাঁদমারি–উদলা মাঠ সবুজ মখমল গায়ে জড়িয়ে নিঝুম পড়ে থাকত।

এ কোণ থেকে সে কোণ গোটা মাঠটায় চক্কোর দিয়ে বেড়াল মালু। ঘাসের নরম পিঠে পিঠ দিয়ে ধুলোয় বেড়ালের মতো গড়াগড়ি খেল। জামা খুলে বাতাস মাখল গায়ে। তারপর বুঝি বন্ধু রাতের ঠাণ্ডা পরশে স্নিগ্ধ হল। ঘরের পথ ধরল।

বাতি জ্বলছে দোতলার ঢাকা বারান্দায়। বাতির নিচে মানুষ। মেয়ে আর পুরুষ, কয়েক জোড়া মিহি কথার কাঁচ ভাঙছে ওরা। ছোট ঘোট হাসির লহর তুলছে। ওদের হাসি, ওদের কণ্ঠ, গুনগুনিয়ে উঠছে অর্গানের নীচু খাদের মিঠে সুরের মতো।

কখনো বা মধ্য রাতের স্তব্ধতা চোখে মেখে থমকে থাকছে ওরা। হাই তুলছে আলস্যের। তন্দ্রালু চোখের ঠিকানাহীন দৃষ্টি ঘুরে ঘুরে হঠাৎ হয়ত লক্ষ করছে পাম গাছটির মাথায় এক ঝাঁপি নিকষ আঁধার।

ঠিক এমন সময় এক ঝলক বাতাস এসে সুড়সুড়ি তুলে ভেঙে দেয় ওদের ঝিমুনিটা। পাকা রাঁধুনির মতো যে উস্কিয়ে দিল নিভু নিভু কথা উনুনের আধ পোড়া কাঠের চেলাটা। অড্রি হ্যাপবার্ণের ছবিটা দেখে এলাম কলকাতায়। চমৎকার অভিনয়। শুনেছি, দুটো একাডেমি এওয়ার্ড পেয়েছে

বাবা, ঢাকায় বসে থাকলে পাঁচ বছরেও নো হোপ। আমি ভাবছি কালই একটা ট্রিপ দেব কলকাতায়। ছবিটাও দেখা হবে দুচারটি কেনাকাটাও সেরে আসব।

হু যাকে বলে রথ দেখা কলা বেচা।

তা, যা বলেছিস। আমার তো ভাই প্রতি মাসেই একবার কলকাতায় না গেলে চলে না। মানুষ থাকে ঢাকায়? না আছে সোসাইটি, না পাওয়া যায় দুটো শখের জিনিস।

ঠিক বলেছিস। একটা ম্যাক্স ফ্যাক্টর লিপস্টিক তামাম ঢাকা শহরে খুঁজেও পেলাম না। আমি তো ওনাকে বলে বলে হয়রান হয়ে গেলাম–চল বদলি হয়ে করাচী। এ ছাই শহর আর ভালো লাগে না। এমনি করে টুন টুন টুন টুন বোল ঝরে ওদের কথায়। গড়িয়ে চলে ডিনার শেষের বিশ্রম্ভালাপ। বিষয়টা মুখ্য নয়। বস্তুটাও না। একটু বা রোমন্থন। পেটের ভেতর গুরু আহার্যগুলোকে নরম করা।

উগ্র আলো ছড়ানো দোতলার নিচে একতলার অন্ধকারটা কেমন ছমছমে। গা ভার ভার ভয় জাগানো। হাত রাখতেই দু ফাঁক হয়ে গেল ভেজানো কপাট। সারাদিন ইয়াসীনের আনন্দে শরিক হয়ে জোর করে যে শূন্যতাটাকে সরিয়ে রেখেছিল দূরে দূরে, এই অন্ধকারে সোয়ার হয়ে দুঃসহ সেই শূন্যতাটাই যেন গ্রাস করে নিল মালুকে। হাতড়ে হাতড়ে দু একটা ঠোক্কর খেয়ে বিছানাটা খুঁজে পেল মালু। লম্বা হল।

অন্ধকারেই বুঝি জেগেছিল চাকরটা। মালুকে ঢুকতে দেখে উঠে আসে। জ্বালিয়ে দেয় বাতিটা। শুধায়, ভাত দেব সায়েব?

বিবি সায়েব খাবে না?

উনি তো উপরে খেয়েছেন।

আমি খাব না। তুই ঘুমা গিয়ে। বাতিটা নিবিয়ে দে।

দোতলার জোড়া জোড়া মানুষগুলোর কথাই ভাবছে মালু। কিন্তু ওরা সবাই কী জোড়া? রিহানার জুটি কে? নামটা মনে মনেও বুঝি উচ্চারণ করতে পারল না মালু।

তারপর প্রায়ই যেমন হয়, মাঝ রাতের ঢলে পড়া প্রহরে ঢুলু ঢুলু ঘুম নামবে ওদের চোখে। ছোট হয়ে আসবে ওদের চোখের তারা। ডিনার শেষের চুটকি আলাপনটা কিছুতেই আর জমবে না। উড়তে চাইবে না ঠুনকো কথার টুনটুনিরা।

শিথিল পা, বোজা বোজা চোখে নেবে আসবে রিহানা। এক তাল ঠাণ্ডা গোশতের মতো দলা পাকিয়ে পড়ে থাকবে বিছানার এক পাশে।

কিন্ত কোথায় চলেছে রিহানা? এতে কী সত্যিই আনন্দ পাচ্ছে ও? রিহানা কী চেয়েছিল? কী চায়?

বার বার ঠেলে দিলেও প্রশ্নগুলো ছেঁকে ধরে মালুকে।

৫৫.

ও শালার হয়ে গেছে।

হয়ে গেছে কিরে! বল ডুবে গেছে। যেমন তেমন ডোবা নয়। একেবারে মধুর চাকে হাবুডুবু গানটান সব ঝেড়ে পালিয়েছে।

শুনছি নাকি কোনো বড়লোকের মেয়েকে ভাগিয়ে…

শালা বেইমান। নেমকহারাম। ফষ্টিনষ্টি করবি তো অন্য জায়গায় কর। তা না ভদ্রলোক বিশ্বাস করে তোকে বাড়িতে ঢুকতে দিলেন। আর তারই মেয়েকে নিয়ে ইলোপ?

মানে গান গাইতে গাইতে একেবারে সপ্ত আকাশে উধাও?

সাধে অমন টসটসে হয়েছে চেহারাখানা। দেখ না একবার, কেমন বাহারের সুরত? এক্কেবারে দুলা মিঞা আর কী!

ছিঃ ছিঃ এ কী কেলেঙ্কারী! শালা একটা আস্ত বদমাস।

ভোঁতা বিদ্রূপ। আড়ালে আবডালে নয়। ওর চোখের সুমুখেই।

অট্টহাসি ছড়ায়। ভেংচি কাটে। মালু দেখে এবং শোনে, উপহাসের জিহ্বা গুলো কেমন লিক লিক করে যায়। এককালে হয়ত এরাই ছিল ওর অন্ধ স্তাবক।

ব্যাটা কিন্তু রোজগার করছে মেলা।

তা আর করবে না; যাকে বলে আদার বনে খাটাস বাঘ। পাকিস্তানের অর্থ ওদের মনপোলি, মানে নো কম্পিটিশন। কিন্তু এখন আর সেটি হচ্ছে না সায়েব।

কেন বলুন তো?

মশায় ঢাকার রাস্তায় এখন গায়কের ছড়াছড়ি। মেয়েকে গান শেখাবেন? দিন না একটা বিজ্ঞাপন, দেখবেন গণ্ডায় গণ্ডায় গায়ক আপনার দরজায় হাজির। এ বলে আমারে দেখ, ও বলে আমারে দেখ।

থামুন তো মশায়, গানটা একটু শুনতে দিন। পেছনের সারির কোনো রস পিপাসুর ধৈর্যে বুঝি আর কুলায় না।

ব্যাটা উজবুক নাকি রে? হো হো হাসির রব উঠে। কার সাধ্য প্রতিবাদ জানায়।

মশায় ওকি গান? ভাটিয়ালিতে বেহাগ রাগ! সুট কোট পরে গলায় চাদর ঝোলান।

যত সব কালোয়াতি

উপায় কী? পুঁজি তো মোটে দেড়খানা বাউল, আড়াইখানা মারফতি, তিনখানা ভাটিয়ালি। সেই মান্ধাতার আমলে শিখে রেখেছে। ওতে কী আর এখন কল্কে মিলে? তাই খিচুড়ি পাকানো শুরু হয়েছে।

লে বাবা, থাম এবার। তার চেয়ে ধরনা একটা বোম্বাই কা গানা। উত্যক্ত করতে চায় ওরা মালুকে। থামিয়ে দিতে চায় ওর গান। ওর এই বিচিত্র পরীক্ষায় ওদের বিদ্রোহ। প্রতিবাদ।

বিদ্রূপের আঙ্গুলগুলো নেচে নেচে যায় মালুর চোখের সুমুখ দিয়ে। কতক্ষণ ও দেখে পারবে! কতক্ষণ উপেক্ষা করবে! বুঝি এ ফোঁড় ওফোঁড় হয়ে যায় ওর সাহস ভরা বুকটা।

উঠতে গিয়েও ভেঙে যায় মীড়। স্বর যায় ফেটে। সুর যায় কেটে। গলা যায় শুকিয়ে। যা গাইতে চায় তাও আর গাওয়া হয় না।

কী সব ছাইপাশ গাও বল তো? আমার যে মুখ দেখানো দায়। তিক্ততার হুল ফোটায় রিহানা।

গান কী আর বোঝ তুমি রিহানা? যে হৃদয় দিয়ে বুঝতে সে তো হারিয়ে ফেলেছ।

ইস কথায় আবার ছিরি দেখ! গা জ্বলে যায়।

জ্বালা কী আমারই কম রিহানা? ঘরে বাইরে উপহাস, মনের ভেতর অশান্তির জ্বালা, তুমি কী দেখছ না?

তার আর কী করা যাবে।

কিছুই কী করা যায় না রিহানা? তুমি কী দিতে পার না এক ফোঁটা সান্ত্বনা, একটু মমতার পরশ? পার না পাখির ডানার মতো তোমার ছোট্ট দুখানি বাহুর শান্ত আশ্রয়ে আমার সব জ্বালা জুড়িয়ে দিতে?

ন্যাকামি রাখতো। ও সব ভালো লাগে না আমার। তোমার ফাংশান-টাংশানে ও আর যাচ্ছি না আমি। বিশ্রী সব রিমার্ক। তুমি সইতে পার। আমার চামড়া অত মোটা নয়। বিতৃষ্ণা বিরক্তি আর তাচ্ছিল্য রিহানার কণ্ঠে।

ও এই বুঝি তুমি? আমার গানের টানে, সুরের আরাধনায় যে উঠে এসেছিল পাতলা ফুঁড়ে। যাকে মনে করতাম আমার পরম পুরস্কার? এত স্থূল, এত নির্মম তুমি?

হ্যা তাই তাই, হল তো? কর্কশ গলায় কয়েক দলা বিষ উগরে দিয়ে বেরিয়ে যায় রিহানা।

যেমন বলেছে রিহানা কাজেও তার ব্যতিক্রম হয় না। গানের জলসাগুলোতে মালুর সাথে ওকে আর দেখা যায় না। কিন্তু মালুকে যেতেই হয়! ওটা ওর যশ। এখন বুঝি অপযশ। তার চেয়েও বড় কথা, ওটা তার রোজগার। তাই ও যায়। বিদ্রূপের কণ্ঠ ছাপিয়ে সুর তোলে। অদৃশ্য কোনো নিয়তির বিরুদ্ধে আকাশের দিকে চেয়ে বুঝি ছুঁড়ে মারে হাতের মুঠো। না বুঝুক, না শুনুক ওরা। তবু মালু গেয়েই যাবে, ওদের শুনতেই হবে বুঝতেই হবে।

কিন্তু ছাত্রীদের বাড়িতে কী সে জিদ খাটে?

মাস্টার সায়েব, মেয়েটিকে খান কয় রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখিয়ে দিন, ওটা বেশ চালু হয়েছে আজকাল।

কী বললেন? রবীন্দ্র-সঙ্গীত? আমাকে দিয়ে হবে না। অন্য মাস্টার দেখুন।

তা…আপনি বলছেন যখন তাই হবে।

এক ঝাঁকের পাখি ওরা। লিলির গার্ডিয়ান কম মাইনের রবীন্দ্রসঙ্গীতের নতুন মাস্টার রাখে। রীনার বাবাও। হয়ত ওদেরই দেখাদেখি অপেক্ষাকৃত নিম্ন আয়ের গার্ডিয়ান রুক্কুর বাবা আর লীনার চাচা, ওরা দুজনে মিলেই নতুন মাস্টার বহাল করে। দু মেয়ে এক সাথেই গান শিখবে।

কিন্তু তর্ক তোলেন অধ্যাপক হোসেন, রেখার বড় ভাই। রীনা লীনা রুক্কু আর লিলির গার্ডিয়ানদের মতো বুঝি এক কথায় মালুকে জবাব দিতে পারেন না তিনি।

বলেন : এমন সুন্দর আপনার গলা। এত আপনার সুনাম। কেন শিখে নেন না রবীন্দ্র-সঙ্গীতটা? সেই সাথে কিছু চলতি আধুনিক?

ভাল লাগে না।

আকাশ থেকে পড়েন সাহিত্যের অধ্যাপক। এমন কথা কখনো শোনেননি তিনি। সকল বাঙালি মধ্যবিত্তের মতোই রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রতি অনুরাগ তাঁর গভীর।

কেন, মানে যুক্তি? কেমন তীক্ষ্ণ শোনাল অধ্যাপকের স্বরটা।

যুক্তি যে আমার কী, সেটা তো তলিয়ে দেখিনি কখনো? মনের ভেতর থেকে সাড়া পাইনি। তাই ওটা শিখিনি।

বলেন কী? ভাবে-ব্যঞ্জনায়-রূপে এমন নিটোলতা, এমন মধুর আনন্দের স্বাদ অন্য কোন্ সুরে আছে বলুন তো? হৃদয়ের রস, প্রকৃতির লাবণ্য আর ফুলের কোমলতা মিশিয়ে যে সুরের সৃষ্টি, সেই রবীন্দ্রসঙ্গীত সাড়া জাগায় না আপনার মনে? আপনার মতো নামজাদা গুণীর মুখে কথাটা শুনে বড় অবাক লাগছে। ছিঃ মালেক।

রবীন্দ্র-সুরের বিপুল অবদানকে তো আমি অস্বীকার করছি না হোসেন সাহেব। আমার মনের প্রক্রিয়াটাই শুধু জানালাম আপনাকে। কেবলই মনে হয় কী এক কান্না এসে কেড়ে নিয়ে যায় মধুর আনন্দটি। যেন এক বেদনা বিলাস দুঃখের গায়েও একটু মাধুরিমা, একটু মহত্তের প্রলেপ লাগিয়ে কী এক অবশ তৃপ্তিতে নিজের ভেতর নিজেকে গুটিয়ে আনি। বুকটা যেন ভরে যায় অক্ষম কোনো ব্যথায়। সে ব্যথার রাজ্যে ডুবে গিয়ে এক ধরনের তৃপ্তিও পাই। এখানেই বিদ্রোহ করে আমার মনটা।

বিদ্রোহটা কেন বলুন তো? উনুখ এক আগ্রহে সামনের দিকে ঝুঁকে আসেন অধ্যাপক হোসেন।

দুঃখ আমার অবাল্য সাথী। সে দুঃখ ক্ষুধার, বঞ্চনার, অপমানের, অকারণ আঘাতের। কদর্য তার রূপ, হিংস্র তার ভাষা। কিন্তু সঙ্গীতের রাজ্যে তাকে প্রকাশের ভাষা বা সুর এখনো খুঁজে পাইনি আমি।

এতো আপনার নিজের কথা বলছেন। ক্ষুণ্ন স্বর অধ্যাপক হোসেনের।

আমি খুঁজছি। তাই মনের ভেতরে সুখের কান্নার মতো পুষে রাখতে চাই না দুঃখটাকে।জ্বালিয়ে রাখতে চাই অগ্নিশিখার মতো। রবীন্দ্রসুরের কান্নার সুখ

আমার অসহ্য। আমি…

একটু থামুন। হাত উঁচিয়ে ওকে থামাবার ইশারা জানিয়ে কী এক উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে পড়েন অধ্যাপক হোসেন। তার পর বসে ঠোঁটের উপর একটা আঙ্গুল রেখে যেন অনুধাবন করলেন মালুর কথাগুলো। অবশেষে বললেন : যাকে আপনি বলছেন কান্নার সুখ, ব্যথার রাজ্যে ডুবে যাওয়ার তৃপ্তি, এ কথাগুলোকেই কী একটু ঘুরিয়ে বলা যায় না? বলা যায় না, দুঃখদীর্ণ জীবনে যে সত্যের আরাধনা তারই নাম সৌন্দর্য, আর এই সৌন্দর্যই রবীন্দ্র-সুর? এ ভাবে বললেই কী সত্য কথাটা বলা হয় না?

কিন্তু, এ সৌন্দর্য যে আচ্ছন্ন করে চেতনাকে। আচ্ছন্ন হৃদয় চেতনায় চিন চিন করে বাজে ব্যথার রাগিণী। কী এক অতৃপ্তি কী এক শূন্যতাবোধ ঘিরে ধরে, বিষণ্নতার অবসাদে চোখ বুজি। কিন্তু আমি তো চাই সেই রূপকথার সোনার কাঠি যার মন্ত্র ছোঁয়ায় প্রাণ জাগে। সেই সঞ্জীবনী সুর…উঁহু দাঁড়ান। হাত তুলে মালুকে আবার থামিয়ে দেন অধ্যাপক হোসেন। ওই যে বললেন চিন চিন করে বাজে। ব্যথার রাগিণী সেই সূক্ষ্ম বেদনাটুকু যে অনেক কিছুর প্রকাশ, মালেক সাহেব। সার্থক শিল্পকর্ম, সার্থক সুর সর্বত্রই তো এ বেদনার ধারা। রবীন্দ্র গীতিকায় এ বেদনাই তো তার উৎকৃষ্টতম আবেদন।

বুঝি দম নেবার জন্য একটু থামলেন হোসেন সাহেব। দম নিয়ে বলে চললেন : আচ্ছা বলুন তো, সৌন্দর্য কী নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ? না, আমি তা মনে করি না। যে বেদনার গর্ভ থেকে তার সৃষ্টি সে বেদনাটা সব সৌন্দর্যের মাঝেই তো মিশে থাকে। তাই ওই বেদনাকে বাদ দিয়ে সৌন্দর্যের অনুভব বা উপলব্ধি শাঁসটাকে বাদ দিয়ে শুধু খোসা নিয়ে তৃপ্ত থাকার মতো। রবীন্দ্র-সুরের এ বেদনার আবেদন অনুপম সৃষ্টি সুন্দরের আবেদন…

মালুর মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ থেমে গেলেন অধ্যাপক। মনে হল তাঁর মালু যেন শুনছে না।

তাই তো রবীন্দ্র গীতির বৃত্তটা ফিনফিনে বাবু সাহেবদের গোছালো ড্রয়িং রুম ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারল না, পারবেও না। যেন আপন মনেই বলল মালু।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন অধ্যাপক সাহেব। সময় হয়ে গেছে কলেজের। তত্ত্বের তর্ক আপাতত স্থগিত রেখে কাজের কথায় এলেন : আসল কথাটা কী জানেন? হাল জামানায় বানের পানির মতো অফিসার কুলে ছেয়ে গেছে দেশটা। এই ছোকরা অফিসারগুলো সঙ্গীত না বুঝুক, গাইতে না জানুক,

কিন্তু দুটি রবীন্দ্র সঙ্গীত জানে না এমন বৌ রোচে না ওদের। তাই ভাবছিলাম রেখাকে...

নিশ্চয় নিশ্চয়। আপনাদের পাড়াতেই তো গীতিকা নামের একটা নতুন গানের স্কুল খুলেছে দেখলাম। রেখার যেমন সুরবোধ দুমাসেই ও রপ্ত করে নেবে। অধ্যাপকের কথাটা আঁচ করে নিয়ে বলল মালু। উদারতার একটি প্রশস্ত হাসি ছড়িয়ে বেরিয়ে এল ও। কিন্তু রাস্তায় পড়তে না পড়তেই হপ করে নেবে এল এক উদ্বেগের ছায়া।

উদারতার হাসিটি উবে গেল ওর।

এদেশে আধুনিকতার জোয়ার এসেছে।

চুলের ফ্যাশনে, ঠোঁটের রংয়ে, শাড়ির নক্সা আঁকা আঁচলে, মুখের বোলে, চলার ঢংয়ে, সর্বত্র আধুনিকতার প্রতিযোগিতা। গানের ক্ষেত্রটা বাদ যাবে সেই প্রতিযোগিতার আওতা থেকে, এমন কিছু ভেবে রেখেছিল নাকি মালু? দশটা আধুনিকের মাঝে একটি ভাটিয়ালি, একটি সারি, জারি, ক্লাসিকাল একটিও না। এই তো চলছে। অস্তিত্বের কঠিন সংগ্রামে এটুকু স্বীকৃতিও কী থাকবে না?

একটার পর একটা ট্যুশনি যাচ্ছে। এর অর্থ আয়ের ঘাটতি। রিহানার গঞ্জনা। মালুর হার রিহানার সুমুখে।

তার চেয়েও বড় কথা মালুর সঙ্গীতের ব্যর্থতা। ওর সাধনার মৃত্যু। একদা মালু বয়াতি, আজ বড় জোর রেডিও গায়ক। এর বেশি কিছু নয়। সঙ্গীতের স্রষ্টা নয়, শিল্পীর সৃজনে, কর্মে আর ধর্মে পথিকৃৎ নয়। আগাগোড়া ভাবতে গিয়ে কেমন যেন খেই হারায় মালু। কিছুদিন আগেও কত শ্রদ্ধা সম্মান এসে লুটিয়ে পড়েছে ওর পায়ে। একটানা প্রশস্তি শুনে শুনে নিজেই কানে আঙ্গুল দিত মালু। সেই মালুকেই আজ চতুর্দিক থেকে বর্জনের হিড়িক পড়ে গেছে।

বর্জন? শব্দটার মাঝে যেন অনেক অর্থ। ওর প্রায় ছাত্রছাত্রী আর শ্রোতা, ওর সাধনার সাথে যারা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে, তারা, এমন কী রিহানা, সবাই আজ বর্জন করে চলেছে ওকে।

মালু ভেবে পায় না, সত্যি কী অবাক হবে ও? মুষড়ে পড়ার মতোই বা কী কারণ থাকতে পারে। কেননা চারিদিকেই তো আজ বর্জনের পালা। অতীতকে, ঐতিহ্যকে, কথামালায় শেখা সত্যবোধ, নীতিবোধকে, মহৎকে, ভালোকে, সুরুচিকে-ঝেড়ে মূল বর্জন করার উৎকট প্রতিযোগিতা আজ এই শহরে। সেখানে

বর্জিত মালুর সুর, কেননা, নতুন সুরের অভিনবত্বের মাঝেও প্রাচীনের গন্ধ, ঐতিহ্যের ছোঁয়া। এ আর তেমন কথা কী!

তাই হোক। উপেক্ষিত অনাদৃত হয়েই থাকুক মালু। আবার যখন আসবে গ্রহণের পালা তখন আপনার ঐশ্বর্য ভাণ্ডার নিয়ে ওদের সুমুখেই এসে দাঁড়াবে মালু। তদ্দিন? তদ্দিন আপনা পথে একলাই চলবে, সেখানেই ওর জিত।

কিন্তু রিহানা? সে যে মালুর সবচেয়ে বড় পরাজয়। এ পরাজয়ের সত্যটাকে এখনো স্বীকার করতে চায় না মন। বুকের হাড়গুলোও যেন কী এক কান্নায় গুমরে ওঠে।

৫৬-৬০

তবু নিজের চেয়ে রিহানার কথাটাই বুঝি বেশি করে ভাবে মালু। রিহানা ঠকে গেছে। ও ভুল করেছে। তাই অনুতাপে তুষের আগুনের মতো ও জ্বলছে সারাক্ষণ। কী এক সহানুভূতিতে ভিজে যায় মালুর মনটা। ওর মনে হয় ওর চেয়েও রিহানার দুঃখটা অনেক গভীর, আশা ভঙ্গের গ্লানিটা অনেক বেশি।

এ কী করছ রিহানা? অন্ধরাগে এ কোন্ নর্দমায় ডুব দিচ্ছ তুমি? মাথার দিকে বালিশ দুটোকে উঁচিয়ে ত্রি-ভঙ্গিমায় শুয়ে আছে রিহানা। মুখটা ঘুরিয়ে শুধাল, কী বলছ? বুঝতে পারছি না।

বুঝি বোঝাবার জন্যই উঠে এল মালু। কিন্তু, বসতে পারল না রিহানার পাশটিতে। কী এক দ্বিধা, কী এক সংকোচ। তার সাথে যেন ভয়ের মিশেল। ফিরে গিয়ে মোড়াতেই বসল মালু। বলল : যা ছেড়ে এসেছ সে দিকে আবার চোখ ফেরাচ্ছ কেন, রিহানা? যা হারালে তার ক্ষতিপূরণ আমাকে দিয়ে হল কিনা সে তর্ক তুলব না আজ। কিন্তু যে গর্বিণীর দীপ্তি নিয়ে ঝাঁপ দিয়েছিলে তুমি অনিশ্চয়তার গর্ভে সে তো জীবনের এক মহা মানিক। তাকে অমন করে ম্লান হতে দিচ্ছ কেন?

তোমাকে না নিয়ে মায়ের সাথে দেখা করতে যাই কেন, এই তো? কিন্তু আমাদের ফ্যামিলিতে তুমি যে গ্রহণযোগ্য নও সে তো বলেই দিয়েছি তোমাকে। করাতের মতো কাটা কাটা কথা রিহানার।

তা নয়। আমি বলছিলাম দোতলার ওই বেপারিটার সাথে তোমার অন্তরঙ্গতাটা বড় দৃষ্টিকটু, পাড়ার লোকেরা মুখ আড়াল করে হাসছে, দেখছ না?

দৃষ্টিকটু? এক ফুলকি আগুনের মতো দপ করে জ্বলে উঠল রিহানা। কমজাতে জন্ম নিলে মনটাও এত ছোট হয়, তাতো জানতাম না? বলি, নামমাত্র ভাড়ায় এতগুলো ঘর যে ছেড়ে দিল তাকে কোনোদিন দিয়েছ একটি ধন্যবাদ? দাওয়াত দিয়ে দুটো খাওয়ানের কথা ভেবেছ কখনো? ভদ্রতা, সৌজন্যবোধ এসব না হয় শেখনি। তাই বলে কৃতজ্ঞতা বোধটুকুও থাকবে না?

আহ্ রিহানা।

মুরোদ তো তোমার খুব দেখলাম। নতুন বৌকে নিয়ে তুললে পচা রাস্তার ঘিঞ্জি ঘরে। আবার বড় বড় কথা!

সেই ঘিঞ্জি ঘরের দুর্গন্ধটা এখনো ভুলতে পারেনি রিহানা। বুঝি সেই দুর্গন্ধটা এখুনি এসে আবার লেগেছে ওর নাকে। তাই নাক আর ঠোঁটের কুঞ্চনে চেহারাটাকে বিশ্রী করল রিহানা।

শিউরে উঠল মালু। যাকে মনে হয়েছিল রূপসী আজও সে সুরূপা সে মুখ এতো কুশ্রীও হতে পারে?

রোজ রোজ এই একই কথা আমাকে শুনিয়ে কোনো লাভ আছে রিহানা? মোহ ভেঙেছে তোমার। অনুতপ্ত তুমি। তাই তো বলছি, মুক্তির পথ তোমার খোলা, সে পথে না গিয়ে কাদা ঘাটছ কেন? পৃথিবীর যে অটল সহিষ্ণুতা আর নিঃসীম আকাশের যে উদারতা তাই যেন কথা বলে গেল মালুর কণ্ঠে।

সাপের জিবের মতো লকলকিয়ে উঠল রিহানা। মুক্তি? মুক্তি কে চায় তোমার কাছে? আমার সব কিছু কেড়ে নিয়ে আমার সর্বনাশ করে উদারতার অহংকার নিয়ে তুমি কেটে পড়বে ভাবছ? ভাবছ গানের বেহেশতে ফিরে গিয়ে নতুন নীড় বাঁধবে তুমি? সে আমি হতে দিচ্ছি না। তিলতিল যন্ত্রণার দাহ নিচ্ছি আমি, তার আঁচ থেকে বাঁচতে চাও তুমি? দুরাশা।

এ কী প্রতিহিংসা রিহানার?

হতভম্ব স্তব্ধ মালু।

এক চিলতে বিকেলের রোদ মেঝের উপর পিঠ এলিয়ে খেলা করছে আপন মনে। শার্শির কোনো কাছে গিয়ে পড়েছে তার প্রতিবিম্ব, সেই প্রতিবিম্বের কোনো চুম্বক আকর্ষণে কেঁপে কেঁপে চলেছে রোদের ফালিটুকু। স্থির দৃষ্টিতে সে রোদের খেলার দিকে চেয়ে মালু যেন ধ্যান করল আদিম কোনো পৌরুষ সত্তার।

ধীরে ধীরে উঠে এল মালুর দৃষ্টিটা। স্থির হল রিহানার মুখের উপর। বলল মালু : আচ্ছা রিহানা। সত্যি করে বলোনা, তুমি কী? আমার সুরের মিতা? অথবা শুধুই গঞ্জনা। এক পুঁটলি স্থূল কামনা?

রিহানার কানে বোধ হয় গেল না কথাগুলো। অথবা কানে তুলল না ও।

ও ফুঁসছে। ফুলছে। কাঁপছে। আচমকা এক ভাঁজ স্প্রিংয়ের মতো আন্দোলিত হয়ে উঠে বসল ও। কী এক ধিক্কারে নিজের প্রতিই যেন ছিটিয়ে দিল ঘৃণার ঝুরি– ইস, যদি জানতাম।

কী জানতে না? শুধাল মালু।

জানতাম না যে তুমি একটা অকাট মূর্খ। বলনি সে কথা।

আর কী বলিনি?

বলনি, জন্ম পরিচয়হীন ভৃত্যের জীবিকায় মানুষ।

আর?

অক্ষম অপদার্থ। সাধ আকাশের চাঁদ ধরবার।

সাধ হয়ত ছিল রিহানা। কিন্তু আকাশের চাঁদটা যে নিজে এসেই ধরা দিল আমার হাতে।

সেটা ভুল।

সবটাই কী ভুল? যে গান যে সুর সমুদ্র মন্থন করে তুলে এনেছিল তোমাকে, সেটাও কী ভুল? রিহানা, সে গান সে সুর তো আমার এখনো স্তব্ধ হয়নি। এসো সুরের রাজ্যে আমরা নতুন বাসর গড়ি? এসো না নতুন প্রাণে বাঁচি? আসবে? যেন মুমূর্ষুর অন্তিম আকুতি কেঁপে উঠল মালুর কণ্ঠে। লিকলিকে বেতের মতো একটুখানি বেঁকেই সোজা হল রিহানা।

সুর সুর সুর। গান গান গান। যেন সুর আর গান খেয়েই বাঁচতে পারে মানুষ। মর্যাদা। গান বেচে কিনতে পেরেছ এক আধলা সামাজিক মর্যাদা? পাত পেয়েছ কোনো ভদ্র ঘরে?

স্থৈর্যের ধৈর্যের অটলতার সেই যে মহা শক্তি মালুর সত্তার গভীরে, সে বুঝি এগিয়ে এল না মালুর সহায়তায়। আঘাতে অপমানে বুঝি ধুলোয় গুঁড়িয়ে যাবে মালু।

কী ভাবছে মালু? পৌরুষে আক্রোশে পরাভূত করবে, ঝলসিয়ে দেবে ওই স্থূল রুচির মেয়েটাকে? শক্তির আলিঙ্গনে খান খান করে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবে ওর মিথ্যা গৌরব? স্বামিত্বের অধিকারে কেড়ে নেবে ওর এই মিথ্যা তেজ?

এত কথা কী ভাবল মালু, না অবকাশ পেল ভাববার? তার আগেই ও লুফে নিল সাপের জিবের মতো লকলকিয়ে যাওয়া সেই দেহখানি।

প্রচণ্ড আঁচে বলক খেয়ে টগবগিয়ে উঠল রিহানা। হাত পা ছুঁড়ল। চিৎকারে কান্নায় ছটফটিয়ে গেল। কামড় বসিয়ে দিল মালুর কাঁধে। আঁচড় কেটে, ঠেলা মেরে আলগা হতে চাইল মালুর নিষ্ঠুর আলিঙ্গন থেকে। কিন্তু আদিম বন্যতার আক্রমণের মুখে কতক্ষণ টিকে থাকবে ওর প্রতিরোধ।

স্তব্ধ হল প্রতিবাদের কণ্ঠ।

নেতিয়ে পড়ল প্রতিরোধের দুটো বাহু।

অবশ হয়ে সিধা হল পা জোড়া।

নিস্তেজ হল রিহানা।

পৌরুষ এসে বিদ্ধ করল ওকে।

বিধ্বস্ত হল আজকের মুখরা রিহানা। পৌরুষ উত্তাপে সিদ্ধ হল রিহানা। সিদ্ধ হয়ে হয়ে নরম হল। নরম হয়ে রোঁয়া রোঁয়া ছিটকে পড়ল। ছিটে-ভিটে একাকার হবার আগে ওর আহত নারীত্বটা বুঝি শেষ বারের মতো একটুখানি শক্তি সংগ্রহ করল। দুর্বল বুজে আসা কণ্ঠের চাপা গর্জনে উচ্চারিত হল একট ভয়ংকর শব্দ-বর্বর।

৫৭.

এ কী করল মালু?

লাঞ্ছিত করল নিজের পৌরুষকে? অপমানিত করল রিহানার নারীত্বকে? কেমন করে ওকে মুখ দেখাবে মালু? পৌরুষ অহংকারের এতবড় পরাজয় নিয়ে ও কী কোনোদিন যেতে পারবে রিহানার সুমুখে?

আশ্চর্য মানুষের মন। আত্মার শাসনের বিদ্রোহ করার জন্যই যেন তার সৃষ্টি। তাই যদি না হবে, তবে কেমন করে বর্বরতার আচরণে আপনাকে কলঙ্কিত করল মালু?

মনটা যদি হত ইস্পাতের কাঠি অথবা একতাল কাদা। তা হলেই যেন তাকে বিশ্বাস করা যায়, নির্ভর করা যায়। আর এমনি মনকে নিয়ে হয়ত যা খুশি তাই করা যায়।

কিন্তু, মালু যেন আর পারছে না ওর মনটাকে নিয়ে যা খুশি তাই করতে। পারছে না মন নামের শক্তিটার উপর নির্ভর করতে। অল্প কয়েকটি দিনের ভেতর কখন এতটা অধঃপতন হল মালুর?

রিহানা উঠে গেছে দোতলায়। সেখানেই থাকে ও।

হঠাৎ কোনোদিন নেবে আসে। দুদণ্ড বসে যায়। দেখা হয় না মালুর সাথে। কখনো বা দেখা হয়ে যায়। কথা হয় না।

রিহানার আর এক খালু করাচী থেকে বদলি হয়ে এসেছে ঢাকায়। ছয় মেয়েকে নিয়ে খালু আপাতত উঠেছে দোতলায়।

ব্যবসার কাজে আহসান গেছে কন্টিনেন্টে। হামবুর্গ, ডুসেলডর্ফ, মিলান, কোপেনহেগেন ইয়োরোপের এমনি সব শহরের ছাপ নিয়ে চিঠি আসে ওর। ছয় বোনের সাথে রিহানা, সাত বোনে মিলে গোগ্রাসে গেলে চিঠিগুলো। সে চিঠি নিয়ে গল্প করে সাত বোন, হয়ত মালুকে শোনাবার জন্যই। মালুর কানে আসে।

সাতটি নানা রং ফুলের তোড়ার মতো ওরা সাজে। বেড়াতে যায়। বাইরে খেতে যায়। সিনেমায় যায়। গেইটে অথবা একতলার দোর গোড়ায় হয়ত দেখা হয়ে যায় মালুর সাথে। আর তখন বারটি চোখের নিগ্রহে মাটির সাথে থেতলে যায় মালু। রিহানা চেয়ে থাকে অন্য দিকে।

ছয় বোনের ছোট দুজন, সবে মাত্র ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরেছে। ওদের চোখে কৌতূহল মেশানো অনুকম্পা। সিঁড়ির গোড়ায় ওদেরই মুখোমুখি মালু। দাঁত জিব কেটে চোখ কপালে তুলে শুধায় ওরা, এ্য মা! ছিঃ আপনি নাকি ম্যাট্রিক পাস করেন নি? গানের টুশানি করে পেট চালান?

ওরা অপেক্ষা করে না উত্তরের জন্য। দৌড়ে উঠে যায় দোতলায়। সেখান থেকে চেয়ে থাকে অসহায় মালুর দিকে।

ছয় বোনের সব চেয়ে বড়জন, সে মুখ খোলে না। যদি কখনও চোখাচোখি হয় মালুর সাথে, নিঃশব্দ অবজ্ঞায় চোখ ফিরিয়ে নেয় ও, যেন বলে, কী স্পর্দ্ধা!

দিনগুলো বেশির ভাগ বাইরেই কাটছে মালুর।

কিন্তু বাইরের জগটাও তো বিষিয়ে উঠেছে। বিষিয়ে উঠেছে সেই হলদে বাড়িটার হাওয়া। সেখানেও উপেক্ষা, সন্দেহ, কিছু অনুকম্পা। শেষ পর্যন্ত হয়ত লাঞ্ছনাও।

মালু প্রস্তুত। জীবনে কোনো কিছুই আর অসম্ভব, অভাবিত বলে ধরে নেয় না ও। সবই সম্ভব এই মানুষের পৃথিবীতে। যে পৃথিবীর বিচিত্র বৈপরীত্যে একই মাটিতে বাস করছে রিহানা, রাবু অথবা ইয়াসীনের বাগদত্তা হোসনার মতো মেয়ে, জাহেদ আর আহসানের মতো পুরুষ। তাই লাঞ্ছনার মুহূর্তটি যখন এসে গেল নিজেকে একটুও অপ্রস্তুত দেখল না মালু।

মালেক, তোমার ওই উদ্ভট এক্সপেরিমেন্টটা ছাড়তো।

স্যার, সব এক্সপেরিমেন্টই প্রথম প্রথম উদ্ভট বলে মনে হয়।

বেশি কাজ অল্প কথার মানুষ বড় সাহেব। মালুর জবাবটা শুনে কেমন থ মেরে চেয়ে থাকেন ওর দিকে। তার পর যা তিনি কখনো করেন না তাই করে বসলেন। অর্থাৎ পয়লা বাক্যে হুকুমটা জানিয়ে দিয়ে ও তর্কে অবতীর্ণ হলেন মালুর সাথে।

দেখ, কলা পাতায় কী ডিনার খাওয়া চলে?

ডিনার মানে, আমরা যা বুঝি বিলেতী পদ্ধতিতে বিলেতী খাবার। এই তো?

হাঁ তাই।

টেবিল চেয়ার কাঁটা চামচ আমাদের নেই বলে সে খাদ্যটা তো আর হারাম হয়ে গেল না? কলা পাতা রয়েছে আমাদের সেই কলাপাতাই সই।

কিন্তু, বেমানান, দৃষ্টিকটু।

হোক বেমানান। স্বাদ দিয়ে কথা। স্বাদটা নেব। নেব আমাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে, প্রয়োজন মতো সংমিশ্রিত করে। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এ সংমিশ্রণ অনিবার্য। নইলে আমাদের গান, কতগুলো মিষ্টি কথা হয়েই থাকবে, সঙ্গীতে উত্তীর্ণ হতে পারবে না। বড় সাহেব নয়, যেন সামনে সমানে তর্ক করছে মালু, তেমনি জোর ওর কথায়।

লোকে বলছে এ নাকি খিচুড়ি এবং জগা খিচুড়ি।

বলুক। লোকে তো অনেক কথাই বলে। উদ্ধত, এমন কী দাম্ভিক জবাব মালুর।

বড় বড় চোখ করেন বড় সাহেব। স্নেহ করেন মালুকে, ওর শ্রোতা বিজয়ী কণ্ঠ আর প্রতিভার জন্য। একটুখানি আশকারাও দিয়ে এসেছেন সব সময়। কিন্তু এমন বেয়াড়া কথাটা বুঝি আর হজম করা যায় না।

কিন্তু মালেক, পল্লী গানে পশ্চিমী বাজনা, দেহাতীদের জন্য ক্লাসিক্যাল রাগ, এতো স্রেফ পাগলামি। এই ক্ষ্যাপামি তোমার বাড়িতে চলতে পারে, কিন্তু, রেডিও হল সরকারি প্রতিষ্ঠান, এখানে চলবে না। তর্কের ইতি টেনে আখেরী ফরমানটা আবার শুনিয়ে দিলেন বড় সাহেব। এর কোনো জবাব নেই। উচ্চতর আদালতে আপিল নেই।

বশির ঝুঁকিয়ে সালাম ঠুকে চলেই আসছিল মালু। আবার ডাক এল, শোন, আর একটা কথা।

ফিরে দাঁড়াল মালু।

খানিক আগের বড় সাহেবী চেহারা আর মেজাজ দুটোই যেন একটু নরম হয়ে এসেছে, নরম গলায় বললেন বড় সাহেব : কানাঘুষো উঠেছে অফিসে, অফিসের বাইরেও। অমন দায়িত্বপূর্ণ পদে নন ম্যাট্রিক কেন? যেখানে অনুরূপ পদে সর্বত্র গ্র্যাজুয়েট! ইদানীং তোমার নামটা অফিসে আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে পড়েছে। তাই...

এতে এত চিন্তিত হচ্ছেন কেন, স্যার? এই অস্বস্তির মাঝে আমারও চাকরি করার ইচ্ছে নেই। ইস্তফা পত্রটা লিখে এখুনি আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি আপনাকে।

ধাঁ করে বলে গেল মালু। দরজা অবধি গিয়ে আবার ফিরল। বলল : আপনার স্নেহ এবং অনুগ্রহ আমি কখনো ভুলব না। ইপাব তৈরিঃ আল মোস্তাইন বিল্লাহ

নিজের কামরায় এসে তক্ষুনি ইস্তফা পত্রখানা লিখে ফেলল মালু। বড় সাহেবের হাতে পৌঁছিয়ে দিয়ে যেন স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ল। চেয়ার খানিতে হেলান দিয়ে হাত পা ছাড়িয়ে আরাম করার অবকাশ পেল মালু।

কিন্তু, একী বিদ্রূপ ওকে ঘিরে! বড় সাহেবের খাস কামরার কথাবার্তাগুলো বুঝি দেয়াল ফুড়েই বেরিয়ে এসেছে, তাই সহকর্মীদের মুখে বিদ্রূপের অবজ্ঞার কী এক চাপা হাসি, খানিকটা তিরস্কার যারা একটুবা সহানুভুতিশীল তাদের চোখে অনুকম্পা!

আরও অসহ্য, মালু ঘৃণা করে অনুকম্পাকে।

আরো আশ্চর্য হয় মালু। কী অদ্ভুত সাদৃশ্য ওদের সাথে রিহানার। এদের চোখ আর রিহানার চোখ, সব চোখেই যেন একই বিদ্রূপ : মূর্খ হয়ে কতদিন আর ফোঁপর দালালী করবে? সব জারিজুরি তো ধরা পড়ে গেল তোমার।

গুণের কদর নেই, রিহানার কাছেও না। এখানেও না।

করিম মিঞা আর ইয়াসীন। মাথা হেঁট ওদের। যেন ওরাই অপরাধী। ওরা বুঝছে না ওরা কী করবে কী বলবে।

তবু ছাই তার চেয়ে একটু ঘুরেই আসা যাক। বিদ্রূপ ভরা চোখগুলোর উপর এ রকম তাচ্ছিল্য ছুঁড়ে বেরিয়ে এল মালু।

রাস্তায় নেবে নিজেকে খুব হাল্কা মনে হয় মালুর, নিজেকেই যেন আজ অদ্ভুত ভাবে ভালো লেগে যায় ওর।

অনেক শৃঙ্খল বুঝি আপনা থেকেই খসে পড়ল। মুক্তি দিল মালুকে। রিহানা গেছে, ছাত্রীরা গেছে। ভক্তজনের বাহবা, আনুকূল্য, শ্রোতার হাত-তালি সবই গেছে। আজ চাকরিটাও গেল।

দায় দায়িত্বের বালাই নেই, বিবেকের তাড়নায় অসমাপ্ত কাজের হিসেব নিয়ে সারাক্ষণ ছটফটিয়ে মরা, কোনো কিছুর বালাই নেই। তালতলি বাকুলিয়া ছাড়ার পর নিজেকে কখনো এত মুক্ত, এত স্বাধীন মনে হয়নি মালুর।

নির্ধারিত শিল্পীর অনুপস্থিতিতে ঢাকার বেতারে রেকর্ড বাজল। পর পর দুহপ্তা!

৫৮.

সব শুনলেন রাকীব সাহেব। গম্ভীর হলেন, কী এক অকল্যাণের চিন্তায়। তাঁর ছোট মুখখানি কুঁচকে আরো ছোট হয়ে এল শুকনো আঙ্গুরের মতো। বললেন, ভুল করছ।

কিন্তু, আত্মসম্মান যে থাকে না রাকীব ভাই।

দায়িত্বের চেয়ে তোমার আত্মসম্মানটাই বড় হল? অকস্মাৎ কী এক উষ্মায় ফেটে পড়লেন রাকীব সাহেব।

নত মুখে নীরব হল মালু।

তারুণ্যটিকে যেমন দীর্ঘদিন ধরে রেখেছিলেন রাকীব সাহেব তেমনি হঠাৎই বুড়িয়ে গেছেন তিনি। সেই কচি কচি মুখখানিতে বয়সের রেখাগুলো আজ প্রকট। মরে গেছে মুখের সেই শ্যামলাপানা রংটি। তার জায়গায় এসেছে বার্ধক্যের পাণ্ডুরতা, রোদ বৃষ্টির ধকল সয়ে সয়ে আঁশ ওঠা ফাটা কাঠের মতো বিবর্ণতা।

হয়ত এই বার্ধক্যের কারণেই জীবনকে গুটিয়ে এনেছেন রাকীব সাহেব। বাড়ি করেছেন শহরতলির নিভৃতে। সেরা জলসাগুলোতে ডাক পড়লে গাইতে আসেন। সেও কদাচিৎ। বেশির ভাগ সময়টা তার নিরালা অবসরেই কেটে যায়।

ঢাকায় যেদিন প্রথম এলাম, সবাই মিলে দল বেঁধে সে দিনটির কথা একবার ভেবে দেখতো? মনের এক অদম্য প্রেরণা ছাড়া কিছুই তো ছিল না আমাদের। তিল তিল করে দানা বাঁধল, গড়ে উঠল আজকের শিল্পী আর গায়কগোষ্ঠী। নিজের শ্রমে, নিজের হাতে গড়া জিনিসটা ছেড়ে যাবে তুমি? বাজবে না বুকে? গানের মতোই কথাগুলো বলে গেলেন রাকীব সাহেব। তেমনি দরদ। তেমনি হৃদয়ের আবেদন।

ছাড়ছি কোথায়? ছাড়িয়ে দিচ্ছে যে? প্রতিবাদ করল মালু। তারপর নিজেকে বুঝি আর একটু স্পষ্ট করার জন্য বলল : আমার গান আমার মতো করে গাইতে পারব না। গাইতে হবে মান্ধাতার আমলের রীতি অনুযায়ী, ফরমাশ মোতাবেক। একি জবরদস্তি নয়?

সেদিন ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁর ব্যাপারটা দেখলে তো? ফস করে অন্য প্রসঙ্গে এসে গেলেন রাকীব সাহেব।

দেখলাম তো, বিড়াল ডাক, কুকুর ডাক, ইঁদুর ডাকের শোর মুচিয়ে বাজনা তাঁর থামিয়ে দিল।

ফল হয়েছে–পাট গুটিয়ে দেশান্তরী হয়েছেন তিনি।

খবরটা জানা ছিল না মালুর। তাই একটু আশ্চর্য হল। কী এক ব্যথায় মোড় খেয়ে গেল ওর শিল্পী মন।

বেদনার ছায়া নেবে এল ওদের মুখে। ওরা নীরব হল।

এক চাক জমাট স্তব্ধতা সুমুখে নিয়ে বসে রইল ওরা, মুখোমুখি অনেকক্ষণ। খ্যাতির শিখরে তৃপ্ত সুখী বৃদ্ধ শিল্পী। আর আপনার বেগে অস্থির চঞ্চল তরুণ ভক্ত।

হঠাৎ স্তব্ধতা ভাঙলেন রাকীব সাহেব, হয়ত আপনার সঙ্গীত আপনার সাধনাকে অপমৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যই ভারতে চলে গেছেন তিনি। কেননা সেখানে তাঁর সমঝদার, কিন্তু তুমি তো আর তা পারবে না। এ মাটির সাথে যে তোমার নাড়ীর বন্ধন। উপেক্ষা অনাদর অপমান নির্যাতন সব তো পথের ধুলো মালু। পথ চলতে গেলে ধুলো যে গায়ে লাগবেই।

জানি রাকীব ভাই, জানি। জানি বলেই তো ছুটে এসেছি আপনার কাছে। আসুন, আমরা একটা কিছু করি হবে আমাদের কীর্তি, আমাদের গৌরব, আপনি হবেন তার পুরোধা।

আমি? বুঝি আকাশ থেকে পড়ে শুধালেন রাকীব সাহেব।

হ্যাঁ রাকীব ভাই আপনিই, আপনাকে কেন্দ্র করে সমাবেশ হবে যত গুণী আর জ্ঞানীর। আপনাকে কেন্দ্র করেই আমরা গড়ব নতুন এক সঙ্গীত নিকেতন। যেখানে থাকবে না চিত্তবিনোদনের সস্তা চটক, থাকবে না গানের নামে প্রহসন,

ফিন ফিনে গলার চিঁ চিঁ কান্না। যেখানে স্থান নেই মামুলিয়ানার, যেখানে অনুশীলন হবে কঠিন, ব্রত হবে সৃজনের।

কী এক আবেগে গড় গড় করে বলে যায় মালু। বলতে বলতে বুঝি ক্লান্ত হয়। শ্বাস টেনে দম নেয়। ফের বলে : আমরা শুধু গাইব না, নিজেকে আনন্দ দেব না। আমরা সৃষ্টি করব সুর। পুরাতনে দেব জীবন, নতুন জীবন, নতুনে দেব অর্থ, ভাব। রাকীব ভাই, বলুন আপনি রাজি। গভীর প্রত্যাশায় চেয়ে থাকে মালু।

কিন্তু আঁশ ওঠা ফাটা কাঠের মতো বিবর্ণ সেই মুখখানিতে খেলে গেল না অভয় জ্যোতি, একটুখানি উৎসাহের দীপ্তি।

একি আর চাট্টিখানি কথা? বলা যত সহজ, করা ঢের কঠিন। সংশয়ে মাথা দোলান রাকীব সাহব।

দশটি হাত মিললে কোনো কিছুই কঠিন নয় রাকীব ভাই।

বুড়ো বয়সে এসব কী আমার পোষায়? পোষায় না।

আপনি। আপনি একথা বলতে পারলেন রাকীব ভাই? মাত্র এক শো খানি গানের রেকর্ড, এই কী আপনার আজীবনের সৃষ্টি? এতেই আপনি তৃপ্ত? আর কিছু আরও বৃহৎ কোনো স্মারক আমাদের জন্য রেখে যাবেন না আপনি? না না রাকীব ভাই আরও বড় কিছু আপনি করতে পারেন, সে বিশ্বাস আমার আছে। আপনার ডাকে জড়ো হবে দেশের শিল্পী, গড়ে তুলবে একটি সার্থক প্রতিষ্ঠান। নইলে দেখছেন না, কেমন গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে চলেছি আমরা? এ আপনাকে করতেই হবে রাকীব ভাই। চাকরি ছাড়ার পর থেকেই গত কয়েকটি দিন শুধু এ কথাটাই যে ভাবছি আমি।

যেন হোঁচট খেয়েই থেমে গেল মালু।

চোখ পড়ল রাকীব সাহেবের মুখের উপর। এ যেন মৃত্যুরই মুখ। মৃত্যুর মতোই অসহায় নির্জীব হিম ছড়ানো।

শুধু বাইরে নয় ভেতরেও বুঝি বুড়িয়ে গেছেন রাকীব সাহেব। মরে গেছে শিল্পীর সে অজেয় সত্তা। একটুক্ষণ আগে যে মানুষটি বলছিল উপেক্ষা অনাদর অপমান নির্যাতন, এ সব তো পথের ধুলো, পথ চলতে গেলে ধুলো যে গায়ে লাগবেই, এ কী সেই মানুষ? বিশ্বাস করতে কষ্ট হল মালুর।

রাকীব সাহেবই বুঝি শেষ নির্ভর ছিল মালুর। শক্ত একটা খুঁটি পাবে। পাবে আশ্বাসে প্রেরণায় দ্বিধাহীন নির্দেশ। সার্থকতর সৃষ্টির মাঝে নতুন খাতে নিয়ে আসবে জীবনটাকে, সুরের সাধনাকে।

শেষ আশাটাও বুঝি গুঁড়িয়ে গেল মালুর।

কিন্তু একি দেখছে মালু পল্লীগীতির সম্রাটের চোখে? চমকে কেঁপে কেমন শিরশিরিয়ে গেল ওর গাটা।

এই যে দেখছ সব কিছু পাওয়ার নিটোল সুখের ছবিটি, এ যে মিথ্যা। মিথ্যা এই নিরালা তুষ্টি, এই প্রশান্তির সমাহিতি। সবটাই যে খোলস–এই নাম ধাম যশ আড়ম্বর। জীবন তো মোটে একশখানি গানের রেকর্ড। আর কিছু কী? একশখানি কীর্তি গাথা, আর কত ভ্রান্তির আমলনামা, কে জানে–এতো খ্যাতির শিখর নয়, আশার ভগ্ন দেউল। অঙ্গার-স্তূপ। রাশি রাশি ছাই অতৃপ্তির। ব্যর্থতার।

এক লহমায় দৃষ্টির অতল থেকে এত ইতিহাস কথা কয়ে উঠতে পারে? অদ্ভুত অকপট এক স্বীকৃতি রাকীব সাহেবের ঝাপসা চোখে। নিঃশব্দে বেরিয়ে এলো মালু।

চলতে চায় না পা। ছ্যাঁচড়াতে ছ্যাঁচড়াতে পা দুটোকে ও নিয়ে এল হলদে বাড়ির সেই সাদা দেয়ালের কামরায়।

না আসার মতোই অফিসে আসে মালু। একান্ত জরুরি কাজগুলো সেরেই বেরিয়ে যায়। অকারণেই বুঝি ঘুরে বেড়ায়। পদত্যাগপত্র ওর গৃহীত হয়েছে নতুন লোক আসা সাপেক্ষে।

চা আনব ভাই?

মুখ তুলে তাকায় মালু। করিম মিঞার কণ্ঠে আত্মীয় বিয়োগ বেদনা। তোমার জন্যও। বলে একটু বুঝি হাসল মালু।

শোন ইয়াসীন। কাল পরশু এসে যাবে নতুন লোক। বকেয়া কাগজ পত্র সব ঠিক করে রাখছো তো?

ইয়াসীন বুঝি কানেই তুলল না কথাটা। ওর অন্যদিকে ফিরিয়ে রাখা চোখের দৃষ্টিটা পানির ভারে ঝাপসা।

শুধু শুধু কী যে ঝামেলা ডাকলেন ভাই সাহেব! শুভাকাঙ্খীর মোলায়েম স্বরে বলল ইয়াসীন।

ঝামেলা? ঝামেলা কোথায় নেই বলতো? এবারও যেন ম্লান মুখে আধখানি হাসি ফোটাতে চায় মালু। বলল আবার : সেই যে হোসনা, সুন্দরের আকর, সেও কী কম ঝামেলা ইয়াসীন? বল, ঝামেলা নয়?

ফাইলের আড়ালে তক্ষুণি বুঝি অদৃশ্য হয়ে যায় ইয়াসীনের মুখখানি। হোসনার নামে যত রাজ্যের লজ্জা এসে ঘিরে ধরে ওকে।

কত আশ্বিনের শেফালী ঝরে গেল। কত সুন্দর লজ্জা মাথা কুটে মরে গেল। তবুও কী তুমি মোহাম্মদ ইয়াসীন, ঝামেলা মুক্ত হয়েছ? নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে বলতে পার, ব্যর্থ যাবে না আগামী আশ্বিনের সোনালী ভোর? এ বুঝি মালুর নিজেরই ভাবনার প্রক্ষেপ, অপূর্ণ কোনো আকাক্ষার খেদোক্তি? আপন মনে নিজকে শোনাবার জন্যই বলে চলেছে।

মুখ সমেত মাথাটাকে টেবিলের তলায় চালান দিতে পারলেই বুঝি বেঁচে যেতো ইয়াসীন। ফাইলের আড়াল থেকেই জবাব দেয় : হলাম গিয়ে ছাপোষা মানুষ। ঝামেলা ঝক্কিই তো নিত্যকার জীবন।

এবার হো হো করে হেসে উঠল মালু। বলল, এতক্ষণে খাঁটি কথাটি বলেছ ভাই। আরে ঝামেলা ঝক্কি, হ্যাঙ্গাম হুজ্জতই যদি থাকল না, তবে আর বাঁচা কেন। ওই এক স্বাদ, টক মিষ্টি অম্বলের মতো।

কথাটার আগামাথা কিছুই বুঝল না ইয়াসীন। হঠাৎ এমন বেদম হাসিরই বা কী কারণ ঘটল তাও ভেবে পায় না ও। কিন্তু, গান গাইছেন না কেন? এটা অন্যায়। সংকোচ ভরে বলল ইয়াসীন।

হ্যাঁ অন্যায়। রাকীব ভাইও তাই বলে। গম্ভীর আর ম্লান হয়ে গেল মালু। চা। এল।

যন্ত্রের ঠোঁট দিয়েই যেন চা টানে মালু, নিঃশব্দে। দৃষ্টিটা ওর ঘুরে বেড়ায় ঘরময়। ক্যালেন্ডারে গত মাসের একটি তারিখের তলায় লাল পেন্সিলের দাগ। ঘড়ির কাঁটাটা কবে যে পাঁচের ঘরে পৌঁছে থমকে গেছে কেউ তার খবর রাখে না। সেকেন্ডের কাঁটাটা পা পিছলে নিজের ঘর ছেড়ে অনেক দূরে এসে আশ্রয় পেয়েছে। আর একটি ক্যালেন্ডারে বিদেশি মহিলার ছবি কেন যে মুখ ঢেকে ওদের দিকে পিঠ করে রয়েছে, বোঝে না মালু।

উল্টো দিকের খোলা কপাট আর দেয়ালটুকুর ফাঁকে একটা মরা মাকড়সা চিৎ হয়ে ঝুলে রয়েছে। নিজের জালে জড়িয়েই মরেছে বেচারী। ওপাশের জানালার শিকে ঝুলছে কালির ঝুল। খেয়াল রাখছে না মালু, তাই এমনি দুরবস্থা ঘরটির। ইচ্ছে হল করিম মিঞাকে ডেকে একটু ধমকে দিক। কিন্তু ডাকতে গিয়ে ওর গলার স্বরটা যেন নিচের দিকেই নেবে গেল। এ ঘরের সাথে সম্পর্ক তো তার চুকেই গেছে। কী হবে অযথা করিম মিঞাকে হয়রান করে।

গান তো আমি ছেড়ে দিয়েছি ইয়াসীন! অনেকক্ষণ পর ইয়াসীনের কথাটার জবাব দিল মালু।

গান ছেড়ে দিয়েছেন? না না না, এ আমি বিশ্বাস করি না। কী এক আকুলতায় যেন চেঁচিয়ে উঠল ইয়াসীন।

ওরা বলে আমার সুর নাকি বিধি নিয়মের বাইরে। তাই অপাংক্তেয়।

কিন্তু যা গাইছিলেন?

একটু যেন ভাবল মালু। বলল : যা আছে শুধু মাত্র সেটুকুও নিয়ে কেউ তুষ্ট থাকতে পারে ইয়াসীন? তুমি পার?

তা আর পারি কই। চাকরি যখন ছিল না তখন ষাট টাকাই মনে হয়েছে স্বর্গ। এখন আশি টাকায়ও অসন্তোষ। কেননা আজ আছি একলা তাই কোনো রকম চলছে। কিন্তু কাল?

হ্যাঁ হ্যাঁ। কাল তো তোমরা দুজন।

পরশু? তখন হব তিনজন, কী আরো বেশি। তোড়ের মুখে বলে ফেলেই বুঝি লজ্জা পায় ইয়াসীন। মুখটাকে তাড়াতাড়ি অন্যদিকে ঘুরিয়ে লজ্জা ঢাকে।

ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা অনিশ্চয়তা সব কিছু মিলিয়ে কেমন স্পষ্ট করে ভাবে ইয়াসীন। বর্তমানটা যেমন গণ্ডিবদ্ধ, কল্পনাটাও বুঝি তেমনি বলগা ধরা, কখনো যায় না আয়ত্তের বাইরে। এরি মাঝে ছোট ছোট ইচ্ছার সুন্দর রূপায়ণ। আর সেটাই বুঝি জীবনে পরমতম আনন্দ। সব মিলিয়ে যেন বাহুল্য বর্জিত সাদাসিধে একতারা। একতারার সহজ স্বচ্ছন্দ সুর। ইয়াসীন আর হোসনা, যাকে এখনো দেখেনি মালু, একটি সহজ জীবনের জন্য ওদের নিঃশব্দ আরাধনার কথাটা ভাবতে গিয়ে আজ কেন যেন বিশেষ করে ভালো লাগল মালুর। আর একদিন এমনিভাবে বিশেষ করে ভালো লেগেছিল ইয়াসীনকে। যেদিন শরমে লাল হয়েও

জানিয়েছিল পয়লা আশ্বিনের কথাটা। এই বুঝি ভালো। ওই একতারার মতো অনাড়ম্বর সহজ সুর। অনেক তারে টংকার তুলে অনেক ঝংকারের অনেক অমিলের দুরন্ত সমুদ্রে দিশে হারাবার বিড়ম্বনার চাইতে এই তো ভালো। যেমন ভালো উঁচু নীচু পাথর ছড়ান পথে টক্কর খেয়ে ক্ষত-বিক্ষত হওয়ার চেয়ে ছোট্ট কোনো নীড়ের মোলায়েম শয্যা।

হঠাৎ যেন আলপিনের খোঁচা খেয়ে চমকে উঠল মালু, কী সব ভাবছে ও। টাল হয়ে আছে চিঠি। বিরক্তি ভরে মালু ঠেলে দিল চিঠির টালটা। এ সব চিঠিতে আর কোনো আকর্ষণ নেই ওর।

ফাইলের ভেতর মুখটা ডুবিয়ে আছে ইয়াসীন। সেদিকে তাকিয়ে বুঝি আগের কথাটারই জের টানল মালু : আমি বলছিলাম ভালোর চেয়ে ভালো, উত্তমের চেয়ে উত্তম, তার আকাঙ্ক্ষা, তার চাহিদা। এই স্বাভাবিক কথাটাকেই আমল দেয় না কিছু লোক।

ঘাড় গোঁজা কলম ঠেলা লোকটি বুঝি ঘাড়টাকে একটু সিধা করল। বিড় বিড় করে বলল : ভাগ্যিস গরিবের ওসব ঘোড়া রোগ নেই।

মালুর কান পর্যন্ত পৌঁছল না কথাটা, ও জিজ্ঞেস করল, কিছু বলছ?

বলছিলাম হোসনার পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে। পয়লা আশ্বিন কিন্তু আপনাকে আসতেই হবে। উঠে এসে দাওয়াতের চিঠিটা মালুর হাতে তুলে দিল ইয়াসীন।

বাহ। কার্ড সব ছাপানো সারা? চমৎকার। খাম খুলে কার্ডটার উপর একবার চোখ বুলালো মালু। তারপর পিঠ চাপড়ে উচ্ছ্বাসের বন্যা ঢেলে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল ইয়াসীনকে। আনন্দটা যেন তারই, ইয়াসীনের নয়।

তা হলে ইয়াসীন, আশ্বিনের লগ্নটি সত্যি এল? এল পয়লা আশ্বিনেই? শিশির ছোঁয়ায় নরম হয়ে। শিউলির মতো পবিত্র হয়ে, মিষ্টি রোদে ঝলমলিয়ে। তাই না?

সলজ্জ হেসে সরে যায় ইয়াসীন। কাব্যিক হতে পারে না ও, অথবা জানে না।

ইয়াসীনকে ছেড়ে বেরিয়ে এল মালু।

অকস্মাৎ মনের সমস্ত গ্লানি আর তিক্ততা কোথায় যেন উবে গেছে। মনটা ওর ভরে গেছে নির্মল এক আনন্দে। আহা, তবু তো এক জোড়া মানুষ সুখী হল পৃথিবীতে। এ পৃথিবীতে কোনো মানুষকে সুখী দেখবার চেয়ে আর কোনো বড় আনন্দ নেই।

৫৯.

একটি মেয়ে। সে যে এত যন্ত্রণা জানত না মালু।

দুপুর বেলায় খেতে এসেছে মালু। কিন্তু, টেবিলের কাছটিতে এসেই সমস্ত ক্ষিধে ওর উবে গেল। ঘন কালির পোঁচ পড়ল ওর মুখে।

বিদ্যে তো তোমার ডিম ভাজা আলু সেদ্ধ। এই মোরগ-পোলাও আর কোর্মা এল কোত্থেকে? ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করল মালু।

মুখ লুকিয়ে মিটমিট করে হাসে ছেলেটা।

এই প্রথম নয়। এর আগেও কয়েকদিন এরকম হয়েছে। রিহানা এসে রান্না করে গেছে।

একটা একটা করে ডিশগুলো তুলে মেঝেতে ছুঁড়ে মারল মালু। ঝনঝনিয়ে টুকরো টুকরো হল চীনে মাটির বাসন খোরা।

দুরন্ত ইচ্ছা জাগল মালুর–কয়টিই বা সিঁড়ি, টপাটপ ডিঙিয়ে উঠে যাক উপরে। কথার তীরে বিদ্ধ করবে রিহানাকে। ফুঁড়ে ফুঁড়ে রক্ত ঝরাবে। নোংরা হবে মালু। ইতর হবে কুৎসিত হবে। স্বামিত্বের অধিকারে পরাভূত করবে ওকে। তারপর পাঁজা কোলা করে ওকে নিয়ে আসবে এক তলায়, সেই ঘরে যেখানে ওর বিকাশ, যেখানে ওর মর্যাদা।

ইচ্ছাটা ইচ্ছাই রইল।

ভীষণ হতে পারল না মালু, ইতরও হতে পারল না। পারল না ছেলেটাকে উপরে পাঠিয়ে রিহানাকে একবার ডেকে আনাতে। এ সবে নিজেকেই ছোট করা হবে আর অপমান করা হবে রিহানাকে।

আশ্চর্য হয় মালু। ওর ভেতরের সেই শক্তিটা যার নাম পৌরুষ, যার নাম সংযম সেই শক্তিটা বার বার ওর স্বামিত্বের অধিকার বোধটাকে খর্ব করে দিয়ে যায়। ও পারে না নৃশংসতার উত্তরে নিষ্ঠুর হতে, ভয়ংকর হতে। ভেবে পায় না মালু, এ কী ওর পৌরুষ না কী দুর্বলতা?

মালুকে খতিয়ে দেখতে হয় নিজের মনটা।

আচমকা কী এক আঘাত খেয়ে সারা দেহটা ওর টন টন করে উঠল। অবাক হল মালু। কখন নীড় বেঁধেছে একটি ভালোবাসা। হৃদয়ের সহস্র পথে শিকড় চালিয়ে

বেড়ে উঠেছে। টের পায়নি মালু। অথবা টের পেয়েও অস্বীকার করেছে। ও ভালোবেসেছে রিহানাকে।

অথচ এই দুর্বল অর্থহীন অনুভূতিটাকেই আপন পৌরুষের শক্তি বলে ভুল করে এসেছে মালু। এখানেই বুঝি ওর সবচেয়ে বড় পরাজয় রিহানার কাছে।

রিহানা জানে, ভালোবাসার দুর্বলতা নেই ওর। ভালোবাসা ছিল না কোনোদিন। ছিল মোহ। সেই মোহ ওর ভেঙে গেছে। তাই নিজেকে সরিয়ে নিয়েছে ও, সরিয়ে নিতে পেরেছে এত সহজে। ও বুদ্ধিমতি। আপনার শক্তির উপর ওর অবিচল আস্থা। তাই তো পারছে ও অমন নৃশংস হতে। আর ও জানে মালুর রয়েছে ভালোবাসার দুর্বলতা।

ডিশ ভাঙার তিন কী চারদিন পর।

খুট করে একটা শব্দ হল। যেন বাতাসের গর্ভ থেকেই উঠে এল রিহানা। বসল খাটের পাশে চেয়ারটিতে। বলল : কোথায় কোথায় থাক, সারাদিন তোমার যে দেখা পাওয়াই ভার। উল্টো অভিযোগ রিহানার।

ঘুরে বেড়াই। সংক্ষেপে বলল মালু।

সেই ভালো। মনের জ্বালা, সুরের জ্বালা সবই ভুলে থাকা যায়।

ঘরটার চারিদিকে চোখ বুলিয়ে আনল রিহানা। যেন দেখে নিল সব ঠিক আছে কিনা। তারপর প্রসঙ্গটা পাল্টিয়ে দিল : বেচারা চাকরটার উপর ঝাল ঝেড়ে লাভ কী? থালা বাসনগুলোরও কোনো দোষ ছিল না। আমি তো ভাবলাম কী দক্ষযজ্ঞই না বাধিয়ে তুলছ। নিচে নেমে দেখলাম তুমি বেরিয়ে গেছ।

কে বলে তোমায় আসতে? কেন আস? কেন এমন করে দিনগুলো আমার দুর্বিষহ করে তুলেছ?

ওরে বাবা! এ যে দেখছি রাগ! তা হলে রাগও হয় তোমার? রিহানার চোখে বিদ্রূপের ঝিলিক।

খুশি হয়েছ বুঝি? সীমার মাঝে নিজেকে বেঁধে রাখবার ব্যর্থ চেষ্টায় ঠোঁটগুলো কেঁপে কেঁপে যায় মালুর। স্বরে আসে বিকৃতি।

খুশি হব না? ভালোবাসলেই ঈর্ষা আসে মানুষের। ঈর্ষা থেকে রাগ। এতো উন্নতি হয়েছে তোমার। খুশি হব না?

মালুর দুর্বল জায়গাটুকুতেও হাসতে হাসতেই বুঝি বল্লমের তীক্ষ্ণ আগাটা বসিয়ে দেয় রিহানা।

এতো উন্নতি নয়। আমার অধঃপতন। কেমন ব্যথাতুর অসহায় মালুর গলাটা।

যাক বাঁচলাম। অহংকারটা এখনো অটুট আছে তোমার। বিদ্রূপের ঝিলিকটা এবার তেরছা একটা হাসি হয়ে ছুটে যায়।

বাঁচলে কী রকম? ওর কথার বুঝি খেই পায় না মালু।

বাঁচলাম না? আমার তো ভয় ছিল দেখা হলেই পায়ের উপর লুটিয়ে পড়বে তুমি। যেমন পড়ে সব পুরুষ। ইনিয়ে বিনিয়ে কান্না জুড়বে, উত্ত্যক্ত করবে আমায়।

মালুর মনে হল ঠাণ্ডা মাথায় বুঝি খুনও করতে পারে রিহানা।

তা না করে যদি এখন বেঁধে রাখি তোমায়?

ও, স্বামিত্বের অধিকার ফলাবে? সেও পারবে না। তোমার অহংকারে বাধবে।

আমাকে ক্ষমা কর রিহানা। সেদিন অন্যায় করেছিলাম...

মালুর কথাটা শেষ হবার আগেই বলে গেল রিহানা : সেদিনের বর্বরতার জন্য তুমি অনুতপ্ত। সে তোমার চোখ দেখেই বুঝেছি। কিন্তু, ওইটুকুও আর পারবে না। কেননা শক্তি তোমার ফুরিয়েছে।

ফুরিয়েছে বলছ তুমি?

আমি বলছি স্বামিত্বের নৈতিক অধিকার, ভালোবাসার নৈতিক জোর যে আমার পক্ষে। সেই তো আমার শক্তি। যে শক্তি আমি এই মুহূর্তে প্রয়োগ করতে পারি তোমার উপর।

আর আমার শক্তি ঘৃণা। ঘৃণা দিয়েই আমি রুখব তোমার বর্বরতা। তোমার জবরদস্তি।

ঘৃণা? যেন দূরাগত কোনো আর্তনাদের মতোই রিহানার কথাটার প্রতিধ্বনি করল মালু।।

বলল মালু : আর ওই কালোবাজারের পাণ্ডাটি? ওখানে বুঝি শুধু ভালোবাসার মিষ্টি সুধা? এতক্ষণে একটুখানি ইতরামির ঝাঁঝ ঢালতে পেরে যেন খুশি হল মালু।

অদ্ভুত। রাগল না রিহানা।

আকর্ষণের, বন্ধনের শেষ সুতোটাও বুঝি ছিঁড়ে ফেলেছে ও। হয়ত তাই প্রতি আঘাতে উদ্যত হবার প্রয়োজনটাও ফুরিয়েছে।

গম্ভীর হল রিহানা। বলল : জানি ওসব নোংরা চিন্তাই গিস গিস করছে তোমার মাথায়।

কাজটাও নোংরা, অতি নোংরা, জঘন্য। দ্বিচারণ। কথার চাবুক মেরে ছিঁড়ে ছুঁড়ে ওকে বুঝি মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে চায় মালু।

চেঁচিয়ো না। চাপা গলায় ধমক দিল রিহানা। দৃষ্টিটাকে তীরের ফলার মতো তীক্ষ্ণ করে ধরে রাখল মালুর মুখের উপর। বলল : অভিযোগটার জবাব দিতেও ঘৃণা বোধ করছি। কিন্তু, একটা কথা শুধাই, কালো বাজারের পাণ্ডার কাছেই যদি আমি সুখ পাই তাতে তোমার অত জ্বালা কেন? একি গায়ক মহলে তোমার মান গেল বলে, না অন্য কিছু?

রিহানাও বুঝি ঠিক করে এসেছে আজ, স্থূল হবে, ভোঁতা হবে; এতটুকু আব্রু রাখবে না শালীনতার অথবা রুচির।

ঠিক। আবগারি কর্তার কন্যার যোগ্য কথা বটে। মালুও ভোঁতা আঘাতটা ফিরিয়ে দিয়ে বিকৃত এক আনন্দের তৃপ্তি পেল। অবশেষে রিহানাও বুঝি রাগল। মালু দেখল লাল রাগটা ওর ফর্শা মুখের ত্বক বেয়ে ছড়িয়ে পড়ছে গলার শিরায়।

এটা তো গালি হল। আমার কথার জবাব হল না।

জবাব যা সে তো তোমার কাছে, রিহানা। দেখছ না? রোঁয়ায় রোঁয়ায় জ্বলছি আমি? অনুক্ষণ দগ্ধ হয়ে চলেছি? আমি যে আর সইতে পারছি না রিহানা।

নোংরা হতে গিয়ে ইতর হতে গিয়ে এ কী কাঙ্গালের কান্নায় ভেঙে পড়ল মালু?

কোন্ ছুমন্তরে উড়ে গেল রিহানার মুখের টকটকে রাগটা। তীক্ষ্ণ এক বিদ্রূপ ঝিলিক খেয়ে নেচে গেল ওর চোখের তারায়। তারপর গোটা শরীরটাকে ঢেউয়ের মতো ফুলিয়ে দুলিয়ে দমকা হাসিতে যেন লুটিয়ে পড়ল রিহানা। থামতে চায় না ওর হাসি।

মালুর সারা গায়ে বুঝি ফোসকা তুলে যায় ওর হাসিটা।

ইস্! শেষমেষ অহংকারটাকেও বিসর্জন দিলে? রইল কী তোমার? এর পরই হয়ত পায়ে ধরবে।

যেন সে রকম পরিস্থিতিতে বিব্রত হতে চায় না রিহানা। তাই পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে যায় ও। চটর চটর চটির বোল তুলে উঠে যায় দোতলার সিঁড়িতে। কিন্তু কী মনে করে তখুনি ফিরে আসে। বলে, একটা সৎ পরামর্শ দিতে পারি?

কি? ক্লান্ত স্বর মালুর।

গান ফানে যে কিছু হবে না সে তো দেখতেই পাচ্ছ। রোজগারের অন্য পথ দেখ, তাতে রোজগারও হবে ভালো, মেজাজটা থাকবে শান্ত। অপেক্ষা করে না রিহানা। কথাটা শেষ করেই যেমন এসেছিল তেমনি চলে গেল।

অথচ, কী আশ্চর্য!

এই রিহানাকে কাঁদতে দেখল মালু। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বালিশে মুখ গুঁজে কেঁদেছে রিহানা।

৬০.

সারা সকাল আর দুপুর ইয়াসীনের সাথে ঘুরতে হয়েছে মালুকে। ইয়াসীন বিয়ের বাজার করছে।

দুপুরটা যখন বিকেলের দিকে গড়িয়ে পড়েছে সেই সময় বাসায় ফিরল মালু। দেখল বসবার ঘরের কপাটটা ভোলা।

পরিচ্ছন্ন ঝকঝকে বসবার ঘর। প্রথম দিন যেমন সাজিয়েছিল রিহানা মনে হয় ঠিক তেমনি। গতকালও এঘরে এসেছিল মালু একটা আলপিনের খোঁজে। ঘরে ঢুকেই দমটা আটকে এসেছিল। রিহানা উপরে উঠে যাওয়ার পর থেকেই ঘরটা বন্ধ। আলোহীন ঘরে ধুলো বালি জমে বিশ্রী গন্ধ আর গুমোটের রাজত্বটা জেঁকে বসেছে। তাড়াতাড়ি জানালাটা খুলে কোনো রকম নিশ্বাস নিয়েছিল মালু।

কাচঢাকা বইয়ের তাক, তারই এক কোণে আলপিনের বাক্সটা গুঁজে রেখেছিল রিহানা। কোনো রকমে আলপিন নিয়ে ছুটে বেরিয়ে এসেছিল মালু। শোবার ঘরে এসে ভেবেছিল এত শখ করে, এত যত্ন দিয়ে যে ঘরটা সাজিয়েছিল রিহানা সে ঘরটার কথা কী একবারও মনে পড়ে না ওর?

অনেকদিন ঘরে বসে না মালু। আজ বসল। পাখাটা ছেড়ে দিল। জামাটা খুলে ফেলল। হাওয়া খেয়ে গাটা ঠাণ্ডা করল।

অনুরাগ সুরুচি আর যত্নের হাত দিয়ে যে ঘরটা সাজিয়েছিল রিহানা হয়ত সে ঘরটার কথা মনে পড়েছিল ওর। হয়ত তাই আজ নিচে এসেছিল ও। পরিষ্কার করে সাজিয়ে গুছিয়ে আবার উঠে গেছে ওপরে। হয়ত তক্ষুণি তক্ষুণি উঠে যায়নি রিহানা। পরিশ্রম করে হাঁপিয়েছিল। দু দণ্ড বিশ্রাম নিয়েছিল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে নিশ্চয় ওর মনে পড়েছিল অনেক কথা, প্রথম প্রেমের আশ্চর্য মধুর অনুভূতিগুলোর কথা ঘুম ঘুম আবেশে মুগ্ধ প্রহরগুলোর কথা। সত্যি কী তাই? সে সব কথা কী আজ মনে পড়ে রিহানার? ওর ভাবনার পৃথিবীতে কী জেগে ওঠে সে সব মুগ্ধ প্রহর? আসলে এটা মালুরই মনের মাধুরী। এক দণ্ড বসেনি রিহানা। কোনো কিছু ভাবেনি। তীব্রভাবে তীক্ষ্ণভাবে কোনো কিছু অনুভব করার ক্ষমতা ওর নেই, ছিল না কখনও। ওর আছে প্রত্যাঘাতের হৃদয়হীন নিষ্ঠুর স্থূল ইচ্ছা। সেই ইচ্ছাটাই ওকে টেনে এনেছিল।

ঘরময় ঘুরে বেড়ায় মালুর চোখজোড়া।

একটা জাপানী পুতুল কিনেছিল রিহানা। দাম নিয়েছিল সাড়ে তিন শো টাকা। দামের অঙ্কটা শুনে মালু প্রায় হার্টফেল করছিল। কিন্তু রিহানা ওকে বুঝিয়ে দিয়েছিল, আসলে পুতুলটা বেশ সস্তাই হয়েছে। দোকান থেকে এনে যেখানে রেখেছিল রিহানা ঠিক সেখানেই রয়েছে পুতুলটা।

ফুলদানির শখ ছিল রিহানার। দেশি, বিলেতী, জাপানী-নানা দেশের, নানা সাইজের, নানা রংয়ের ফুলদানি। কোনোটা চীনে মাটির, কোনোটা বাঁশের, কোনোটা শেলাকের, কোনোটা খাঁটি দেশি মাটির মসৃণ পালিশ করা, কোনোটা পেতলের, নিরলংকার অথবা মোরাদাবাদী কাজ করা।

ঢাকার দোকানে যত দেশের যত কিসিমের ফুলদানি পাওয়া যায় সবই এনে জড়ো করেছিল রিহানা। আতঙ্কিত মালু চেঁচিয়ে উঠেছিল, এ কী করছ রিহানা? ঘরটাকে কী ফুলদানির দোকান বানাবে।

মালুর শঙ্কিত চিৎকারটা গায়ে না মেখে বলেছিল রিহানা, দেখই না কেমন করে সাজাই।

মালু দেখেছিল এবং চুপ করে গেছিল। ওকে চুপ হতে হয়েছিল কেননা ঘরের কোণে, শো-কেসের মাথায়, দরজার পাশে, বইয়ের তাকের ফাঁকে, কোথাও

ফুলের গুচ্ছ, কোথাও বিনা ফুলে, ফুলদানিগুলোর অবস্থান ওকে খুশি করেছিল। বিজয়িনীর হাসি হেসেছিল রিহানা।

ঘরময় ঘুরে বেড়ায় মালুর চোখ। সেই পুতুল, ফুলদানি, যেটির পেছনে রিহানার নিজের হাতের বুটি-কাজ, যেটি যেখানে ছিল তেমনি রয়েছে। নেই শুধু রিহানা।

খচ করে কী যেন বিঁধে গেল বুকের ভেতর। বুকের ভেতর সেই চিন চিন ব্যথাটা। রিহানা নেই ওর জীবনে, এই নিষ্ঠুর সত্যটাকে আজও মেনে নিতে পারছে না মালু। মেনে নিতে কষ্ট হয়।

বুঝি এই কষ্টটাকে অস্বীকার করার জন্যই গাঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল মালু। হাতে তুলে নিল পাঞ্জাবিটা, এল শোবার ঘরে।

বিছানার কাছে এসে থমকে দাঁড়াল মালু। বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে আছে রিহানা। রিহানা কাঁদছে।

হতভম্ব মালু। কী করবে, কী করা উচিত জানে না ও। এই মুহূর্তে গোটা দোতলা বাড়িটাই যদি ভেঙে পড়ত ওর মাথায় তাহলেও বুঝি এমন বেদিশা হত না মালু।

বিছানায় রিহানার পাশে বসে ওর মাথায় সান্ত্বনার হাতটা বুলিয়ে দিতে চাইল মালু। পারল না।

রি–, প্রিয় সম্বোধনে রিহানাকে ডাকতে চাইল মালু। পারল না। আওয়াজ নেই গলায়।

বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে রিহানা। কান্নাটা যেন আসছে দুর্বার কোনো স্রোতের মতো। ওকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। বুঝি তাই বালিশটাকে প্রাণপণে আঁকড়ে রয়েছে রিহানা।

দুহাতে টেনে নিক কান্না-চৌচির দেহটাকে। অনুরাগে চুম্বনে মুছে দিক ওর সমস্ত কান্না। দুরন্ত ইচ্ছেটা মালুকে টেনে আনল বিছানার মাথায়, রিহানার খোলা বাহুর পাশে।

ততক্ষণে মুখ তুলেছে রিহানা। চোখ মেলেছে। আধ-ভেজা বালিশটাকে সরিয়ে রেখেছে একপাশে। ভেজা এলোমেলো চুলে ঢাকা পড়েছে রিহানার অর্ধেকখানি মুখ, একটা চোখ। কানের পাশের গুঁড়ো গুঁড়ো চুলগুলো মানচিত্রের চিকন কালো রেখার মতো সেঁটে রয়েছে ওর গালে। কান্নার মাঝেও এমন সুন্দর রিহানা? মালুর

বুক জুড়ে ভালোবাসা। ভালোবাসাটা কী এক করুণার নিঃশব্দ কান্নায় ভেঙে পড়ল, মালুকে ভাসিয়ে নিল।

ভালবাসা দুর্মর। দুর্নিবার রিহানার আকর্ষণ। এই মুহূর্তে সমস্ত পৃথিবীটাই বুঝি মিথ্যা। মিথ্যা সঙ্গীত, মিথ্যা গানের আরাধনা, চেতনার কশাঘাত, দায়িত্বের বোঝ। সত্য শুধু রিহানা। এই মুহূর্তে সব কিছু ছেড়ে দিতে পারে মালু রিহানার একটি মধুর নির্দেশে।

পাখির পালকের মতো মসৃণ রিহানার বাহু। সে বাহুটাই স্পর্শ করল মালু। রেশমের মতো মিহিন পিছল চুল রিহানার। সে চুল স্পর্শ করল মালু। কানের নিচে রিহানার বাহুর পাশটা জড়িয়ে রয়েছে এক গোছা চুল। একদিন বুঝি এখান থেকেই রিহানা এক গুচ্ছ চুল কেটে নিয়েছিল, সোহাগ করে গুঁজে দিয়েছিল মালুর হাতে। সে চুলগুলো এখনও লম্বা হয়নি।

ভালবাসার মতোই বুঝি ভালোবাসার কান্না। এর কোনো শুরু নেই, এর কোনো শেষ নেই। অথবা এর শুরু আছে, শেষ নেই। মালুর বুক জুড়ে সেই কান্নার ঢল।

আর একটু কাছে এল মালু। রিহানাকে টেনে নিল কোলের পাশে। বলল, চল রি। আমরা চলে যাই অন্য কোথাও, অনেক দূরে; যেখানে জাতের বড়াই নেই, ধনের দম্ভ নেই। যেখানে মিথ্যার আঘাতে মৃত্যু হয় না ভালোবাসার। যেখানে গুণের সমাদর। চল যাই সেখানে।

আহ্। বিরক্ত হল রিহানা। ঠেলে বিছানা থেকে সরিয়ে দিল মালুকে। এক চোখেই তাকিয়ে আছে রিহানা। চোখের পাতাগুলো এখনও ভেজা। অশ্রুর কণাগুলো এখনও শুকায়নি। চোখের কোণ দিয়ে গড়িয়ে পড়া কান্নার দাগটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে মালু।

উহ্! যাও তো তুমি! আমাকে একটু একলা থাকতে দাও। দোহাই তোমার। চেঁচিয়ে উঠল রিহানা। কান্নার ঢেউ হয়ে ভেঙে পড়ল আবার। বসবার ঘরে এল মালু। তারপর বারান্দায়। বারান্দা থেকে চত্বরে পাম গাছটির তলায়।

পাম গাছের তলা থেকেও শোনা যাচ্ছে রিহানার কান্না। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে রিহানা।

কেন অমন করে কাঁদছে রিহানা?

পাম গাছের তলায় দাঁড়িয়ে প্রশ্নটার জবাব খোঁজে মালু।

৬১-৬৫

রিহানা কী নাববে না?

দোতলার বাসটা কী চিরস্থায়ীই করে ফেলল ও?

একটু চিকন হাওয়া। হলুদ রং বিকেল। এক চিলতে পড়ন্ত রোদ পাম গাছটির মাথায় চড়ে দোল খাচ্ছে ধীরে ধীরে নিশ্চিন্ত সুখে, সে দিকে চোখ রেখে বিদায়ের রাগিণীটি কী এক করুণ সুরে বেজে উঠল মালুর বুকের কোমলতায়।

কিন্তু আজ যদি নাবত রিহানা। চটচট চটির বোল তুলে আঁচল উড়িয়ে যদি নিচে আসত একবার!

যেমন ও আসে অসতর্ক অপ্রস্তুতির মুহূর্তে। কখনও সকালে কখনও বা এমনি হলুদ রং বিকেলে। নিঃশব্দে যন্ত্রণার হুল ফুটিয়ে আবার চলে যায়। রেখে যায় দাগ, নরম মাংসে নৃশংসতার চাবুকের মতো। হাজার চেষ্টাতেও যা মুছে ফেলা যায় না। জেগে থাকে নিষ্ঠুরতার কাল চিহ্ন হয়ে।

চিতি পড়ে বিশ্রী হয়ে আছে টেবিল ল্যাম্পের পেতলের স্ট্যান্ডটা। ব্রাসে ঘষে পরিষ্কার করে রিহানা। ঢাকনিটার উপর জমেছে ধুলোর আস্তর। ঝেড়ে সাফ করে যথাস্থানে বসিয়ে রাখে রিহানা। বিকেলে ঘরে ঢুকেই চোখে পড়ে মালুর, ঝকঝকে পেতলের গায়ে ওরই মুখের প্রতিবিম্ব। যেন অদৃশ্য চাবুক পড়ে চাক চাক তুলে নেয় ওর গায়ের মাংস। ক্ষিপ্র হাতে বাতিদানিটা তুলে নেয় ও, আলমারির শেষ তাকে ছুঁড়ে দিয়ে চাবি আঁটে।

পরদিন বেরুলনা মালু। অপেক্ষা করে রইল ঘরে। কিন্তু রিহানা এল না। তার পরদিনটাও শুয়ে কাটিয়ে দিল মালু। রিহানা যখন নাববে একবারটি শুধু শুধাবে ওকে, কী আনন্দ পাও রিহানা আমাকে অমন যন্ত্রণা দিয়ে?

কিন্তু কোথায় রিহানা।

আজ ওসব কথা কিছুই বলবে না মালু। যে মুখে অজস্র ভালোবাসার চুম্বন এঁকেছিল মালু সে মুখটা আজ দু হাতে তুলে নেবে ও। মোমের মতো নরম যে চোখ, মোমের মতো স্নিগ্ধ শিখায় জ্বলন্ত যে চোখের তারা, যে চোখের কোমল গভীরে ও দেখেছিল ওর সুরের প্রতিবিম্ব, ওর গানের ঝংকার, দুঃসাহসী হবার প্রেরণা, সে চোখের উপর চোখ রাখবে মালু শেষ বারের মতো।

উৎকর্ণ হল মালু।

অনেকগুলো মেয়েলী কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে দোতলায়। ওরা ছয় বোন আর রিহানা। হয়ত সবাই মিলে ওরা বেরুবে এক্ষুণি। হয়ত একলাই বেরুবে রিহানা। বেরুবার পথে একবার উঁকি মারবে এখানে।

নাঃ। দোতলাটা আবার নিঃশব্দ। মনে হয় না কেউ রয়েছে সেখানে। পাম গাছের মাথায় সেই এক চিলতে হলুদ রোদ, এখনও দোল খাচ্ছে ধীরে ধীরে নিশ্চিন্ত সুখে।

কিন্তু, আজ নাবছে না কেন রিহানা? ওকে ভীষণ দরকার মালুর। শেষ কথাটা কতবারই তো কতভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরস্পরকে বলেছে ওরা। তবু যেন বলা হয়নি। আজ শেষ বারের মতো শেষ কথাটা বলতে চায় মালু। শব্দে নয়, নিঃশব্দে ক্ষমা প্রার্থনায়।

কবে না দেখা হয়েছিল রিহানার সাথে? দিন পাঁচেক হয়ে গেল বুঝি। অফিস থেকে ফিরছে মালু।

একতলার বারান্দাটায় পায়চারি করছে রিহানা, বোধ হয় অপেক্ষা করছে মালুর জন্য। মালুকে দেখেই বলল, একটা দরকারি কথা আছে তোমার সাথে।

এরা এল সেই ঘরটিতে, একদা যেটা ছিল ওদের শোবার ঘর। বসল সেই যুগল শয্যাটায় যেখানে এখন এপাশ ওপাশ করে কাটে মালুর নিঃসঙ্গ রাত।

চাবির গোছাটা দাও দেখি? হাত বাড়াল রিহানা।

আমি কী আর চাবির খোঁজ রাখি? দেখ, যেখানে রেখে গেছিলে সেখানেই হয়ত রয়েছে।

হাঁ। ঠিক সেখানেই, ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারে হাত গলিয়েই চাবির গোছাটা পেয়ে গেল রিহানা।

ছড়া থেকে একটা লম্বা গোছের কুঞ্জি আলাদা করে নিল রিহানা। খুলে ফেলল আলমারির ডালাটা। তারপর আর একটি ছোট গোছের চাবি ঘুরিয়ে খুলল ভেতরের দেরাজ। দেরাজ-থেকে বেরুল আরও দুটো মাঝারি ধরনের চাবি। ওদের মাথায় সুতোর আঁটুনি। চাবি দুটো হাতে নিয়ে দেরাজটা ঠেলে দিল রিহানা। আলমারির একটি কেবাড় ভেজিয়ে দিল। মোড় নিল। ভেজানো কেবাড়টায় পিঠ রেখে শুধাল, কী ভাবছ?

ভাবছি পালিয়ে যাওয়া বৌ ফিরে এলে কেমন লাগে। চেষ্টা করেই সহজ হল মালু।

লাগে না, বল, কেমন লাগবে। শুধরিয়ে দিল রিহানা। তারপর চোখের ঢল থেকে হঠাৎ এক পসলা কৌতূহল ঝরিয়ে শুধাল, গানটান ছেড়ে দিলে নাকি?

প্রায়। ইপাব তৈরিঃ আল মোস্তাইন বিল্লাহ

সকালে তো আর গলা সাধছ না।

না।

শুনলাম চাকরিটাও নাকি ছেড়ে দিয়েছ?

হ্যাঁ।

এবার বুঝি বিবাগী হবে?

হ্যাঁ।

তা জাহান্নামেই যাও আর বুড়িগঙ্গাতেই ঝাঁপ দাও, আমি তার কী করতে পারি?

কিছুই না।

এক বা দু অক্ষরের ঠাণ্ডা উত্তর মালুর। খোঁচা খোঁচা বরফের মতো, রিহানার গায়ে গিয়ে বিঁধে থাকুক তাই বুঝি চায় ও।

কিন্তু বিঁধছে কী? চোখের মণি দুটোকে ছোট্ট করে তাকাল রিহানা, ঠোঁটের সীমানায় টানল তাচ্ছিল্যের রেখা, বলল, কী ব্যাপার, আজ যে দেখি আর এক মূর্তি।

কী যেন দরকারের কথা বলছিলে? পাশ কাটিয়ে যায় মালু।

হ্যাঁ, বলছি। কাবিনের স্বাক্ষরটা এখনো মুছে যায়নি।

মানে?

মানে, এখনো আমি তোমার বিবাহিতা স্ত্রী। রাহা খরচের দাবিদার। অমানুষিক শক্তিতে আত্মসংবরণ করল মালু। দাঁতের ফাঁকে চেপে রাখল ঠোঁট জোড়া। ইপাব তৈরিঃ আল মোস্তাইন বিল্লাহ

অথচ একদিন খোঁজও নিলে না, খাই কী, পরি কী! কমজাতে জন্ম নিলে মানুষ বুঝি এমনি ইতর আর দায়িত্বহীন হয়? কথাটা পুরোপুরি শেষ করল রিহানা।

তারপর ও আলগা করল আলমারির ভেজানো কেবাড়টা। কালো সূতোয় বাঁধা চাবি দুটো পর পর ঘুরিয়ে বড় দেরাজের নিচে আর একটি দেরাজ খুলে ফেলল। সেখান থেকে বের করে আনল গয়নার বাক্সগুলো। খুলে বুঝি মিলিয়ে দেখল যা যা রাখা ছিল সব ঠিক আছে কিনা।

বিয়ের সময় রাকীব সাহেব সেজেছিলেন কন্যাপক্ষ। জাহেদ আর রাবু বরপক্ষ।

তাড়াহুড়ো বলে কী নতুন বৌকে বাসর ঘরে পাঠাবে একেবারে সোনা শূন্য?

সে হতেই পারে না। রাকীব সাহেব আর রাবু দৌড়ে গেছিল বাজারে। হাতের গলার কানের বাজুর কোনো অঙ্গের কোনো পদই কিনতে বাকী রাখে নি ওরা।

আহা। বাপ মা, আপন জন কেউ নেই এই সুখের লগ্নে। কনের মতো করে সাজাও গো। যেমন করে ওর মা সাজিয়ে দিত তেমনি করে। একটি একটি করে গয়নাগুলো পরিয়ে দিচ্ছিল রাবু আর পাশে বসে বলেছিলেন রাকীব সাহেব।

এ সব স্মৃতির বুঝি কোনো দাম নেই রিহানার কাছে।

পরে সে গয়নার সাথে আরো কিছু অনুরাগের উপহার জুড়ে দিয়েছিল মালু। এ সব তো আমারই জিনিস, নিয়ে যাচ্ছি। বিক্রী করে দেব, বলল রিহানা। এত নির্লজ্জও হতে পারে কোনো মেয়ে?

না। এটাকে নেহাৎ নির্লজ্জতা বলে মেনে নিতে পারলে তো বেঁচেই যেত মালু। ধীর স্থির ঠাণ্ডা মাথায় যে মেয়ে নিত্য নতুন পীড়নের পন্থা উদ্ভাবন করে চলেছে এতে তারই আর একটি নির্যাতন। আঘাত পাবে মালু। কত সোহাগ আর অনুরাগ মেশানো স্মৃতিটাকে এখনো মনের কোণে লালন করে চলেছে মালু, সেখানে পড়বে আর একটি হাতুড়ির ঘা। তাই তো অলংকারগুলো বিক্রী করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে রিহানার। হয়ত সত্যি টাকার দরকার পড়েছে ওর। হাত খরচ ও পাবে কোথায়? মেয়েদের স্কুলের বইয়ের মতো গয়নার বাক্সগুলো বুকের কাছে দুহাতের বেড়ে গুছিয়ে নিল রিহানা। শুধাল, কিছু বলবার আছে?

না।

একটি মেয়ে সে কী এত যন্ত্রণা? কতদিন ভেবেছে মালু। আজও ভাবল। এমনি যন্ত্রণা হয়েই নেবে আসে ও।

ময়লা হয়ে গেছে বিছানার চাদরটা। পাল্টিয়ে ধোয়া চাদর বিছিয়ে দেয় রিহানা। উত্তরের জানালা দিয়ে তেরছা ভাবে রোদ পড়ে বিছানায়, এতদিন লক্ষ করেনি কেউ। রিহানা খাটটাকে সরিয়ে আনে আর একটু দক্ষিণে।

আসে রিহানা, যাবার আগে এমনি সব নির্যাতনের উপকরণগুলো সাজিয়ে রেখে যায়। রেখে যায় তীক্ষ্ণ ধার তোলা শান দেয়া অস্ত্রের মতো। মালু যখন ঘরে ফিরবে, ক্লান্ত হাত পাগুলো আল্গা করে আরাম কেদারাটায় এলিয়ে দেবে দেহটা, পীড়নের ওই অস্ত্রগুলো তীক্ষ্ণধার ফলা উঁচিয়ে ঘিরে ধরবে মালুকে। খোঁচায় খোঁচায় জর্জর করবে ওকে। রক্ত ঝরবে। পরাজিত ক্লান্ত মালু দুহাতে মুখ ঢেকে পড়বে বিছানায়। অথবা অস্থির যন্ত্রণায় ছটফটিয়ে ছুটে বেরিয়ে যাবে ঘরের বাইরে।

মালুর যাকে মনে হত সুরভির কন্যা, এত বিষ তার হৃদয়ে?

কিন্তু সবটাই কী নির্ভেজাল বিষ, শুধু, নৃশংসতার হুল ফোঁটানো? তাই যদি হবে তবে কেন ওর অনুপস্থিতিতেই নেবে আসে রিহানা। হাজার তাম্বি-তদারকে অস্থির করে তোলে চাকরটাকে। রেখে যায় ওর উপস্থিতির চিহ্ন?

আপন মনের গহিনে মালু নিজেও কী সম্পূর্ণ করে নিঃসংশয় হতে পেরেছে? সুরের মেয়ে, সুরভির মেয়ে, যে চায় না মুক্তি, আজ তার সবটাই কী শুধু যন্ত্রণা?

মনে পড়ল মালুর।

লজ্জা করে না এমন ভালোমানুষির অভিনয় করতে? কেন? কেন সেদিন আমার সাময়িক ভাবালুতার সুযোগ নিয়েছিলে তুমি? কোথায় ছিল আজকের ঔদার্য? আজ...না পারি দুটো বন্ধুকে বাড়িতে আনতে, না পারি সমাজে মাথা উঁচু করে চলতে।...উদাসীনতার ভণ্ডামি জানি না আমি। আমার যন্ত্রণা হাজার গুণে তোমাকে ফিরিয়ে দিয়ে তবে আমার তৃপ্তি।

সেই দুর্ঘটনাটি তখনও ঘটেনি। রিহানা দোতলায় উঠে যায়নি। সে সময় ওরা থাকত একতলার এই ঘরটিতেই। একই বিছানার দু প্রান্তে নির্জীব জড় পদার্থের দুটো পিণ্ডের মতো থাকতো। মালু বলেছিল : এসো বিদায় নিই, তুমি যাও তোমার সোজা সড়কের মসৃণ পথে, আমি চলি আমার দুর্গমে

জবাবে সেদিন আরো কত কথার হুল ফুটিয়েছিল রিহানা।

আশ্চর্য! এই রিহানা কাঁদতে পারে। কেন অমন করে কেঁদেছিল রিহানা?

পাম গাছের মাথার সেই হলুদ রোদটা সরে গিয়ে কখন যে সন্ধ্যা নেবেছে লক্ষ করেনি মালু। সেই সন্ধ্যাটা রাতের আঁধারে গাঢ় হয়ে উঠেছে। উঠে এসে জানালার পর্দাটা সরিয়ে দিল মালু। ভেতর আর বাইরের অন্ধকারটা মিশ খেয়ে একাকার হল। কালও তো এসেছিল রিহানা। তার আগের দিনও। দেখা হয়নি মালুর সাথে। ঘরে এসে পেয়েছিল ওর চুলের গন্ধ, গায়ের সুবাস। এখনো কী গন্ধরাজ ফুল খোঁপায় পরে ও?

দেখা হলেও ওর খোঁপাটার দিকে বুঝি তাকায় না মালু। অথবা প্রাণপণে অস্বীকার করতে চায় ওর গায়ের, ওর চুলের সেই চেতনা-অবশ-করা সুবাসটি। কিন্তু, আজ যদি দেখা হত, হাতে ধরে ওর সুন্দর খোঁপাটা স্পর্শ করত মালু।

না। রিহানা আজ নাবল না।

বিদায়ের সাক্ষাৎ বুঝি এল না ওদের জীবনে। ক্ষমার ঔদার্যে, একটু বা উপলব্ধি, কিছু বা মমতার ধারায় ভিজিয়ে দিয়ে বলা হল না শেষ কথাটা। মালু চেয়েছিল যাবার দিন আজ একটি গান শোনাবে রিহানাকে। অনেক দিন আগে একটি নতুন গানে সুর বেঁধে রেখেছিল ও। গাওয়া হয়নি সে গান।

গাওয়া হল না।

খুট করে শব্দ হল। বাতি জ্বলল।

ধড়ফড়িয়ে উঠে বসল মালু।

রিহানা নয়। কাজের ছেলেটা।

সায়েব ভাত দেব? শুধাল ছেলেটা।

না আমি খাব না, তুই খেয়ে নে।

জানালাটা বন্ধ করে দিল মালু। বিছানার উপর তা করে রাখা জামাকাপড় গুলো ভরে নিল সুটকেসে। ঘড়িটার দিকে তাকাল। এখনও সময় আছে হাতে।

রিহানা এল না। রিহানার সাথে দেখা হল না।

সেই ভালো। মালুর জীবনের সীমানা থেকে দূরে থাকুক রিহানা। সেই ভালো। আসলে ভালোবাসা নয় রিহানা। রিহানা তেমন একটি দুর্ঘটনা যা অভিজ্ঞতার সম্পদ হয়েই বেঁচে থাকে জীবনে।

বাঁ হাতটা বুক পকেটে লেগে খস খস করে উঠল। কয়েকবার পড়া চির কুটটা পকেট থেকে বের করে আনল মালু। আবার পড়ল—

মালু, ভীষণ বিপদ রাবুর। আমি যাচ্ছি। তুইও চলে আয়। দেরি করিসনে কিন্তু। মেজো ভাই।

পনের দিন আগের তারিখ দেয়া চিঠি। একটি লোক এসে আজই সকালে পৌঁছে দিয়ে গেছে মালুর হাতে। ভেবে পায় না মালু, এমন কী বিপদ হতে পারে রাবুর।

খামে ভরে চিঠিটা আবার পকেটে রেখে দিল মালু, উঠে দাঁড়াল।

ক্ষিপ্র হাতে তুলে নিল হাত ব্যাগ আর সুটকেসটা। টিপে দিল সুইচ। নেবে এল সমুখের খোলা চত্বরে।

সংখ্যাহীন নিঝুম রাতের সাক্ষী আর অনেক গানের শ্রোতা পাম গাছটির তলায় এসে দাঁড়াল মালু। তাকাল দোতলার দিকে। যেন তীর খেয়ে ফিরে এল ওর চোখ। পাম গাছের ছমছমে ছায়াটা মাড়িয়ে রাস্তায় পড়ল মালু।

৬২.

সবুজ ঘাস। ঘাসের নিচে নরম মাটি।

আলোর পথ। তেড়া বাঁকা।

হৈমন্তী ধানে ভরা মাঠ। কারা যেন গুঁড়ো সোনা ছিটিয়ে গুঁড়ো ছড়িয়ে বিছিয়ে এতটুকু ফাঁক রাখেনি মাঠে। সোনা রং মাঠের বুকে হেসে খেলে গড়িয়ে পড়ছে হেমন্তের রোদ। সোনা রোদ। মিষ্টি রোদ।

আকাশের রোদ আর পৃথিবীর রংয়ে এমন মিতালি কতদিন দেখেনি মালু। ওর বুক জুড়ায় মন জুড়ায়। নেচে নেচে বেড়ায় ওর চোখ। পাকা ধানের গন্ধে, নরম মাটির স্পর্শে ও যেন সেই ছোট্ট মালু। ছুটে চলেছে আলোর পথ ধরে।

মিষ্টি রোদে গা ডুবিয়ে নাইল মালু। রোদ তো নয়, কাঁচা তরল সোনা। সোনার তরঙ্গ। ছোঁয়া যায়। ধরা যায়। অনুভব করা যায়। হাতের মুঠোয় পুরে আবার ছিটিয়ে দেয়া যায়। কোণাকুণি মাঠের আল ভেঙে মালু উঠে এল ট্রাংক রোডে।

ইট ট্রাংক রোড।

কবে না যুদ্ধ হয়েছিল? এই ট্রাংক রোডের দু পাশে ধ্বংস মৃত্যু আর কান্নার কী তাণ্ডবই না বয়ে গেছিল সেদিন।

আজ মনে হয় সে যেন দূর অতীতের কোনো দুঃস্বপ্ন। বিভীষিকাটা তার মুছে গেছে মন থেকে, তেমনি ঘটনাগুলোও ঝাপসা হয়ে এসেছে। স্মৃতির পটে চকমকি ঘষে তাদের জাগিয়ে তুলতে হয় বুঝি। শুধু মালুর নয়, হয়তো সব মানুষেরই স্মৃতিশক্তিটা এমনি ক্ষীণ।

তবু যুদ্ধের ক্ষত একেবারে মুছে যায়নি এ অঞ্চল থেকে।

মাটির ট্রাংক রোড, যুদ্ধের সময় মাটির বুকে পড়েছিল ইটের গাঁথুনি। কোথাও বা পীচ। কিন্তু ভারী ট্রাক ট্যাংক কামান বন্দুক বয়ে বয়ে ট্রাংক রোডের ইট গাঁথা বুকখানি আজ হাড় জর্জর। কোথাও ইট উপড়ে তলার মাটি হা মেলেছে। কোথাও ভাঙা ইট শিথিল গাঁথুনি খাবলা খাবলা ঘা তুলেছে। ফলে রাস্তার মাঝখানটি হয়ে পড়েছে অকেজো। দু পাশটিতে যেখানে নরম মাটি ভাঙা ইটের গুঁড়ো খেয়ে খেয়ে বুঝিবা গোত্রান্তরের চেষ্টায় গায়ের রংয়ে এনেছে ঈষৎ লাল আভা, সে দিক দিয়েই এখন গাড়ি ঘোড়া মানুষের চলাচল।

দুধারের গ্রামগুলোতে এখনো চোখে পড়ে কাঁচা ঘরের পাশাপাশি নীচু দেয়ালের ব্যারাক, গুদাম। টিনগুলো বিক্রি হয়ে গেছে নীলামে, নিরাবরণ দেয়ালগুলোর গায়ে শ্যাওলা মেখে দাঁড়িয়ে আছে বিগত যুদ্ধের সাক্ষী আর কৃষকদের হাজারো অসুবিধার কারণ হয়ে।

রাস্তার পাশে মাটির নিচে তৈরি হয়েছিল বিমান আক্রমণের সময় আশ্রয় নেবার ঘর। সেই আশ্রয় শিবিরের ছাদটা এখনও অটুট, রাস্তা থেকে হাত দুই উঁচু। এখন সেটা নামাজের জায়গা। রাস্তার কিনার ঘেঁষে দুব্বার উপর দিয়ে মাটি আর দুব্বার স্পর্শ নিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে চলেছে মালু।

শাঁ করে বেরিয়ে গেল গাড়ি। আবলুস রংয়ের নতুন আর আধুনিক মডেলের গাড়ি। এ রাস্তায় অমন একটা গাড়ির উপর চোখ না পড়ে পারে না। মালুরও চোখ পড়ল।

কিছু দূর গিয়েই ব্রেক কষে থেমে গেছে, গাড়িটা। দরজা খুলে অতি ধীরে বেরিয়ে এসেছে এক জোড়া পা। তারপর মাঝারি গোছের একটি বপু। বন্ধুর সাথে অত্যন্ত আয়েশী মেজাজে বেরিয়ে এল চালতের মতো গোলাকৃতি রসে টইটম্বুর একখানি মুখ। সে মুখে পাকা টমাটোর ছিলকের মতো চকচকে আভা।

মালুর দিকে চেয়েই যেন লোকটি দু পাটি হাত বিস্ফারিত করল। তাড়াতাড়ি কাছে আসার ইশারা জানাল।

ইতস্তত করল মালু। তাকাল পেছন দিকে। সেই যে ছাতা বগলে হন হনিয়ে আসছিল একটি লোক, সে বুঝি অনেক কাছে এসে পড়েছে। চালতের মতো মুখখানি ততক্ষণে এগিয়ে এসেছে। তুলে নিয়েছে মালুর একখানি হাত নিজের হাতে। বলছে : ভাগনে যে আমায় চিনতেই পারে না দেখি। মাশাল্লাহ্ গায়ে গতরে তো বেশ জোয়ান হয়েছিস!

এ কণ্ঠ চিনতে ভুল হবে কেন মালুর? সেই লাল মতো কুঁত কুঁতে এক জোড়া চোখ। ফোলা গালের থলথলে মাংসটা উপরের দিকে ঠেলে উঠে প্রায় ঢেকেই দিয়েছে চোখ দুটো। তাই তো এতক্ষণ চিনতে পারেনি মালু।

যেন সন্দেহ-মুক্ত হবার জন্যই লোকটার কানের দিকে তাকাল মালু। বেচারা রমজান! কাটা কানটাকে ঢেকে রাখবার কোনো ব্যবস্থাই এখনো করতে পারেনি ও।

আয় আয় গাড়িতে উঠে আয়। ওর হাতের স্যুটকেস আর ব্যাগটা তুলে নিয়ে ড্রাইভারের পাশে রেখে দিল রমজান। ওকে জড়িয়ে ধরল।

অনেকদিন পর এলাম কিনা গ্রামে, হাঁটতে বড় ভালো লাগছে। আপনি যান। হেঁটেই আসছি আমি। ওর অস্বস্তিকর আলিঙ্গন থেকে আলগা হয়ে বলল মালু।

ঠিক ঠিক। যে শক্ত মাটি শহরে। আমি হেন লোক হাঁপিয়ে উঠলাম সেই রেঙ্গুন শহরে যাকে বলে শহরের রাণী। পারলাম কই থাকতে? সেই বাপ দাদার দেশেই তো ফিরে আসতে হয়েছে। মালুর সবিনয় প্রত্যাখ্যানে বুঝি বিব্রত রমজান। তাই নিজের কথাটা পেড়ে মালুকেই সমর্থন জোগাল।

চিনলেন স্যার। আবদুল মালেক, নামজাদা গাইয়ে। আমাদের গ্রামের রত্ন। গাড়ির ভেতরে ভারি ভদ্রলোকটিকে উদ্দেশ্য করে বলল রমজান। পরিচয় করিয়ে দিল মালুর সাথে, আমাদের কন্ট্রোলার সাহেব।

হ্যাঁ হ্যাঁ রেডিওতে প্রায়ই শুনি ওনার গান। রেকর্ডও কয়েকখানা আছে আমার বাড়িতে। গাড়িতে বসেই হাত বাড়িয়ে মালুর সাথে হাত মিলাল ভারি মুখ লোকটি।

আমার ভাগনে হয় স্যার। মালুর পরিচয়টা যেন এতক্ষণে সম্পূর্ণ করে রমজান।

বেশ বেশ। ভারি মুখের ঠোঁটজোড়া ঈষৎ ফাঁক হয়েই বন্ধ হয়ে গেল আবার।

মন্দ না। দুচোখ ভরে দেখতে দেখতে হেলে দুলে আস্তে আস্তে হেঁটে যাওয়াই ভালো। এ রকম কত হেঁটেছি তোদের বয়সে। এখন কী আর মরার ফুরসুত আছে আমার? আজ ইউনিয়ন বোর্ড, কাল ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড, পরশু রিলিফ কমিটি, মিটিং করে করেই জানটা গেল রে মালু।

গাড়িতে উঠে গেল রমজান। মুখটা বাড়িয়ে আবার বলল : দিন ভর মিটিং চলবে। রাত্রে একটা পার্টি হচ্ছে আমার বাড়িতে। কন্ট্রোলার সাহেব চলেছেন, এস, ডি. ও. সাহেবও আসছেন বিকেলে। মানি মর্যাদার মেহমান সব। তুইও আসিস। আসবি কিন্তু।

চাবি ঘুরিয়ে স্টার্ট নেয় ড্রাইভার।

আমার স্যুটকেস? হাত বাড়ায় মালু।

না না। ও থাক। খামাখা এতটা পথ বয়ে বেড়াবি? উঠছিস কোথায়?

সৈয়দ বাড়িতে।

ফোলা মুখটা সামান্য কুঁচকে কেমন লম্বা হয়ে গেল। কিন্তু, সেটা মুহূর্তের জন্যই। বলল রমজান : আমি পৌঁছেই পাঠিয়ে দেব তোর ব্যাগ স্যুটকেস। স্টার্ট নিয়ে এক কদম এগিয়ে গেল গাড়িটা। হাত ইশারায় ড্রাইভারকে থামিয়ে মুখটা আবার বের করে আনল রমজান। বলল : দাওয়াত খেতে আসবি অবশ্যই। তালতলির কাজি বাড়ি। আমার নতুন বাড়ি। ওখানেই থাকি আজকাল।

ধুলোয় ঘূর্ণী তুলে ছুটে গেল গাড়িটা।

বিস্ময়ের নিশ্চল মূর্তি হয়ে চেয়ে থাকে মালু। চেয়ে থাকে যতক্ষণ না আবলুস রং গাড়িটা অদৃশ্য হয়ে যায় দৃষ্টির বাইরে।

চেহারা রং, সবই বদলে গেছে রমজানের। বদলেছে ওর কথা ওর ভাষাটিও। পেশাগত হোক আর বংশগত হোক বাকুলিয়ার অনেক মানুষেরই নামের পেছনে ছিল পদবী। কেউ সৈয়দ, মিঞা, চৌধুরী, মুনশী। কেউ বা সারেং, মাঝি, ট্যান্ডল। কিন্তু রমজান ছিল শুধুই রমজান। এমন কী রমজান মাঝিও না। এ নিয়ে আফসোসের অন্ত ছিল না রমজানের। আফসোস থেকে খেদ, খেদ থেকে বিক্ষোভ, বিক্ষোভ থেকে বেপরোয়া নৃশংসতা, কূট কূটিল চক্রান্তের পথে বিচিত্র অভিযান।

সে অভিযান শেষে আজ বুঝি তোয়াঙ্গর রমজান। সার্থক ওর পদবীর আকাক্ষা। রমজান থেকে রমজান সর্দার, রেঙ্গুন বন্দরের কুলি সর্দার। তারপর ফেলু মিঞার নায়েব। মুখে যে-যাই ডাকুক কাগজ-পত্রে নাম সইতে ও তখন রমজান আলি। তেমনি সময় ওই কমিনা বেশ্যা হুরমতির বেদিল নফরমানিতে রটে গেছিল আর এক নাম, কানকাটা রমজান। কানকাটা রমজান লুটে নিল যুদ্ধের নেয়ামত। সে নেয়ামতের জোরে মুছে দিল হুরমতির দেয়া পদবী। যুদ্ধের কন্ট্রাক্টর, জঙ্গী বাহিনীর মাল-মশলার যোগানদার, নাম তার শেখ রমজান। যুদ্ধের পর এল পাকিস্তান।

পাকিস্তানের মওকাও ছাড়েনি রমজান।

আজ বুঝি আরও উঁচু স্তরের মানুষ শেখ রমজান। আজ তার কোন্ পদবী তালতলির কোন কাজি বাড়িতে তার নতুন মসনদ! জানে না মালু। ওলট পালট, লয় পরিবর্তন, এটাই নাকি পৃথিবীর নিয়ম। সে নিয়মেরও ধর্ম আছে, ধারা আছে। সে পরিবর্তনের ধর্ম, তার গতি সময় ও কালের ফলকচিহ্নে দৃষ্টিগ্রাহ্য।

কিন্তু রমজান? ও যেন ভোজবাজি, ছুমন্তর। পীর সাহেবের ফুঁক ফাঁক তুক তাক, কুদরতের ভেল্কিবাজি। লোকে বলে সেই ভেল্কিবাজিতে একখানা নোট দশখানা হয়, দেখতে এক টাকার নোটখানা হয়ে যায় একশো টাকার।

ম্যাজিকের ওই ভেল্কিবাজিকেও যেন হার মানিয়েছে রমজান। ছাড়িয়ে গেল সময়ের গতিকেও। উল্টিয়ে দিয়েছে নিয়মের চাকা।

ট্রাংক রোডের দূর বাঁকে চোখ রেখে আবার পা বাড়াল মালু। মনে মনে হাসল। তালতলি-বাকুলিয়ার নতুন এক মাতুল পেয়েছে ও।

হারামখোর। শুয়রখোর। নমরুদের গোষ্ঠী। ফেরাউনের বাচ্চা। বেঈমান। বদমাশ।

অনুচ্চ অসংবদ্ধ প্রলাপের মতোই শব্দগুলো কানে এল মালুর। পেছন ফিরে দেখল সেই ছাতা বগলে লোকটা ধরে ফেলেছে ওকে। মাথা ভর্তি চুল। গাল ভর্তি দাড়ি। সবই সাদা, মাঝে মাঝে কালোর পোঁচ। মাথা ঝুঁকিয়ে দৃষ্টিটাকে রাস্তার উপর স্থির রেখে হনহনিয়ে চলেছে লোকটা। দেখে মনে হয় মাটির নিচে অদৃশ্য ক্রিমি কীটদের উদ্দেশ্য করেই চোখা চোখা গালিগুলো ছুঁড়ে মারছে।

কোনোদিকে লক্ষ নেই লোকটার। মালুকেও ছেড়ে এগিয়ে গেল। খপ করে তার ছাতার মাথাটাই ধরে ফেলল মালু। চেঁচিয়ে উঠল, মাস্টার সাহেব?

পথের মাঝে অকারণ বাধা পেয়ে বুঝি বিরক্ত হল লোকটা। চুল দাড়ির জঙ্গল ভেদ করে তার দৃষ্টি স্থির হল শান্তিভঙ্গকারী বেয়াদব ছেলেটির মুখের উপর।

মাস্টার সাহেব, বাকুলিয়া-তালতলির সেকান্দর মাস্টার। বয়সের ভারে নয়, নিষ্ঠুর জীবনের চাপে কুঁজো তার পিঠ। সূর্যের খরতাপ আর মাটির দাহ চুষে নিয়েছে শরীরের তেল চর্বি। অকালেই বৃদ্ধ হয়েছে সেকান্দর মাস্টার। তবু গা ফাটা পোড়া মাটির মতো শিরা ফোলা ঝলসানো হাত আর পা জোড়া বুঝি অক্লান্ত, অস্থির। ক্লান্তির বিরুদ্ধে চরম অবজ্ঞা হেনে আর আঘাতের মুখে নির্ভীকতার প্রতীক হয়ে ওরা এখনো চলমান। হয়ত যুদ্ধমান।

আরে তুই? এ্যাঁ, মালু-মালেক। চিনতে পেরে শুধু নামটার উপরই জোর দেয় মাস্টার। খুশিটা প্রকাশ করতে গিয়ে ব্রিত হয়। বগলের ছাতাটা পড়ে যায় মাটিতে।

এমন ক্ষেপে গেলেন কার উপর? গালি তো কোনোটাই বাকী রাখলেন না। ছাতাটা কুড়িয়ে নিয়ে সহাস্যে শুধায় মালু।

মুহূর্তেই জ্বলে উঠল সেকান্দর মাস্টার। রমজান রমজান, ওই বেঈমান, শূয়রের পয়দাশ। হার্মাদটা কী বলছিল তোকে?

বিকেলে খাবার দাওয়াত দিল।

দাওয়াত? যাবি? তুই ও বদমাশটার বাড়ি?

সে কী আর বলার অপেক্ষা রাখে? তবু মালুর ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠল মৃদু কৌতুকের হাসি। এই ব্যর্থ আক্রোশের সাথে ওর আবাল্য পরিচয়, যার বিরুদ্ধে এত ক্রোধ আর ঘৃণার উদ্গীরণ–সেই রমজান, সে তো রয়েছে খোশ দিলে, বহাল তবিয়তে। সামান্য আঁচ লাগেনি তার শরীরে। এতটুকু আঁচড়ে পড়েনি তার গায়ে।

কী মূল্য এই অন্ধ বিক্ষোভের, ক্লীবের ধিক্কারে। অভিশাপ যদি ধ্বংস করতে পারত মানুষকে তবে লেকুর মৃত স্ত্রী আর হুরমতির অভিশাপে রমজান তো এ্যাদ্দিনে সবংশ নির্মূল হত এই পৃথিবী থেকে। তা হয়নি–কখনো হয় না।

ওদের ভগ্নশ্বাস ঝড় তুলতে পারেনি। অনুকূল বাতাসে তর তর করে এগিয়ে গেছে রমজানের পাল তোলা নৌকা। শ্রীবৃদ্ধির ভরা বন্দরে এখন বুঝি নোঙ্গর ফেলেছে রমজান।

আর মাস্টার? বাকুলিয়া-তালতলির প্রিয় সেকান্দর মাস্টার?

বারুদ-ঠাসা হৃদয়ে কবে একদিন আগুন ধরেছিল। সে আগুনে পোড়াতে পারেনি কাউকে। নিজেই শুধু দগ্ধ হয়েছে তিলে তিলে। এখনো বুঝি নিঃশেষ হয়নি। ছাই হয়ে ঝরে পড়েনি। পোড়া ঘরের পোড়া খুঁটির মতো এখনো দাঁড়িয়ে আছে সর্বগ্রাসী কোনো ধ্বংসের একক সাক্ষী হয়ে। মাস্টারের হাড়সর্বস্ব শরীরখানির দিকে তাকিয়ে তাই মনে হলো মালুর।

আপনার যেখানে যাতায়াত নেই আমি সেখানে যাব, এ প্রশ্নই ওঠে না। জিজ্ঞাসার চিহ্ন আঁকা মাস্টারের মুখের উপর চোখ রেখে বলল মালু।

শুধু সমর্থন নয়। কী এক আশ্বাস আর সহানুভূতির ছোঁয়া মালুর কথায়, মালুর স্বরে। অনেক দিন বুঝি এসব পায়নি সেকান্দর মাস্টার। খুলে গেল ওর কথার বাঁধ, অবরুদ্ধ যত ক্ষোভের উৎস।

কম জ্বালিয়েছে, কম জ্বালাচ্ছে ওই লোকটা? উৎখাত করেছে গোটা বাকুলিয়া। তাতেও কী তার তিয়াষ মিটেছে? মাত্র দুদিনের মাঝে ফাঁকা হয়ে গেল অতবড় তালতলি। সোনা দানা জায় জেয়র যতটুকু সম্ভব সঙ্গে নিয়ে গেছে, কিন্তু জোত-জমি, বাড়ি-ঘর তো আর হাঁটতে পারে না? বোঁচকা বেঁধে নিয়ে যাবার জিনিসও নয়, সে সব তো রয়েই গেল। ধর্ম না হয় আলাদা, তাই বলে কী ওরা মানুষ নয়? ওরা এ দেশের মাটির সন্তান নয়? হাজার বছর সুখে-দুঃখে এক সাথে থাকিসনি? আর সেই মানুষগুলোর দুর্দশার সুযোগ নিয়ে এমন বেঈমানী করলি তুই? লাখ লাখ টাকার আমানত স্রেফ জবত করে নিলি?

শুধু কী তাই? চশমখোর বেঈমানের কী জাত আছে, না ধর্ম আছে। ফেলু মিঞার তেল নুন খেয়ে তুই মানুষ। হোক হারামের রুজি, তবু রামদয়ালের কৃপাতেই তো দুটো পয়সা করলি তুই। আর তাদেরও রেহাই দিলি না? এমন নিমকহারামির কথা কেউ শুনেছে কখনো?

রানুদির বাড়িতে কী কেউ নেই? কথার মাঝখানেই শুধাল মালু। বাধা পেয়ে বিরক্ত হল সেকান্দর। ভেংচি কেটে বলল : আর রানুদি, বলছি কী এতক্ষণ! গোটা তালতলিতে ঘুঘু চরছে। দত্ত বাড়িতে সাদ্দাদি বালাখানা খুলেছে রমজান, কাজি মোহাম্মদ রমজান। মিত্তির বাড়িতে দিব্যি গুছিয়ে বসেছেন আমার গুণধর ভ্রাতা সুলতান মিঞা। ভট্টচার্যি বাড়িতে মিঞার পেয়াদা কালু এখন শেখ।

ও, তা হলে দত্তবাড়িটাই রমজানের কাজি বাড়ি। আমি তো এতক্ষণ ভেবে সারা, তালতলিতে আবার কাজি বাড়ি এল কোত্থেকে। করুণ রসেও বুঝি হাসি পায় মানুষের। আসলে সেটা কান্নারই আর এক রূপ। তেমনি একটি হাসি পেল মালুর।

রমজান যেন মর্মান্তিক, আর করুণ কোনো কৌতুক নাটকের নায়ক। তাকে ঘিরে যেন ইতিহাসের প্রহসন। কিন্তু ফেলু মিঞা? চোখের কোলে প্রশ্ন আঁকল মালু।

রমজানের বাপদাদারা ছিল মিঞাদের গোলাম। সেই গোলাম জাতের রাজত্বে বাস করবে মিঞারা? তাই ফেলু মিঞা চলে গেছে শ্বশুর বাড়ি। সেখানে থাকে এখন। ঘরজামাই। সুখেই আছে।

সত্যি কী সুখে আছে? নিজেকেই যেন শুধাল মালু। সেই কবে দেখা গাবতলায় দাঁড়ানো পরাজিত ফেলু মিঞার উদাস দৃষ্টিটা আজও যেন স্পষ্ট হয়ে ভেসে উঠল মালুর চোখের সুমুখে।

বেচারা ফেলু মিঞা। পারল না লুপ্ত গৌরবের এক কণা ফিরিয়ে আনতে। না পারল নতুন জীবনে খাপ খাওয়াতে।

বুঝি এমনি অদ্ভুত আর নির্মম জীবনের ধর্ম। কাউকে ক্ষমা করে না সে। রেহাই দেয়নি ফেলু মিঞাকে।

ফেলু মিঞার কথা থাক, অন্যদের কথা বলুন না মাস্টার সায়েব? হাঁ, সবার কথা বলবে সে। বলার জন্য, শুধু বলার জন্যই তো এখনো বেঁচে আছে সেকান্দর মাস্টার।

রাবু আপা কেমন আছে?

ভালো। সংক্ষেপে বলে আবার রমজানের প্রসঙ্গেই ফিরে এল সেকান্দর। কথায় কথায় ছোট হয়ে আসে পথ। ট্রাংক রোড ছেড়ে ওরা নেবে এল ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তায়। যে রাস্তাটা তালতলি আর দত্তের বাজার হয়ে বড় খাল ডিঙিয়ে সোজা চলে গেছে বাকুলিয়ায়।

তালতলির তালের সারি। তেমনি উন্নত শির। সজাগ প্রহরী। কাঁঠালী চাঁপার গন্ধে ভুর ভুর বাতাস, দৌড়ে এসে যেন জড়িয়ে ধরল চেনা মানুষ মালুকে। গাছ গাছালির ছায়া ঢাকা পথ, যেমনটি ছিল আগে।

তবু কী তেমনি আছে তালতলি?

জন নেই, মানুষ নেই, কোথাও এতটুকু কোলাহল নেই। বড় বড় দালানগুলো দাঁড়িয়ে আছে বসতিহীন শ্রীহীন শোভাহীন। যেন প্রাগৈতিহাসিক কংকালের সারি। সভ্যতার কোনো লুপ্ত যুগের স্মারক। কী এক শূন্যতায় খাঁ খাঁ করছে তালতলি।

শ্মশানের দীর্ঘশ্বাসের মতো কী এক হাহাকার তালতলির মাটির বুকে।

স্কুলের জাঁদরেল পণ্ডিত ভট্টচার্যি মশায়। তাঁর নাতির ছিল বাগানের শখ। শৌখিন শহুরেদের অনুকরণে বাড়ির সুমুখে সাজিয়েছিল দেশি-বিদেশি ফুলের কেয়ারি। সৌন্দর্যের সেই কোমল কুঁড়িদের গ্রাস করেছে আগাছার জঙ্গল।

মিত্তির বাড়ির ডাঙ্গা ছাড়িয়ে দক্ষিণে ডিস্ট্রিক বোর্ডের রাস্তা ঘেঁষে চাঁপাতলা। ছেলেমেয়েদের ফুল কুড়ানো আর খেলার জায়গা। কত দিন রানুর জন্য মালু ফুল কুড়িয়েছে এই চাঁপাতলায়।

চাঁপাতলায় আজ কেমন গা ছম ছম ভয়। সেই কবে থেকে চাঁপার কলিরা ঝরে চলেছে। ঝরে ঝরে শুকিয়ে গেছে। গালের উপর শুকিয়ে যাওয়া কান্নার দাগের মতো কত দাগ কেটে গেছে মাটির গায়ে। কেউ তার খোঁজ রাখেনি। কেউ আর আসে না ফুল কুড়াতে। আঁচল ভরে তুলে নেয় না। মালা গাঁথে না।

নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে চায় না মালু। বিশ্বাস করতে চায় না সেদিনের সেই ছবির মতো সুন্দর কোলাহলমুখর তালতলির এই ভুতুড়ে স্তব্ধতা।

হয়ত ছবির মতো সুন্দর ছিল না তালতলি। শ্রীহীন বাকুলিয়ার তুলনায় শ্রীময় মনে হত তালতলিকে।

চোখের সুমুখে উঠে আসে পরিচিত মুখগুলো। ভেসে উঠে ওদের স্বচ্ছল পরিচ্ছন্ন জীবনের ছবিটা। ওদের বিলাস, ওদের অর্থ, মর্যাদা, শক্তি। ওদের ক্ষুদ্রতা, ওদের মহত্ত্ব। একদা যারা ছিল তালতলির নামের আকর্ষণ। সম্ভ্রম, হয়ত ভীতিও।

ছিন্নমূল সেই মানুষগুলো। কোথায় কোন্ দেশের মৃত্তিকাহীন জীবনে বেঁচে আছে তারা, কে জানে! রানুর মতো হয়ত অনেকেই হারিয়ে গেছে নিষ্ঠুর কোনো মৃত্যুর ওপারে।

ছোট্ট একটা নিশ্বাস কেঁপে কেঁপে বেরিয়ে এল মালুর বুক চিরে। বেরিয়ে এসে মিলিয়ে গেল তালতলির হাহাকারে।

দেখতে দেখতে কী যেন হয়ে গেল। দরবেশ চাচা বলে, সবই মাদারির খেল– সচকিত হল মালু। সেই যে বলতে শুরু করেছে, সেকান্দর মাস্টার এখনো বলেই চলেছে।

দরবেশ চাচাই ঠিক। সবই ভেল্কিবাজি। মাদারির খেল। আবারও বলল সেকান্দর মাস্টার।

তাই কী? মূঢ় নির্বোধ ওই আকাশটাকেই যেন শুধাল মালু। এ কী বধির কোনো বিধাতার অভিশাপ? অথবা জীবনেরই কোনো নির্মম ধারা। সঠিক জবাবটা কেউ দিতে পারে কী?

ভটচার্যিদের সেই ছেলেটা মালুকে যে ম্লেচ্ছ বলে গালি দিয়েছিল। তার কথা মনে পড়ল। ছোট সেই অপমান বোধের সামান্য অবশিষ্টও জমে নেই মনে। আজ ওকে পেলে বুকে টেনে নিত মালু। জিজ্ঞেস করত, কেমন আছ ভাই?

বনমালির কথাটাও মনে পড়ল। ভটচার্যিদের বাড়ির পেছনেই ছিল বন মালিদের বাড়ি। ভাটচার্যিদের ছেলেটা বাজে ছেলে, বলেছিল বনমালি। আর মালুকে বুঝিয়েছিল, ওই বাজে ছেলেটার বাজে কথায় তুমি স্কুল ছেড়ে দেবে? কখনো না। তুমি এসো স্কুলে।

অশোকের গানের স্কুলে মালুর সাথে যারা গান শিখত তাদের কথাও মনে পড়ল। বিনোদ, কৃষ্ণপদ, হরিহর। বিভা, সুলেখা, আরতি। জাপানীর ভয়ে অনেক গেরেস্ত যখন গ্রাম ছেড়েছিল, ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা গেছিল কমে, তখন ছেলে আর মেয়েদের এক সাথেই ক্লাস নিত অশোক। ছাত্রীদের মাঝে বিভাকেই ভালো লাগত মালুর। ঠিক রাশুর মতো। রাশুর মতোই আপন মনে হত বিভাকে। বিভার জন্য কতদিন মটর, বাতাসা আর নকুলদানা পকেটে করে নিয়ে গেছিল মালু।

কী বিশ্রী একটা অভ্যাস ছিল বিভার। নকুলদানাই হোক আর বাতাসাই হোক, কখনো ডান হাতে নিত না ও, নিত বাঁ হাতে নিয়েই ফস করে লুকিয়ে ফেলত আঁচলের তলায়। একদিন তো অশোকের হাতে ধরাই পড়ে গেল।

আচ্ছা? তলে তলে এসব হচ্ছে? চোখ পাকিয়ে বলেছিল অশোক। কই দেখি? আমার ভাগটা কোথায়?

সেদিন অর্ধেক নকুলদানা একাই সাবাড় করেছিল অশোক। বাকী অর্ধেক বিলিয়ে দিয়েছিল সবাইকে।

লজ্জায় মাটির সাথে মিশে গেছিল মালু। কিন্ত বলিহারি মেয়ে বিভা। লজ্জা শরম তো দূরের কথা, উল্টে বলেছিল, বা-রে, আমার জিনিসে সবাই ভাগ বসাবে কেন!

এমনি আরও কত মধুর স্মৃতি তালতলিকে ঘিরে। মধুর স্মৃতিরা জড়িয়ে ধরে মালুকে।

মিত্তির বাড়ির পাশ কেটে একটা রাস্তা চলে গেছে যুগী পাড়ার দিকে। তারপর ঘুরে এসে মিশেছে তালতলির বাজারের মুখে মূল রাস্তাটার সাথে। নামটা যুগী পাড়া হলেও সেখানে থাকে তালতলির যত ইতরজন কামার কুমোর জেলে আর মেথর। যুগী পাড়ার সেই রাস্তাটার মুখে এসে ধপ করে বসে পড়ল মালু।

কিরে, কী হল? পায়ে লেগেছে? ঝুঁকে এসে শুধাল সেকান্দর মাস্টার। মাস্টারের প্রশ্নটা হয়ত কানেই গেল না মালুর। অকম্প দুটো চোখ ওর মিত্তির বাড়ির সুপারী গাছের ফাঁকে উঁকি দেওয়া আকাশের ধূসরতায় কী যেন খুঁজছে!

হয়ত বুঝল সেকান্দর মাস্টার। বলল, আমি যাই বাজারে, কিছু কাজ আছে সেখানে। সুলতান ভূঁইঞার দোকানের সামনে পাবি আমাকে।

মিত্তির বাড়ির পেছনে যুগীপাড়ার রাস্তার লাগোয়া প্রকাণ্ড পুকুর। পুকুরের উত্তর পাড় ধরে বড় মাঠ। পুকুরের পাড়ে আর ওই মাঠে মেলা বসত দোলের সময়, চৈত্র সংক্রান্তিতে। ছোট বেলায় জাহেদের সাথে রাবু আরিফা মিলে কতবার এই মেলায় এসেছে। কত কিছু কিনত ওরা। রাবু আরিফা পর্দা নেয়ার পর মালু একাই আসত ওদের ফরমাশ নিয়ে। তারপর এই মেলা থেকেই তো বিভাকে একটা মাটির নটরাজ কিনে দিয়েছিল মালু। লাজুক নয় বিভা, এটা সবাই জানতো। কিন্তু সেদিন বিভার শ্যামলা মুখখানা কী এক লজ্জায় আনত হয়েছিল। বিভা বলেছিল তুমি কেন এত কিছু দাও আমাকে?

কোনো উত্তর জোগায়নি মালুর কণ্ঠে। হাতের অবশিষ্ট জিনিসগুলো বিভার আঁচলে তুলে দিয়ে বোকার মতো দাঁড়িয়েছিল ও।

মুখ তুলে হেসেছিল বিভা। বলেছিল, নটরাজটা সুন্দর, ঠিক তোমার মতো। বলেই পালিয়ে গেছিল বিভা।

বিভা নেই। আরতি, সুলেখা, বিনোদ, হরিহর ওরা কেউ নেই। এখন আর মেলা বসে না এখানে। যারা মেলা বসাতে তারা নেই। পুকুরের পাড়গুলো কে বা কারা কেটে ফেলেছে, ক্ষেত বানিয়েছে। মাঠটাও নেই। সেখানে এখন ধানের ক্ষেত। ভাবতেও কেমন লাগে মালুর। তালতলিতে বিভাকে আর দেখা যাবে না কখনও। এ গ্রামে আর কেউ অশোকের গান শুনবে না কোনোদিন। রানুদের বাড়িতে আর কখনও ডাক পড়বে না মালুর।

ছোট বেলার মতো দুচোখ ছাপিয়ে কান্না এল মালুর। অন্ধ-অভিমানে রাগে ক্ষোভে অপমানে। ছোট বেলায় যেমন করে কাঁদত মালু। মালুর মনে পড়ল, বাকুলিয়া

তালতলি ছাড়ার পর এই প্রথম দুচোখ ভাসিয়ে কাঁদল ও।

৬৩.

চোখ মুছে উঠে পড়ল মালু। যুগীপাড়ার মুখে ক্ষীরোদের মার সাথে দেখা।

তোমরা যাও নি?

না।

যুগীপাড়ার অনেকেই যায়নি।

ওরা বলল, ওদের সামর্থ্য নেই রেলের টিকেট কিনবার। কেমন করে যাবে, কোথায় যাবে? এখানে তবু বাপদাদার ভিটিটা তো আছে।

আশ্বস্ত হল না মালু। তবু যেন একটু ভরসা পেল মনে।

কিন্তু জেলেপাড়াটা একেবারেই ফাঁকা। ওরা সব দল বেঁধে চলে গেছে। জেলেপাড়া থেকে বাজারের দিকে মোড় ঘুরে অবাক হল মালু। পরিত্যক্ত রামঠাকুরের দিঘির পাড়গুলো যেমন প্রশস্ত আর উঁচু ছিল তেমনি রয়েছে। এই দীঘির পাড়ে একদা গোরাদের ছাউনি পড়েছিল। অনেক বছর ছিল সেই ছাউনি। গোরারা থাকতে, ওরা উঠে যাবার পরও কেউ এ দীঘির পাড় মাড়াত না ভয়ে। জীবনে একবারই ওই দীঘির পাড়ে চড়েছিল মালু। মালু তখন ছোট, খুবই ছোট। তখনও গাছে চড়া শেখেনি মালু, স্পষ্ট মনে আছে ওর। ঘটনাটা পুরো মনে নেই মালুর। শুধু মনে আছে সেকান্দর মাস্টারের হাত ধরেই এসেছিল ও। কেন যেন ভীষণ উত্তেজিত হয়েছিল সেকান্দর মাস্টার। গলা চড়িয়ে তর্ক করছিল গোরাগুলোর সাথে। সেই ফাঁকে মালু দেখে নিয়েছিল গোরারা একটা লোককে মাথা নিচের দিকে দিয়ে পা জোড়া উপর দিকে বেঁধে রেখেছিল একটা গাছের ডালে। ভীষণ শীত পড়ছিল, বোধ হয় মাঘ মাস হবে। আর একটা লোককে গোরারা দীঘির পানিতে গলা পানি অবধি টেনে বাঁশের সাথে বেঁধে রেখেছিল।

সেই বিভীষিকার স্মৃতি মালু ভোলেনি, কোনোদিনই ভুলবে না। তালতলি গ্রামের যে দুটো তাজা ছেলেকে গোরারা পিটিয়ে মেরেছিল তাদের একজন ছিল রানুর বন্ধু, সে কথাটাও মনে আছে মালুর। বড় হয়ে এই বিপ্লবীদের কথা সেকান্দর মাস্টারের কাছেই শুনেছে মালু।

কিন্তু মালুকে যা অবাক করেছে সে হল দীঘির পাড়ে একটি স্মৃতিফলক। কখন, কে বা কারা তুলছে এই স্মৃতিফলক, মালু জানে না। কিন্তু তাদের প্রতি শ্রদ্ধায়

মাথা নত করল মালু।

বাজারের দিকে ঠিক উল্টো ছবি তালতলির।

দত্তের বাজারে ঘরের সংখ্যা বেড়েছে, বেড়েছে গুদাম আর আড়তের পরিধি। সেই যে যুদ্ধের জামানায় দত্তের বাজার কেঁপে উঠেছিল বন্দরে, আজকের সীমানা তার সে বন্দরকেও ছাড়িয়ে গেছে।

ধানের কল, গম ভাঙার কল অনবরত ঘর ঘর শব্দ তুলে চলেছে। শহরের পাইকার আর বেপারীদের স্থায়ী আস্তানা পড়েছে। পণ্যের বিকিকিনি, বায়নাদার, দাদনদার, ফড়ে বেপারীর লেন-দেনে চঞ্চল দত্তের বাজার।

বাজারের শেষ মাথায় দত্ত বাড়ির পুরনো ভিতে উঠেছে কাজি বাড়ির নতুন ইমারত। তালতলির পরিত্যক্ত বাড়িগুলোর যত শূন্যতা আর হাহাকার এখানে এসে পথ হারিয়েছে, থমকে দাঁড়িয়েছে। এখানে রং। এখানে জৌলুস। বাজারের কোলাহল নেই। রয়েছে একটি অভিজাত গাম্ভীর্য। রামদয়ালের প্রকাণ্ড বৈঠক ঘরটি ছিল মহাজনী গুদামের কিঞ্চিৎ সংস্কৃত রূপ। শক্ত গাঁথুনির মোটা-সোটা দেয়াল। তাতে ছিল না সৌষ্ঠব। কিন্তু, কাজি রমজানের শখ আছে। রামদয়ালের সেই দালানটাকে বারান্দা আর ব্যালকনির অলংকার দিয়ে নতুন করে সাজিয়েছে ও। সুমুখে করেছে মাঠ। মাঠের পরে ঠিক বাজারের রাস্তায় লোহার রেলিং ঘেরা সীমানা। সেখানে শহুরে কায়দায় ফটক।

চুম্বকের আকর্ষণের মতো মালুর চোখজোড়া গেঁথে থাকে কাজি বাড়ির ফটকে। পুরনো দত্তবাড়ির শক্তি আর দম্ভকে ম্লান করে দিয়ে সেই সাবেক গাঁথুনির উপর মাথা উঁচিয়ে শক্তি আর বিলাসের নতুন ইমারত। আসমান বিস্তৃত তার অভিলাষ। আসমান উঁচু তার ঔদ্ধত্য।

ছিল বদমাশ জাঁহাবাজ, মিঞাদের লেঠেল। এখন হয়েছে শয়তান। আস্ত শয়তান। শয়তানের বুদ্ধি তার লোমের রোঁয়ায় রোঁয়ায় হাড্ডির গিঁঠে গিঁঠে। আতুড়ির প্যাঁচে প্যাঁচে। এমনি করেই বলে সেকান্দর। বলে যেন অনেক দিনের। পুঞ্জীভূত ঘৃণা আর বিক্ষোভের দুর্ভারটাকে একটু লাঘব করে নেয়।

নিজের কথা তো কিছুই বললেন না মাস্টার সায়েব। শুধাল মালু। আর নিজের কথা। এতক্ষণে সেকান্দর মাস্টার একটু হাসল। শীর্ণ আর ম্লান হাসি।

মা-টা মারা গেল। মা-ই তো ছিল ঘরের একমাত্র বাঁধন। রাশু, ভালোই আছে ও। এক ছেলে দুই মেয়ের সংসার ওর। অশান্তির মরুভূমিতে ওই তো একটুখানি

শান্তির উদ্যান। এতক্ষণের জ্বালাধরা কর্কশ গলাটি কোমল হয়ে এসেছে সেকান্দরের।

একলা একলা এত কষ্ট করছেন মাস্টার সায়েব, বিয়ে করলেন না কেন? আচমকাই জিজ্ঞেস করে বসল মালু।

বিয়ে? হা হা হা, তুইও যেমন। রাস্তার মাঝেই বুঝি অট্টহাসির বেগে লুটিয়ে পড়তে চায় সেকান্দর মাস্টার।

চমকে চাইল মালু। একী হাসির বিকৃতি! মালুর মনে হল যুগসঞ্চিত কোন ব্যথার কান্না নীরবে জমে জমে পাথর হয়েছে, সেই জমাট কান্নার পাথরটাই যেন মাথা কুটে ভেঙে পড়তে চাইছে ওই হাসির আবরণে। সেই আহলাদী বোন রাশু? ভালো আছে ও। বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে মাঝারি অথবা বড় গোছের একটা সংসার হয়েছে তার। এটুকুই কী সেকান্দর মাস্টারের জীবনের সান্ত্বনা?

এও এক সুখ। এক হাজার একশোটি ঝামেলা ঝন্ঝাট নিয়ে মেতে থাকা ডুবে থাকা, পিছু টানবার কেউ নেই। মালুর মনের প্রশ্নটা যেন আঁচ করেই বলল সেকান্দর মাস্টার।

সুখ না ছাই। শুধু বঞ্চনা। প্রবঞ্চনা, মিথ্যা প্রবোধ দেওয়া মনকে, কী এক প্রতিবাদে গলাটাকে হঠাৎ উঁচুতে তুলে ফেলল মালু।

হোক না বঞ্চনা। শান্ত এক স্থিরতা নেবেছে সেকান্দারের স্বরে।

কিন্তু কেন? কিসের জন্য? কিসের পায়ে বিলিয়ে দিলেন জীবনটা? পায়ে পায়ে তো এগিয়ে আসছে মৃত্যু, রংহীন অর্থহীন অতি সাধারণ এক মৃত্যু। মাস্টার সায়েব, এই কী আপনার কাম্য ছিল? জীবনের কাছে কিছুই কী চাওয়ার এবং পাওয়ার ছিল না আপনার?

বুঝি হোঁচট খায় সেকান্দর মাস্টার। দাঁড়িয়ে পড়ে। বগল বদলিয়ে ছাতাটাকে নিয়ে আসে ডান বগলে, ডান হাতের ঝোলাটাকে বাঁ হাতে। তারপর বলে, চাওয়ার ছিল না কিছুই, পাওয়ার ছিল অনেক, সবই পেয়েছি। মিথ্যে কথা।

মিথ্যে কথা? যেন পালট খেয়ে তাকায় সেকান্দর মাস্টার।

কোনো দিন যে মাস্টারের ছাত্র ছিল ওরা সে কথাটা যেন মনে পড়ে না ওদের। এখন ওরা দুই পুরুষ জীবনের কঠিনতম কোনো সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জীবনকেই যাচাই করছে। নিজেদেরই বিচার করছে, ওজন করছে তুলাদণ্ডে।

মিথ্যেই তো। বুড়িয়েছেন অকারণে। চুল পেকেছে অকালে। অকালেই গায়ের মুখের চামড়া এসেছে কুঁচকে, হাড় পাঁজরা গেছে বেঁকে। সব মিলিয়ে এ যে মর্মান্তিক, মাস্টার সায়েব, মনে হয় করুণ এক পরিহাস।

পরিহাস নয়রে! পরিহাস নয়। দুঃখজয়ী যারা তারাই তো জীবনজয়ী। জীবন দাতাও। কোনো বঞ্চনাই তাদের কাছে বঞ্চনা নয়। বঞ্চনার সড়ক ধরেই ওরা এগিয়ে যায় মহাপ্রাপ্তির দিকে। দেখছিস না তোর চারপাশে? এ যেন অতীতের সেই ধীর গম্ভীর সহিষ্ণু মাস্টার সাহেব, গভীর যত্নে আর অক্লান্ত ধৈর্যে বুঝিয়ে দিচ্ছেন পাটিগণিতের কোনো দুরূহ প্রশ্ন।

মানি না। মানি না। এ শুধু অন্তঃসার কথার লেপন। আজীবনের অতৃপ্তি আর বঞ্চনাকে, ব্যর্থ জীবনের পরিহাসকে সহনশীল এমন কী গরিমার তিলক ছিটিয়ে মনকে সান্ত্বনা দেয়া। তেতো ঝাঁঝ মালুর কণ্ঠে।

তা হলে তো পৃথিবীর সমস্ত মহৎ জনের ত্যাগকেই বলতে হয় ফাঁকি। ব্রত সাধনাকে বলতে হয় নিরর্থক।

মহৎ জনের মহত্ত্বের সাথে আমাদের তুলনা কেন, মাস্টার সাহেব। তুচ্ছ আর ক্ষুদ্র জীবনে আমাদের এত যে অতৃপ্তি আর হাহাকার মহতের দৃষ্টান্ত তুলে তাকে কী এতটুকু লাঘব করতে পারছি?

কে চাইছে লাঘব করতে?

আমি চাই, আমি চাই, মাস্টার সায়েব। আমি পারি না এত বেদনার বোঝ বইতে। পারি না এই হুতাশ কান্নার প্রদর্শনীর আর একজন হতে। গভীর কোনো বেদনার নিঃসরণ বুঝি চুঁইয়ে চুঁইয়ে ঝরে পড়ে মালুর কণ্ঠ বয়ে।

রিহানা। নিঃশব্দে এল যে। সব কিছু লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে চলে গেল যেন সেই মেয়েই বুঝি এখনো আচ্ছন্ন করে রেখেছে ওর চেতনাকে। লজ্জিত হল মালু। কী সব বলেছে ও। এ-তো ওর নিজের কথা নয়? মনের গভীরে যে বেদনাকে কবর দিতে চাইছে ও, ভুলে যেতে চাইছে পরাভবের যে গ্লানি এ বুঝি তারই ক্লেদাক্ত প্রকাশ। নিজের কাছেও এমন ভাবে উলঙ্গ হয় মানুষ?

কিন্তু আগুনে পোড়া সেই মানুষটি, সে যেন বুঝল সব কিছু।

একটি হাতের স্পর্শ নেবে এল মালুর কাঁধে। সে স্পর্শে সহানুভূতি, দরদ। আর সেই তপ্ততীক্ষ্ণ অন্তরভেদী চোখজোড়া। সেখানে পৃথিবীর কোমলতা। সে চোখের

দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল মালু। লজ্জার হাসি হাসল। তারপর চলতে চলতে বলল অনেক বছর আগে রাবুর মুখে শোনা একটি কথা, নিজের অভিজ্ঞতার সাথে মিলিয়ে, নিজের মতো করে : জানেন মাস্টার সাহেব। আমাদের সুখ দুঃখের গণ্ডীটাও বড় ক্ষুদ্র। সেই ক্ষুদ্র জীবনের ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা দিয়েই বিচার করতে চাই এতবড় দুনিয়াটাকে। তাই এত বিড়ম্বনা পায়ে পায়ে। না পারি নিজেকে যাচাই করতে। না পারি অপরকে বুঝতে।

থুতু ফেলল মালু। জিবটা বড় তেতো লাগছে। কে যেন বিস্বাদ মেখে দিয়েছে সারা গালে। রিহানার সাথে সাথে নিজের প্রতি, মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা আর আস্থাটাকেও সে কী ফেলে এসেছে পেছনে? নইলে বজ্রের দহনে ঝলসে গিয়েও যে প্রাণে একক শুকতারার মতো দীপ্যমান বাকুলিয়া তাল-তলির আকাশে, সেই মাস্টার সাহেবের জীবনে শুধু নিঃসঙ্গতা, শুধু ব্যর্থতাটাই ওর চোখে পড়ল কেন?

ফিস্ ফিস্ করে বলল মালু : মাফ করে দিন মাস্টার সাহেব। আমারই ভুল। আগুনের পরশমণি দিয়েই তো প্রাণের উন্মেষ। তারই নাম শাশ্বত প্রাণ যার নেই বিনাশ।

সেকান্দর মাস্টার যেন শুনলই না ওর কথাটা। অথবা শুনেও শুনতে চাইল না, তাকিয়ে রইল সুমুখের ধু ধু মাঠটার দিকে। হয়ত অন্য কথা ভাবছে সেকান্দর মাস্টার। ভাবছে সেদিনের সেই হাফপ্যান্ট পরা গান গাওয়া ছেলেটি শুধু গুণী হয়নি জ্ঞানীও হয়েছে।

টিকা নিয়েছিস? ওর দিকে চেয়ে শুধাল সেকান্দর মাস্টার।

জী হ্যাঁ, কেন?

জানিস না তুই? চোখ বড় বড় করে তাকাল সেকান্দর মাস্টার। আমার চিঠি পাসনি? জাহেদ কিছু লেখে নি?

না তো? পেয়েছিলাম শুধু মেজো ভাইর একটা চিরকুট। সেও তো ঢাকায় বসেই লেখা। তাতে লিখেছেন ভীষণ বিপদ রাবু আপার।

বিপদ কী ওর? বিপদ তো সবার, গোটা বাকুলিয়ার।

কী বিপদ মাস্টার সাহেব? উদ্বেগ ঝরল মালুর কণ্ঠে।

বসন্ত। কাল বসন্তে উজাড় হয়েছে বাকুলিয়া। ইঁদুরের মতো মরেছে মানুষ। এখনো মরছে। ভাগ্যিস রাবু ছিল। জাহেদও এসে পড়েছিল দরকারের সময়। নইলে একা

একা কী যে করতাম। দাফন কাফনও করা যেত না লাশগুলোর! শকুন টেনে টেনে খেত মরা মানুষের গোশত। খাচ্ছেও তো। মোহাম্মদপুরে নাকি গোর দেবার লোকও নেই। জানাজা তো দূরের কথা।

মোহাম্মদপুরেও মড়ক লেগেছে। সে তো অনেক উত্তরে। জিজ্ঞেস করল মালু।

ওই বাকুলিয়া থেকে শুরু করে উত্তরে আট দশ গ্রাম, সব গ্রামেরই এক অবস্থা। শুধু কাঁচা কাঁচা কবর। কবর আর কবর। মুশকিল হচ্ছে যারা বেঁচে আছে তারাও পালাচ্ছে ভয়ে। পালিয়ে যে বাঁচতে পারছে তা নয়। হয়ত পথের মাঝে গুটির ব্যথায় কাতরে কাতরে শেষ নিশ্বাস ছাড়ছে। ফল হয়েছে রোগটা এ গাঁ থেকে সে গা ছড়িয়ে পড়েছে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সেকান্দর মাস্টার।

এককালের সেই দত্ত দীঘির তাল শ্রেণীর সারি সারি ছায়া মাড়িয়ে উত্তরের মাঠে নেবে এল ওরা।

দুপুরের সূর্যটা আস্তে আস্তে হেলে পড়ছে পশ্চিমে। রোদের তেজে গা-টা চনচন করছে। হাত বাড়িয়ে সেকান্দর মাস্টারের বগল থেকে হাতটা নিল মালু। ছড়িয়ে দিল মাথার উপর। বলল : এতটা পথ ছাতাটা বগলে বয়ে বেড়ানোর চেয়ে মাথার উপর ছড়িয়ে রাখলেই কী ভালো হত না? ভারটাও কম মনে হত। রোদটাও কম লাগত।

তা ঠিক। সেই শীর্ণ হাসিটাই আবার ফিরে এসেছে সেকান্দর মাস্টারের বিশীর্ণ মুখে।

ক্যাম্বিসের জুতোটা বুঝি গরম হয়ে উঠেছে। জুতো জোড়া খুলে হাতে নিল সেকান্দর মাস্টার। বলল : খেটে খেটে আর রাত জেগে জেগে বড় কাহিল হয়ে পড়েছে রাবু। ওর জন্যই তো গেছিলাম শহরে। একটা টনিক আর এক ডিবে ভিটামিন বড়ি নিয়ে এলাম।

বাকুলিয়ার মানুষের প্রিয় দখিন ক্ষেত। সেই কবে এক অন্ধকার রাতে মিঞা বৌকে পথ দেখিয়ে দখিন ক্ষেতটা মাড়িয়ে গেছিল মালু। আজ পায়ের নিচে দক্ষিণ ক্ষেত। সেদিনের কথাটাই যেন স্মরণ করিয়ে দিল মালুকে।

সামনেই রূপোর পাতের মতো চিক চিক করছে বড় খাল। দূরে খালের ওধারে স্পষ্ট মিঞা পুকুরের উঁচু পাড়। পাড়ের দক্ষিণ কোণে সেই ঝাকড়া মাথা গাব গাছটাকে ঠিক আগের মতো এখান থেকেই চেনা যায়। চেনা যায় মিঞা বাড়ির সেই উঁচু সিদুরে আম গাছটাকেও।

মিঞারা নেই, ফেলু মিঞাও নেই। কেন যেন মনে হল মালুর, ফেলু মিঞার দীর্ঘশ্বাস হয়েই দাঁড়িয়ে আছে ওই দুটো গাছ। দুটো গাছই আরো অনেক কাল এমনি ভাবেই দাঁড়িয়ে থাকবে বুঝি।

জোরে জোরে পা ফেলল ওরা।

৬৪.

এই মাত্র মারা গেল।

মুর্দার আপাদমস্তক একখানা সাদা শাড়িতে ঢেকে রেখে শিয়রের দিকে বসে আছে রাবু। সেকান্দর মাস্টার আর মালুকে ঢুকতে দেখে অস্ফুটে সংবাদটা জানিয়ে দিল।

কে মরল? মালু যেন চাবকিয়েও স্মৃতি শক্তিটাকে জাগিয়ে তুলতে পারছে না। রমজানের বাড়িতে রমজান, রমজানের বৌ আর ওদের দুটো ছেলে আর কেউ ছিল কী?

হ্যাঁ ছিল। ছিল ওর মা। সতেলী মা নয়। আপন মা, যে রমজানকে পেটে ধরেছিল। মাথাটাকে ঝাঁকিয়ে স্মৃতিটাকে যেন উদ্ধার করে আনল মালু।

নামায কলমা নিয়ে পর্দার অবরোধে নির্জন জীবন কাটাত বুড়ি! কেউ ওর খোঁজ রাখত না, রমজানের সেই মা-ই মারা গেল এই মাত্র।

ধুমধামের সাথেই রামদয়ালের বাড়িতে উঠে এসেছিল রমজান। মিলাদ পড়িয়েছিল। তিন মসজিদে সিন্নি দিয়েছিল। পাঁচ গ্রামের ষোল আনা দাওয়াত দিয়ে তিরিশ গরু আর বিশ খাশির জেয়াফত খাইয়েছিল। ধর্মীয় বা সামাজিক কোনো আয়োজনেই ত্রুটি রাখেনি রমজান।

কিন্তু গোল বাধিয়েছিল ওর বুড়ি মা! বেঁকে বসেছিল। কিছুতেই নড়েনি নামাযের চৌকি ছেড়ে, বলেছিল : ছনের ঘরই ভালো আমার। শ্বশুরের ভিটি খসমের তোলা ঘর ছেড়ে কোথায়ও যাব না আমি।

যায়নি বুড়ি! রয়ে গেছে। খসমের ভিটিতেই শেষ নিশ্বাস টেনেছে। লেকু ফজর আলি দুজনকে দিয়েই খবর পাঠিয়েছিলাম রমজানকে। যা হয় করতে বলেছে। বসন্তের মরা নাকি ঘাটতে পারবে না সে। কাফনের সাদা থানটা ফাড়তে ফাড়তে বলল জাহেদ।

ঝোলাটা মালুর হাতে দিয়ে গুম হয়ে রইল সেকান্দর মাস্টার। কয়েক সেকেন্ড তারপরই ফেটে পড়ল আকস্মিক এক বিস্ফোরণে : দাও। মুর্দাটাকে তুলে দাও আমার পিঠে। ওই হারামজাদার বালাখানার সুমুখেই ফেলে আসব আমি। ওরই সামনে শকুন এসে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাক ওর মাকে। দেখুক লোকে।

আহা উত্তেজিত হচ্ছ কেন? কাফনটাকে দু টুকরো করে রাবুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল জাহেদ।

উত্তেজিত হব না মানে? দৌড়ে দৌড়ে গেছি আট মাইল। আবার এসেছি আট মাইল। জিরিয়েছি এক মিনিট? কে যাবে এখন গোর খুঁড়তে? আমি পারবো না।

নাও না একটু জিরিয়ে। কবর দিতে না হয় একটু দেরিই হোক! তাতে তো আর কিছু আসছে যাচ্ছে না। কাফনের ছোট একটা টুকরোকে ফিতের মতো সরু সরু করে ছিঁড়ে নেয় জাহেদ।

না। কবর-টবর আমি দিতে পারব না। তার চেয়ে তোমরা বাড়ি ফিরে যাও।

বুড়িটা পচুক। আমি ওই জানোয়ারটাকে খুন করে আসি।

সত্যি বুঝি খুন করতে যাবে বলে পা তুলল সেকান্দর মাস্টার।

কাফনের ফিতেগুলো মৃতার চৌকির উপর ছুঁড়ে ফেলে ঝট করে দাওয়া ছেড়ে নেবে এল জাহেদ। শক্ত করে ধরে ফেলল সেকান্দর মাস্টারের হাতের কবজিটা। চেঁচিয়ে উঠল, পাগল হলে নাকি?

রুদ্ধ রাগে গরগরিয়ে কাঁপছে সেকান্দর মাস্টার।

গরগরিয়ে কাঁপা মানুষটার দিকে চেয়ে থাকল মালু। একটু অগেও মমতার স্পর্শ বুলিয়েছিল মালুর কাঁধে। ধীর সহিষ্ণুতায় প্রকাশ করেছিল হৃদয়ের আর উপলব্ধির গভীর এক সত্যকে, এ যেন সে মানুষ নয়-অন্য মানুষ। আবেগবর্জিত ভাবালুতাহীন, এই তো ছিল সেকান্দর মাস্টারের পরিচয়। জাহেদ বলত একটু ভীতু, বড় বেশি সাত পাঁচ ভাবে। কিন্তু দিলটা খাঁটি কোহিনূর। বলে হাসত জাহেদ। অপ্রতিভ সেকান্দর মৃদু স্বরে ধমকে উঠত : চুপ কর তো জাহেদ।

জীবনের সাথে যুঝে যুঝে দুঃখ আর অনাচারের জঞ্জাল ঘেঁটে নিঃশঙ্ক হয়েছে সেকান্দর মাস্টার। স্পর্শকাতরও। হয়ত অন্ধও হয়েছে। অন্ধ ওর রাগ। অন্ধ ওর বিক্ষোভ। তাই মনে হল মালুর।

জানোয়ারের উপর রেগে কোনো ফায়দা আছে মাস্টারজী। মৃতার শেষ কৃত্যের দায়িত্বটাতো আমাদের উপরই বর্তেছে। নম্র গলায় বলল রাবু। ম্যাজিকের মতো ফল হল রাবুর কথায়।

মুখ নীচু করে মুর্দার চৌকিটার দিকে এগিয়ে এল সেকান্দর। নিস্পলক চোখে চেয়ে রইল বুড়ির মরা মুখের দিকে। বার্ধক্যজর্জর মুখের মরা রেখার কঠিন ভাঁজে কী যেন দেখল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে, গভীর মনোযোগে। তার পর হাত রাখল কপালে। যেন দেখল, রমজানের মা সত্যি মরেছে কিনা।

মালু। চৌবাচ্চা থেকে দুঘড়া পানি তুলে দিবি?

সেকান্দরের সাথে সাথে মালুও বুঝি মন দিয়েছিল মরা মুখের পাঠোদ্ধারে, রাবুর গলা পেয়ে ফিরে চাইল। চেয়ে রইল।

একটা ঢিলেঢালা ইরানী বোরখা পরেছে রাবু। গলা থেকে কোমরের নিচু অবধি ঢিলে জোব্বার মতো। হাত মুখ আর মাথাটা ভোলা। মাথার অংশটুকু ওড়নার মতো আলতোভাবে ফেলে রেখেছে কাঁধের উপর। বোরখার হাল্কা ঘি-রং বিলেতী লিনেন আশ্চর্য মিশ খেয়ে গেছে রাবুর ফর্শা রংয়ের সাথে।

মেজো ভাই। তুমি যাও। গোর খোঁড়ার ব্যবস্থা করগে। মাস্টারজী একটু বিশ্রাম নিক। আমি মুর্দাকে গোসল করিয়ে সাজিয়ে রাখছি। থাক, বিশ্রাম একেবারেই নেব, কবরে গিয়ে। তুমি কবরখানার দিকে যাও জাহেদ। আমি ঝাড় থেকে বাঁশ কেটে আনছি।

থপ থপ করে পা ফেলে চলে গেল সেকান্দর। ওকে অনুসরণ করল জাহেদ। দুহাতে দুটো ঘড়া তুলে নিল মালু।

চল। আমরাও একটু জিরিয়ে নিই। বলল রাবু।

উঠোন পেরিয়ে রমজানের সেই পরিচিত ডাঙ্গার কলা গাছের তলায় গিয়ে বসল ওরা।

মনে পড়ল মালুর, এখানেই একদিন হুরমতির দিকে ছেনি ছুঁড়ে মেরে ছিল রমজান। কলার ডগায় আটকে গেছিল ছেনিটা। খিল খিল করে হেসেছিল হুরমতি।

ভাল আছিস তো? মুখটা অত শুকনো কেন রে? স্নেহ ঝরিয়ে শুধাল রাবু।

আমার মুখ শুকনো? নিজের চেহারাখানি আয়নায় একবার দেখ, তারপর বল।

উত্তরে ছোট্ট হাসির একটি ক্ষীণ আভা ফুটল রাবুর মুখে। আবার শুধাল : একলা ফেলে এসেছিল রিহানাকে। কেমন আছে ও?

নিরুত্তরে মুখটা ঘুরিয়ে নিল মালু। মুখ ঘুরিয়ে অল্প অল্প বাতাসে দোল খাওয়া কলা পাতার খেলায় মন দিল বুঝি।

মাটির বুকে ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে কলা পাতার ছায়ারা। কলা পাতার ছায়ারা কাঁপছে। সে ছায়ার ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে সরে সরে যাচ্ছে রোদটা। একমনে যেন তাই দেখছে মালু।

রাবু আপা, ডাকল মালু।

সপ্রশ্ন চোখ জোড়া ওর মুখের উপর তুলে ধরল রাবু।

যেদিন তোমায় ট্রেনে চড়িয়ে দিলাম সেদিন খটকা ছিল মনে। বলেছিলাম তোমাকে। মনে পড়ে?

কী বলেছিলি রে?

বলেছিলাম কোথায় যেন হার মানছ তুমি। সে সন্দেহ আমার ঘুচে গেছে, রাবু আপা। সব মিলিয়ে আজ তোমারই জিত।

কী জানি বাপু। মেয়ে মানুষ আমি। তোদের মতো করে হারজিতের কথাটা তো ভাবিনি আমি কোনোদিন। বলতে বলতে রাবুর ঠোঁটের রেখায় আবারও অস্পষ্ট একটি হাসি জাগল। পরক্ষণেই মিলিয়ে গেল।

সত্যি বলছি রাবু আপা? মুখটা তোমার ফ্যাকাশে। চোখের কোলে অনিদ্রার কালি। ভীষণ শুকিয়ে গেছ তুমি। তবু এত সুন্দর তো তোমাকে দেখিনি কখনো? মনে হয় কোনো দুর্লভ আনন্দ লেপে রয়েছে তোমার মুখে তোমার...।

হাত তুলে ওকে থামিয়ে দিল রাবু। বলল : অনেকখানি সেরে উঠেছেন আব্বা। স্কুলটাও চলার মতো অবস্থায় এসেছিল। মড়কের জন্য বন্ধ এখন! রাবু থামল। একটা চকিত দৃষ্টি বুলিয়ে নিল মালুর মুখের উপর। বলল আবার রোগে শোকে জন্মস্থানের মানুষদের সেবায় সান্ত্বনায় এগিয়ে আসতে পারছি। এ কী কম সৌভাগ্য?

শুধু কী তাই রাবু আপা? আর কিছু না? অন্য কোনো গৌরব, অন্য কোনো প্রাপ্তি?

নীরব রাবু। মাটির গায়ে নখ দিয়ে দাগ কেটে যায় অজস্র। দাগ কেটে চলে।

তিমির রাতে যার হাত ধরে পথ চলা যায় নির্ভয়ে, নৈকট্য যার পৃথিবীর আলো আর আনন্দের পরশ, সে এক মানুষ। সে মানুষটি যেন নিবিড় একটি অনুভূতি, নিবিড় একটি অনুভূতির মতো সঞ্চারিত রাবুর চৈতন্যের নিঃশব্দ জগতে। নিঃশব্দ জগতের কথাটা কখনো কী অন্যের সুমুখে ব্যক্ত করা যায়?

তবু যে প্রাপ্তির গৌরব লেখা হয়ে গেছে ওর মুখে, গোটা দেহের ছন্দে, প্রশান্ত চোখের স্নিগ্ধ ছায়ায়, সেটা তো লুকিয়ে রাখার বস্তু নয়! লুকিয়ে রাখতে পারেনি রাবু। ধরা পড়েছে মালুর চোখে।

মাটির গায়ে আঁচড় কাটতে কাটতে বুঝি ধুলো উঠল। সে ধুলোয় মুঠো ভরল রাবু। মুখ তুলল। তাকাল মালুর দিকে।

মালু দেখল, টলটলে ওই চোখের কোলে উজ্জ্বল দুটো মুক্তোর ফোঁটা। দুটো মুক্তোর ফোঁটা কেঁপে কেঁপে ঝরে পড়ল।

বলল রাবু : এই মাটির ধুলো আর ওই মানুষটা, সে যখনই যেখানেই থাকত তাকে নিয়ে আমি সার্থক। আমি খুব সুখী। বুঝলি মালু? আমি সুখী।

শব্দ নেই কোথাও। ওরা এখন চুপচাপ। মাথার উপর দোল খাচ্ছে কলা পাতা। নিচে ধূপ-ছায়ার আলপনা। উঠোনের ওপারে ঘরের দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছে সাদা শাড়ি ঢাকা রমজানের মরা মাকে।

আচমকা নীরবতা ভেঙে মুখর হল মালু।

রাবু আপা। এত তিক্ততার মাঝেও জীবনের সুর যার খণ্ডিত হয়নি সে আমার নমস্য। নাও, আমার সালাম নাও তুমি। মাথা নুয়ে ওর পা ছুঁল মালু। ওর পায়ের ধুলো কপালে মাখল।

আরে থাম থাম। বড্ড নাটুকেপনা করিস তুই, ত্রস্তে পা জোড়া সরিয়ে নিল রাবু।

কী যেন বলতে যাচ্ছিল মালু। পেছন থেকে হুরমতি এসে দাঁড়িয়েছে ওদের সামনে। ওর হাতে দুগ্লাস দুধ।

ওমা মালু? তুই কখন রে? বিয়ে করেছিস শুনলাম? খুব সুন্দরী আর শহুরে মেয়ে। কই মেজো মিঞা কোথায়? এক সাথে অনেক প্রশ্ন হুরমতির।

জাহেদ নেই। ওটা মালুকে দে। দুধের গ্লাসটা মালুর হাতে তুলে দিল রাবু। আর একটা গ্লাস নিল নিজে।

হুরমতিকেই দেখছে মালু। হুরমতির স্বাস্থ্য গেছে কিন্তু রূপ যায়নি। কপালের সেই কলঙ্ক তিলক যা ওর কাছে ছিল আপন ব্যক্তিত্বের সদর্প ঘোষণা, সেই তিলকটা তেমনি আছে।

ঢাকায় যেমন দেখেছিলাম তার চেয়ে তোমার শরীরটা একটু ভালো। ওকে খুশি করার জন্যই বুঝি বলল মালু।

শরীর আমার সব সময় ভালো, তোদের সকলের চেয়ে ভালো। মালুর শূন্য গ্লাসটা হাতে নিয়ে বলল হুরমতি। তারপর হাসল।

ধানের কোরা মাথায় লেকু এল।

ওকে দেখেই খেঁকিয়ে উঠল হুরমতি। এ কী? তুমি এখনও যাওনি ধান ভাংতে? সেই সকাল ট্যাঁ ট্যাঁ করছি সরু চাল ফুরিয়ে গেছে। সরু চাল না পেলে দরবেশ চাচা আমার মাথা ভাঙবে। তবু...

থাম তো। কামের কাম তো একটাই জানিস, আমার সাথে ঝগড়া। পুরুষ মানুষের মেলা কাম। কোরাটা মাথা থেকে নাবিয়ে সকাল থেকে একের পর এক কামের ফর্দটা দিয়ে গেল লেকু। সেই ভোর রাত্রে গগন ডাক্তারকে ডেকে এনেছে। গগন ডাক্তার বলেছে বুড়ি বাঁচবে না, তবু তেরটা দাওয়াই দিল। সে দাওয়াই আবার সঙ্গে ছিল না ডাক্তারের। লেকুকে ফের যেতে হল ডাক্তারের সাথে। বুড়ির শেষ অবস্থা, খবরটা পৌঁছে দিল রমজানের বাড়িতে। রমজান ছিল না। পরে শুনলাম রমজান এসেছে, এদিকে বুড়িও অক্কা পেয়েছে। ছুটতে ছুটতেই খবরটা দিয়ে এলাম রমজানকে। এসে দেখি মাস্টার আর মেজো মিঞা নিজেরাই লেগে গেছে কবর খুঁড়তে। এটা শরমের কথা না? ওদের হটিয়ে আমি আর ফজর আলি খুঁড়ে ফেললাম কবরটা। মনে পড়ল ধানের কথা। সেই ধান নিয়ে আবার ছুটছি তালতলিতে। তবুও তুই চিল্লাবি? গড়গড় করে কথাগুলো বলে গেল লেকু। তারপর ট্যাক খুলে বের করল ছোট্ট একটা পানের খিলি। পানের খিলিটা গালে পুরে একটু দম নিল। হুরমতি এবার খি খি হাসল। বলল, হা হা, তুমি যে কামের মানুষ সে কী কারও অজানা? এখন জলদি জলদি যাও, জলদি ফিরে এস। মুর্দাটাকে দাফন করতে হবে তো।

এতক্ষণে মালুর দিকে মনোযোগ দিল লেকু। বলল না কিছু, খুশি হয়েছে–ছোট্ট হাসিতে শুধু সেটুকুই জানিয়ে দিল। তারপর ধানের কোরাটা মাথায় তুলে রওনা দিল তালতলির দিকে।

রমজানের দায়ের কোপ জোয়ান শরীরের যে তাকতটা কেড়ে নিয়েছিল সে তাকতটা ফিরে পায়নি লেকু। তবু ওর চলায়, ধানভর্তি কোরাটা দুহাতের টানে মাথায় তুলে নেয়ার মাঝে সেই ষোল বছর আগের মতোই এমন এক শক্তি আর পৌরুষের প্রকাশ যা যে কোনো মানুষকে মুগ্ধ করে। হুরমতিকেও বুঝি এই পৌরুষই মুগ্ধ করেছিল। আজও মুগ্ধ করে। মুগ্ধ চোখে চেয়ে থাকে হুরমতি গাছ গাছালির ঝোপে ঢাকা পথটার দিকে যেখানে এই মাত্র অদৃশ্য হয়ে গেল লেকু।

লেকু আর হুরমতি। বাকুলিয়ার যা কিছু মালুর কাছে প্রিয় তার সাথে জড়িয়ে আছে ওরা। ওদের কাছে এসে মালুর মনে হল ওর বুকের অনেক শূন্যতা ওর অলক্ষেই কখন ভরে গেছে। গেল কয়েক মাসের সকল নিরানন্দ আজ এক মুহূর্তে মুছে গেছে।

জান রাবু আপা, হুরমতি বুয়ার কাণ্ড? ভর্তি করে দিয়ে এলাম হাসপাতালে। দুদিন পর গিয়ে দেখি নেই, পালিয়ে গেছে হাসপাতাল ছেড়ে। কেন পালিয়েছিলে হুরমতি বুয়া?

কী যেন বলতে যাচ্ছিল হুরমতি। কিন্তু তার আগেই রাবু বলতে শুরু করেছে। কাণ্ড কী আর কম করেছে ও? একমাত্র লেকুই ওর দাওয়াই। শুনেছিস সে ঘটনা?

না তো? ঔৎসুক্যে গলাটা রাবুর দিকে বাড়িয়ে নিল মালু।

হুরমতি তো বিয়ে করল লেকুকে। প্রথম দিনটা ভালোয় ভালোয় কাটল। দ্বিতীয় দিন বাধল গোলমাল। হুরমতি বলে, তুমি আমার বাড়িতে উঠে এসো। লেকু বলে, কখনো না। আমি কেন তোর ঘর জামাই হতে যাব? ব্যাস লেগে গেল দুজনে।

তারপর?

একদিন যায়। দুদিন যায়। তিন দিন যায়। নড়চড় নেই লেকুর কথায়। চারদিনের দিন সুড় সুড় করে হুরমতি বিবি উঠল গিয়ে লেকুর বাড়ি। হো হো করে হাসল মালু। রাবুও।

বুঝি লজ্জা পেয়ে মাথায় কাপড় টানল হুরমতি। বলল, ছিঃ বুজান। একটা মুর্দাকে সামনে রেখে ঠাট্টা তামাসা করছি আমরা? চমকে উঠল মালু। রাবুও। কথার মাঝে

ডুবে গেছিল ওরা, ভুলে গেছিল রমজানের মৃতা মা ওদের চোখের সামনেই শুয়ে আছে শেষ শয্যায়।

এটাই তো স্বাভাবিক। মৃত্যুর জন্য জীবন কখনো অপেক্ষা করে না। মৃত্যুর পাশাপাশিই জীবনের অস্তিত্ব। তাই না, রাবু আপা? অপ্রস্তুত হওয়া রাবুকে কিছুটা সহজ করার জন্যই বলল মালু।

কিন্তু রাবু ততক্ষণে ডাঙ্গা ছেড়ে পৌঁছে গেছে উঠোনে। সেখান থেকে ফরমাশ দিচ্ছে, ঘড়াগুলো নিয়ে যা, পানি তুলে দে।

ওমা সে কী কথা? তুমি একলা মুর্দা গোসল করাবে নাকি? হুরমতি চেঁচিয়ে উঠল। একটু অপেক্ষা কর। তোমার আব্বাকে ভাতটা দিয়েই ফিরে আসছি আমি।

এখনও ভাত দাওনি আব্বাকে? হুরমতি বুয়া, তুমি শীগগীর যাও। আব্বা নিশ্চয় বাড়ি মাথায় করছে। আতঙ্কিত কণ্ঠ রাবুর।

যা হয়েছে তোমার আব্বা, ছিল দরবেশ হয়েছে লাট সাহেব।

আলু সেদ্ধ দিলাম। ডিম ভাজি করে দিলাম। সঙ্গে ঘিয়ের রান্না মুগডাল। বলে কিনা মাছ দে, গোশত দে, কী আর করি। মুরগি একটা জবাই করে ছিলে টিলে রেখে এসেছি। এখন রান্না করব। যেতে যেতে বলল হুরমতি। ঘড়া নিয়ে চৌবাচ্চার দিকে চলে গেল মালু। পানিতে ভরিয়ে দিল মৃতার চৌকির পাশে রাখা মটকাটা।

ব্যাস, ওতেই চলবে। বাইরে গিয়ে বস তুই। আমি না ডাকলে এদিকে আসবি না। সাবান আর কর্পূরের মোড়কটা খুলতে খুলতে বলল রাবু।

বাইরে এসে কবেকার পড়ে থাকা ভাঙা এক চৌকির পায়ার উপর বসল মালু। বেড়ার ফাঁক দিয়ে সব কিছুই যেন স্পষ্ট দেখছে ও। দেখছে, ধীরে ধীরে মুর্দার আবরণটা সরে গেল। কোমরের কাছে কোনো রকমে জড়িয়ে থাকা শাড়ির টুকরোটাও খুলে ফেলল রাবু। তারপর আস্তে আস্তে বদনা বদনা পানি ঢালল মৃতার শরীরে।

প্রথমে সাবান ঘষে মাথার চুলগুলো পরিষ্কার করল। পাতলা ন্যাকড়া দিয়ে মুছে নিল পানিটা। তারপর চিরুনি চালিয়ে পাট করে দিল শণের মতো ধূসর দড়ি পাকানো চুলের গোছাগুলো।

এবার পুঁজগলা, ফাটা, কোথাও বা কুঁচকে যাওয়া শরীরটাকে আস্তে আস্তে সাবান মেখে ধুয়ে দিল রাবু। গভীর যত্ন আর মমতায় ন্যাকড়া চেপে চেপে পুঁজ আর পানিটা শুকিয়ে নিল। একটা ধোঁয়া শাড়ি দিয়ে দেহটাকে ঢেকে দিল আবার। ডাকল মালুকে, একবার এদিকে আসবি মালু?

মসজিদের মুর্দা ফরাশের খাঁটিয়াটা দাওয়ায় তুলে রেখে গেছে জাহেদ আর ফজর আলী। খাঁটিয়াটাকে ঘরের ভেতর নিয়ে এল ওরা। কাফনের এক প্রস্থ কাপড় খাঁটিয়ার উপর বিছিয়ে দিল রাবু। তারপর দুজনে ধরাধরি করে মুর্দাকে উঠিয়ে নিল চৌকি থেকে। শুইয়ে দিল শেষ যাত্রার পালকিতে। যা এবার।

চলে এল মালু। রাগ হল ওর। মরা মানুষের সামনেও জ্যান্ত মানুষগুলোর সংস্কারের অন্ত নেই। মরার না আছে জাত, না আছে ধর্ম, না স্ত্রী পুরুষের ভেদ। কী এমন আসে যায় বুড়ির শেষ গোসলে, শেষ প্রসাধনে মালুও যদি একটু হাত লাগায়! আর একলা একলা হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে রাবু। তবু মালুকে থাকতে দেবে না পাশে।

রাবুর ওই বোরখাটা। সেও তো একটি কুসংস্কারের স্বীকৃতি। সৈয়দ বাড়ির মেয়ে বেপর্দা, ঢি ঢি পড়ে যাবে গোটা তল্লাটে। তাই লোকনিন্দা আর নিজের ইচ্ছে কোনোটাকেই অগ্রাহ্য না করে একটা মাঝামাঝি রাস্তা কেটে নিয়েছে রাবু। মালু বুঝে পায় না রাবুর মতো মেয়েরাও কেন আপস করবে?

মৃতার গায়ে আতর মাখাল রাবু। আতর ভেজা তুলো গুঁজে দিল ওর কানে।

কাফনের কাপড়ে কর্পূর পানি ছিটিয়ে দিল। সাথে একটু গোলাপ নির্যাস। এ যেন পাক হয়ে সাফ হয়ে গন্ধ মেখে নতুন পোশাকে কোনো এক আনন্দ যাত্রা। অথবা এ এক অন্তিম আকুতি মানুষের আজন্ম সৌন্দর্য কামনার। সুন্দর হয়ে পবিত্র হয়ে, সারাক্ষণ খোসবু দিয়ে নিজেকে ঘিরে রাখা, এমন করে যে বাঁচা সে কয়টি মানুষের ভাগ্যে ঘটে? হয়ত তাই সবারই আকাঙ্খা শেষ যাত্রার সময় পৃথিবীর শেষ দিনটিতে সব কাদা কালি ধুয়ে মুছে আতর মেখে নতুন পোশাকে ওরা সাজুক। সেজে গুঁজে যাত্রা করুক।

কবর খুঁড়ে এসে গেছে ফজর আলী জাহেদ সেকান্দর। মৃতার খাঁটিয়াটা কাঁধে তুলে নিল ওরা। মালুকেও কাঁধ লাগাতে হল।

একটা মোল্লা নেই। একটা মৌলভী নেই। কবর খোঁড়ার একটা লোক নেই। বাপ-দাদার জন্মে কেউ শুনেছে এমন কথা? সব ব্যাটা জাহান্নামে যাবে। সব জাহান্নামে

যাবে। গজ গজ করে সেকান্দর। থাম না মাস্টার। কবরে গিয়েও দেখছি শেষ হবে না তোমার বিক্ষোভ। মৃদু ধমকে বলল জাহেদ।

তবু গজর গজর না করে বুঝি পারে না সেকান্দর। মাথার উপর ভারটা সামলিয়ে চলতে অসুবিধে হচ্ছে ওর। খাঁটিয়াটার চার পায়ার পাশ দিয়ে চারটি লম্বিত ডাণ্ডা। একটি পায়া কেমন নড়বড়ে। গত কুড়ি দিন ধরেই মরা বইতে হচ্ছে। মেরামতের সুযোগ পায়নি ওরা। সেই নড়বড়ে পায়াটাই পড়েছে সেকান্দরের কাঁধে। তাই সামলে বুঝে চলতে হচ্ছে ওকে। পায়াটার ওপর হাত রেখে চৌকাঠটাকেই কাঁধের উপর নিয়েছে সেকান্দর। আর সেই কসরতে কখনো এদিক কখনো ওদিক বেঁকে যাচ্ছে খাঁটিয়াটা।

আহা। দেখ তো কী রকম ঝাঁকুনি খাচ্ছে বুড়িটা। একটু আস্তে চল মাস্টার।

সাবধানী দিল জাহেদ। বলল আবার, একটু দাঁড়াও।

কাঁধটা পাল্টিয়ে নিল ওরা।

আহা বেচারী! ছেলে মেয়ে নাতি পোতা সব থেকেও কেউ ছিল না বুড়ির।

শেষ যাত্রায়ও একটু আরাম পেল না। আপন মনে বিড় বিড় করে সেকান্দর। তারপর যেন জাহেদকে শোনাবার জন্যই চেঁচিয়ে বলল : বুড়ির অভিশাপ লাগবে না ভাবছ? আলবৎ লাগবে। এই আমি বলে রাখছি, এই বুড়ির বদ-দোয়ায় ছারখার হবে রমজানের শাদ্দাদী বালাখানা।

হয় কী তাই? কখনো হয়েছে?

কেন যেন সেকান্দরের এই অটুট কিন্তু মিথ্যা বিশ্বাসে এই মুহূর্তে হাসি পেল মালুর। ওর মনটা যেন সেকান্দরের ভবিষ্যৎবাণীটাকে বিশ্বাস করতে চাইল, বিশ্বাস করে কী এক সান্ত্বনা পেতে চাইল।

মৃত্যুর পর মানুষের ওজনটা হয়ত বেড়ে যায়। হয়ত তাই কাঁধের উপর রমজানের মৃতা মায়ের ভারটা ওর শীর্ণ দেহের তুলনায় বেশিই মনে হয় মালুর। ধীরে ধীরে পা ফেলছে আর চোখ দুটোকে দুপাশে চলমান রেখেছে মালু।

ট্যান্ডল বাড়ি, মৃধা বাড়ি, ভূঁইঞা বাড়ি, মাঝি বাড়ি, শেখ বাড়ি, কারি বাড়ি, চৌকিদার বাড়ি আর এর মাঝে মাঝে অনেক বাড়ি যেগুলো অমুক বাড়ি বা অমুকের বাড়ি বলে বিশিষ্ট নামের কোনো মর্যাদা এখনও পায়নি, একটার পর

একটা পেরিয়ে যায় ওরা। প্রতিটি বাড়ি, প্রতিটি ঘরের সাথে মালুর নিবিড় পরিচয়। মানুষের সাড়া নেই কোনো বাড়িতে।

স্মৃতিরা জেগে উঠে। স্মৃতিরা আবার ঘিরে ধরে মালুকে। চোখের সুমুখে ভেসে ওঠে মানুষগুলো। কারি সাহেব, হাফিজ সাহেব আর সেই খতিব সাহেব, গালের ভেতর পান পুরে গালটাকে সব সময় ফুলিয়ে রাখতেন যিনি, সেই রহমত যার গরুর গাড়িতে একবার চড়েনি এমন লোক নেই এ তল্লাটে।

বেচারী ট্যান্ডল বৌ। দুটো ছেলেই গেছে কবরে। ট্যান্ডল আটক পড়েছে বার্মায়। আহা দেখ, মাঝি বাড়ির ঘাটায় কুকুরটা শুয়ে আছে। ওই এক কুকুর ছাড়া আর কেউ নেই ও বাড়িতে। যেন মালুর চিন্তাটা অনুসরণ করেই বলে গেল সেকান্দর।

কসিরের ছাড়াবাড়ির পাশ দিয়ে চলেছে ওরা। কসিরের ভিটিতে চাষ দিয়েছিল রমজান, কিন্তু ভিটিটা তেমনি উঁচু রয়ে গেছে। ভিটিটা ঢাকা পড়েছে বাবলা আর বুনো বেতের ঝোপে।

ধীরে ধীরে নেবে আসছে বিকেলের আবছায়া। দূরে মিঞাদের সুপুরি বাগানের ওপারে আস্ত চলেছে সূর্য। সুপুরি ডালের চিকন গায়ে দিন বিদায়ের রক্তরাগ।

নিথর নিঝুম বাকুলিয়া। কোথাও এতটুকু প্রাণের সাড়া নেই। শব্দ নেই। থ্যাবড়া নাকের মতো নিচু নিচু ছনের কুঁড়েগুলো শুধু মাত্র নৈঃশব্দকে বুকে নিয়ে জবুথুবু পড়ে রয়েছে। বসন্তের মারী উজাড় করেছে বাকুলিয়াকে।

কিন্তু, মানুষগুলো কী আবার ফিরে আসবে না? ছনের শূন্য কুঁড়েগুলো কী আবার শিশুর কান্নায় মায়ের হাসিতে ভরে উঠবে না?

শোকার্ত ওই পশ্চিম দিগন্তের কাছেই যেন জবাব চাইল মালু।

৬৫.

গোরের কোলে শেষ বিছানায় বুড়িকে শুইয়ে দিল ওরা। ঝুরঝুরে মাটি ঢেলে ঢেকে দিল কাফনটা।

ঢিপির মতো উঁচু হয়ে গেল কবরটা। ছয়টি হাত সযত্নে চার পাশের মাটিটা ঢালু করে নাবিয়ে দিল কবরের চারটি পাড়। কবরের পিঠটাকে গম্বুজের মতো সামান্য উঁচিয়ে মাটির ঢেলাগুলো ভেঙে ভেঙে সমান করে দিল ওরা। তারপর কবরটার উপর পুঁতে দিল ছোট্ট একটি মেন্দি গাছের ডাল।

পাশাপশি আরও অনেকগুলো কবর। কাঁচা কবর। বুঝি গুনতে চেষ্টা করল মালু। পারল না।

দাফন সেরে গোসল করল ওরা। গোসল করে উঠে এল বড় দালানের রোয়াকে।

সৈয়দবাড়ির সেই বড় দালানটা। একটা শির শির অনুভূতি স্নায়ু বয়ে সারা গায়ে ছড়িয়ে পড়ল মালুর। স্মৃতিরা আবারও ঠেলে উঠল। অজস্র বাহু মেলে ওকে টেনে নিতে চাইল অতীতের দুয়ারে।

স্মৃতিরা মিষ্টি, অভিজ্ঞতাগুলো তেতো। দুয়ে মিলে বুঝি সুমুখের আলো। ভেবে বেশ অবাক হল মালু। যে গ্রাম যে বাড়িতে ওর জন্ম, কোনোটাই ওর আপন। নয়। আপন নয় বলেই ছেড়ে গেছিল, অপমান আর অস্বীকৃতির জ্বালা বুকে নিয়ে। কী এক দুর্নিবার টানে সে গ্রামে, সে বাড়িতেই তো আবার এল ও। এ কী মাটির টান? নাড়ির টান? যে টান কেউ অস্বীকার করতে পারে না কখনো? চাট্টি খেয়ে জলদি জলদি শুয়ে পড়। যা খাটনি গেছে দিনভর, রাবু ডাকল ওদের।

হ্যাঁ, তাই দাও। গরু ছাগল, আর মানুষ সবাই এক সাথে মিলেই আখেরি কাজটা সেরে ফেলছে। কাল থেকে নিষ্কৃতি। লম্বা করে বুঝি একটা নিষ্কৃতির নিশ্বাসই ছাড়ল সেকান্দর। ভ্রূ জোড়া কুঁচকে, চোখ দুটোকে সরু করে ওর দিকে তাকাল জাহেদ। বলল : সারা গ্রাম আজ কবরখানা। আর তুমি ভাবছ নিষ্কৃতির কথা?

লোকগুলোকে ফিরিয়ে আনতে হবে না?

সেকান্দর যেন গায়েই মাখল না ওর কথাটা। বলল : বলিহারি রমজান। নিজের বাজারটা দিব্যি বাঁচিয়ে ফেলল। একটা লোকেরও যদি গুটি উঠত তালতলিতে।

উঠলে যেন খুব খুশি হতে তুমি? দেখ মাস্টার, মরে গিয়েও রমজান ভূত হয়ে চেপে থাকবে তোমার ঘাড়ে। আমি বললাম, দেখে নিও। অসন্তোষের খোঁচা জাহেদের স্বরে।

সেই দুপুর থেকেই লক্ষ করছে মালু, কম কথা বলছে জাহেদ, যা ওর স্বভাবের বিপরীত। আর যখন বলছে কী এক তীক্ষ্ণতার ধার তুলছে, একটু যেন ঝাঁঝ উড়িয়ে দিচ্ছে।

সেই দুপুর থেকেই দেখছে মালু, শান্ত ধীর সংযত জাহেদ, যা কোনো কালে ছিল না ও। অভিজ্ঞতা বুঝি ওর দুরন্ত আবেগের অস্থিরতাটা কেড়ে নিয়ে ওকে দিয়েছে গভীরতা। সে গভীরতা ওর ভাবনায়, ওর ধীর আচরণে, ওর তীক্ষ্ণ কথায়ও।

আলবৎ খুশি হতাম। আরো খুশি হতাম যদি উজাড় হত ওই তালতলির বাজার, ঝাড়ে-বংশে নির্মূল হত ওই কম-জাত শুয়রের গোষ্ঠীটা।

এবার হাসল জাহেদ। বলল : এ হল সিনিকের কথা, হতাশার কথা।

তর্ক রেখে খেতে বস তো। হস্তক্ষেপ করল রাবু।

পাতা দস্তরখানের সুমুখে শতরঞ্জির উপর এসে বসল ওরা।

কই তোর পাত কই? রাবুর দিকে তাকিয়ে শুধাল জাহেদ।

আমি গরম গরম একটু দুধ খেয়ে নিয়েছি, আর কিছু খাব না।

কেন?

এমনি। ভালো লাগছে না। চামচ দিয়ে ভাত তুলতে তুলতে উত্তর দিল রাবু।

হ্যারিকেনের স্বল্প আলোয় জাহেদ তাকাল রাবুর মুখের দিকে। কী যেন খুঁজল সেখানে। খপ করে ধরে নিল ওর একখানি হাত। উত্তাপটা অনুভব করল। নাড়ির উঠতি পড়তি স্পন্দনটা গুনে দেখল।

থাক। তোমার আর ডাক্তারী করতে হবে না। হাতটা ছাড়িয়ে নিল রাবু। নিশ্চয়ই ঠাণ্ডা পানিতে গোসল করেছিস?

তুমি যেন কত গরম পানিতে চান করে এলে, পাশ কাটাতে চায় রাবু।

অন্যায় করেছিস। তিরস্কার জাহেদের চোখে।

চকিত দৃষ্টিতে বুঝি মিনতি ঝরে পড়ল রাবুর। যেন স্বীকার করে নিল অন্যায়টা। কেউ না শুনতে পায় তেমনি নীচু গলায় বলল : হয়েছে।

বকুনিটা থামিয়ে এবার থালার দিকে মন দাও।

এশার নামাযের আযান পড়ল না। না মিঞাবাড়ির মসজিদে, না সৈয়দ বাড়িতে। বাকুলিয়ার জীবনে এমন একটা ব্যতিক্রম ভাবতে পারে না মালু। কেমন একটা গুমোট গরম। তাই বারান্দায়ই মালু আর জাহেদের জন্য দুটো বিছানা পেতে দিয়েছে রাবু। সেকান্দর শুয়েছে ঘরে। শুয়েই বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে।

মালুর বিছানার চাদরটা বেরিয়ে এসেছে শানের উপর। চাদরটা তোষকের তলায় গুঁজে দিতে দিতে বলল রাবু : ঘুমিয়ে চাংগা হয়ে নে। সকালে উঠে গল্প করা

যাবে।

আচ্ছা। যেন উপায় নেই তাই ঘুমুতেই রাজি হল মালু।

বালিশে মাথা রেখে কেমন উসখুস করে জাহেদ। হাতের তালপাখাটা বিরক্তি ভরে ছুঁড়ে রাখে পায়ের কাছে।

কী হল? তুমিও কী মাস্টারজীর মতো মনে মনে কারো চোদ্দপুরুষের পিণ্ডি চটকাচ্ছ নাকি? ছোট্ট হেসে শুধাল রাবু।

না।

তবে ঘুমাও।

ঘুম কী আসবে? স্বরটাকে কেমন অসহায় আর কাতর করে বলল জাহেদ। তারপর মধ্যমা আর বুড়ো আঙ্গুলে কপালের দুপাশটা টিপে ধরে চোখ বুজল।

ভারি দুষ্টু হয়েছ তো? কপট রাগে বলল রাবু। চলে যাবার জন্য উঠে দাঁড়াল।

মেজো ভাইয়ের মাথা ধরেছে। দাও না একটু টিপে। সুপারিশ করল মালু।

তুই জানিস না। শোবার আগে আজকাল রোজই ওনার মাথা ধরছে। টিপে দিলে ঘুম আসে না। তেমনি কৃত্রিম গাম্ভীর্যে বলল রাবু। কিন্তু বসল জাহেদের শিথানে। বালিশটা সরিয়ে কোলের উপর টেনে নিল ওর মাথাটা। আঙ্গুলগুলো ডুবিয়ে দিল ওর চুলের ঘন অরণ্যে। বলল : বক্তৃতার বেলায় তো নির্যাতিতের দরদে বুক ভাসাও। এদিকে ফিউডাল অভ্যাসগুলো দিব্যি আছে।

ছোট বেলা থেকে এই দেখছিস বুঝি তুই? আহত অভিমান জাহেদের স্বরে।

আহা, তাই যেন বলেছি আমি। ত্রস্তে জাহেদের ঠোঁটের উপর নিজের নরম আঙ্গুলগুলো বিছিয়ে দিল রাবু।

দ্বিতীয়া কী তৃতীয়া জানা নেই মালুর। ক্ষীণাঙ্গী চাঁদ হয়ত লুকিয়ে আছে, কোনো মেঘের আড়ালে। আকাশের বুকে বসেছে হাসিখুশি তারার মেলা। এখানে সেখানে দুচারটি হাল্কা মেঘ গা জড়াজড়ি করে ভেসে বেড়াচ্ছে, ইতস্তত। যেন কোনো কাজ নেই ওদের!

মিটিমিটি তারার ঝাড় পিদিমে মৃদু আলোকিত আকাশটা যেন আজ নেবে এসেছে অনেক নিচে। কী এক সান্ত্বনার আলিঙ্গন বাড়িয়ে দিয়েছে পৃথিবীর দিকে।

পৃথিবীর রাত্রির প্রথম প্রহরে আকাশ কত সুন্দর, স্নিগ্ধ মায়া ভরা তার তারা চোখের চাহনি, কবে যে এমন করে দেখেছিল আকাশের দিকে, ভুলে গেছে মালু। ওর ইচ্ছা হল সঁপে দিক আপনাকে আকাশের আলিঙ্গনে, বিবশ হয়ে চোখ বুজুক, ভুলে যাক রিহানা বাকুলিয়ার যন্ত্রণা, নিষ্ঠুর যত মৃত্যুর যন্ত্রণা। বিস্মৃত হোক সেই রাজধানী আর সেই মেয়েটিকে।

রাবু। তোর হাতটা বড় গরম।

ও কিছু না। শুধু শুধুই উদ্বিগ্ন হচ্ছ তুমি।

ছোট ছোট কথার কলি ভাংছে জাহেদ আর রাবু। ভালো লাগে মালুর। ওদের কথায়, ওদের নাড়ির স্পন্দনে যেন ওরই কথার প্রতিধ্বনি ওরই নিজের নাড়ির সুর।

গলা খাঁকারি দিয়ে বেরিয়ে এলেন দরবেশ। এশার নামায পড়বেন। তাই বাইরের পুকুরে চলেছেন ওযু করতে। ঘোমটা টেনে উঠে দাঁড়ায় রাবু। নিঃশব্দ পায়ে অদৃশ্য হয়ে যায় ঘরের ভেতর। খড়মের খটখট আওয়াজ তুলে ওদের পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন দরবেশ। মুহূর্তে আকাশের আলিঙ্গন থেকে যেন ছিটকে পড়ল মালু। আকাশটা সরে গেল আপন সীমাহীন দূরত্বে।

দরবেশকে এখনো সইতে পারে না মালু। অন্ধকার নিস্তব্ধ রাতে প্যাঁচার আচমকা কর্কশ আওয়াজটা যেমন গায়ে কাঁটা ফোঁটায় তেমনি শঙ্কিত অস্বস্তিতে উঠে বসল মালু।

কিরে? উঠে গেলি যে? বালিশ থেকে মাথাটা একটু আল্গা করে শুধাল জাহেদ।

ভাবছি।

ভাবার উপযুক্ত সময় আর পরিবেশ বটে। মুচকি হাসল জাহেদ। হুঁ।

অস্ফুট উচ্চারণ করেই আবার চুপ মেরে গেল মালু।

কী ভাবছিস?

ভাবছি দরবেশ চাচার কথা। তাঁর স্বার্থপর আধ্যাত্মিকতার মাসুল জোগাতে গিয়ে দুটো মেয়ে খুন হয়ে গেল।

হুঁ। সঙ্গে সঙ্গে একটা দীর্ঘশ্বাসও যেন বেরিয়ে এল জাহেদের বুক চিরে।

বলল আবার : দুটো নয়রে একটা।

সাড়া না পেয়ে চুপ করে গেল জাহেদ। হয়ত নিজেও ডুবে গেল কোনো অন্তহীন ভাবনার গভীরে।

তারা ভরা আকাশটা যেন নীরবে এসে যোগ দিল ওদের ভাবনায়।

অখণ্ড নিস্তব্ধতা।

গর-র-র-গ-অ-অ। বারান্দার শেষ প্রান্তের ঘরটিতে জোর জোরে নাক ডেকে চলেছে সেকান্দর।

মেজো ভাই। মাস্টার সায়েব বড় মজার লোক। তাই না? ফুক করে রেগে উঠতেও যেমন সময় লাগে না তেমনি পিঠে বিছানাটা লাগতেই ঘুম। বলল মালু।

ওটা স্বাস্থ্যের লক্ষণ। কেমন আলগা ভাবে বলে চুপ করে যায় জাহেদ। ও বুঝি ডুবে আছে একটুক্ষণ আগের অনুচ্চারিত ভাবনাটির মাঝে। না, ভাবনা নয়, কী এক আনন্দ যেন। সেই আনন্দটাকেই জিবের চেটোয় রেখে চেখে চেখে উপভোগ করে চলেছে ও।

বিরামহীন বিরতিহীন এক চলার আবেগ ওর জীবনটা। চলতে চলতেই ভাবনা। ভাবতে ভাবতেই চলা, এর মাঝে কত মোড় গেছে ঘুরে, কত ভাব গেছে বদলে। পুরাতন চিন্তা আর পরিবেশে এসেছে নতুনের অভিনবত্ব। নতুনের মাঝে খেই হারানোর সমস্যা আসেনি। যেমন প্রশ্ন ওঠেনি পুরাতনকে আঁকড়ে থাকার। শুধু একটি গ্রন্থি শিথিল হয়নি। সে বুঝি রাবু, একটি আনন্দের গ্রন্থি যা দিনে দিনে দৃঢ়তর হয়েছে, সুন্দরতর হয়েছে।

অনেক সময় ক্লান্তি এসেছে, উন্মনা হয়েছে মনটা। কী এক কাতরতায় ব্যাকুল হত মনটা, নরম কটি আঙ্গুলের স্পর্শ একটু বা কোমল উষ্ণতার ছোঁয়া, শান্ত দৃপ্ত একটি মুখের মায়া, সব মিলিয়ে অপার সান্ত্বনা আর নির্মল আনন্দের স্নিগ্ধ ছায়া। সে ছায়ার আশ্রয়ে ছুটে আসত জাহেদ, বলত : চল রাবু, একটু খোলা মাঠে বেড়িয়ে আসি।

স্মিত হেসে রাবু বলত—চল।

কখনো বা এই উন্মনা মনটাকে আর তার কাতর ব্যাকুলতাকে আপন অস্থি আর চৈতন্যের বাঁধন থেকে সজোরে ছিঁড়ে নিয়েছে জাহেদ। এক পাশে সরিয়ে রেখেছে। শাসিয়েছে নিজেকে, কেন এই বিলাস? কেন এই মমতার আনন্দছায়ার

লোভ? পথের মাটিটাকে আরও জোরে আঁকড়ে ধরেছে ও। কিন্তু মন কী মেনেছে সে শাসন? আজ ভাবতেও অদ্ভুত লাগে ওর। যা ছিল স্নেহমাখা মমতা, হয়ত করুণাও, রাবু তাই মনে করে সেই মমতাটা ওর অজান্তেই কখন রূপান্তরিত হয়েছে তীব্র তীক্ষ্ণ এক ভালোবাসার অনুভূতিতে। সে ভালোবাসাটা আজ আর শুধু পিছু টানে না, সুমুখেও ঠেলে দেয়। শক্তি দেয়। অভয় দেয়। বুঝি সে জন্যই সেটা আনন্দ, স্নিগ্ধ শীতল আনন্দ ছায়া।

রাবুর তুলতুলে আঙ্গুলের স্পর্শটা বুঝি এখনো লেগে রয়েছে ওর ঠোঁটে আর চিবুকে। হাতের তালুটা কী এক আদরে আপন মুখের উপর আস্তে বুলিয়ে নিল জাহেদ।

বাবা জাহেদ। জেগে আছে নাকি? নামায সেরে পাশে এসে বসেছেন দরবেশ।

জী। রোমন্থনের জগৎ থেকে ধড়ফড়িয়ে উঠে বসে জাহেদ।

কেশে গলাটা সাফ করলেন দরবেশ। দাড়ির নিচের ত্বকটা বার দুই চুলকিয়ে নিলেন। কিছু বলবেন, এ বুঝি তারই ভূমিকা।

পোশাকে আশাকে, কথায় আচরণে অবিশ্বাস্য রকম বদলে গেছেন দরবেশ। প্রায় দিগম্বর দরবেশের গায়ে এখন জোব্বা পিরানের আধিক্য। লম্বা বাবরির জায়গায় সুন্দর আর ছোট করে ছাঁটা সিঁথি কাটা চুল। এখন পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়েন। জিকির করা ছেড়ে দিয়েছেন। প্রচুর পরিমাণ আহার করে উদ্গার তোলেন। আলবোলায় টানেন মসলা মাখা সুগন্ধি তামাক। সব মিলিয়ে মনে হবে স্বাভাবিক সুস্থ সুখী মানুষ দরবেশ। কিছু বলবেন? অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও দরবেশকে নীরব দেখে শুধাল জাহেদ।

হ্যাঁ। বলাই উচিত। তবু ইতস্তত করলেন দরবেশ। তসবির ছড়াটা বের করে আনলেন জামার পকেট থেকে। একটু নেড়ে চেড়ে আবার ফিরিয়ে রাখলেন পকেটে। তারপর ধাঁ করে বলে ফেললেন কথাটা : রাবুর পড়াশোনা তো শেষ হল। ভাবছি এবার ওকে শ্বশুর বাড়ি পাঠিয়ে দেব।

চনচন করে গোটা দেহের রক্তটা বুঝি মাথার দিকে দৌড়ে গেল জাহেদের। বলল : আপনার মেয়ে। ইচ্ছে হয় কেটে পানিতে ভাসিয়ে দিন। আমাকে কেন জিজ্ঞেস করছেন।

কখনো না। সেই বুড়ো এক পা কবরে দিয়ে ধুক ধুক করছে। তার কাছে যাবে রাবু আপা? অসম্ভব। চেঁচিয়ে উঠল মালু।

থাম্ তো ছোকরা। তোকে নাক গলাতে বলছে কে! শুধু ধমক দিল না, কান মলে ওর আসল জায়গাটা যেন চিনিয়ে দিল দরবেশ।

তবু থামল না মালু। বলল : আপনি না মোহাম্মদের উন্মত? ইসলামের পাবন্দ? এ সব নিয়ে তো খুব বড়াই করেন আর এ দিকে মেয়ের মতটাই নিচ্ছেন না।

মেয়ের মত? একটু যেন ভাবনায় পড়লেন দরবেশ। যেন মতটা নেয়ার জন্যই উঠে গেলেন ঘরের দিকে।

এ কী করলে মেজো ভাই? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে আরাম তোমার হারাম? আর নিজের বেলায়, তোমার নিজের অংশ যে আর একজন, তার বেলায় কেমন করে এত দায়িত্বজ্ঞানহীন হও মেজো ভাই? যেন তারাগলা রাতের বুক চিরে তীক্ষ্ণ কোনো আর্তনাদের মতোই বেরিয়ে এল মালুর কথাগুলো।

নিরুত্তর জাহেদ। সমস্ত দ্বিধা, সমস্ত বাধা, স্পর্শ কাতর মনের জটিলতা জয় করে ওরা যে হাতে হাত মিলিয়েছে, মনে মন মিলিয়েছে। সুন্দর সেই গ্রন্থিটা ছিঁড়বার জন্য দরবেশের আবির্ভাব হবে, এ কী ভেবেছিল জাহেদ? অকস্মাৎ সচকিত হল ওরা।

না না। জান গেলেও না। কী সম্পর্ক আমার ওই বুড়োর সাথে! তাকে আমি স্বীকার করি না, মানি না। কোনোদিন মানিনি। দৃঢ় উদ্দীপ্ত কণ্ঠ রাবুর। কণ্ঠটা দেয়াল ফুঁড়ে বেরিয়ে আসছে। দ্রুত নিশ্বাসের সশব্দ পতনের ধাক্কাটাও যেন এসে লাগছে ওদের গায়ে।

প্রত্যুত্তরে ওরা শুনল চাপা গর্জন, ভর্ৎসনা, তিরস্কার। অশ্রাব্য কতগুলো গালি। কুৎসিত ইঙ্গিত রাবু এবং রাবুর গর্ভধারিণী মৃতা মা সম্পর্কে। ক্ষিপ্ত দরবেশ বলতে পারেন না এমন কথা নেই, করতে পারেন না এমন কাজ নেই।

নিস্পন্দ জাহেদ। রুদ্ধশ্বাস মালু।

মাফ করবেন আব্বাজান। কোনোদিন আপনার মুখে মুখে তর্ক করিনি, কথা বলিনি, কিন্তু আজ বলছি। আমাকে জ্বালাবেন না।

ওরা যেন দেখল! নির্বাক বজ্রাহতের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছেন দরবেশ। দেওবন্দের বুজুরগ আলেম, মাইজভাণ্ডারের দেওয়ানা দরবেশ এ কী দেখলেন চোখের সুমুখে? অভাবনীয় অকল্পনীয় এক প্রতিরোধ আর বিদ্রোহের অগ্নিশিখা। দপ

করে জ্বলে উঠেছে, ছুটে চলেছে কোনো উল্কা খণ্ডের মতো। হয় তাকে পথ করে দিতে হবে, নয়ত পথ রোধ করে পুড়ে মরতে হবে।

দেওয়ানা দরবেশ। জীবনে তাঁর অভিজ্ঞতার একমাত্র নারী, সে একান্ত দুর্বল। অসহায়। আত্মসমর্পণে সদা প্রস্তুত। পায়ে ধরেছে। দেয়ালে মাথা কুটেছে। কেঁদে কেঁদে বুক ভাসিয়েছে। লাথি খেয়েছে তবু যে পায়ের লাথি খেল সেই পা টাকেই জড়িয়ে ধরেছে। তারপর একদিন আপন অদৃষ্টের কাঁধে সকল বোঝা হাল্কা করে চলে গেছে সম্ভোগের এই পৃথিবী ছেড়ে।

কিন্তু, নিজের মেয়ে, সে বিদ্রোহ করে? মুখে মুখে কথা ফিরিয়ে দেয়? আপনার মতো নিষ্ঠুর পিতা, আমি কোনোদিন দেখিও নি, শুনিও নি।

শক্ত অভিসম্পাতটা দরবেশের গলার মাঝ পথেই বুঝি আটকে রইল। ওরা শুনল রাবুর পায়ের শব্দ। রাবু বেরিয়ে এসেছে দরবেশের ঘর থেকে। নিজের ঘরে গিয়ে খিল এঁটেছে।

ওরা ঘুমায়নি। পরস্পরের অনিদ্রার সাক্ষী হয়ে শুধু ঘুমের ভান করে নিথর পড়ে থাকে বিছানায়।

রাত গড়িয়ে চলে।

ধপ করে কী যেন পড়ল। ওরা চোখ খুলে দেখল।

রাবুর হাতের মোড়াটা পড়ে গেছিল। মোড়াটা ঠিক করে ও বসল।

কী ব্যাপার! ঘুমুবে না? শুধাল জাহেদ।

ঘুম আসে কই? কিছুক্ষণ আগের তিক্ততাটা এখনও মুছে যায়নি রাবুর গলা থেকে।

জাহেদ উঠে বসল। মালুও।

রাত বাড়ছে। দালানের পেছনে, রসুই ঘরের পাশে আমগাছগুলোকে মনে হয় কালো বিকটকায় ছায়া। যত গম্ভীর হচ্ছে রাত, ছায়াগুলো যেন ছোট হয়ে আসছে আর উজ্জ্বলতর হচ্ছে তারার প্রদীপ। তারায় আলোকিত আকাশটাকে সুমুখে নিয়ে নিঃশব্দে বসে আছে ওরা তিনজন, জাহেদ, মালু আর রাবু।

উত্তেজিত হয়ে কোনো লাভ আছে? এ সব তো এ্যাদ্দিনে গা-সওয়া হয়ে যাওয়া উচিত তোমার। প্রচুর খাটনি গেল এতটা দিন। একটু যদি না ঘুমাও শরীর খারাপ

করবে। যাও। অনেকক্ষণ পর মুখ খুলল জাহেদ।

রাবু শুনল। বলল না কিছু। বসে রইল আরও অনেকক্ষণ। এক সময় উঠে চলে গেল ঘরের ভেতর।

মালু আর জাহেদ, বালিশে মাথা রেখে শরীরটাকে বিছানার কোলে এলিয়ে দিল ওরা। কিন্তু চোখে ঘুম নেই। ঘুম বোধ হয় আসবে না আজ। হয়ত ভোরের দিকে একটু তন্দ্রা লেগেছিল ওদের চোখে। সেকান্দরের ঝাঁকুনি খেয়ে ধড়ফড়িয়ে উঠে বসল ওরা।

এই ওঠো। রাবুর বোধ হয় জ্বর এসেছে। বড় কোঁকাচ্ছে ও। বলল সেকান্দর।

যাও না ভেতরে, দেখ। আমি আসছি মুখ ধুয়ে। সেকান্দর চলে গেল পুকুর ঘাটের দিকে।

গায়ে হাত রেখে চমকে উঠলো ওরা। এখন কোঁকাচ্ছেন না রাবু। অচেতন পড়ে আছে। জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে গাটা।

রাবু। কপালে হাত রেখে ডাকল জাহেদ।

সাড়া পেল না।

আশংকার কালো ছায়া পড়ল জাহেদের মুখে। কপালে ফুটল উদ্বেগের রেখা।

ভয় নেই টিকে নিয়েছে সেই মড়কের শুরুতেই। বুঝি নিজেকে আশ্বস্ত করার জন্যই বলল জাহেদ, মালুর জিজ্ঞাসা আকুল চোখের দিকে তাকিয়ে।

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলেই কী চলবে? একটা জোর ঝাঁকুনি দিয়ে শরীর আর মনের তন্ত্রীগুলোকে যেন সজাগ করল জাহেদ। ঘর থেকে সাইকেলটা বের করে চড়ে বসল।

কোথায় যাও মেজো ভাই। সাইকেলের হাতলটা ধরে নিয়ে শুধাল মালু। তালতলি। সরকারি ডাক্তারকে নিয়ে আসি। এক্ষুণি আসছি আমি। তুমি বস গিয়ে রাবু আপার কাছে। আমি যাই। জাহেদের হাত থেকে সাইকেলটা এক রকম ছিনিয়ে নিয়ে প্যাডেলে পা রাখল মালু।

ডাক্তার এল। দেখল। গম্ভীর মুখে বলল, পক্সের আলামত।

কী বলছেন? ভুলও তো হতে পারে ডাক্তারের, তাই শুধালে জাহেদ। কোনো সন্দেহ নেই। জোর দিয়েই বলল ডাক্তার।

সেকান্দর দৌড়েছিল শহরের দিকে। জোহর নাগাদ শহরের এম, বি. কে. নিয়ে সেও পৌঁছে গেল।

সাবেক রায়টাই বহাল রাখল এম. বি. ডাক্তার। বলল : প্রধান ওষুধ নার্সিং। ভালো নার্সিং চাই।

সে তো বটেই। হুরমতি আর ওরা তিন জন, সবাই হাত লাগাল। চারিদিকের জানালাগুলো খুলে দিল। ঝেড়ে মুছে নতুন চাদরে নতুন পর্দায় ঝকঝকে করে ফেলল রাবুর ঘরটি। সাড়া বাড়িতে ছিটিয়ে দিল জীবাণুনাশক দাওয়াই। কিছু ফুল নিয়ে এল জাহেদ। রক্তজবা আর মরসুম শেষের যুঁই। রাবুর মাথার দুপাশে দুটো তেপয়ে কিছু গুছিয়ে, কিছু ছড়িয়ে রাখল ফুলগুলো।

মৃদু মিষ্টি যুঁই সুবাসে বুঝি অচেতন ঘোরটি কেটে যায় রাবুর। ও চোখ মেলল। রক্তজবার মতোই টকটকে লাল। ঘরের চারিদিকে বুলিয়ে আনল চোখ জোড়া। যেন খুশির সাথে অবাক হল। বলল : বাহ্। কেমন সুন্দর সাজিয়েছ! কেন গো? কেন এত সাজ?

অনির্দিষ্ট চোখের আরক্ত দৃষ্টিটা হঠাৎ তীক্ষ্ণ হল, স্থির হল জাহেদের চোখের উপর। ওর কাছেই যেন জানতে চাইছে রাবু। তারপর হাতটা বাড়িয়ে দিল তেপয়টার দিকে। তুলে নিল এক মুঠো যুঁই। কম্পিত মুঠোর আঙ্গুল গলে ছড়িয়ে পড়ল ফুলগুলো। হীরের ছোট ছোট নাক ফুলের মতো ফুলগুলো ছড়িয়ে পড়ল ওর বুকে মুখে বালিশে।

লক্ষ করল জাহেদ, গভীর লালের ছোপ লেগেছে রাবুর হাতে গালে আর গলায়। রক্তবর্ণ চোখগুলোর চেয়েও লাল সেই অমসৃণ ফোলা ফোলা দাগগুলো। আর ওর দৃষ্টিটা অস্বাভাবিক চঞ্চল। স্থির থাকছে না কোথাও। দুহাতে সুমুখের চেয়ারের হাতলটা ধরল জাহেদ। বসে পড়ল। ওর সমস্ত শক্তি কে যেন নিঃশেষে টেনে নিয়েছে।

মালু ভাই। শোন। এদিকে আয়। এত কম ফুল হলে তো চলবে না। আমার বিয়েতে আরো বেশি ফুল চাই। হ্যাঁ, এমনি লাল আর সাদা। অন্য রং ভালো লাগে না আমার। কিন্তু বেশি চাই। অনেক বেশি। বিছানা হবে ফুলের। মেঝে হবে ফুলে

ছাওয়া। দেওয়াল হবে ফুলের। ছাদে থাকবে ফুলের ঝালর। তবে তো ফুলশয্যা? পারবি তো, আমার মনের মতো করে সাজাতে?

প্রলাপ বকছে রাবু। চার জোড়া চোখ অনিমিষ চেয়ে থাকে ওর দিকে। ওকি? কাছে আয়। নিরুত্তর দেখে মালুকে আবার ডাকল রাবু।

কাছে এল মালু। হাতের আলিঙ্গনে ওর মুখটা টেনে নিল রাবু। আস্তে করে শুধাল, মেজো ভাইয়ের খোঁজ পেলি?

দু টুকরো জ্বলন্ত লোহার মতো চোখ দুটো চেয়ে রইল মালুর দিকে। আচমকা ঠেলে দিল ওকে। কর্কশ গলার ধিক্কারে চেঁচিয়ে উঠল : পাসনি খোঁজ? অপদার্থ। অপদার্থ তুই। পারলি না একটা লোককে খুঁজে বের করতে? ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল রাবু। জবাটকটক চোখের লাল ভেঙে পানির ঢল নাবল।

বুঝি কিছু বলতে চাইল জাহেদ। চাইল দুহাতের তালুতে রাবুর মুখখানা তুলে নিতে। চোখে চোখ মিলিয়ে চেয়ে থাকতে। তবু কী রাবু চিনতে পারবে না ওকে?

কিন্তু রাবুর কান্নাটা কেড়ে নিল ওর কণ্ঠ। রাবুর বিস্মৃতিটা নির্মম এক পরিহাসের মতোই বিঁধল ওর বুকে। স্থানুর মতো বসে রইল ও। হ্যাঁ, পেয়েছি। স্মরণের আলোকে ওকে ফিরিয়ে আনার উদ্দেশেই বলল মালু।

সত্যি? উৎসুক হাসিতে উদ্ভাসিত হল রাবু। ভ্রূ জোড়া যেন নেচে উঠল। চোখের মণিতে বুঝি ফিরে এল স্বাভাবিক দীপ্তি। মালুর কানের কাছে মুখ এনে বলল ও : বলেছিস? বলেছিস আমার কথা? আমি যে খুঁজছি ওকে, চেয়ে আছি ওর পথের পানে? এ সব বলেছিস তো ওকে? নিঃশব্দে দরজাটা খুলে বেরিয়ে গেল জাহেদ।

৬৬-৬৭

যতক্ষণ বা যতদিন না রাবু নিরাময় হচ্ছে তদ্দিন শহরের ডাক্তারটি থেকে যাবে, এই ঠিক হল।

একদা যে ঘরটিতে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে পড়ত ওরা সে ঘরটিই খুলে দিল মালু। বিছানা পেতে দিল ডাক্তারের জন্য। টেবিলটা সাফ করতে গিয়ে হঠাৎ অতীতটার সাথে দেখা হয়ে গেল মালুর। দেরাজের ভেতর বাল্যশিক্ষা, ধারাপাত। নাম লেখা– আবদুল মালেক। বড় বড় বাঁকা তেড়া হস্তাক্ষর, এখনো পড়া যায়। আরো বই– গণিতের, পদ্যের, মালু রাবু আর আরিফার নাম লেখা।

অতীত বিরোধী মন মালুর। পদে পদে অতীতের শৃঙ্খল ভেঙে অতীতটাকে অস্বীকার করে চলতে হয়েছে ওকে, অথচ অতীত ওকে বার বার টেনে নেয় নিজের দিকে। অতীতের স্মৃতি আর মানুষগুলোকে জীবনের বৃন্ত থেকে ছিঁড়ে ফেলতে পারেনি মালু। আজও কী এক জাদুর মায়ার মতো অতীত যেন হাতছানি দিয়ে গেল ওকে।

হ্যাঁ। সুন্দর ছিল সেই উদাম দিনগুলো। এত মৃত্যু ছিল না। এক কাপ চা খাওয়াতে পারবেন?

হঠাৎ ডাক্তারের কথায় অতীত থেকে উঠে এল মালু। বলল : হ্যাঁ। নিশ্চয়।

হ্যাঁ তো বলল। কিন্তু কোথায় চা, কোথায় চিনি। কোথায় উনুন। দুপুরে তো খাবারই প্রবৃত্তি ছিল না, না মালুর, না জাহেদের। হুরমতির খেয়াল নেই কোনো দিকে। পানি আনছে মিশ্রী ভাংছে সরবত তৈরি করছে রুগীর জন্য। বাকী সময়টা বসে থাকছে রাবুর পাশে। পাক ঘরে উনুন জ্বলেনি আজ। কিন্তু সেকান্দর মাস্টার শহর থেকে ফিরে এসেই উনুন ধরিয়েছিল। বার্লি করেছিল রাবুর জন্য। ফুটিয়ে নিয়েছিল চারটে আলু-ভাত। তারপর জাহেদকে সুমুখে পেয়ে খেঁকিয়ে উঠেছিল : বুদ্ধি সুদ্ধি লোপাট পেয়েছে নাকি? মেয়েটার তো আল্লায় জানে কী হবে। নিজেও কী অসুখ বাধাবে? যাও দুটো খেয়ে আস।

বড় দালানের পেছনে ভেতরে বাড়ির উঠোন। উঠোনের পর রসুই ঘর।

রসুই ঘরে পৌঁছে মালু দেখল তুলকালাম কাণ্ড বেধে গেছে। চাল ডাল ছিটিয়ে হাঁড়িপাতিল লণ্ডভণ্ড করে অগ্নিমূর্তিতে দাঁড়িয়ে দরবেশ। চা নেই। নাস্তা নেই। ক্ষিধেয় প্রাণ যায়। এ বাড়িতে মানুষ থাকে? চেঁচিয়ে চলেছে উত্তেজিত দরবেশ।

উনুনের সুমুখে বসে চামচ দিয়ে বার্লি নাড়ছে হুরমতি। পাশে দাঁড়িয়ে সেকান্দর। মুখ না ঘুরিয়েই বলল সেকান্দর, কেন রাগছেন দরবেশ চাচা? কে আপনাকে চা করে দেবে? দেখছেন না গোটা বাকুলিয়া আজ বিরানা। বসন্তের ভয়ে দাসী চাকর সব পালিয়েছে। কেউ নেই বাড়িতে। হুরমতি রাবুকে নিয়ে ব্যস্ত। দেখছেন না?

পালাবেই তো। আল্লা নেই খোদা নেই, যতসব মনহুসের আচ্ছা, এ বাড়িতে মানুষ থাকবে কেমন করে? খোদার কহর পড়বে এ বাড়িতে, আমি বলিনি? আমি বলিনি বিরানা হবে, ছারেখারে যাবে এ বাড়ি?

দরবেশ চাচা! অভিসম্পাতের গলাটা অন্তত আজকের দিনের জন্য থামাবেন? বাড়িতে অসুখ, দেখতে পাচ্ছেন না? অনুনয়ের স্বরেই বলল সেকান্দর। তারপর হুরমতির হাত থেকে বার্লিটা নিয়ে ঢালল বাটিতে। ঠাণ্ডা করার জন্য বাটিটা বসিয়ে দিল গামলা ভর্তি পানির উপর। চামচ দিয়ে নেড়ে চলল ঘন ঘন। অসুখ না ভড়ং। ওই মেয়েকে চিনি না আমি? কম ভড়ং ছিল নকি ওর মার? ফ্যাঁস ফ্যাঁস কান্না, এই বেহুঁশ, এই বিলাপ। এই কথা বন্ধ। দরজা বন্ধ। সেই মায়ের মেয়ে তো? করতে চায় না স্বামীর ঘর, যেতে চায় না শ্বশুর বাড়ি তাই ভড়ং ধরেছে। আমি বুঝি না ওসব?

কিন্তু, ও সব শয়তানী ভড়ং ছুটিয়ে দেবার দাওয়াইটাও আমার জানা আছে। কথার সাথে সাথে দরবেশের মুখের থুথুগুলোও ছিটিয়ে পড়ে চারিদিকে।

দপ করে জ্বলে উঠল সেকান্দর। চুপ করবেন দরবেশ চাচা? ক্ষিধে পায় তালতলি চলে যান। সেখানে রমজানের বাড়িতে আজ মোল্লা খাওয়াচ্ছে। এ বাড়িতে ভাত চা কোনো কিছুই মিলবে না আজ।

অদ্ভুতই বটে, সেকান্দর মাস্টারকে ভয় করে দরবেশ। ওর ঝামটা খেয়ে চুপ করে যায়। গুটি গুটি বসে পড়ে একটা জলচৌকির উপর।

বার্লির বাটিটা নিয়ে বেরিয়ে যায় সেকান্দর।

যাকে ঘৃণা করা যায় বেশি তার উপরও বুঝি মায়া হয়। কেমন মায়া হল মালুর। সারাদিন পেটে কিছুই পড়েনি। সন্ধ্যার দিকে খেয়েছে চারটে আলু ভাত। এখন রাত। ক্ষিধে তো পাবেই। বলল মালু : আপনি ঘরে যান দরবেশ চাচা। আমি চা করে আনছি।

ডাক্তার আর দরবেশকে চা খাইয়ে ভাত আর ডালের পানি চড়িয়ে দিল মালু। পানিটা ফুটলে চালের সাথে কয়েকটা আলুও ছেড়ে দিল মালু। আর অতিথি

ডাক্তারের জন্য একটা আণ্ডা। হুরমতি শুধু একবার দেখে গেল। কিছু বলল না। একটা লাকড়িও এগিয়ে দিল না মালুর দিকে। চুলোর ভেতরে আমের শুকনো লাকড়ি কেমন ফড় ফড় কাপড় ফাটার আওয়াজ তুলে জ্বলছে। লাল ছুরির মতো লিকলিকে শিখাগুলো যেন বেরিয়ে আসতে চাইছে উনুনের অবরোধ ভেঙে। রসুই ঘরের দেয়ালে সে শিখার ছায়া পড়ছে। উজ্জ্বল হচ্ছে ঘরটা! বড় আর লম্বা হচ্ছে ছায়ারা। তারপর কেঁপে কেঁপে আবার কোনো আবছা অন্ধকারের অস্পষ্টতায় মিলিয়ে যাচ্ছে ছায়াগুলো।

একটা দীর্ঘ শিখার কম্পিত প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে গেল মালু।

ক্ষীণ কোনো আশার মতো একটি সন্দেহ বুঝি ছিল জাহেদের মনে। হয়ত স্বাভাবিক জ্বর। অতি খাটুনি আর অল্প ঘুমে দুর্বল হয়েছিল শরীরটা। তাই এমন কাবু করেছে জ্বর।

কিন্তু, দ্বিতীয় দিনে আর কোনো সন্দেহই রইল না। বসন্তের গুটি বেরিয়েছে রাবুর গা ফুঁড়ে।

ডাক্তাররা হার মানল না। আশা ছাড়ল না আপন মানুষ। আরো ডাক্তার এল। ঢাকা থেকে এল নামী ডাক্তার। লড়াই চলল মৃত্যু আর জীবনে। যন্ত্রের মতো নিষ্প্রাণ নির্জীব হয়ে রইল জাহেদ। যন্ত্রের মতোই হাঁটে, বসে, রাবুকে ওষুধ খাওয়ায়, রাবুর মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়।

কেন এমন ভেঙে পড়েছ মেজো ভাই। আমি বলছি সেরে উঠবে রাবু আপা। সান্ত্বনা দেয় মালু।

মালুর সান্ত্বনার খোঁচায় সংযমের কৃত্রিম বাঁধটা বুঝি ভেঙে যায়। ডুকরে কেঁদে উঠে জাহেদ। বাড়ি বাড়ি ঘুরে যে সান্ত্বনা দিল সেবা দিল এ্যাদ্দিন, তাকেও কবরে রেখে আসতে হবে? অসম্ভব। অসম্ভব। শিশুর মতো কাঁদে আর চিৎকার করে জাহেদ।

আরো দুটো দিন কেটে যায় উদ্বেগ আশঙ্কায়।

দেখেছ? এমন বেদিল অমানুষিকতা দেখেছ কখনো?

উত্তেজিত সেকান্দর। হাজার গণ্ডা আজরাইলের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও বুঝি ওর উত্তেজনার শেষ হবে না। সারাক্ষণ চটে আছে ও। সারাক্ষণ একটা না একটা বিক্ষোভের উপলক্ষ সৃষ্টি হচ্ছে ওর জন্যে। এই মুহূর্তে ইন্ধন যুগিয়েছে দরবেশ।

দরবেশের অপরাধ ভাত চেয়েছে। সময় মাফিক ভাত না পেয়ে চেঁচামেচি শুরু করেছে আর হুরমতিকে কাঠের চেলা ছুঁড়ে মেরেছে।

দিনরাত খালি খাই খাই...এদিকে মেয়েটা মরছে। দেখতে এল একবার? জিজ্ঞেস পর্যন্ত করল না কেমন আছে মেয়েটি। মানুষ তো নয় সীমার, জানোয়ার। জাহেদকে নির্বাক দেখে বুঝি বেড়ে যায় সেকান্দরের রাগের মাত্রাটা।

সারা রাত জেগেছে জাহেদ। ভোরে মালু আর হুরমতিকে রাবুর ঘরে বসিয়ে সকাল ধরেই একটু ঘুমের চেষ্টা করছে। ঘুম নেই। চোখ দুটো টনটন করছে। মাথার ভেতরে কী যেন টগবগিয়ে ফুটছে সারাক্ষণ। মাথাটাকে ছিঁড়ে ফেলতে পারলেই হয়ত একটু আরাম পেত।

দোহাই তোমার, সেকান্দর একটু চুপ কর। দু আঙ্গুলে কপালের রগ দুটো টিপে ধরে বলল জাহেদ।

মেজো ভাই, রাবু আপা ডাকছে। ভেসে এল মালুর গলা।

চমকে উঠল জাহেদ, সেকান্দর। বাকুলিয়ার ঘরে ঘরে যে দৃশ্য দেখেছে ওরা রাবুর ঘরে গিয়েও কী তাই দেখবে?

না, ভয়ের কিছু নেই। ডাক্তার বলছেন, বিপদ পেরিয়ে গেছে, এখন সেরে উঠবে। ওদের আশ্বস্ত করল মালু। তারপর বলল জাহেদের দিকে তাকিয়ে, তোমাকে ডেকেছে দুবার।

ওরা এল রাবুর ঘরে।

জাহেদ দেখল ভোরে যেমন রেখে গেছিল তেমনি শুয়ে আছে রাবু। শুধু রাতভর বুজে থাকা চোখগুলো এখন খোলা। সে চোখে সহজ দৃষ্টি, একটি ক্লান্ত শান্তি।

হাতের ইশারায় ওকে কাছে ডাকল রাবু।

রাবুর পাশে গিয়ে বসল জাহেদ।

পুরো গাল হাসল সেকান্দর। বলল, এই তো, আর কী, কালই হেঁটে চলে ঘুরে বেড়াবে। ব্যাস।

এবার বাকুলিয়ায় এসে এই প্রথম সেকান্দর মাস্টারকে পুরো গাল হাসতে দেখল মালু।

চোখের সেই টনটনে ব্যথাটা কখন সেরে গেছে। মাথার ভেতরে টগবগিয়ে ফোটা সে আগুনটা কখন নিভে গেছে। সমস্ত স্নায়ুতে অদ্ভুত এক শান্তি। জাহেদের মনে হল ওর মৃত্যু হয়েছিল। এইমাত্র বেঁচে উঠল ও।

৬৭.

রাবু সেরে উঠেছে।

একটু একটু করে উঠোনে, দহলিজে হেঁটে বেড়ায় ও। মক্তব আর স্কুলের শূন্য দালানে গিয়ে বসে।

বাব্বাঃ, কী যে ভাবিয়ে তুলেছিলে, কী যে হত, হাসতে হাসতে বলল মালু।

কী আবার হত? এত লোক মরেছে, আর একজন মরত? ম্লান হেসে বলল রাবু।

সে তো দর্শনের কথা হল... ইপাব তৈরিঃ আল মোস্তাইন বিল্লাহ

মালুর কথাটা শেষ হবার আগেই চেঁচিয়ে উঠেছে জাহেদ, থাম তো মালু। কেন বার বার খালি মৃত্যুর কথা বলছিস?

একটা বই পড়ছিল জাহেদ। বইটা বন্ধ করে ওদের পাশে এসে বসল। কেউ যদি বই বন্ধ করে জীবনের কথা শোনায় আমাদের, আমরা কী আপত্তি করব? কৌতুক নেচে গেল রাবুর চোখে।

মোটেই না। মোটেই না। উচ্চৈঃস্বরে সায় দিল মালু।

ওরা তিনজনে গলা মিলিয়ে হাসল, যে হাসি মৃত্যুকে অস্বীকার করে। তারপর ওরা শুরু করল জীবনের গল্প, মানুষের গল্প...হাঁ, তখন সমাজে শ্রেণী বিভাগ আসেনি। দলবদ্ধভাবে শিকার করত যা পেত একসাথে ভাগ করে খেত আদিম মানুষ... দলপতি ছিল একান্তভাবেই আজকের নির্বাচিত প্রতিনিধির মতো...। এলো গোষ্ঠীপ্রথা...গভীর মনোযোগে ওরা সবাই শুনছে জাহেদের কথা।

ওরা লক্ষ করেনি লেকু আর ফজর আলী কখন এসে বসেছে দাওয়ায়। ফজর আলীর সাথে ওর বিশ বছরের জোয়ান ছেলেটাও। আজই যেন প্রথম ওকে লক্ষ করল মালু।

কী খবর লেকু? শুধাল জাহেদ।

খবর ভালোই। বুড়ো কারি সাহেব ফিরে এসেছেন। চৌকিদার বাড়ি, সারেং বাড়ি, ভুঁইয়া বাড়ির সবাই ফিরে এসেছে।

ছেলেমেয়েগুলো? ওরা ফিরে এসেছে? বুঝি স্কুলের কথাই ভাবছে রাবু। তাই ওর ছাত্র-ছাত্রীদের কথাই শুধাল রাবু।

জি হ্যাঁ। ফজর আলীর ছেলেটাই জবাব দিল।

শালা শুয়রের বাচ্চা বেঈমান নাফরমান বেজন্মা বদমাইশ হারামখোর সুদখোর...।

বচনগুলো কানে এল আর ওরা চুপ করে গেল।

দাওয়ায় উঠে বগলের ছাতাটাকে দেয়ালের দিকে ছুঁড়ে মারল সেকান্দর। বিড় বিড়িয়ে চলল, হারামখোর বদমাইশের দল, দেশটাকে লুটেপুটে খেল। কী হল মাস্টার? শুধাল লেকু।

হবে আবার কী? যা সব সময় হচ্ছে তাই? দেখছিস না চোখে? মুখ খিঁচিয়ে লেকুর দিকেই কট মট করে তাকিয়ে রইল সেকান্দর। যেন সব দোষ লেকুর।

আহা, ব-ল-ই না, কী হয়েছে, এবার শুধাল জাহেদ।

যা সব সময় হচ্ছে তাই, বলল সেকান্দর। তালতলির হিন্দুরা চলে যাবার পর ছাত্রের অভাব, শিক্ষকের অভাব, অর্থের অভাব, এত অভাবের মুখে বন্ধই হয়ে যেত স্কুলটা, যেমন বন্ধ হয়েছে উদরাজপুর আর চাটখিলের স্কুল। বন্ধ হতে দেয়নি সেকান্দর মাস্টার। কয়েকজন ভালো মাস্টার, ওদের দেশত্যাগ করতে দেয়নি সেকান্দর, পায়ে ধরে রেখে দিয়েছে। এদিক ওদিক থেকে রীতিমতো পায়ে ধরে ধরে ছাত্র এনেছে, জাগীরের ব্যবস্থা করেছে সেকান্দর। তবে না আজ আবার গমগম করছে তালতলির স্কুল। আশপাশের পনের বিশ গ্রামের ছেলেরা এখানেই তো পড়তে আসে। ছাত্রসংখ্যা এখন চার শো। কম কথা? এই চার শোর মাঝে তিনশোই মুসলমান, সবই কৃষকের ছেলে। কম কথা?

ভেবে দেখ তো দশ বছর আগের কথা? কটা মুসলমান ছাত্র ছিল তালতলি স্কুলে?

সে তো জানি। কিন্তু এখন তুমি চটেছ কেন? ওকে বাধা দিয়ে শুধাল জাহেদ।

চটব না? ওই ওই শালা শুয়োরখোর হারামখোর.... ইপাব তৈরিঃ আল মোস্তাইন বিল্লাহ

ও? রমজানের উপর চটেছ? সকৌতুকে হাসল জাহেদ।

যখন চলছিল না স্কুলটা, ওই বদমাইশটা এক পয়সা সাহায্য দিয়েছে? উল্টো জ্বালিয়েছে সবাইকে। যেমনি জমে উঠল স্কুলটা অমনি জেঁকে বসলেন কাজি মোহাম্মদ রমজান। সেক্রেটারী হল, প্রেসিডেন্ট হল, কত-কিছু হল। মাতব্বরির তার শেষ নেই। কী আর করি। সবই সয়ে গেলাম। কত শালার লাথিই তো খেলাম জীবন ভর। থামল সেকান্দর। পকেট থেকে বের করে বিড়ি ধরাল। বিড়ির প্যাকেটটা বাড়িয়ে দিল লেকুর দিকে।

তারপর? চুম্বক কথাটা কখনও সরাসরি বলে না সেকান্দর। সেটা শোনার জন্যই অধৈর্য জাহেদ।

তারপর আর কী! শালা বলে স্কুলের নাম বদলাও, নইলে টাকা দেব না। সরকারি গ্রান্ট বন্ধ করাব।

কেন? কেন বদলাবে? কী নাম দিতে চায় ও? এবার উত্তেজিত হয়েছে জাহেদ।

শ্যামাচরণ দত্ত হাই স্কুলের নাম পাল্টে নাম হতে হবে কাজী মোহাম্মদ রমজান হাই স্কুল। নইলে টাকা বন্ধ, গ্রান্ট বন্ধ। কথাটা শেষ করে বিড়িতে ফোঁক ফোঁক দুটো টান মারল সেকান্দর। বলল আবার, এবার বুঝলে?

তুমি কী বললে? শুধাল সেকান্দর। বলেছি, অসম্ভব। সেই প্রথম যে স্কুলটা গড়ল তার নাম বদলানো চলবে না। সে কী রাগ রমজানের! পারলে আস্ত খেয়ে ফেলে আমাকে।

শেষ দম টেনে বিড়ির গোড়াটা ফেলতে গিয়ে বুঝি রাবুর দিকে চোখ পড়ল সেকান্দরের। বলল, এই দেখ, স্রেফ ভুলে বসে আছি। বহুদিন পর তালতলির বাজারে একটা কোরাল মাছ পেলাম। ভালো করে রান্না করতো। একটু মজা করে খাওয়া যাক।

মাছ ভর্তি চটের লম্বা থলেটা চেয়ারের হাতলে ঝুলিয়ে রেখেছিল সেকান্দর। থলেটা রাবুর হাতে এগিয়ে দিল। বলল আবার, নদীর মাছ নদীতেই থাকে, নদীতেই মরে। ধরবে কে? সব জেলেগুলোকেই তো দেশছাড়া করেছে শুয়রের বাচ্চা রমজান।

রাবুর তদারকিতে মাছটা রান্না করল হুরমতি। সবাই একসাথে বসে খেল। তারপরই সে দাওয়ায় বসেই গল্প জুড়ল।

গল্পের ওদের শেষ নেই। তালতলির গল্প, বাকুলিয়ার গল্প, যুদ্ধের গল্প, দুর্ভিক্ষের গল্প, দাঙ্গার গল্প, ইংরেজ চলে যাবার গল্প, রমজানের মতো এই দেশটাকে যারা ভোজবাজি দেখাল তাদের গল্প, ভিটেহারাদের গল্প সব মিলিয়ে ওদের নিজেদের গল্প। ওদের এক একটি জীবন অসংখ্য কাহিনী। সে কাহিনীর সবটুকু কেউ জানে না। মালু জানে না, লেকু আর হুরমতি কেন আর কেমন করে দূর দেশে পাড়ি দিয়েছিল, কখন আর কেনই বা ফিরে এসেছে বাকুলিয়ায়। ওই ফজর আলী। এত লোক এত কিছু করছে, এত দিকে ছুটছে, কিন্তু ফজর আলী কেন মাটি কামড়ে পড়ে আছে? মালু জানে না।

রেহানী জমিগুলো কি উদ্ধার করতে পেরেছে লেকু? বাপের কাছ থেকে পাওয়া জাম কাঠের চৌকিতে শুয়ে আজও কী স্বপ্নে দেখে ও? মালু জানে না। রোদ বৃষ্টি ঝড় তুফান মাথায় নিয়ে গোটা তল্লাট জুড়ে বটবৃক্ষের মতো যে দাঁড়িয়ে আছে সেকান্দর মাস্টার, তার কথাগুলো কী সব শোনা হয়েছে? হয়ত প্রয়োজন নেই সব কথা শোনার। কেননা একই প্রাণের সূত্রে গাঁথা ওদের জীবন। ওদের স্বপ্ন ওদের আশা-ভঙ্গ, ওদের অটুট নিষ্ঠা। সব মিলিয়ে ওরা চলমান মানুষ। কোথাও থমকে দাঁড়ায়নি ওরা।

গল্পে গল্পে রাত গড়িয়ে যায়। এক সময় লেকু আর ফজর আলীরা চলে যায়।

উঠি উঠি করেও যাওয়া হয় না সেকান্দরের। এত রাতে করবে কী বাড়ি গিয়ে? ঘুমুতে হলে এখানেই তো পাতা রয়েছে তোমার বিছানা। হাতটা ধরে ওকে বসিয়ে দেয় জাহেদ।

রাশু আসছে কাল দুপুরে। কে নাকি খবর দিয়েছে ওকে, খেটে খেটে শরীর বলে কোনো কিছু আর অবিশষ্ট নেই সেকান্দরের। তাই রাশু এত্তেলা দিয়েছে দুমাস থাকবে বাকুলিয়ায়। বলতে বলতে বুঝি সেই উদ্বিগ্না বোনটির উদ্দেশে স্নেহ ঝরিয়ে হাসে সেকান্দর।

তুই এখনও বসে আছিস রাবু? আবার অসুখ বাধাবি। যা না ঘরে। এই নিয়ে তিনবার তাম্বি দিল জাহেদ।

সেই তখন থেকেই মাথায় ঘোমটা টেনে বসে বসে ওদের গল্প শুনছে রাবু। লেকু ফজর আলীরা যাবার পর ঘোমটাটা ফেলে দিয়েছে, দেয়ালে হেলান দিয়ে পা জোড়া ছড়িয়ে দিয়েছে সুমুখে।

আমরা না উঠলে সেও উঠবে না। দাঁড়িয়ে পড়ল সেকান্দর।

না না মাস্টারজী। আপনারা গল্প করুন। ঘরে চলে গেল রাবু।

থমথমে জমাট বাঁধা অন্ধকার। আকাশের তারারাও আজ হারিয়ে গেছে অন্ধকারের আড়ালে। বিছানায় গা এলিয়েই নাক ডাকছে সেকান্দর। জেগে আছে জাহেদ আর মালু।

আশ্চর্য! এমন সময় রিহানার কথাটা মনে পড়ল? অপমান, ধিক্কার, লজ্জা। আর সেই সাথে কী এক যন্ত্রণা। অন্ধকারেই মুখ ঢাকল মালু। সব ক্ষতই শুকিয়ে যায়। রিহানার ক্ষতটাও শুকিয়ে যাবে, এখনও শুকায়নি, মনে মনে ভাবল মালু।

আরও আশ্চর্য! জাহেদ জেনেছে সবই। কেমন করে কার কাছ থেকে সে প্রশ্ন অবান্তর।

সরাসরি কিছু বলল না জাহেদ। বলল ইঙ্গিতে। জানিস মালু? এক ধারায় নয়, বহু ধারায় প্রবাহিত মানুষের জীবন। যদি শুকিয়ে যায়, যদি রুদ্ধ হয় একটি ধারা আর এক ধারায় জীবন বয়ে চলে সার্থকতার পানে। এটাই জীবনের ধর্ম। সহস্র ধারায় জীবনের বিকাশ, অজস্র পথে তার পূর্ণতা।

গভীর এক প্রত্যয়ের আহ্বান হয়ে কথাগুলো বাজে মালুর কানে।

অন্ধকারে দেখা যায় না জাহেদের মুখটা। তবু সেদিকে চোখ ফেরায় মালু। বলল, আমি জানি মেজো ভাই। সে জীবনবোধ তো তোমার কাছ থেকেই পেয়েছি।

অন্ধকার এলোমেলো করে আবারও বাতাস বইল। নিথর মৌনতা ভেঙে সচকিত হল গাছের পাতারা।

ওরা ঘুমিয়ে পড়ল। ইপাব তৈরিঃ আল মোস্তাইন বিল্লাহ

মালুর মনে হল ঘুমিয়েও বুঝি জেগে রয়েছে ও। ওর চোখের সুমুখে হেঁটে চলেছে ওর জীবনটা। ঘাসে ঢাকা আলোর পথ, কর্দমাক্ত কোনো গ্রামের রাস্তা। ঘাস মাড়িয়ে, কাদা ভেঙে মালু উঠে এসেছে উঁচু সড়কের শক্ত মাটিতে। প্রশস্ত উঁচু সড়ক। সেখানে চেনা অচেনা কত মানুষ। রাবু, জাহেদ, সেকান্দর মাস্টার আরও অনেক যাদের কাউকে চেনে না মালু, কাউকে বা চিনেও চিনতে পারছে না মালু। ওরা চলছে। ওদের আর চলার শেষ নেই। অন্ধকার ছিল। অন্ধকারের বুক চিরে কখন তারার আলো চোখ মেলেছে। তারপর তারার উজ্জ্বল চোখগুলো এক সময় নিষ্প্রভ হল। সূর্য উঠল। স্নিগ্ধ ঔজ্জ্বল্যে নিরুপম ভোরের সূর্য।

বুঝি রোদের ছোঁয়ায় আলগা হল মালুর চোখের পাতা। চোখ মেলে ও দেখল, ঘন ঘন সিগারেট টানছে জাহেদ আর অবিরাম ধোঁয়া ছাড়ছে। কানে এল সেকান্দরের গলা, পরমাত্মীয় কিনা? তাই তোমার স্বাস্থ্যের খোঁজ নিতে এসেছে। যাও একবার স্বাস্থ্যটা দেখিয়ে এস।

উত্তরে সিগারেটে আরও ঘন ঘন কয়েকটা টান মারল জাহেদ। কুণ্ডলী পাকানো ধোঁয়ার দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। বিরক্তি ভরে ছুঁড়ে মারল আধপোড়া সিগারেটটা।

কোন্ পরমাত্মীয় কোত্থেকে কেনই বা এসেছে তারা, কিছুই বুঝল না মালু। শুধু দেখল সেকান্দর আর জাহেদ, ওদের দুজনের মুখই অস্বাভাবিক গম্ভীর, চোখময় অমঙ্গলের ছায়া।

কাচারীর দিকে উঠে গেল ওরা। মালুও এল পিছু পিছু।

ও, আপনি জাহেদ সাহেব? সেলামাইলাইকুম। দারোগারা, একে একে হাত মিলালো জাহেদের সাথে।

মশাই কম ভুগিয়েছেন আপনি? দিনের পর দিন সারা দেশ তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়াচ্ছি আপনাকে। আর আপনি কিনা স্বগ্রামে স্বগৃহে বহাল তবিয়তে বিরাজ করছেন? সত্যি জাহেদ সাহেব, দারুণ বোকা বানালেন আমাদের। প্যান্ট কোট পরা এক তরুণ কিছু হাসি, কিছু অবজ্ঞা মিশিয়ে বলল।

বোকা আমিও কম হলাম না, স্বগতোক্তির মতো বলল জাহেদ।

এখন চলুন তো, বলল আর একজন।

না না এক্ষুণি নয়। তাড়াহুড়োর কিছু নেই। আপনি যখন রেডি হবেন তখুনি যাব আমরা। তরুণকে পাশে সরিয়ে আর এক প্রৌঢ় অফিসার বললেন এবং স্বাভাবিকভাবেই হাসলেন।

দেরি করে লাভ নেই। অযথা পুড়তে হবে রোদে। আপনারা বসুন। পাঁচ মিনিটে রেডি হচ্ছি আমি।

ওরা ফিরে এল ভেতর বাড়ি।

ঘুম থেকে সবার আগেই উঠেছিল রাবু। সবার আগেই বুঝতে পেরেছিল ও। ওই জাগিয়েছিল সেকান্দরকে।

নিঃশব্দে সুটকেসটা গোছাচ্ছে রাবু। পায়জামা লুঙ্গি সার্ট প্যান্ট তোয়ালে। সেভিং সেট কাঁচি আয়না সাবান।

মশারি, টুথপেস্ট, টুথব্রাস। দিয়েছিস তো? পাঞ্জাবিটা পরতে পরতে শুধাল জাহেদ। কাছে এল। কাঁধে হাত রাখল রাবুর।

ছিঃ তুই কাঁদছিস?

কই না তো? কাঁদছি কোথায়? সুটকেসের ডালার আড়ালে মুখ লুকাল রাবু। ব্যস্ততার ভানে গোছানো জিনিসগুলোকে আবার অগোছালো করল। জোর করেই রাবুর মুখটা হাতের কোষে তুলে নিল জাহেদ। বলল, তোর চোখে আমি আর অশ্রু দেখতে চাই না, রাবু। কাঁদবি না। কথা দে?

দিলাম।

লেকু, ফজর আলী, ট্যান্ডল-বৌ, ভুঁইঞা বাড়ি আর মৃধা বাড়ির যারা ফিরে এসেছে গ্রামে তারা, ওরা সবাই এল। বড় খাল অবধি এগিয়ে দিল জাহেদকে। বড় দারোগা গেছিলেন কাজি বাড়ি পদধূলি দিতে। পদধূলি দিয়ে এবং নাস্তা খেয়ে ফিরে এসেছেন তিনি। কিন্তু জীপটা আসেনি, যন্ত্রটা বিকল। রমজানের জীপ বা গাড়িতে চড়বে না জাহেদ। অতএব বড় দারোগার গোমড়া মুখ অগ্রাহ্য করেই সাম্পানে যাওয়াই সাব্যস্ত হয়েছে। দোহাই তোমার, রাবু আপা। প্রসন্ন মুখে বিদায় দাও মেজো ভাইকে। কিন্তু রাবুর কানে বুঝি পৌঁছল না কথাগুলো। সুমুখে দত্ত দীঘির তালসারি। তালসারির মাথায় আকাশের দিগন্ত। সে দিকেই চেয়ে রয়েছে রাবু।

রাবু আপা। দোহাই তোমার, একটু হাস। আবারও বলল মালু। ততক্ষণে সাম্পানে উঠেছে জাহেদ। সাম্পানে দাঁড়িয়ে হাসছে আর বলছে, মাস্টার, আবার আসব আমি।

হ্যাঁ হ্যাঁ এসো। আজ থেকে রাবুর স্কুলে আমি জয়েন করলাম। বুঝলে?

চেঁচিয়ে বলল সেকান্দর।

হ্যাঁ তাই কর।

রাবুর দিকে তাকিয়ে হাত তুলল জাহেদ। বলল, আসি।

অশ্রু টলটল রাবুর চোখ। টপ টপ করে ঝরে পড়ল দুটো ফোঁটা। রাবু হাসল। বলল এসো।

সাম্পান পৌঁছে গেছে মাঝ গাঙ্গে। পকেট থেকে রুমাল বের করল জাহেদ। উড়িয়ে দিল নিশানের মতো। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলল, চিন্তা করিসনে রাবু, আমি ফিরে আসব। আমি আসব।

বড় খালে জোয়ার এসেছে। জোয়ারের টানে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল সাম্পান। কল কল জোয়ার বড় খালে। শাঁই শাঁই বাতাসের দাপাদাপি বড় খালের বুকে, দখিন ক্ষেতে। সব কিছু ছাপিয়ে রাবুর কানে এসে বাজে শুধু একটি কথা–আমি আসব। আমি আসব।

ইপাব তৈরিঃ আল মোস্তাইন বিল্লাহ

Table of Contents

০১-০৫
০৬-১০
১১-১৫
১৬-২০
২১-২৫
২৬-৩০
৩১-৩৫
৩৬-৪০
৪১-৪৫
৪৬-৫০
৫১-৫৫
৫৬-৬০
৬১-৬৫
৬৬-৬৭